ও কাঞ্চনে বদ্ধ আবার তাঁর দয়া হইলেই ঐ সংসারী জীব মুক্ত হয়ে যায়, এই বলিয়া ঠাকুর গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন—

গান—মহামায়া—বন্ধনমুক্তিদায়িনী

শ্যামা মা উড়াচ্চো ঘুড়ি, সংসার বাজারের মাঝে।
(ঐ যে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, (তাতে) পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ী স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার বাজার মাঝে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

"তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা, তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী, লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সকলকে সাংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুলে আর দৌড়া দৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে খেলা হয় কেমন করে? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চল্‌লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়।

"তাই, লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতপাপড়ি।

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন 'যা এখন সাংসার করগে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হলে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়। এই বলিয়া ঠাকুর আবার গান গাইতে লাগিলেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা, খেলেনা সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে, খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁকঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি॥
তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে।
'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরি আঁকঠারি।'

(কর্ম্মযোগ। সংসার ও নিষ্কাম কর্ম্ম।)

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারেমাতে (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেসি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ পাঁচে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ দশে আছো। বেসি কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য।)

"সত্য বল্‌ছি,তোমরা যে সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপবে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নালে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই হবে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজি পড় তো অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট, গড়েবমাঠ। (সকলের হাস্য।) আবার পায়ে বুট্‌ জুতা; শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তাহলে অমনি শোলোক্‌ ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথা, বার্ত্তা, চিন্তা, হয়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো তাহা হলে ঈশ্বর চিন্তা, হরি কথা এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার আর এক পাশে সন্তান; একজনকে এক ভাবে আদর করে; আবার সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন!

(ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।)

"মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। 'আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমার আবার বাঁধে কে?' যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' জোর করে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ-নই' 'আমি বদ্ধ নই,' 'আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'!

(কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' বার বার বলে সে শ্যালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি!' কৃষ্ণ কিশোর পরম হিন্দু; সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিছলো, একদিন ভ্রমণ করতে২ তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলো একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত মুচি, কৃষ্ণ কিশোর বল্লে, তুই বল শিব।

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম্ম যাহা করেছি, আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম মাহাত্ম্য গান গাইতে লাগিলেন—

গান।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশিগো ব্রাহ্মণ, হত্যাকরি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশিনারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পরি।

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; আর বলেছিলাম 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য,

আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

(ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি ॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এই সংসার 'ধোঁকার টাটি' রামপ্রসাদ বলেছিল। কিন্তু হরি পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করলে এই সংসারই আবার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।"

"জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি। সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।" (সকলের হাস্য।

(ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা। গৃহস্থের সাধন।)

"কিন্তু ফস্‌করে জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক এক বার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্যে তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি একদিনও অবসর পেয়ে নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকের মাগ ছেলের জন্যে এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে বল? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের ভিতর বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মনস্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকেনা। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

"রোগটী হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করাতে চাও, তাহা হলে ওকে ওঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই, ভাল মুখে জল সরে। কাছে আনতে হয় না। এরূপ জিনিষ ও ঘরে রয়েছে। যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে তবে সংসার কত্তে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি অনেক কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে আর কুমীরের ভয় থাকেনা। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ

নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ অনিত্য, দুই দিনের জন্য। এইটী বোধ।

"আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপরে যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোনো।

বংশীবাজিল ঐ বিপিনে।
(আমারতো না গেলে নয়)
(শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কিনা যাবি বল গো॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা সই॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বল্লেন,রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টান টুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

"ব্যাকুলতা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(সর্ব্বভূতহিতেরত।)

ভাঁটা পড়িয়াছে। অগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে, পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়িয়া আসিতে। কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল, অনেকের তাহাই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছে। কোন্ দিক্ দিয়ে সময় যাইতেছে হুঁস নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়িনারিকেলের আয়োজন করে এনেছিলেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে, বিজয় ও কেশব দুজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর উভয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

যেন, দুজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ কেমন জানো যেমন শিবরামে যুদ্ধ। (সকলের হাস্য)। শিব রামের গুরু। যুদ্ধও হোলো আবার দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেত গুলো আর রামের বানর গুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না (সকলের উচ্চ হাস্য)।

"আপনার লোক। তবে এরূপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

"আবার জানো, মায়ে ঝীয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে; যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটী সমাজ আছে আবার ওরও একটী দরকার। (সকলের হাস্য)।

"তবে এসব চাই। যদি বলো ভগবান লীলা করেছেন, তবে জটিলে কুটিলের কি দরকার। জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয়না (সকলের হাস্য)। জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না (উচ্চ হাস্য)।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগ্‌ল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।

(গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ)

সকলে আনন্দ করিতেছেন।' আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেশবকে সম্বোধন করিয়া

বল্লেন, তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করোনা, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর সত্বগুণ বেশী;কারু রজোগুণ বেশী,কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য।)

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি,আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?

(ব্রাহ্মসমাজ ও আদেশবাদ)

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তবে যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুক-দেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ্ তো জানো। যতক্ষণ কাঠে জাল ততক্ষণ দুধ ফোঁসকরে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে আর কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে! এই এখানটা কুয়া খুঁড়চে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, আবার ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো। এই রকম! আবার, মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথাকন্। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়! শুধু লেক্‌চার? ঐ দিনকতক লোকে শুন্‌বে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ করবে না।

"ও দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পারে রোজ সকাল বেলা লোকে বাহ্যে করে রাখতো। যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব গালাগালি দেয়। কিন্তু আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামেনা (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না।' তখন সব বন্দ হলো (হাস্য)।

"যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস থাকা চাই। তানা হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে (হাস্য)। তাতে হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হলে তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেহ কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

"আদেশ না থাকলে, 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয় আমি কর্ত্তা*। 'ঈশ্বর কর্ত্তা' 'ঈশ্বরই সব করছেন আমি কিছু করছিনা', এ বোধ যদি হয়, তাহলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থেকেইতো যত দুঃখ অশান্তি।

* অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।

(কর্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু! আর তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো'। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিন তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত। যত দিন না ঈশ্বর লাভ হয়, ততদিন কি সব কর্ম্ম ত্যাগ করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, কর্ম্ম ত্যাগ করবে কেন? তাঁর চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কর্ম্ম এসব করতে হবে।

ব্রহ্মজ্ঞ। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তাও করবে, সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে বেশী কর্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই, মনে করছি নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।"

"শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে দানই কর্ত্তে লাগলো, কালী দর্শন আর হলো না। (সকলের হাস্য)। আগে জোঁসোকরে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন কর্ত্তে হয়, তার পর দান যত কর, আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব কোরো। কেননা ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি তুমি বলবে, আমার কতকগুলা হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী করে দাও। (সকলের হাস্য) ভক্ত কখনও তা বলে না, বরং বলবে 'ঠাকুর আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, পাদ পদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করতে বলেছে, তাও কলিকালে করা বড় কঠিন। এখন অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশী দেরি সয় না। তাই এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। "(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তি-যোগ। তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য। তোমা-দের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। তোমরা ও রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। আর তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল-হয়ে তাঁকে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথী বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টার

ও দু একটী ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ তিনি কই?'—অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে প্রস্তুত হইলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরাজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছেন। অট্টালিকা গুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্র কিরণে বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের দ্বার দেশে বাষ্পীয় দীপ—কক্ষ মধ্যে দীপমালা—স্থানে স্থানে হারমোনিয়াম্, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ বল্লেন, 'আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?' তখন কি করা যায়! নন্দলাল (India Club) ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্য, জিজ্ঞাসা করিলেন 'গ্লাসটী ধোয়াতো,' নন্দলাল বল্লেন হাঁ। তখন সেই গ্লাসেই জল খাইলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকলতাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। সুরেশ ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেশ বাড়ী ছিলেন না, নূতন বাগানে গিয়াছিলেন। বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিল।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেশ থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর বল্লেন একজন ভক্তকে, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেনা। ওরা কি জানেনা ওদের ভাতারবা যায় আসে?' (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র ঐ পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে একজন ভক্তকে পাঠালেন।

এদিকে বাড়ীর লোকেরা দুতালার ঘরে ঠাকুরকে লইয়া বসাইলেন। ঘরের মেজ্যাতে চাদর পাতা, দু চারটা তাকিয়া তার উপর রহিয়াছিল। কক্ষ প্রাচীরে সুরেশের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত Oil painting; যাহাতে কেশবকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিতেছেন, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বল্লেন,

"আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজ করে বেড়াতে গিছলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল।" মাষ্টার কে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লেন, "একে জিজ্ঞাসা কর কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায় ঝীয়ে মঙ্গলনার, আর জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই

হয় না।” এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?

মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেশ ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশ হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন, নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

লক্ষী পূর্ণিমা-জগৎহাসিতেছে। কি সুন্দর রাত্রি! একজন ভক্ত ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ দিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—

“বড় হাসি পাচ্ছে—হালদার পুকুরের চাপরাসীর নোটিসের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের কাছে আদেশ না পেয়ে লোক শিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বটে। ঠাকুর কেশবকে উপদেশ দিলেন কেমন ভাবে! ‘আমি খাই দাই থাকি, সব আমার মা জানেন’। অথচ গুরু গিরিকে নিন্দা করা হলো, বল্লেন ‘গুরু, কর্ত্তা, আর বাবা, এই তিন কথাতে আমার গায়ে কাঁটা বিঁধে’। আবার কেউ যে মনে গড়ে বলবেন, আমার আদেশ হয়েছে, আমি এইবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তাও হবে না। সে কেবল আপনাকে ঠকানো। মনে মনে একটা ভাব কি বিশ্বাস জম্মালো—তাতে আদেশ হয় না! ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর যথার্থ সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন! তিনি দেখা দিয়া যদি বলেন, ‘তুমি লোক শিক্ষা দেও, তার নাম আদেশ’। আর ঈশ্বরকে না জেনেই বা lecture দিতে যাওয়া কেন? সত্যই তো এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি নাই—যাদের lecture দিচ্ছি তাদের কি প্রকৃতি, কিরূপ রোগ জানি না। ‘যদি ছিল রোগী বসে বদ্যিতে শোয়ালে এসে’। কাণা কাণাকে পথ দেখাবেন। না দেখিয়ে ছাড়বেন না! আর ১০ জনে যাই বাহবা দিয়েছে, অমনি lecturer মনে করেছেন, ‘ঠিক বলেছি’। কি ভুল! ঠাকুর ঠিক বলেছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজুগে, এই একজনকে বড় বল্‌ছে, আবার দুদিন পরে আর একজনকে বড় বল্‌ছে, আর তাকে ভুলে গেছে। এই হুজুগে যে ভোগে তার দফা রফা দেখিতেছি।

“কেশবকে বল্লেন, ‘তোমরা এতো ‘পাপ ‘পাপ’ করো কেন’? এতদিনে একটা চট্‌কা ভাঙলো। স্কুলে যখন পড়ি তখন ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বসি। বরাবর শুনছি ‘পাপ’ ‘পাপ’। আজ কাল কেশবের মুখে একটু কম পড়েছে। আমাদের আজ কালের ধর্ম্ম দেখ্‌ছি সব খ্রীষ্টানদের কাছে শেখা। তাও ভালকরে শেখা নয়। যিশু, সেকালের আর নিজের দেশের লোকের যা দরকার, তাই বলেছিলেন। ‘অনুতাপ করো, তা না হলে পাপের শাস্তি পাবে—নরক হবে।’ খ্রীষ্টানধর্ম্ম দাঁড়িয়েছে এই, যিশুকে ধরো তবে ‘উদ্ধার’ হবে ‘পরিত্রাণ হবে’। হিন্দুধর্ম্ম ঠাকুরের মুখে শুনছি, সনাতন ধর্ম্ম! এতে পাপের কথা আছে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথাও আছে। কিন্তু কেবল ‘পাপ’ ‘পাপ’ এই কথা নেই। প্রধান

কথা, ঈশ্বরকে ভক্তি করো, সব অন্য আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ভালবাসো। যেমন শুকদেব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ভাল বেসেছেন। যেমন ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ভালবেসেছেন।

"সনাতন ধর্ম্মের কি শিক্ষা! ঠাকুর বল্লেন, ভক্তে বলে 'তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!'—ভগবানের নামে দেহ মন শুদ্ধ হয় বলে, পাপ পালিয়ে যায়—পাপের পাহাড় তুলার পর্ব্বতের ন্যায় নামাগ্নিতে একক্ষণে পুড়ে যায়। আহা কি গান!

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে
গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি
বিনাশি নারী।
এসব পাতক, নাভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ
নিতে পারি॥

"কৈ শ্রীগৌরাঙ্গ ও তো পাপের কথা তুলতেন না! কেবল তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন। কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসবার কথা। কেবল ভজনানন্দ, প্রেমানন্দ; নিশিদিন হরি-প্রেমে মাতোয়ারা। ঠাকুর ও জীবকে শিখাচ্ছেন, 'ঈশ্বরকে ভালবাসা, এরিনাম 'ধর্ম্ম' (religion) তাঁর প্রেমে ডুব দাও, মরবে না, সে প্রেমসাগর অমৃতের সাগর'।

"আবার মনে হচ্ছে উপনিষদের কথা—'কে এ সৌম্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি মানুষ না দেবতা!' এঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, সকলেই আসে দেখছি। শাক্ত বাউল, বৈষ্ণব, সকলেই বলে, ইনি আমাদের লোক! ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি, কিন্তু সব দলের লোকেরা, দলপতিরা, আসে আর বলে, ইনি আমাদের! ইনি কেশবের, আবার ইনি বিজয়ের!

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নো
দ্বিজতে চ যঃ"।
এ সৌম্য কে রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতেরত
ইনি কে?

সাকারবাদীরা জানে, ইনি পাকা সাকারবাদী। নিরাকারবাদী ইদানীন্তন ব্রহ্মজ্ঞানীরা জানেন, উনি নিরাকারবাদী। যদি সাকারবাদী, নিরাকারবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলেন 'দেখ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালী মানেন' তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন "সে কালী মানে কি আপনি জানেন? তাঁর 'কালী' মানে আলাদা; সে গভীর তত্ত্ব; আপনারা বুঝবেন না।" এরই নাম কি যিশু যা বলেছিলেন, "Be perfect as your Father in heaven is perfect'? ঈশ্বরের সূর্য্য সুহৃৎ মিত্র-অরি-উদাসীন-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর আলো দিতেছেন! এ বিশ্বজনীন ভাব কি সামান্য মানুষের হতে পারে? সামান্য মানুষ 'ধর্ম্মপ্রচার' করে কিন্তু লোক রঞ্জন করিতে, লোকমান্য হবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত—দলাদলি করে ফেলে! আবার, এই মহাপুরুষের কি নিরহঙ্কার। সামান্য লোকে শিক্ষাদিতে গেলেই 'আমি শিক্ষা দিতেছি' এই অভিমান এনে ফেলে। এঁর ভাব 'আমি যন্ত্র, ঈশ্বর যন্ত্রী,'—গুরু একমাত্র তিনি।

কিরূপে লোক শিক্ষা দিতে হয়, সেইটী দেখাবার জন্য, কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, এইটী জীবকে দেখাবার জন্য, ঈশ্বর নিজে কি নরদেহ ধারণ করে এলেন নাকি? ব্রাহ্ম ভক্তদের গানে যে আছে 'নরহরি' ইনি কি তাই? "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এ কি তাই?

"ঈশ্বর কি মানুষ হন? অনন্ত ঈশ্বর সাড়ে তিন হাত মানুষ? হিন্দুরা তো

বলেন; অবতার। খৃষ্টানরাও বলেন—যিশুর কথা। শুনেছি ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তা হলে তাঁর শক্তিতো সব তাতেই অবতীর্ণ। তবে একটা কথা আছে, জল সব জায়গায় আছে বটে—মাটী খুঁড়ে গেলেই জল বেরোয়। কিন্তু সকলে মাটী খুঁড়ে জল নিতে চায় না, পারেও না। তাই নদী, পুষ্করিণী, কূপের কাছে যায়। ঠাকুর বলছেন যে, ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তবে উত্তম ভক্তও আছে, মধ্যম ভক্তও আছে, অধম ভক্তও আছে। যদি ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ দেখতে হয়, তবে একপ রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতেরত, হরি প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক বৈরাগী, আবার সর্ব্বদা সমাধিস্থ আদর্শ মানব মহাপুরুষেই দেখা সুবিধা। তাই বুঝি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে লিখেছেন যে, 'হয় যমনিয়মাদি ষড়াঙ্গ যোগ অভ্যাস কর, নয় কোন মহাপুরুষের সর্ব্বদা ধ্যান চিন্তা কর। দুইয়ের মধ্যে একটী উপায় অবলম্বন করিলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হবে, ঈশ্বর দর্শন হবে।'

"অহেতুক কৃপাসিন্ধু! সংসারী লোক বলিয়া ঘৃণা নাই! মার কাছে শাশ্রুনয়নে বলছেন, 'মা আমি কি এদের ব্যাডার ভিতর থেকে বাঁচাতে পারি'! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু' এই কথা বোলে সংসার ত্যাগ করতে বল্লে, কোন্ সংসারী শুনবে বা করবে? ঠাকুর বুঝেছেন তাদের 'problem' বড় কঠিন। Fool! here is thy ideal or nowhere'.* তাই বলছেন," সংসারেতেই থাকো, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকবে, 'শুদ্ধাভক্তি দাও, দেখা দাও' এই বলো।" আর অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতে বলেছেন। "আমি অধম, আমি পাপী, আমি বদ্ধজীব, এ সব কথা দূর করে দাও, তাঁর নামে বিশ্বাস করো, অমনি শুদ্ধ হবে; দুর্ব্বলের ন্যায় মিউ মিউ কোরো না; বল আমি মুক্ত, আমি মায়ের ছেলে, রাজরাজেশ্বরীর ছেলে, আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি, আমার কি ভয়, আর নিষ্কাম কর্ম্ম করবার শক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করো।" আহা কি অভয় দান! গৃহস্থের পথ কঠিন বটে, কিন্তু ভয় নাই। ঠাকুর যা শিখালেন, এই ধর্ম্মের এতটুকুও সত্য সত্যই মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে।† আবার, "তোমাদের সংসার ত্যাগ করতে হবে না, তবে মন রেখো তাঁর পাদপদ্মে; নির্জ্জনে ব্যাকুল হয়ে ভেবো, সময় হলে তাঁর দর্শন পাবে।"

"ঈশ্বর দর্শন কি? ঈশ্বর দর্শন করলে কি হয়? কি অবস্থা হয়? বোধ হয় এই মহাপুরুষের অবস্থা হয়!

'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!—কি সুন্দর রাত্রি। (এইবার ভক্তটী গান ধরিলেন—নরেন্দ্রের গান —

কি সুখ জীবনে ও হে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে॥
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে।
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে॥
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদবদনে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাইহে॥
কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতি দেখ আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয়হে॥

"কি সুন্দর রাত্রি! (আবার গান)

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকা মণ্ডিত চমকে মোতিরে।

* Carlyle.

† নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

"চন্দ্র তারামণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল। যেন বৃহৎ পুষ্পপাত্রে ফুলন্ত জ্যোতিঃ অসংখ্য কুসুম। বুঝি চরাচর বিশ্বের এক সঙ্গে পূজা হচ্ছে। শীতল শারদ সমীরণ। 'পবন চৌরি করে'। গ্রহগণের নৃত্যগীত। Pythagoras বলেছিলেন। সকল লোক গায় 'ধন্য! তুমি ধন্য! এই গীতি অনিবার।' সাধু মহাত্মারা কেউ সমুদ্র প্লাবিত নদীকূলে, কেউ প্রান্তরে, কেউ গিরিগুহার বাহিরে আসিয়া, কেহবা মানসসরোবরে এই পূজা দেখিতেছেন, আর কত স্তব স্তুতি করিতেছেন। মা সাক্ষাৎকার হয়ে পূজাগ্রহণ কর্‌ছেন, সন্তানদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, বরাভয় দিবেন। মা বিপদনাশিনী, ব্রহ্মময়ী, ভক্তিদায়িনী' —

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মিকে।
সর্ব্ববেদান্ত সংসিদ্ধে নমোহস্তু তে ॥

"মধুমান্ আকাশ, মধুমান চন্দ্র, মধুমৎ নক্ষত্র, মধুমৎ জগৎ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। সব মধুময়। সুন্দর নগরী, সুন্দর সৌধধবলিত গৃহ, সুন্দর রাজপথ, সুন্দর মানুষ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা! জগৎপ্রসবিনী আবার জগতেই রয়েছেন। সর্ব্বব্যাপিনী। মাকড়সার জাল মাকড়সা বার করেছে, আবার মাকড়সা সেই জালের উপর আছে। শুধু উপরেই বা কেন? উপরে, অন্তরে, বাহিরে।

"কিন্তু মাকড়্সা আবার জাল নষ্ট করে; খেয়ে ফেলে! এ সব কিছুই থাকিবে না! জীবের বিনাশতো রোজ দেখা যাচ্চে। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন, প্রলয় হয় মাঝে মাঝে। এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জীব, জগৎ কিছুই থাকবে না! আকাশ, কাল, এ সবও থাকবে না? ঐ যা! সব গোল হয়ে গেল। কে বুঝিবে! বুদ্ধির অতীত!

"এই সুন্দর লীলারসতরঙ্গ—হয় যায়! মা লীলাময়ী জগৎ সৃষ্টি করেন। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহং, এ সব সৃষ্টি করেন। আবার পালন করেন।

জগৎ অ-ধ জনপালিনি জনমোহিনী জগৎজননী।

বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারাবতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস! শুনিতে পাই কতই লীলা হ'ল। গোপীপ্রেম। দুষ্টের দমন; শিষ্টের পালন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে ফল সমর্পণ। রাজ্যশাসন। কত কাণ্ড হলো! কিন্তু লীলা সাঙ্গও হলো। 'হে উদ্ধব!* এ সংসার মিথ্যা, এই যে সব লীলা দেখ্‌লে এ সব মায়া। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তুমি আমার বড় প্রিয় তাই তোমায় বল্‌ছি। এখানে আর থেকো না। যাও বদরিকাশ্রমে। সেখানে পরব্রহ্মের চিন্তা করগে। আমি লীলা সম্বরণ কর্‌বো। যদুবংশ ধ্বংস হবে।'

কে সেই পরব্রহ্ম? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁকে মহাকালী, নিত্যকালী বল্লেন? যিনি প্রলয়ের সময় 'ন্যাতাকাতার হাঁড়িতে' ব্রহ্মাণ্ডের বীজ তুলে রেখেছেন! যিনি দেশ কালের অতীত, যিনি গুণের অতীত, যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ! প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। কেবল তিনি। নরেন্দ্রের সেই গান—

রূপ অরূপ নামবরণ, অতীত আগামী কালহীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।

নিবিড় আঁধার। মা নিরাকারা। এই সুন্দর চন্দ্র নাই, শারদকৌমুদী নাই, সূর্য্য নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, অহং নাই! মহাকালী মহাকাল!

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
অস্ফুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে,

* শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশ স্কন্ধ।

উঠে ভাসে ডুবে পুন, হেরি বিশ্ব চরাচর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা নিরন্তর;
সে ধারাও রুদ্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ মনসোগোচর বুঝে প্রাণ বুঝে যার॥

"নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গেল। একটু নেমেই গলে গেল কে তার খপর দেয়! ওমা এতো সব মিথ্যা! কেবল তুমি, তুমি! সে দিন কবে হবে! ঠাকুরের গান মনে পড়ছে;—

কবে সমাধি হবো শ্যামাচরণে
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।

"কিন্তু যতদিন দেহবুদ্ধি রাখবে, ততদিন যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি থাকে। আর যেন তোমার শ্যামাকালী, রক্ষাকালী বরাভয়দায়িনী চিন্ময়রূপ দেখতে পাই। যতদিন এই মায়াময় সংসার সত্য বলে বিশ্বাস করাবে, ততদিন যেন এ সমস্তই তোমার সত্তায় সত্ত্ববান্ এইটী বোধে বোধ হয়। দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যখন তুমি দূর করবে তখন যা তোমার ইচ্ছা তাই হবে। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

ভক্তটী অনেক রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। এমন রাত্রে জাগরণ বিধি! কি মনোহর রাত্রি! এই মহাপূজাকালে কে নিদ্রা যাইবে? তিনি দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি রেখে দিয়েছেন, অতএব আমি কেন না এই মহাপূজায় যোগদান করিব? আমিতো মায়া দেখ্‌ছি না; স্বপ্নবৎ দেখ্‌ছি না; জীব জগৎ সব সত্য দেখ্‌ছি। এই মহালক্ষ্মী পূজা আমারই জন্য।

অযুত তারকা চমকে রতন কাঞ্চন-হার
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, (হায়) পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার।
হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য! ধন্য! এই গীতি অনিবার।

রাজা সুবোধ নারায়ণ।

রাজা সুবোধ নারায়ণ শ্রীহট্টস্থ প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অন্যতম। কিন্তু কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তি বলে তাঁহার নাম ভিন্ন দেশীয় দূরে থাকুক, স্বদেশীয়দের মধ্যেই লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তাঁহার বংশধরেরাই কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার নামের সহিত শ্রীহট্টস্থ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিশেষ সম্বন্ধ বিজড়িত। বহু আয়াসে উক্ত রাজার সম্বন্ধে তাঁহারই বংশধর বিষ্ণুপুর-নিবাসী স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার মহাশয় যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই স্থল বিশেষে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অতি সংক্ষেপে আমি প্রকাশ করিলাম। ক্রমে সুবোধ নারায়ণের বংশীয়দের নামধাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

অতি প্রাচীন কালে শ্রীহট্টের অধিকাংশ স্থল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহামহিমান্বিত বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ খ্যাত নামা স্বর্গীয় আদিধর্ম্মপা মাণিক্য বাহাদুর ৫০ ত্রিপুরাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া যজ্ঞ করণে অভিলাষী হন। কিন্তু তৎ সময়ে স্বদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল বলিয়া ৫১ ত্রিপুরাব্দে মৈথিলাধিপতি স্বর্গীয় বল্লভচন্দ্র সিংহকে অনেক

অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার অধিকৃত কান্ত-কুঞ্জের ইটোয়া গ্রাম হইতে চতুর্দ্দশ গুণ সম্পন্ন বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রীয় শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম নামক পাঁচজন বৈদিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ প্রত্যাগমন পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাধিপতিরই অধীনতায় বাস করার জন্য উক্ত মহারাজ ব্রাহ্মণপুঙ্গবদিগকে বিশেষ স্তব স্তুতি করায় তাঁহারা মহারাজের আশ্রিত ভাবেই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে স্বদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক ত্রিপুরা মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরে আসিয়া মহারাজ আদিধর্ম্মপা মাণিক্য বাহাদুর হইতে পঞ্চান্ন (৫৫) ত্রিপুরাব্দের মাঘী পূর্ণিমা দিনে "পশ্চিম ও উত্তরে ক্রোশিবা (কুশিয়ারা) নদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হাঙ্কালা কুকীর অধিকৃত স্থান" এই চতুঃসীমার অন্তর্গত 'টেঙ্গরী কুকী কর্ষিত' ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ ক্রমে তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ সব্‌ডিবিসনের অন্তর্গত পঞ্চ পরগণাই অধুনা উক্ত ভূখণ্ডের পরিচায়ক। উক্ত ভূমির দান পত্রের অনুলিপি যে তাম্রফলক আজ ও ত্রিপুরারাজধানীতে বর্ত্তমান, তাহাতে এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম্মপা,
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু।
বৎস বাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ।
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমাঃ।
প্রতীচ্যা মুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিকা নদী।
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কালা কৌকীকাপুরী॥
এতন্মধ্যস্থ সমগ্রাং বাং টেঙ্গরী কুকী কর্ষিতাং।
প্রদত্তা ময়া ভবদ্ভ্যশ্চিরেষু পঞ্চ তপস্বিষু।
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা।"

উক্ত তপস্বিগণ কথিত পঞ্চখণ্ড পরগণাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমশঃ তদ্দেশবাসী কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মদ্‌গুল্য, স্বর্ণ কৌশিক ও গৌতম এই পাঁচ গোত্রীয় সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক সহ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি উক্ত বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মদ্‌গুল্য, স্বর্ণ কৌশিক ও গৌতম এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইহাঁদের স্বাক্ষর ব্যতীত কোন বিধি ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত নাই। ইহারা শ্রীহট্টে "বৈদিক সাম্প্রদায়িক" বলিয়া খ্যাত আছেন। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি সহকারে ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ সম্প্রতি চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য ও শিকদার প্রভৃতি উপাধিধারণে পঞ্চখণ্ড, ঢাকাদক্ষিণ, বেঙ্গা, ব্রহ্মচাল, লংলা ইটা, ছয়চিরি, সাতগাঁও, বালিশিরা, তরপ, বুরুঙ্গা প্রভৃতি পরগণাতে বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত বাৎস্য গোত্রীয় তপস্বী আনন্দের বংশীয় নিধিপতি ভট্টাচার্য্য নামক সুধী পুরুষ স্বীয় কৃতিত্ব বলে মহারাজ আদিধর্ম্ম পা মাণিক্য বাহাদুরের বংশোদ্ভব স্বর্গীয় সুধর্ম্মপা মহারাজ হইতে ১৬৪ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখীয় শুক্লা তৃতীয়া দিবসে জঙ্গলাকীর্ণ "মনুকূল" নামক প্রদেশ ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করেন। দান পত্রের অনুলিপি ত্রিপুরা রাজধানীতে বর্ত্তমান। ঐ তাম্রফলকে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ শ্রীশ্রীযুক্ত সুধর্ম্মপা
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৌথিলায় তপস্বিনে।

শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বংশ্য গৌত্রায় ধর্ম্মিণে।
প্রাচ্যাং লংলাইকুকীস্থানং প্রতীচ্যাং গোপলা নদী।
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরস্য দক্ষিণস্যামরণ্যকম্।
ক্রোশিরা লদ্ধ্যাওবস্যাং প্রাগুদত্ত স্থানমেবহি।
এতন্মধ্যা সশস্যা যা মনুকুল প্রদেশিনী।
সাপি প্রদত্তা তস্মৈ তবৈদিকায় তপস্বিনে।
শুক্লে পক্ষে তৃতীয়ায়াম্দিনে মেষগতে রবৌ।
চতুঃ ষড়েক রাজাব্দে ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা॥"

উল্লিখিত তাম্রফলক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, 'মনকুল' প্রদেশের পূর্ব্বে লংলাই কুকীর বসতিস্থান, পশ্চিমে গোপলা নদী, দক্ষিণে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরার জঙ্গলময় আবাসভূমি ও উত্তরে ক্রোশিরা নদী ছিল। লংলাই কুকীর বাসস্থান এখন 'লংলা পরগণা' বলিয়া পরিচিত। মনুনদীর দক্ষিণতীরেই দক্ষিণ শ্রীহট্ট সব্‌ডিবিসন্ অবস্থিত। এবং উক্ত সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটা ও চোয়ালিশ পরগণা বলিয়া অভিহিত।

নিধিপতি ভট্টাচার্য্য প্রাগুপ্ত ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করিয়া আত্মীয় স্বজন সহ ইটা পরগণার এওলাতলী গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ইটোয়া গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার বাসস্থানের 'ইটা পরগণা' নামাকরণ করেন। তাঁহার যত্নে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানাজাতীয় লোক আসিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভূধর ভট্টাচার্য্য। ভূধর ভট্টাচার্য্যের ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর নামে তিন পুত্র ছিলেন। (কোন কোন প্রাচীন হস্তলিপি মতে ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য্যগণ ভূধর ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র পুত্র।) পুষ্কর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য্য দ্বয় ইটা পরগণার পূর্ব্ব সীমাস্থ ব্রহ্মচাল পরগণার অধিকারী হইয়া তথায় বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদের বংশীয়েরা অদ্যাপি ভূম্যধিকারী রূপে চৌধুরী, শিকধার নামে নন্দনগর, সীঙ্গুর, গুড়াভুই, উত্তর ভাগ ও বড়কাফন প্রভৃতি স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক ব্রহ্মচাল পরগণার নন্দনগর মৌজাধিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বোক্ত প্রভাকর ভট্টাচার্য্যের বংশীয় জনৈক বি, এ।

ভাস্কর ভট্টাচার্য্যের পুত্র শুভরাজ মান্ (শুভঙ্কর ?) ইটা পরগণার পঞ্চগ্রাম মৌজায় তৎখাত একটী দীর্ঘিকা আজও "সুরাজধার দীঘি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র ভান নারায়ণ। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। একদা চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরা নামক ত্রিপুরা রাজের জনৈক পার্ব্বতীয় প্রজা স্বদলসহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, ত্রিপুরাধিপতি প্রেরিত সৈন্যের সাহায্য ভানু নারায়ণ, চন্দ্রসিংহকে বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত করেন। ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভানু নারায়ণকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মনুকুল প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছেন। রাজা ভানু নারায়ণ উদয়পুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া একটী দীর্ঘিকা খনন পূর্ব্বক তৎপশ্চিমে নূতন বাসস্থান নির্ণয় করেন। রাজ বাড়ীর চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত রাজনগর থানা উক্ত রাজ বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত। রাজার আবাস ভূমিই রাজনগর বলিয়া পরিচিত।

সুবোধ নারায়ণ, ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ নামে রাজা ভানু নারায়ণের চারি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে

রূপ নারায়ণ কৈশোরেই মানবলীলা সংবরণ করেন এবং জ্যেষ্ঠ সুবোধ নারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশিষ্ট সহোদর সহ কিয়ৎকাল রাজ্যভোগ করেন। ইটা পরগণার পূর্ব্ববর্ত্তী বাড়ুয়া পাহাড়ে রাজা সুবোধ নারায়ণের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বরদানাম্নী কন্যাখ্যাত রাজবাড়ীর দক্ষিণস্থ দীর্ঘিকা এখন "বলদা (বরদা) সাগর" বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজা সুবোধনারায়ণ তাঁহার একটী কন্যাকে কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতি ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া পাচ গাঁও, ভূমিউড়া, পশ্চিমভাগ, সুরানন্দ ও এওলাতলী নামক পাঁচখানি গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত কাত্যায়ন বংশীয়েরা সুখ্যাতির সহিত বাস করিতেছেন। রাজা সুবোধ নারায়ণ নিজ বাড়ী স্থানান্তরিত করার মানসে ইটা পরগণার সুপ্রসিদ্ধ "সাগর দীঘি" খনন করাইয়া তাহার পশ্চিমে প্রকাণ্ডবাড়ী প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। ঐ বাড়ীর চারি দিকের গড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি সম্প্রতি ঘড় গাও (গড়গ্রাম) বলিয়া পরিচিত। "সাগর দীঘি" পল্লবন সুশোভিত হইয়া আজও তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। কিন্তু বক্ষ্যমান দুর্ঘটনা নিবন্ধন তিনি স্বীয় ভদ্রাসন স্থানান্তরিত করণে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। এবং ঐ দুর্ঘটনাই রাজা সুবোধ নারায়ণ তৎপূর্ব্বপুরুষ নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের বংশের পরিচায়ক হওয়ার এক মাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়।

একদা রাজা সুবোধ নারায়ণ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় বিষ্ণু মন্দিরে সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় মুর্শিদাবাদের পাঠান বংশীয় জনৈক খওয়াজওসমান খাঁ নানা স্থান জয় করার পর হঠাৎ সসৈন্যে রাজবাড়ী আক্রমণ করে। এরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া রাজা নিরুপায় ভাবিয়া পূজা মণ্ডপেই রাজোপাধির সহিত স্বকীয় জীবনের পরিসমাপ্তি করেন। ধর্ম্ম নারায়ণ স্ত্রী পুত্রাদিসহ গুপ্ত পথে পলাইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছয়গিরি পরগণার চৈত্র ঘাট মৌজার পশ্চিমের জঙ্গলে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কিন্তু রামনারায়ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ভ্রাতৃবিরোধই এই অনর্থপাতের মূল কারণ।

মুসলমানগণ রাজবাড়ী প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ নামক সুবোধনারায়ণের চারি জন অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রব্যতীত রাজপরিবারের অন্য কাহাকেও না পাইয়া বাড়ী লুণ্ঠন করতঃ তাহাদের জাতিধ্বংস করিয়া ক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ইছা খাঁ নাম করণ করে। জামাল খাঁ ও কামাল খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। অপর দুই জনের সন্তানাদি মধ্যে ইটা পরগণার স্বনামখ্যাত সদাশয় জমিদারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত আবদুল আলেক চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতিই বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। ইটা পরগণার শ্রীসূর্য্য মৌজার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে খাওয়াজওসমানের নির্ম্মিত একটী দুর্গ এখনও "খাওয়াজওসমানের গড়" বলিয়া পরিচিত আছে।

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর খাওয়াজওসমানের দৌরাত্ম্যের বিষয় অবগত হইয়া সুজাৎখাঁ নামক একজন সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। সেনাপতি উৎপীড়ন-

কারীকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া বিজিত ভূভাগ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করতঃ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বহুমূল্যের দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করেন। এই বিবরণ পারস্য ভাষায় লিখিত "এক-বাল" নামক জাহাঙ্গীরি পুস্তকেও "তারিখ ফিরিস্তা" নামক ইতিহাসে সংক্ষেপে উক্ত আছে।

মুসলমান রাজত্বকালে সকল পরগণাতেই খ্যাতনামা প্রতাপশালী জমিদারেরা শাসন সংরক্ষণের জন্য "চৌধরাই" সনন্দ লাভ করেন, তদবধি রাজা সুবোধ নারায়ণের বংশীয়েরা চৌধুরী উপাধি ধারণে সসম্ভ্রমে বাস করিতেছেন।

ধর্ম্মনারায়ণ কিছুদিন পরে ছয় চিরি পরগণার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর মৌজায় মানস সরোবর সদৃশ সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৎপশ্চিম চৈত্র ঘাটস্থ স্বীয় বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি অশেষ প্রতিপত্তির সহিত তথায় অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী মহাশয়দ্বয় বি, এ,উপাধি লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা কীর্ত্তিবানের অতীত সাক্ষীস্বরূপ আজও সুনির্ম্মল সুপেয় দানে "ধর্ম্মনারায়ণ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীহট্টের অন্যান্য ভূমির সহিত রাজা সুবোধ নারায়ণের অধিকৃত ভূমি ইংরেজা-ধিকৃত হইলে ত্রিপুরাধিপতি উক্তভূমি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু মুসলমানগণ রাজা সুবোধ নারায়ণকে স্বাধিকার চ্যুত করিলে ত্রিপুরা-ধিপতি কোন আপত্তি করেন নাই, এবং ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মুসলমানদেরই নিকট হইতে ইহা অধিকার করিয়াছেন,—এই বলিয়া ত্রিপুরারাজের দাবী অগ্রাহ্য হয়। এই মোকদ্দমার আদেশপত্রে রাজা সুবোধ নারায়ণের বিবরণ লিখিত আছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর নিবাসী খ্যাতনামা বাৎস্যগোত্রধুরন্ধর সঙ্গতিপন্ন কৃতী পুরুষ শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্ন মহা-শয়ের অনুগ্রহ লিপিতে জানিতে পারিলাম, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গীয় কাশীরাম ন্যায়া-লঙ্কার মহাশয় অকৃতদার অবস্থায় যবন-পীড়িত হইয়া শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইটা পরগণাস্থ নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ীর নিকট গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদ নবাবের শাসনাধীন উক্ত সেরপুরের গাজী নামক প্রবল প্রতাপান্বিত লম্পট জমিদার স্বীয় কর্ম্মচারী জনৈক রমাই মজুমদারের পরমাসুন্দরী কন্যা লাভে বিফল-মনোরথ হওয়াতে স্বহস্তে রমাইর জীবনান্ত করিয়া নিজ জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। রমাইর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রামনাথ মজুমদার তাহার প্রাচীন ভৃত্যের পরামর্শে পিতৃবধের প্রতি-কার-পরায়ণ হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাবের বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত-ক্রমে জননী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য সহ নবাব বাড়ীর নিকটে বাস করিতে থাকেন। তখন উক্ত কাশী রাম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নায়ী ও জপপূজা-পরায়ণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি রামনাথ ও ভৃত্যের অচলা-ভক্তি জন্মে। পরে তাৎকালিক বিচার পদ্ধতির মহিমায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও, অভিযোগের কোন ফলাফল জানিতে না পারিয়া, তাহারা তাহাদের মঙ্গলার্থ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করার জন্য কাশী-

লঙ্কার মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তিনি প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও অবশেষে তাহাদের আর্ত্তনাদ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় প্রতিশ্রুত হন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই নবাববাহাদুর বিচারালয়ে রামনাথের তলব লয়। রাম নাথ নবাব কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া স্বীয় ভৃত্যের পূর্ব্বপরামর্শানুসারে পিতৃহন্তার জীবনের পরিবর্ত্তে সমুদয় সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গাজীর জমিদারী সেরপুর পরগণা রামনাথের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ হয়। রামনাথ মজুমদার এইরূপ অভাবনীয় শুভ সংঘটনে অতীব আশ্চর্য্যা-ম্বিত হইয়া ভক্তি ভরে অনেক স্তব স্তুতিতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে সন্তুষ্ট করেন এবং তৎসন্নিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ জমিদারী হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রযত্নে তাঁহার সেরিগ্রামে বাস করার প্রবৃত্তি জন্মাইতে সক্ষম হন। তদবধি ন্যায়-লঙ্কার মহাশয়ের বংশীয়েরা সেরিগ্রামে প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান হয় যে,উক্ত কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার রাজা সুবোধ নারায়ণের কনিষ্ঠ পলায়িত রামনারায়ণেরই নামান্তর, অথবা তাঁহারই কোন বংশধর। যে হেতু অতি পূর্ব্বে সুবোধ নারায়ণের বংশীয় ব্যতীত বাৎস্য গোত্রীয় অন্য কোন ব্রাহ্মণ বংশ ইটা পরগণায় ছিলেন না। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে; প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইলেও নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের বংশধরেরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া জ্ঞান লাভ করতঃ ঈশ্বর চিন্তায় কালযাপন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ অনেকেই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং রাম সহোদর রামনারায়ণের (বা কাশীরামের) "ন্যায়ালঙ্কার" উপাধি থাকা বিচিত্র নহে।

শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয় আরও বলেন যে, বগুড়াতে তাঁহাদের এক ঘর জ্ঞাতি আছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সপিণ্ডতা নাই; অথচ তাঁহার কোন্ পূর্ব্ব পুরুষ বগুড়াবাসী হন, তাহাও তিনি জানেন না।

যে হিন্দুকুলতিলক রাজবংশের প্রসাদে অরণ্যসঙ্কুল শ্রীহট্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রসার হইয়াছে, সেই পুণ্যশ্লোক ত্রিপুরারাজবংশ স্বকৃতকীর্ত্তির সহিত অক্ষুণ্ণ থাকিয়া চিরদিন দেশহিত ব্রতে রত থাকুন, প্রবন্ধাবসানে ইহাই মঙ্গলময় সন্নিধানে নির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

উপসংহারে সানুনয় নিবেদন এই যে, কোন স্বদেশানুরাগী প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা সুবোধ নারায়ণের বংশের এতদতিরিক্ত বিশেষ বিবরণ প্রমাণ সহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে চিরবাধিত হইব।

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী।

সাবিত্রী তত্ত্ব।

চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য সংসারে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত সাবিত্রী-তত্ত্ব পড়িতে বড় আগ্রহ হইয়াছিল। পুস্তকখানি পড়িবার পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে তৎসম্বন্ধে দু একটী ভাল মন্দ সমালোচনাও পড়িয়াছিলাম। তাহা আমার আগ্রহের "পরিবর্দ্ধক ও তীব্রতা-

সাধক" হইয়াছিল। অত আশা করিয়াছিলাম বলিয়াই কি এত নিরাশ হইয়াছি?

আমার একটি বন্ধু একখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। সংবাদপত্রে দু চারিবার যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া আমার মনে একটা খটকা লাগে। বন্ধুকে এক পত্র লিখি। উত্তরে বন্ধু লিখিয়াছিলেন "সংবাদপত্রে যাহা লিখি, তাহা যে আমার মত, আপনাকে কে বলিল? আমি দোকান করিতে বসিয়াছি, যাহা বিকায় তাহা প্রস্তুত করি, লোকে যাহা চায়, আমি তাহা যোগাই।" বস্তুতঃ সংবাদ পত্র ও সংবাদ পত্র আছে। কোন সংবাদ পত্রে লেখকের মত প্রকাশ হয়। সম্পাদক আপন মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণকে সেই মত গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। দ্বিতীয় প্রকারের পত্রে পাঠকের ভ্রম নিরাকরণ করিবার বা তাঁহাকে উচ্চমত শিখাইবার ভাণ বা প্রয়াস নাই। লোকে যাহা বলে, দ্বিতীয় প্রকারের পত্রে তাহাই প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সংবাদ পত্র পাঠকের মুখপাত্র, প্রথম প্রকারের পত্র সম্পাদকের মুখপাত্র। উভয় প্রকারের পত্রেরই আবশ্যকতা আছে। প্রথমটি শিক্ষক, দ্বিতীয়টী দূত। তুমি হয়ত বলিবে, প্রথমটীর গৌরব অধিক, আমি বলি, দ্বিতীয়টীর আদর অনেক।

কিন্তু সম্পাদকের দৌত্যকার্য্য আদরণীয় হইলেও, গ্রন্থকারের শিক্ষকতা কার্য্য অবশ্য প্রতিপাল্য। গ্রন্থকার ভাটের কার্য্য গ্রহণ করিলে সমাজের সমূহ বিপদ ঘটে। চন্দ্রনাথ বাবু বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে তাঁহার প্রয়াস আছে। অন্যে না বলুক, আমি বলি, সে কার্য্য করিতে তাঁহার অধিকারও আছে। সাবিত্রী-তত্ত্ব সমাজের মঙ্গলের জন্য রচিত। এ গ্রন্থ পড়িয়া লোক সমাজের, না হয় বলিলাম হিন্দু সমাজের, কতদূর মঙ্গল হইবে, আমি কেবল সেই কথারই আলোচনা করিব।

এখন "আর্য্যামির" যুগ। গ্রন্থকার আর্য্যামি দেখাইয়া গ্রন্থখানি আরম্ভ করিয়াছেন।

একটা পুরাতন কথা বলি। অনেক দিন হইল, মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণী আপিশ। অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেখানে গিয়াছিলাম। তখন শশধর তর্কচূড়ামণি দেখা দিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর ওখানে যাইয়া দেখিলাম, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের অনুকূলে, অক্ষয় বাবু, ইন্দ্রবাবু, চূড়ামণি প্রতিকূলে, একটু অবসর পাইয়া আমি চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাহা ছিল তাহাই? না ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া লইতে হইবে? দু চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনকার দিনে তাহা কি চলিবে?" চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন "ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া লইতে হইবে।" তখনও বঙ্কিম বাবুর সহিত চূড়ামণির মতান্তর ঘটে নাই। অভ্যুত্থানকারীরা দুই দলে বিভক্ত হন নাই। ইন্দ্রনাথ চূড়ামণির কথায় সায় দিলেন না। "ছাঁটিবে ছুঁটিবে কে? সুতরাং যাহা ছিল, ঠিক তাহাই লইতে হইবে।" ছাঁটিবার আবশ্যকতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না, উপযুক্ত রাঁধুনীর অভাবেই কাঁচা তরকারী খাইতে হইবে।

চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দু আচার পদ্ধতির পক্ষপাতী। তিনি বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর দলের, ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রথমেই

তিনি ভণিতা করিয়াছেন যে "ইউরোপীয়দিগের প্রথম দৃষ্টি শরীরের উপর, হিন্দুর প্রথম দৃষ্টি স্বভাব প্রকৃতির উপর।" উদাহরণঃ—"সাবিত্রীর জন্ম হইল। ব্যাস বলিলেন তিনি "রাজীবলোচনাম" অর্থাৎ কমললোচনা।" গ্রন্থকারের মতে কমললোচনা স্বভাব প্রকৃতির পরিচায়ক। আবার "দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইল, ব্যাস বলিলেন, দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল।" সন্তান লাভের জন্য হিন্দুরা কার্ত্তিক পূজা করে, পুরাণ কথা শুনে, মা বাপ ভাই বোনের মঙ্গলের জন্য ছোট ছোট মেয়েরা যমপুকুর পুণ্যপুকুর করে। "এ বিশ্বাস সমূলক কি অমূলক, তাহার বিচার বা মীমাংসা বড় সহজ নহে।" "কিন্তু এ বিশ্বাস বড় গভীর, এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায় তাহা হওয়া অসম্ভব নয়।" বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভাবনা হইতে পারে—চন্দ্রনাথ বাবু এই কথা বলিয়াছেন—"শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্ম বলে তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব।" বন্ধ্যার সন্তান হয়, মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করে, মরা মানুষ ফিরে আসে ইত্যাদি। পরকালে সদ্গতি লাভ হইবে বিশ্বাস করিয়া খন্দ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতা মাতাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া একত্র করিয়া পোড়ায়। তাহাদেরও চিত্তের একাগ্রতা,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা থাকে "অনেক স্থলে" তাহাদের উদ্দেশ্য "সাধিত হয় কি না? প্রশ্নটী গুরুতর। কাপালিক কর্ত্তাভজা প্রভৃতির বিশ্বাসের একাগ্রতা যথেষ্ট আছে। যেবিশ্বাসে একাগ্রতা থাকিবে, তাহাই মঙ্গলপ্রদ কি না, এ কথার মীমাংসা হওয়া উচিত। বিশ্বাস করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভাল, এরূপ মতের প্রচার হইলে হিন্দু সমাজ কেন, কোন সমাজ একদিন বাঁচিতে পারে না, ঠগ, ডাকাইত, তাহাদেরও একাগ্র বিশ্বাস আছে। ব্যভিচারী ও অনাচারী ও একটা কিছু বিশ্বাস করিয়া কুকার্য্য (?) করে। তোমার মঙ্গল হইবে বলিয়া তোমাকে হত্যা করিলে আমার অপরাধ হইবে না; ইমেসিয়স্ লয়লার শিষ্যেরাও এমন ভয়ানক মত প্রচার করিতে সাহসী হয় নাই। কল্পনার গোলাপী নেশায় কবিতার সৌন্দর্য্য সাধন করে কিন্তু সমাজশাসনে কল্পনার ঢুকুঢুকু আরম্ভ হইলে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। এ সম্বন্ধে আর একটী কথার আলোচনা করিব। কার্ত্তিক পূজা, যমপুকুর কি পুণ্যপুকুর করায় বা পুরাণ কথা শোনায় ভাবের উৎকর্ষ হয়। ভাবের উৎকর্ষ সাধনে এ রকমের কার্য্য প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ কাল ইহারা সে কার্য্য সাধনেও সক্ষম নহে। কার্ত্তিক এখন বারবনিতার আশ্রয় লইয়াছেন, পুরাণ কথা বারোয়ারী তলায় স্থান পাইয়াছে। যদি কেবল ভাবের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই প্রকার কার্য্যগুলির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইহাদের অপেক্ষা যাহারা অধিকতর ফলপ্রদ, ইহাদিগের স্থানে তাহাদিগকে গ্রহণ করা উচিত কি না, ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু ভাবের উৎকর্ষের জন্য কার্ত্তিক পূজা করিবেন না। বন্ধ্যার সন্তান হইবার জন্য তিনি কার্ত্তিক পূজার ব্যবস্থা করেন। থিয়সফি বা মার্কিন ব্রহ্মবিদ্যা হিন্দুয়ানীর স্যান্ডেনী ব্যবস্থা করা অবধি

হিন্দুধর্ম্ম একটা নেবুলস অবস্থা লাভ করিয়াছে। কেহ বা যেখানে যুবক যুবতীকে প্রণয় সম্ভাষণে প্রবৃত্ত দেখেন, অপরে সেখানে দীর্ঘশ্মশ্রু তপোধনকে ধ্যানগত অবলোকন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ হিন্দু ভিন্ন কাহারও এ বিশ্বাস নাই, কি ও বিশ্বাস নাই, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদাহরণ দিয়া এরূপ অহঙ্কার করিলে বাজারে লোকের কাছে সং সাজা হয় মাত্র। ইহাতে অর্থ ও আদর ও লাভ হয়, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে এরূপ আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর আর্য্যামির আর একটী পরিচয় দেই। চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে, সন্তানোৎপাদন ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া হিন্দুরা জানে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিতে তাহারা যেরূপ সংযত হয়, সন্তানোৎপাদন কার্য্যও সেইরূপ সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে, তাই হিন্দুরা এমন সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন যে, আমাদের সন্তান দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইউরোপের লোকে অসংস্কৃতভাবে শারীরিক শক্তি নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তাই ইউরোপে কেবল ষণ্ডামার্ক জন্মিতেছে। অর্থাৎ হিন্দুর সন্তান অধিকাংশ দেবতা, ও ইউরোপীয়ের সন্তান অধিকাংশ অসুর। চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতিনীতি চর্চ্চা করিয়া এ কথা বলিয়া থাকিবেন। তাঁহার মত আমাদের অভিজ্ঞতা নাই এবং ইউরোপীয় অসুরের নিকট তিনি যত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, আমরা তত করি নাই। তাঁহার এই একটা কথাতেই প্রমাণ হইয়াছে, হিন্দু কিরূপ সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন, যাহা দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ চন্দ্রনাথ বাবুর অবিবেচনার যথোচিত নিন্দা করা যায় না।

চন্দ্রনাথ বাবুকে আমি সম্মান করি। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কঠোর কথা সকল লিখিতে কষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার আর্য্যামি অতি প্রবল হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আমাকে এমন তীব্র সমালোচনা করিতে হইতেছে। সাবিত্রীর বধূত্ব, পাতিব্রত্য প্রভৃতি অধ্যায় তিনি এত গুণপণার সহিত লিখিয়াছেন যে, তাহাতে সমাজের প্রকৃতই মঙ্গল হইবে। হিন্দু সমাজের গুণাগুণের কথা বলিতে অন্য সমাজের সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন সামান্য ছিল। ইউরোপীয় সমাজের কথা তিনি অল্পই জানেন এবং অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের ন্যায় ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি কুৎসিত। তিনি মনে করেন, ইউরোপীয় মহিলার পতিপ্রেম ধর্ম্মমূলক নহে। তিনি বলেন, "যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে অনেক রমণী যে এক বা একাধিক পুরুষের অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, সন্দেহ হইতে পারে না।" এইরূপ অনেক কুৎসিত কথায় চন্দ্রনাথ বাবুর সাবিত্রী-তত্ত্ব কলঙ্কিত হইয়াছে। এ গুলি না থাকিলে গ্রন্থখানি বড়ই, সুন্দর হইত। ইংরাজের নিন্দা এখন বাঙ্গালীর বড় ভাল লাগে। চন্দ্রনাথ বাবুও সেই স্রোতে ভাসিয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

নীতির মূলতত্ত্ব কি ?

এই অন্ধকারময় সংসারারণ্যে আলোক কোথায় ? এই মহাসমুদ্রে জীবনপোতে দিগ্‌দর্শন শলাকা কি ? জ্ঞানই আলোক। বিবেকই দিগ্‌দর্শন শলাকা।

জ্ঞান কাহাকে বলে ? সত্যের ধারণা। বিবেক কি ? অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে বিবেক শব্দ যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। এক্ষণে ইংরেজী conscience শব্দের প্রতিশব্দরূপে বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে বিবেক শব্দ ঐ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে বিবেক শব্দের অর্থ, সংসার মিথ্যা, ঈশ্বর সত্য, ইত্যাকার জ্ঞান।

ইহা প্রকৃত কথা নহে। আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তিন প্রকার অর্থে বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম, নিত্যানিত্য বিবেক অর্থাৎ নিত্য বস্তু কি, এবং অনিত্য বস্তুই বা কি, ইহার ভেদ জ্ঞান। দ্বিতীয়, আত্মানাত্ম বিবেক। অর্থাৎ আত্মা কি, এবং অনাত্মা কি, ইহার ভেদ জ্ঞান। তৃতীয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক। অর্থাৎ ধর্ম্ম কি ও অধর্ম্ম কি, ইহার ভেদজ্ঞান। এখন দেখুন, এই তিন প্রকার বিবেকের মধ্যে, তৃতীয় প্রকার বিবেক, ইংরেজী conscience শব্দের অর্থের সহিত মিলিতেছে কি না ? যাঁহারা বলেন, conscience শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বিবেক শব্দ ব্যবহার করা ভুল, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। তবে, কেবল বিবেক না বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় বটে। ধর্ম্মবুদ্ধি শব্দও ইংরেজী conscience শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম্মবুদ্ধি শব্দের ঐ প্রকারই অর্থ, এবং ঐ প্রকার অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বিবেক স্বাভাবিক ; তবে নৈতিক বিষয়ে মতভেদ কেন ?

এই যে বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, ইহা মানব-প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবতঃ বর্ত্তমান। এ কথায় সচরাচর এই আপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে যে, যদি বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে নৈতিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে এত মতভেদ কেন ?

মতভেদ আছে সত্য। মতভেদের কারণ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, কোন একটা বিষয় স্বাভাবিক হইলেই যে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকেনা, এমন নহে। কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেই তাহার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেই যে, বিষয়টা মিথ্যা বা অমূলক, এরূপ সিদ্ধান্ত কখন যুক্তিযুক্ত নহে।

বিবেক ও সৌন্দর্য্যবোধ।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সৌন্দর্য্য-বোধ স্বাভাবিক। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সে বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। চীন দেশীয়েরা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ছোট পা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। অথচ আমরা কখন সেরূপ মনে করি না। যাহাতে পা

বড় হইতে না পারে, সেই জন্য তাঁহারা অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগকে লৌহনির্ম্মিত পাদুকা পরাইয়া দেন। ইংরেজেরা মনে করেন যে, লম্বা গলা ও কটা চক্ষু হইলে নারীজাতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের যদি হাঁসের ন্যায় লম্বা গলা এবং বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু হয়, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে সুন্দরী দেখি? এখন দেখুন, সৌন্দর্য্য বোধ যে স্বাভাবিক, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। উহার স্বাভাবিকত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অথচ সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে কত মতভেদ রহিয়াছে।

নৈতিক বিষয়ে মতভেদের কারণ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নৈতিক বিষয়ে এত মতভেদ কেন? মতভেদের তিনটি প্রধান কারণ। প্রথম, আংশিক দৃষ্টি। দ্বিতীয়, নৈতিক অবনতি। তৃতীয়, ধর্ম্মবুদ্ধির অবিকশিত অবস্থা।

প্রথম, আংশিক দৃষ্টি যে মতভেদের একটি কারণ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোন ব্যক্তি দূর হইতে দেখিলেন যে, দুই জন লোক একটি শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে, আর এক জন উহার উরুদেশে তীক্ষ্ণাস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। শিশুটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তির বড়ই ক্রোধ হইল। শিশুটিকে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় গিয়া শুনিলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন শিশুর পিতা, আর একজন তাহার পিতৃব্য; আর যিনি শিশুর উরুদেশে অস্ত্র বিদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি একজন ডাক্তার। শিশুর উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে বলিয়া তিনি অস্ত্রচিকিৎসা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তির ক্রোধ একেবারে চলিয়া গেল। তিনি সকলই বুঝিতে পারিলেন।

এখন দেখুন, ঐ ব্যক্তির যে ক্রোধ হইয়াছিল, উহা আংশিক দর্শনের ফল। আংশিক দর্শনে প্রকৃত কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং ক্রোধ হইল। যখন সকল দিক জানিতে পারিলেন, তখন ক্রোধ চলিয়া গেল। যাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনেক স্থলেই, কি নৈতিক বিষয়ে, কি অন্যান্য বিষয়ে, মানুষের মধ্যে মতভেদের একটি প্রধান কারণ, আংশিক দৃষ্টি।

দ্বিতীয়, নৈতিক অবনতি, নৈতিক বিষয়ে মতভেদের আর একটি কারণ। চক্ষুর দোষ হইলে, দর্শন বিষয়ে, মানুষে মানুষে প্রভেদ উপস্থিত হয়। অন্য লোকে যেরূপ দেখে, চক্ষুরোগী সেরূপ দেখেনা। অন্য লোকে যাহা অন্য বর্ণ দেখিতেছে, যাহার ন্যাবা হইয়াছে, সে তাহা হরিদ্রাবর্ণ দেখে। অন্য লোকে যাহা দেখিতেছে, চক্ষুরোগী তাহা ভাল করিয়া অথবা আদবেই দেখিতেছে না।

নৈতিক বিষয়েও সেইরূপ হয়। এক খানি তীক্ষ্ণাস্ত্রকে প্রস্তরের উপর আঘাৎ করিলে কি হয়? তীক্ষ্ণাস্ত্র ক্রমে ক্রমে তাহার তীক্ষ্ণতা হারায়। সেইরূপ পুনঃপুনঃ দুষ্কার্য্য করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতি আঘাৎ করিলে ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে তাহার তীক্ষ্ণতা হারায়, নীতিসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান মলিন হইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির সেই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় মনুষ্য অনেক স্থলে ন্যায়

অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

তৃতীয় ধর্ম্মবুদ্ধির অবিকশিত অবস্থা, নীতি সম্বন্ধীয় মতভেদের একটি গুরুতর কারণ। *ব্যক্তিগত জীবনে বা জাতিগত জীবনে*, যদি কোন বিশেষ নৈতিক ভাব বিকশিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে অন্য উচ্চতর অবস্থার ব্যক্তি বা জাতির সহিত তাহাদের মতভেদ নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে।

এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। প্রাচীন গ্রীস দেশে স্পার্টানদিগের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন শিশুদিগকে হত্যা করিতেন। উহাকে অসৎ কার্য্য বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক, সৎকার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের নিকটে উহা মহাপাপ। উহা স্মরণ করিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এরূপ মতভেদের কারণ কি? *প্রাচীন স্পার্টানদিগের মধ্যে* কোন কোন ধর্ম্মভাবের অস্ফুট অবস্থাই ইহার কারণ। জনসমাজকে *সর্ব্বাঙ্গসুন্দর* করাই তাঁহারা অতি মহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ব ভাল বুঝিতেন না। সমগ্র জনসমাজের মঙ্গলের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন। ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ব না বুঝিবার একটি কারণ এই যে, মানবাত্মার অমরত্বে, ও অনন্ত জীবনে, তাঁহাদের বিশ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই। সেই জন্য তাঁহারা মনে করিতেন যে, যাহাদের দ্বারা জনসমাজের কোন কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহারা জনসমাজের কোন প্রকার সেবা করিতে পারিবে না, বরং যাহাদের দ্বারা জনসমাজের কদর্য্যতা ও দুঃখতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাদিগকে জনসমাজ হইতে অপসারিত করাই বিধেয়। সেইজন্য তাঁহারা *তাহাদিগকে হত্যা করা পাপ বলিয়া মনে* করিতেন না।

এইরূপ হত্যা করিবার আর একটি কারণ ছিল। স্পার্টানদিগের ব্যবস্থাপক লাইকরগসের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে একটি যোদ্ধা জাতি করেন। তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থারই ঐ এক লক্ষ্য, যাহাতে স্পার্টাবাসিগণ একটি যোদ্ধা জাতি হয়। দুর্ব্বল, চিররুগ্ন শিশু হত্যারও তাহাই একটি কারণ। দুর্ব্বল, চিররুগ্ন শিশুর পক্ষে যুদ্ধোপযোগী হইবার সম্ভাবনা অল্প, প্রত্যুত তাহাদের দ্বারা জনসমাজের কদর্য্যতা ও দুঃখভার বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাদিগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ। স্পার্টাবাসীগণ ইহাই মনে করিতেন। এ স্থলে কোন কোন উচ্চভাবের অপরিস্ফুট অবস্থা, এবং একটি বিশেষ ভাবের প্রবলতাবশতঃ ঐ ভীষণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

বিবেকবাণী কিরূপ স্থলে প্রকাশ পায়?

সকল অবস্থাতেই যে বিবেকবাণী প্রকাশ পায়, এমন নহে। গো, মনুষ্য প্রভৃতি বধ করিয়া ঐ ভীষণ ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আহার করিতেছে। তজ্জন্য তাহার লেশমাত্র অনুতাপ হয় না। নরহত্যা প্রভৃতিকে সে পাপ বলিয়াই জানে না। বিড়াল যে ইঁদুর ধরিয়া খায়, তাহাতে তাহার কিছুই পাপবোধ নাই, অনুতাপ নাই। কেন এমন হয়? ব্যাঘ্রের প্রবল জিঘাংসা প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহা

ঐ জিঘাংসার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে। ব্যাঘ্রের জিঘাংসা আছে, কিন্তু দয়া নাই। ব্যাঘ্রের যদি জিঘাংসা ও দয়া উভয় প্রবৃত্তিই থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ কখন কখন প্রাণীবধ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইত। কিন্তু ব্যাঘ্রের মনে জিঘাংসার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দয়া প্রবৃত্তি কখন দণ্ডায়মান হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে, দুই প্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত।

বিরোধের অবস্থায় বিবেকবাণী প্রকাশ পায়। যেখানে একটি মাত্র প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, কোন বিরোধী প্রবৃত্তি নাই, সেখানে বিবেকবাণী প্রকাশ হয় না। সেখানে পাপবোধ থাকে না। অসঙ্কোচে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কার্য্যানুষ্ঠানের পর, আত্মগ্লানির উদয় হয় না। যেখানে উচ্চ ও নিকৃষ্ট, এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির মধ্যে সংগ্রাম, সেখানেই উচিত কি অনুচিত, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, এইরূপ বিচার সম্ভব। সেখানেই বিবেকবাণী প্রকাশ হইতে পারে। অন্য স্থলে নহে।

ব্যাঘ্রের জিঘাংসা আছে, দয়া নাই, সুতরাং সেখানে প্রাণীবধের সময় কোন সঙ্কোচ নাই, এবং তৎপরে গ্লানি নাই। কিন্তু মনুষ্যের জিঘাংসা ও দয়া উভয় প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে, জীবহত্যা করিবার সময় সঙ্কোচ ও আন্দোলন, এবং তৎপরে আত্মগ্লানি সম্ভব। মনুষ্যের পক্ষে, হত্যা কার্য্য করিবার সময় বিবেকবাণী প্রকাশ হওয়া সম্ভব। সেক্ষপিয়ারের ম্যাকবেথ ইহার কেমন সুন্দর চিত্র। হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় কেমন সঙ্কোচ ও আন্দোলন, ও তৎপরে কি তীব্র অনুতাপ! এই বিষয়ে মহাকবির মানব চরিত্রের বর্ণনা কেমন সুন্দর! কেমন গভীর!

এই প্রকার উচ্চ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরোধের জন্যই আমাদের কার্য্য নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা এ সম্ভাবনা থাকিত না। যদি কোন কৃপাপাত্র নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করি, তবে উহা অতিশয় নিন্দনীয়। কেননা আমি এস্থলে দয়া ও ন্যায়ের উচ্চ অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। যদি প্রচুর অন্ন সত্বেও আমি কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অন্ন না দিয়া নিজে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করি, তাহা যারপরনাই নিন্দনীয়, কেননা এস্থলে আমি আমার উচ্চতর প্রবৃত্তিকে অধিকার-চ্যুত করিয়াছি। এই জন্যই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মার্টিনোর মতে, আমাদের মনোবৃত্তি সকলের আপেক্ষিক উচ্চতা-নীচতাবোধনিবন্ধন বিবেকবাণী সম্ভব।

বলিয়াছি যে, নৈতিক মতভেদের তৃতীয় কারণ, নৈতিক জ্ঞানের অবিকশিত অবস্থা। মার্টিনোর মত ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, উহাতেই নৈতিক অবিকশিত অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রাচীন স্পার্টাবাসিগণের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের মর্য্যাদা ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বহুল পরিমাণে অবিকশিত অবস্থায় ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে বিষয় বিশেষে গুরুতর নৈতিক পার্থক্য।

মানবজাতির ক্রমোন্নতি হইতেছে। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া মানবজাতির বিকাশ হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও বিকাশ হইতেছে। সমগ্র মানবজাতির অন্তর্গত সর্ব্ব জাতির অথবা সকল বংশের বিকাশ, সকল বিষয়ে

যে, সমভাবে অথবা সমান পরিমাণে হইতেছে, এমন নহে। তবে, ইহা নিশ্চয় যে, গড়ের উপর সমগ্র মানবজাতির উন্নতি বা বিকাশ হইতেছে।

স্পার্টানদিগের রুগ্ন শিশুহত্যা, উহার একটি দৃষ্টান্ত। রুগ্ন শিশুহত্যা যে মহাপাতক, ইহা বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতে কে না স্বীকার করিবে? রুগ্ন শিশু হত্যার কথা শুনিলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়?

এ বিষয়ে আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। দাম্পত্যনীতি এ বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম সময়ে মানবসমাজে দাম্পত্য সম্বন্ধ ছিল না। স্পেন্সরের রচিত সমাজ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানবজাতির আদিম অবস্থায় দাম্পত্যধর্ম্ম থাকে না। প্রথম, দাম্পত্য সম্বন্ধের অভাব। দ্বিতীয়, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষেই বহু বিবাহ। তৃতীয়, একপত্নীত্ব ও একপতিত্ব, এইরূপ সোপান পরম্পরায় মানবজাতি দাম্পত্যধর্ম্মে অধিরোহণ করিতেছেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে মানবজাতির এইরূপ ক্রমোন্নতি বা বিকাশ (evolution) হইতেছে। আদিম অবস্থার লোকের মনে বিবাহ সম্বন্ধের ভাব অবিকশিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থার লোকের মনে বিবাহ সম্বন্ধে একানুগত্যের ভাব অবিকশিত রহিয়াছে। তৃতীয় অবস্থার লোক, বিবাহ সম্বন্ধে একানুগত্য অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং এই তিন অবস্থার লোকের মধ্যে দাম্পত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম বা নৈতিক ভাবের অবিকশিত অবস্থা, নৈতিক মতভেদের একটি প্রধান কারণ।

মহাভারতের শ্বেতকেতুর উপাখ্যান দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য সমাজে এক সময়ে দাম্পত্য সম্বন্ধ যারপরনাই শিথিল ছিল। এখনও দাক্ষিণাত্যবাসী নেয়ার নামক অনার্য্য হিন্দু জাতির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ, অত্যন্ত শিথিল। সেই জন্য তথায় পুত্রের পরিবর্ত্তে ভাগিনেয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। উক্ত জাতির মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা পুত্রের নামে উইল করিতে বাধ্য হইতেছেন। উইল না করিলে পুত্র বিত্ত হইতে বঞ্চিত হইবে, এবং ভাগিনেয় বিত্তাধিকারী হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পুত্রের নামে উইল করিতেছেন।

দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে নেয়ার জাতির মধ্যে যে অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা মানবজাতির আদিম অবস্থার চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়।

এস্থলে এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিষয়ে যে তিনটি সোপান বা অবস্থার কথা বলা হইল, উহা যুগে যুগে, পরে পরে আসিয়াছে। একটি অবস্থা চলিয়া গেলে আর একটি আসিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে একটি অবস্থার পর আর একটি অবস্থা আসে বটে, কিন্তু সকল জাতি, সকল সমাজ ও সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যের মধ্যে, সমগ্র মানবজাতিতে সমকালে যে,একটি অবস্থার পর আর একটি অবস্থা আসে, এমন নহে। বর্ত্তমান সময়েই জগতে এই তিন অবস্থার মনুষ্য রহিয়াছে। এমন কি, একই জাতিতে, একই সমাজে,

একই সময়ে বিভিন্ন অবস্থার লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। দাসত্ব প্রথা বিষয়ে মানবজাতির নৈতিক জ্ঞান যে, প্রাচীন কালে অবিকশিত অবস্থায় ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। ভারতবর্ষ, মিসর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাসত্ব প্রথা যে অন্যায়, মনুষ্যকে স্বাধীনতাবিবর্জ্জিত করিয়া গো ছাগের ন্যায় নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করা যে অন্যায়, প্রাচীনকালে সভ্যতম দেশ সকলেও, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মনেও এ ভাবের অভ্যুদয় হয় নাই। মহাত্মা সেণ্টপল একটি ক্রীতদাসকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে আপনার প্রভুর নিকট যাইতে বলিলেন। দাসত্ব প্রথাকে অন্যায় বলিয়া বোধ থাকিলে, তিনি কখনও সেরূপ বলিতেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের মর্য্যাদা বোধ, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ যে অন্যায় ও পাপ, সুসভ্য জগতে সহস্র সহস্র লোক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই জন্যই আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে, অসংখ্য মানবের শোণিতস্রোতে এই মহাপাতক বিধৌত হইয়া গেল! এই জন্য রুষরাজ আলেকজান্দারের লেখনীর এক আঁচড়ে চিরক্রীত সার্ফগণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নৈতিক জ্ঞানের অবিকশিত অবস্থা ও তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের একটি প্রধান কারণ। যাঁহারা বিকশিত নৈতিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অপর লোকের নৈতিক মতের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

বিবেকের মৌলিকত্ব।

নৈতিক বিষয়ে মতভেদের কারণ নির্দ্ধারণ করা হইল। এক্ষণে বিবেকের মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে মানবহৃদয়জাত মৌলিক বৃত্তি বা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা নীতিতত্ব কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করেন?

স্বার্থবাদ।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিক স্বার্থবাদ সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে মানুষ সুখ লাভ ও দুঃখ নিবারণের জন্যই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। মানবের সকল কার্য্যের লক্ষ্য একমাত্র সুখ। যে কার্য্যে সুখোৎপত্তি, তাহাই উচিত কার্য্য, এবং যে কার্য্যে দুঃখোৎপত্তি, তাহাই অনুচিত কার্য্য।

স্বার্থবাদীরা অনেকেই বলেন যে, মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যের মূল, সুখের লোভ কিম্বা দুঃখের ভয়। সুখ লাভ বা দুঃখ নিবারণ ব্যতীত মনুষ্যের কার্য্যানুষ্ঠানের আর কোন অভিসন্ধি নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা কি প্রকৃত কথা যে, মানুষ সকল কার্য্যই সুখের জন্য করিয়া থাকে? কখনই না। আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি স্বতঃই কার্য্য করে। ফলাফল চিন্তার উপরে তাহাদের ক্রিয়া

নির্ভর করে না। ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহাদের ক্রিয়া হয়

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। প্রথম ক্রোধ। যাহার প্রতি ক্রোধ হয়, তাহাকে কষ্ট দিয়া লোকে সুখী হয়। কিন্তু ঐ সুখের কারণ কি ? সুখ হইবে বলিয়া ক্রোধ, না, ক্রোধের জন্য সুখ ?

এস্থলে কারণ কি ও তাহার কার্য্য কি ? সুখের লোভ কারণ, না, ক্রোধ কারণ ? নিশ্চয়ই ক্রোধ কারণ। কিসের কারণ ? কষ্ট দেওয়াতে যে সুখবোধ হয়, তাহার কারণ। ক্রোধ হয় বলিয়াই মানুষ শত্রুকে কষ্ট দিয়া সুখী হয়। ক্রোধ না হইলে তাহা হয় না। সুতরাং ক্রোধ কারণ, সুখবোধ তাহার কার্য্য।

এখন দেখুন, সুখের লোভে ক্রোধ হয় না, ক্রোধের জন্যই সুখ হয়। সুতরাং সুখকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ, সকল কার্য্য করে, এ কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ক্রোধ সম্বন্ধে যেমন, দয়া সম্বন্ধেও সেই-রূপ। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে মানুষের দয়া হয়। সেই কষ্ট দূর করিতে পারিলে মানুষ সুখী হয়। এস্থলে সুখের কারণ দয়া। দয়ার চরিতার্থতায় সুখ। দয়া পূর্ব্ববর্ত্তী, সুখ পরবর্ত্তী। দয়ার চরিতার্থতা কারণ, সুখ তাহার কার্য্য। দয়া চরিতার্থ না হইলে সুখ হয় না। যাঁহারা বলেন, সুখকে লক্ষ্য করিয়া আমরা সকল কার্য্য করি, তাঁহাদের কথার অযুক্ততা এস্থলে সুস্পষ্ট বুঝা যাই-তেছে। সুখ হইবে বলিয়া দয়া হয় না, দয়া হয় বলিয়া তাহার চরিতার্থতায় সুখ। এস্থলে সুখের জন্য দয়া হয় বলিলে,কার্য্যকে কারণ ও কারণকে কার্য্য বলা হয়।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বার্থবাদীদিগের মতের অসারতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। স্বার্থবাদীরা বলেন, যাহা সুখকর, তাহাই উচিত, এবং যাহা দুঃখকর তাহাই অনুচিত। কিন্তু সুখের ভাব ও নৈতিক ভাব কখনই এক নহে।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সুন্দর পদার্থ ও উপকারী পদার্থ এক নহে। এ দুই ভিন্ন। সুন্দর বলিলেই যে, উপকারী বুঝায়, এবং উপকারী বলিলেই যে, সুন্দর বুঝায়, এমন নহে। মাখাল ফল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যের কি উপকার, তাহা জানি না। সেই জন্য মাখাল ফলকে সুন্দর বলি, উপকারী বলি না।

যেমন, সুন্দর ও উপকারী একার্থ-বোধক শব্দ নহে, সেইরূপ সুখকর ও উচিত, এই দুই শব্দও একার্থবোধক নহে। সুখ-কর বলিলে যাহা বুঝি, উচিত বলিলে কি তাহাই বুঝি ? কখনই না। এ দুটি শব্দে আমাদের মনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাব আসে। এ দুটি শব্দ একার্থবোধক নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যাহা সুখকর, তাহাই উচিত, এ কথার কোন অর্থ থাকিত না। অর্থাৎ সুখকর ও উচিত এ দুই শব্দের এক অর্থ হইলে,যাহা সুখকর তাহাই উচিত, এই বাক্যের অর্থ হইত, যাহা সুখকর, তাহাই সুখকর। দুঃখকর ও অনুচিত একার্থ বোধক শব্দ হইলে, যাহা দুঃখকর, তাহা অনুচিত, এবাক্যের অর্থ হইত, যাহা দুঃখ-কর, তাহাই দুঃখকর।

তবেই হইল যে, সুখবোধ ও নৈতিক জ্ঞান এক নহে। সুখের ভাব ও ঔচিত্যের ভাব এক নহে। এ দুই ভিন্ন। সুতরাং সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এক নহে। সুখে-

চ্ছায় কোন কার্য্য করা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে কোন কার্য্য করা, এ দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এক হইলে, চোর ও লম্পটের সহিত সাধুর প্রভেদ কোথায়? কেবল সুখেচ্ছায় কার্য্য করিলে, উহা কেমন করিয়া নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য হইবে? যতই কেন অধিক সুখ হউক না, কেবল সুখেচ্ছায় কার্য্য করিলে, উহা ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। নৈতিক-বোধ (moral sense) ব্যতীত, নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। কেবল সুখের ইচ্ছায় কার্য্য করিলে, যদি নৈতিক কার্য্য হয়, তাহা হইলে পোলাও খাওয়া, থিয়েটারে যাওয়া পাসাখেলা, ঘোড়ার দৌড়ে বাজি দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের সহিত নৈতিক কার্য্যের প্রভেদ কোথায়? সুখেচ্ছাপ্রণোদিত এই সকল কার্য্যের সহিত কি নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য এক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

এস্থলে আমাদের মনের ভাব বুঝিতে কেহ যেন ভুল না করেন। আমরা একপ বলিতেছি না যে, সুখ পরিত্যাজ্য। আমরা সেরূপ বিকৃত বৈরাগ্যমতাবলম্বী নহি। পরমেশ্বর মনুষ্যকে সুখ দিয়াছেন, মনুষ্য উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র সুখলালসা হইতে যে কার্য্য প্রসূত হয়, উহা প্রকৃত ভাবে নৈতিক কার্য্য নহে। যে কার্য্য, ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকের ফল, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, পার্থিব বা পারলৌকিক কোন প্রকার সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কর্ম্মফল প্রত্যাশা না করিয়া, বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সম্পন্ন করেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সুখের জন্য ধর্ম্ম, ইহা অতি অসার কথা। ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি আছে, যাহার জন্য ধর্ম্মসাধন করা যাইতে পারে? যিনি বলেন, সুখ উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম তাহার উপায়, তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য কিছুই জানেন না। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ"। স্বার্থবাদীরা বলেন যে, মানবপ্রকৃতিতে, স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক মত। মানব প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান, কে এ কথা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবও যে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। স্বার্থ ও পরার্থ, এই উভয় প্রকার ভাব স্বভাবতঃ মানবের অন্তরে বর্ত্তমান। ইহার কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বার্থবাদীদিগের মূল কথা যে অমূলক, তাহাতে লেশ মাত্র সংশয় নাই।

সুখবাদ।

যাঁহারা বিবেকের মৌলিকত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে, ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থই যে নীতির মূল, ব্যক্তিগত সুখকে লক্ষ্য করিয়াই যে, কার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। যাহাতে নিজের সুখ হয়, তাহাই যে উচিত কার্য্য, একপ নহে। নীতিসঙ্গত কার্য্যের উদ্দেশ্য, নিজের সুখ নহে, আমার সুখ নহে, জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ। জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের দিকে যে কার্য্যের গতি, অর্থাৎ যে কার্য্যের দ্বারা জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ

হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নীতিসঙ্গত কার্য্য, তাহাই উচিত কার্য্য। স্থূল কথায় ব্যক্তিগত সুখ, নীতির উদ্দেশ্য নহে, জনসমাজের সুখই উদ্দেশ্য।

যদি সকলেই সত্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে জনসমাজের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়। আবার সকলেই যদি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহা হইলে জনসমাজের অসুখ ও অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য সত্যব্যবহার সৎকার্য্য, নীতিসঙ্গত কার্য্য, এবং মিথ্যাব্যবহার অসৎ কার্য্য, নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। যাহা সৎকার্য্য, অর্থাৎ যাহাতে জনসমাজের সুখ হয়, তাহাই করা উচিত, এবং যাহা অসৎ কার্য্য, অর্থাৎ যাহাতে জনসমাজের ক্লেশ হয়, তাহা করা অনুচিত। এই মতকে সুখবাদ বলা যাইতে পারে।

স্বার্থবাদ ও সুখবাদের মধ্যে প্রভেদ কি, এবং ঐক্যই বা কি ? প্রভেদ এই যে, স্বার্থবাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত সুখ, এবং সুখবাদের লক্ষ্য জনসমাজের অধিকাংশের সুখ। স্বার্থবাদী বলেন, আমার সুখ, আমার কার্য্যের লক্ষ্য। সুখবাদী বলেন, আমার সুখ হইলে, যদি জনসমাজের অধিকাংশ লোকের অসুখের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমার সুখ চাইনা, জনসমাজের অধিকাংশ লোকের সুখ চাই। স্বার্থবাদী ও সুখবাদীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

ঐক্য কোথায় ? ঐক্য এই যে, উভয়েরই লক্ষ্য সুখ। ইহা ভিন্ন আরও একটি বিষয়ে ঐক্য আছে। উভয় দলের লোকই সাধারণতঃ স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্য, সকল জ্ঞান লাভ করে। এমন লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াও সুখবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। কিন্তু কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে। যাহাতে অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহাই কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং যাহাতে তাহার বিপরীত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই অকর্ত্তব্য কার্য্য। স্বাভাবিক নৈতিক জ্ঞান থাকিলেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এইরূপে নিদ্ধারণ করিতে হইবে। ইহাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর স্বরূপ।

এখন একটি বিশেষ প্রশ্ন এই যে, সুখই লক্ষ্য হইলে, কোন্ প্রকার সুখকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ? সুখের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং কোন্ প্রকার সুখ কার্য্যের লক্ষ্য, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে ? ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাতে সুখ, এবং জ্ঞানচর্চ্চাতেও সুখ। এই উভয় প্রকার সুখের মধ্যে কোন্ প্রকার সুখ ভোগ করিব ? এপ্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, উভয় প্রকার সুখই ভোগ কর। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এই উভয় প্রকার সুখ দিয়াছেন। সুতরাং উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত ভাবে, এই উভয় প্রকার সুখই ভোগ কর। কোনটাই পরিত্যাজ্য নহে।

এ উত্তর যথেষ্ট হইল না। যে স্থলে ইন্দ্রিয়সুখ ও জ্ঞানালোচনাজনিত সুখ পরস্পর বিরোধী হয়, সেখানে কি করিব ? যেখানে একপ্রকার সুখভোগ করিতে গেলে, অন্যপ্রকার সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে কি করিব ? এস্থলে

সুখবাদী বলিবেন, যাহাতে শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহাই গ্রহণ কর। এ উত্তরও যথেষ্ট হইল না। শ্রেষ্ঠ কি, অশ্রেষ্ঠ কি, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে? এই প্রশ্নেই সুখবাদীর চক্ষু স্থির! তাঁহার সুখবাদ দর্শন এখানে নীরব। এ কথা বলিলে চলিবে না যে, অধিকাংশ লোক যাহাকে শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করে, তাহাই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ সুখ। অধিকাংশ লোক যদি ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাকেই শ্রেষ্ঠ সুখ বলে, বাস্তবিক কি তাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ হইবে? কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ের এক সাক্ষী আপনার অন্তরাত্মা। ইন্দ্রিয়সুখ, জ্ঞানালোচনার সুখ, পরমেশ্বরের উপাসনার সুখ, এই বিবিধ প্রকার সুখের মধ্যে, কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ, তাহা তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থির হয় না। আপনার অন্তরই বলিয়া দেয়, কোন্ সুখ শ্রেষ্ঠ। এখানে হৃদয়ের বাণী শুনিতেই হইবে। বুদ্ধি ও বিচারদ্বারাই সকল নৈতিক তত্ত্ব স্থির হয়, সুখবাদীদিগের এ মত টেঁকিতেছে না।

নৈতিক বাধ্যতাবোধ।

সুখবাদীদিগের মত সমালোচনা করিতে হইলে, আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। 'উচিত' ও 'অনুচিত' শব্দের অর্থ কি? উচিত ও অনুচিত বলিলে কি বুঝায়? যাহাতে অধিকাংশ লোকের সুখ, সেইপ্রকার কার্য্য করাই উচিত, এরূপ বলিলে উচিত শব্দে কি বুঝায়? উচিত শব্দে বাধ্যতা বুঝায়। কোন কার্য্য করা উচিত, বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহা করিতে আমি বাধ্য। কোন কার্য্য করা আমার অনুচিত বলিলে, ইহাই বুঝায় যে, উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আমি বাধ্য।

যে কার্য্যের দ্বারা অধিকাংশ লোকের সুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহা আমার করা উচিত। অর্থাৎ তাহা করিতে আমি বাধ্য। এস্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, তাহা করিতে আমি বাধ্য কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মানুষের মনে ভাব (feeling) আছে। কোন একটি ভাব প্রবল হইলে, মানুষ তদুপযোগী কার্য্য করিবে, ইহা স্বাভাবিক। এক জন দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিয়া তোমার দয়া হইল, তুমি তাহাকে কিছু দান করিলে। তোমার দয়া চরিতার্থ হইল। জনসমাজের হিতসাধন করিতে, তোমার ইচ্ছা হইল, তোমার হৃদয়ের সদ্ভাব উত্তেজিত হইল, তুমি জনসমাজের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে। সৎকার্য্য সাধনোপযোগী ভাব মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলেই মানুষ সৎকার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে?

ইহা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইল না। এইরূপ উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে বটে, এমন কি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু ইহাই কি সদুত্তর? ভাব (feeling) চরিতার্থ করিতে হইবে বলিলে কিছুই বলা হইল না। ভাব চরিতার্থ করিতে আমরা বাধ্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। কেবল ভাব হইলেই য কার্য্য করিতে হইবে, কে বলিল? ভাব হইলে কার্য্য করিব, এবং খুসি হইলে কার্য্য করিব, এ দুই কি এক প্রকারের কথা নহে? আমার ইচ্ছা হইল, তাস ক্রীড়া করিব, তাসক্রীড়া করিলাম। আমার ইচ্ছা, আমার মনের ভাব, আমার খুসি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু ইহাতে কোন নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্ম কার্য্য হইল না। যে কার্য্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, নৈতিক বাধ্যতাবোধ বর্ত্তমান নাই, সে কার্য্য কখনই নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অধিকাংশ লোকের যাহাতে সুখ হয়, এমন কার্য্য করিতে আমি বাধ্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, আমি জনসমাজের একজন, যাহাতে অধিকাংশ লোকের সুখের সম্ভাবনা, তাহাতেই আমার সুখের সম্ভাবনা, সুতরাং সেরূপ কার্য্য আমাকে অবশ্য করিতে হইবে।

ইহা সদুত্তর হইল না। সুখবাদ সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থবাদ আনা হইল। স্বার্থবাদ যে অযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং স্বার্থবাদের দ্বারা সুখবাদের সমর্থন সম্ভব নহে। প্রশ্ন এই যে, আমি অধিকাংশ লোকের সুখের জন্য কার্য্য করিতে বাধ্য কেন? স্বার্থবাদের দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া হইবে? কেহ সুখবাদ রক্ষা করিতে গিয়া স্বার্থবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আবার স্বার্থবাদ রক্ষা করিতে গিয়া সুখবাদের শরণাপন্ন হন। ইহাতে কোনটাই রক্ষা পায় না। উভয়ই মারা যায়। গল্পের মূষিক যেমন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, "পুনর্ম্মূষিকোভব" এই ঋষিবাক্যে পুনর্ব্বার মূষিকত্ব প্রাপ্ত হইল, সেইরূপ স্বার্থবাদ একবার সুখবাদের আকার, আবার স্বার্থবাদের আকার, কখন ধারণ করিতে পারে না। স্বার্থবাদের দ্বারা নৈতিক বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে এই বাধ্যতাবোধ কোথা হইতে আসিল?

যদি কোন নির্জ্জন স্থানে দশ সহস্র মুদ্রা কুড়াইয়া পাই, তাহা আমি কি করিব? আত্মসাৎ করিব, অথবা উহা যে ব্যক্তির টাকা অন্বেষণ করিয়া তাহাকে দিব? এ স্থলে আমার স্বার্থপর প্রকৃতি বলিতে পারে, উহা গ্রহণ করিয়া আত্মসুখ বৃদ্ধি কর। কিন্তু আমার ভিতরে আর কি আছে, যাহা বলিবে "ছি! ছি! করিও না। যে ব্যক্তি ঐ অর্থের স্বত্বাধিকারী, অন্বেষণ করিয়া উহা তাহার হস্তে সমর্পণ কর। তুমি উহা করিতে বাধ্য। না করিলে তুমি অপরাধী। স্বার্থবাদ ও সুখবাদ, এই বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা কেমন করিয়া করিবে? করিতে নিতান্তই অক্ষম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বার্থবাদী ও সুখবাদী, বিবেকের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, বুদ্ধিদ্বারা ন্যায়, অন্যায়, উচিত, অনুচিত স্থির হয়। আমাদের নৈতিক জ্ঞান, বুদ্ধি বৃত্তিরই ক্রিয়া।

বুদ্ধি ও বিবেকের প্রভেদ।

বুদ্ধি হইতে কি নৈতিক বাধ্যতাবোধ উৎপন্ন হইতে পারে? নৈতিক বাধ্যতাবোধ কি বুদ্ধির ক্রিয়া হইতে পারে? অভিজ্ঞতা হইতেও কি বাধ্যতাবোধ আসিতে পারে? কখন না। বুদ্ধির কার্য্য কি? ঘটনা বা পদার্থ সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করা, জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত তত্ত্ব নির্ণয় করা, এই সকল বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি হইতে নৈতিক বাধ্যতাবোধ কেমন করিয়া আসিবে?

চিকিৎসা দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এ কথা বলে। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করান যে উচিত, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তাহা কেমন করিয়া বলিবে? উহা বলে, বিবেক। কোন

ঘটনার কি কারণ, বুদ্ধি তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বলিতে পারে। কোন্ কার্য্যের কি ফল, অভিজ্ঞতা তাহা জানিতে পারে। ইহার অধিক আর বলিতে পারে না। বিষ ভক্ষণে প্রাণ নষ্ট হয়, অভিজ্ঞতা ইহা বলিতে পারে। কিন্তু বিষ ভক্ষণে প্রাণবিনাশ করা যে অধর্ম্ম, ইহা বিবেকের বাণী। দুঃখীকে দান করিলে তাহার দুঃখ দূর হয়। অভিজ্ঞতা ইহা বলিতে পারে। কিন্তু দুঃখীকে দান করা যে উচিত, তাহা কে বলে? উহাই বিবেকের বাণী।

বিবেক, এবং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যেরূপ ঘটনা আনিয়া বিবেকের সম্মুখে উপস্থিত করে, ...নুসারে বলিয়া দেয়, উহা উচিত কি অনুচিত। স্ফোটক অস্ত্র করার দৃষ্টান্ত এ স্থলে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। তুমি কোন স্থানে হঠাৎ দেখিলে এক ব্যক্তিকে কয়েকজন লোকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে, আর একজন উহার দেহে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। সে লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। তুমি ইহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা মনে করিয়া সেই লোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই দিকে ধাবমান হইলে। কিন্তু গিয়া শুনিলে যে, সে লোকটির দেহে ভয়ঙ্কর স্ফোটক হইয়াছে, একজন ডাক্তার উহা অস্ত্র করিতেছেন এবং কয়েকজন আত্মীয় ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়াছেন। এ স্থলে ঘটনাটি প্রথমে যেরূপে তোমার জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাতে তুমি সিদ্ধান্ত করিলে যে, উহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা, সুতরাং উহা নিবারণ করা উচিত। তাহার পরে আবার ঘটনাটির সকল দিক্ যখন তোমার জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তুমি অন্য মীমাংসায় উপস্থিত হইলে। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য, ঘটনার প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা। বিবেকের কার্য্য, যেরূপ ঘটনা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তদনুসারে উচিত কি অনুচিত বলিয়া দেওয়া, সেই সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি বলিয়া দেওয়া।

শাস্তিভয় ও বিবেক।

নৈতিক বাধ্যতাবোধ কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের আর একটি উত্তর এই যে, উহা সামাজিক ও রাজনৈতিক শাস্তিভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে দুষ্কার্য্যের শাসন জন্য জনসমাজে শাস্তি প্রচলিত। লোকে যখনই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই স্বভাবতঃ তাহাদের মনে শাস্তিভয় উপস্থিত হইয়াছে। বংশপরম্পরায় এই প্রকার হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে, বৈজিক নিয়মানুসারে, উহা মানবের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাকে বিবেক, নৈতিকবাধ্যতা, দায়িত্ববোধ বা কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছ, উহা সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসনভীতি হইতে উৎপন্ন। উহা, বাস্তবিক, কোন মৌলিক বৃত্তি নহে। এক সময়ে যাহা, শাসনভয় ছিল, তাহাই বিকাশের নিয়মানুসারে, বংশপরম্পরায়, বৈজিক তত্ত্বানুসারে, রূপান্তরিত হইয়া মানবহৃদয়ে বিবেক বা নৈতিক বাধ্যতার আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা যুক্তিযুক্ত মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি, কখনই সম্ভব নহে। ভয় হইতে বিবেক কেমন করিয়া আসিবে? যদি ভয় ও বিবেক সমধর্ম্মী পদার্থ হইত, তাহা হইলে এ মতের কতকটা যুক্তিযুক্তা

থাকিতে পারিত। কিন্তু ভয় ও বিবেক বিপরীত ভাবাপন্ন। সুতরাং একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ভয়ের গতি ও নৈতিক বাধ্যতার গতি, বিপরীত দিকে। ভয় ও বিবেক এতই বিপরীত ভাবাপন্ন যে, একটী আর একটিকে বিনাশ করে। যে পরিমাণে বিবেক প্রবল হয় সেই পরিমাণে ভয় হ্রাস হইয়া যায়, আবার যে পরিমাণে ভয় প্রবল হয়, সেই পরিমাণে বিবেক ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিবেক প্রবল ও উজ্জ্বল, তাহার ভাব কি? যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিব। কোন কষ্ট, কোন বিপদ, কোন প্রকার লোক ভয় গ্রাহ্য করিব না।

সাধু মহাত্মাদিগের জীবন আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমাজভয় বা রাজভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তির মত, একান্ত অসার ও অযুক্ত। সক্রেটিস ইসা, সেণ্টপল, পার্কার, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন আলোচনা করিলে এক নিমেষের জন্যও মনে করিতে পারিনা যে, বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভয়সম্ভূত ভাবমাত্র। জগতের মহাত্মাগণ, যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, জনসমাজের কল্যাণের জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে, অসঙ্কুচিত ভাবে, সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসনকে গ্রাহ্য করেন নাই। কোন প্রকার ভয় ও বিপদ, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। যে পরিমাণে বিবেক প্রবল ও উজ্জ্বল হয়, সেই পরিমাণে মানব, পার্থিব ভয় ভাবনার অতীত হয়, সেই পরিমাণে সামাজিক শাসনভীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। ভয় হইতে, ভয়ভাবনাবিনাশকারী বিবেকের উৎপত্তি, এ কথা একান্তই অসার ও অযুক্ত। ভয় মানবপ্রকৃতির একটি নিকৃষ্ট ভাব, এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক, মানবপ্রকৃতির একটি উচ্চ ও মহৎ ভাব। যাঁহারা বলিতে পারেন যে, ভয় হইতে বিবেকের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, অন্ধকার হইতে আলোক হইয়াছে।*

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে বিবেক বা নৈতিক বাধ্যতাবোধ রহিয়াছে, উহাকে স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক বলিতেই হইবে। যতই কেন চেষ্টা করনা, উহাকে অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

নৈতিকজ্ঞান স্বাভাবিক।

মানবপ্রকৃতির গভীর স্থান হইতে নীতির উৎপত্তি। পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা, কর্ত্তব্য এই সকলের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা স্বভাবতঃ বিকশিত হয়। বাহির হইতে এই সকল নৈতিক ভাবের উৎপত্তি নহে, ভিতর হইতেই ইহাদের উৎ-

* সমাজশাসন ও রাজশাসন হইতে বিবেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা অসার ও অযুক্ত হইলেও ইহা বলিতেই হইবে যে, সমাজবিধি ও রাজবিধি দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ সমাজবিধি ও রাজবিধি সমাজসংরক্ষণের অনুকূল। সুতরাং ঐ সকল বিধি, ধর্ম্মবুদ্ধিরও অনুকূল। কেননা, ধর্ম্মবুদ্ধি সর্ব্বথাই সমাজসংরক্ষণের পক্ষপাতী। সুতরাং সমাজবিধি ও রাজবিধি ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তির কারণ না হইলেও, বংশপরম্পরায় ধর্ম্মবুদ্ধিকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

পত্তি। তবে বাহিরের অনুকূল অবস্থা, নৈতিক ভাবের বিকাশের সাহায্য করে।

আমাদের উচ্চতর প্রকৃতি ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির মধ্যে যে বিবাদ রহিয়াছে, যে সংঘর্ষণ রহিয়াছে, তাহা হইতেই আমরা স্বভাবতঃ পবিত্রতার জ্ঞান লাভ করি। ন্যায়বোধও মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। উহা স্বভাবতঃ মানবঅন্তরে বাস করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিহিংসা বৃত্তি হইতে ন্যায়বোধের উৎপত্তি। আদিম অবস্থায় মনুষ্যের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হয়। প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। এই প্রতিহিংসা হইতেই ন্যায়বোধের উৎপত্তি। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান, ইহা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। এক সময়ে যাহা ছিল, প্রতিহিংসা, এখন বিকাশের নিয়মে, তাহাই হইয়াছে, ন্যায়বিচার।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, একথা নিতান্তই অযুক্ত। কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই যদি ন্যায় হইত, তাহা হইলে একবার মনে করিলেও করিতে পারিতাম যে, প্রতিহিংসা হইতে উহার উৎপত্তি। কিন্তু ন্যায় বলিলে কেবল অপরাধীর শাস্তি কখনই বুঝায় না। ন্যায়ের অর্থ, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া। অপরাধীর শাসন, উপকারীর প্রত্যুপকার, উত্তমর্ণের ঋণপরিশোধ প্রভৃতি সকলই ন্যায়পরতার কার্য্য। ন্যায়পরতা কেবল অত্যাচারীর শাস্তিতেই বদ্ধ নহে। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহাই দেওয়া ন্যায়। সুতরাং প্রতিহিংসা হইতে ন্যায়ের উৎপত্তি, একথা একান্ত অসার ও অযুক্ত।

স্বভাবতঃ মানুষ সত্যকে ভালবাসে, মিথ্যাকে ঘৃণা করে। যে নিজে মিথ্যাবাদী, সেও ইচ্ছা করে না যে, লোকে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করে। পরোপকার পরম ধর্ম্ম। কিন্তু পরোপকার যে ধর্ম্ম, তাহা কি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে? কখনই না। পরোপকার কর্ত্তব্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি? দয়াবৃত্তি চরিতার্থ হয়, ভাব (feeling) চরিতার্থ হয়, সুতরাং কর্ত্তব্য, একথাও একান্ত অযুক্ত। কেননা, ভাবকে চরিতার্থ করিতে আমরা বাধ্য কেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। পরোপকার কর্ত্তব্য কেন, এ প্রশ্নের আর এক উত্তর এই যে, যদি জনসমাজের সকলেই পরোপকারব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমাজের সকলেই উপকৃত হয়, আমি সমাজের একজন, সুতরাং আমিও উপকৃত হই। অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, পরোপকার কর্ত্তব্য। কিন্তু, বাস্তবিক, ইহাতে কিছুই প্রমাণ হইল না। পরোপকার যে ধর্ম্ম, তাহা প্রমাণ হইল না। উহাতে যে আত্মউপকারের সম্ভাবনা, ইহাই প্রদর্শন করা হইল। বাস্তবিক, পরোপকার যে ধর্ম্ম, পরোপকার যে কর্ত্তব্য, ইহা কোন প্রকার যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় না। পরোপকার ধর্ম্ম, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহা নৈতিক সহজ জ্ঞান।

বাধ্যতাবোধে দুই জন বুঝায়।

এখন নৈতিক বাধ্যতাবোধ সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা একান্ত আবশ্যক। বাধ্যতা বলিলেই এরূপ বুঝায় যে, একজন বাধ্য করিতেছে, আর এক জন বাধ্য হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য

এই, বাধ্য করে কে? আমি আপনাকে আপনি কি বাধ্য করি? তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, আমার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যবোধ, অনেক সময় বিপরীত পথে চলিয়া থাকে। আমার ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহাই আমার কার্য্য। যাহা আমার ইচ্ছার বিপরীত, তাহা কখন আমার কার্য্য হইতে পারে না। অনেক সময়, কি এমন হয় না যে, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান, আমার নৈতিক বাধ্যতাবোধ, আমার ইচ্ছার বিপরীত দিকে আমাকে লইয়া যায়? আমি বলি, আমি ক্রীড়া করিয়া, আমোদ করিয়া সময় অতিপাত করি, কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কে বলে, তোমার অমুক আত্মীয় রোগ শয্যায় কাতর, তাঁহার নিকটে গিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সেবা কর। আমি ইচ্ছা করি, উপাদেয় সুখাদ্যে আমার রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করি, কিন্তু ভিতর হইতে কে বলে "অগ্রে ঐ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃতপ্রায় দরিদ্রকে আহার দান কর।" আমি ইচ্ছা করি, মূল্যবান, শোভন বস্ত্রে আমার দেহকে সজ্জিত করি, কিন্তু আমার ভিতর হইতে অবাক্ গম্ভীর ধ্বনিতে কে বলে, "ঐ শীত বাতে কম্পিত অসহায় দরিদ্রকে অগ্রে উপযুক্ত গাত্রাবরণ প্রদান কর।'

আমারই ভিতরে আমার অন্যায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে অন্য রূপ আদেশ কে করিতেছেন? আমি কি দুই জন? যদি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি, "আমি কি দুই জন?" তাহা হইতে এই সুস্পষ্ট নিঃসংশয় উত্তর পাই, "না, আমি এক।'' যদি কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি, "মহাশয়! আপনি একজন, না, দুই জন?" তিনি নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। আত্মার একত্বে সকলেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস।

আমি একজন। তবে এই বিপরীত ভাব কেন? তবে আমাকে বাধ্য করে কে? অন্য কোন প্রকারে এই বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। বলিতেই হইবে, উহা ঈশ্বরপ্রেরিত। মহাত্মা থিওডোর পার্কারের মতের ন্যায় বলিতেই হইবে, উহা মানবহৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী।

ঐ বাণী একদিকে যেমন আমার নহে, পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ আবার উহা আমার। উহা আমার আত্মার অবস্থা, উহা আমার মনের ভাব। এস্থলে আমার সহিত আমার ঈশ্বরের একত্ব দেখিতেছি। যাহা ঈশ্বরের বাণী, তাহাই আবার আমার বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি। এস্থলে একে দুই, দুইয়ে এক। মানবের নৈতিক প্রকৃতি মধ্যে এই দ্বৈতাদ্বৈত চিরদিনই বর্ত্তমান। ব্রাহ্মসমাজ বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন, বিবেক পরমেশ্বরের বাণী। সুতরাং মানবের নৈতিক প্রকৃতিতে এই দ্বৈতাদ্বৈত, ব্রাহ্মসমাজকে স্বীকার করিতেই হইবে।

এস্থলে পরমেশ্বরের সহিত আমরা এক। কেননা, যাহা তাঁহার বাণী, তাহাই আমার ধর্ম্মবুদ্ধি। এক অথচ দুই। কেননা, নৈতিক বাধ্যতাবোধে দুই জন বুঝায়। বিবেক আমাদের পরিচালক। সংসারপথে, ধর্ম্মপথে, বিবেক আমাদিগকে চালাইতেছে। বিবেক আমাদের উপদেষ্টা। বিবেক আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে। বিবেক আমাদের তিরস্কর্ত্তা। আমরা কোন অনুচিত কার্য্য করিলে বিবেক আমাদিগকে তিরস্কার করে। বিবেক বলে, "ছি! ছি! এমন কার্য্য করিলে!" আমি যদি কোন

অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, বিবেক বলে, "উহা করিওনা, উহা করিও না।" বিবেকের আদেশের সঙ্গে আমার ইচ্ছার কখন মিলন হয়, কখন বা উহা অতিক্রম করি। কিন্তু যখন বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলি, তখনও বিবেক, তাহার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না।

বিবেকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? বিবেক পরিচালক, আমি পরিচালিত; বিবেক নেতা, আমি নীত; বিবেক উপদেষ্টা, আমি উপদিষ্ট; বিবেক শিক্ষক, আমি শিক্ষিত; বিবেক শাসক, আমি শাসিত; বিবেক তিরস্কর্ত্তা, আমি তিরস্কৃত। বিবেকের সহিত আমার এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।

যে পরিচালক, সেই পরিচালিত; যে নেতা সেই নীত; যে উপদেষ্টা, সেই উপদিষ্ট; যে শিক্ষক, সেই শিক্ষিত, যে তিরস্কর্ত্তা, সেই তিরস্কৃত, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের অন্তরে একজন রহিয়াছেন, যিনি পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আদেশ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেছেন, "ইহা কর, ইহা করিও না।" এই প্রবন্ধের উপসংহারে, সেই অন্তরাত্মা, সেই অন্তরবিহারী হরি, সেই চৈত্যগুরুর শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্মরণার্থ।

গত ফাল্গুনমাসের নব্যভারতে "বালিকার কবিতা" নামে যাহার রচিত তিনটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের নব্যভারতেও "বাঙ্গালির ছেলে" নামক যাহার আরও একটী সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পঙ্কজিনী আর ইহজগতেই নাই। সম্পর্ক গুণেই পঙ্কজিনী আমার স্নেহের পাত্রী ছিল। সদ্ভাবপূর্ণ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিয়া পঙ্কজিনী আমার অধিকতর স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার অকাল মৃত্যু আমার পক্ষে দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে। পঙ্কজিনীর শ্বশুর বন্ধুবর কুমুদ বাবু লিখিয়াছেন, পঙ্কজিনী বিয়োগে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্র পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুত্রবধূকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে প্রাণ ভরিয়া স্নেহ করিতেন; আবার সেই বালিকার মধ্যে যে মূর্ত্তিমতী দেবীভাব ছিল, মাতৃজ্ঞানে তাহার পূজা করিতেন। কুমুদ বাবু লিখিয়াছেন, পঙ্কজিনী দেবকন্যা ছিল, তাহার দেব চরিত্রের গুণে পরিবারের আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, আর তাহার সম্মান করিত। পঙ্কজিনীর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই সে যে সকল কবিতা লিখিয়াছে, তাহাতেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বড় আশা ছিল, কালক্রমে সেই কবিত্বশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় এবং স্বদেশীয়দিগের সুখ ও গৌরবের কারণ হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই তিনি দেবকন্যা পঙ্কজিনীকে দেবধামে লইয়া গিয়াছেন। পঙ্কজিনীর স্মরণার্থে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই পাঠাইলাম। পঙ্কজিনীর লিখিত কয়টী কবিতা আমার নিকটে আছে। নব্যভারতে প্রকাশ করিবার জন্য উহা পরে পাঠাইব। পঙ্কজিনীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-মিশ্রিত এই চিহ্ন গুলিই তাহার আত্মীয়দিগের পরম যত্নের জিনিস হইয়া থাকিবে।

বুঝিতে না পারি বিধি, কেন পাঠাইলে
হেন পুষ্প পৃথিবীর পঙ্কিল সলিলে?
সৌরভ-শোভায় যার পুষ্কর ভরিলে,
অকালে তারেই বিধি ছিঁড়িয়া লইলে!
শত শত পুষ্প আছে উদ্যান ভরিয়া,
আঁধার করেছ কিন্তু একটী হরিয়া।
শত শতদল সম ছিল যার প্রাণ,

বিকচ কমল সম পবিত্র বয়ান,
সেই পঙ্কজিনী হায় ষোড়শী বালিকা,
প্রেমপুণ্যে প্রভাময় ফুটন্ত কলিকা;
দুর্ব্বল মৃণাল দেহ স্বহস্তে ছিঁড়িয়া
কেন বিধি হেন নিধি নিয়েছ কাড়িয়া!
অথবা এ অনুযোগ নহে সমুচিত,
ভাল মন্দ, কালাকাল তোমারি বিদিত;
যা করেছ, তাই ভাল; হেন মনে লয়,
তোমার পূজার যোগ্য যেই ফুল হয়,
তারে তুমি ধরা হতে লইয়া যতনে,
রেখে দেও আপনার পবিত্র চরণে;
তোমারি হাতের পুষ্প পূত পঙ্কজিনী,
আপনার পদে তারে রেখেছ আপনি।
বন্ধুবর, বুঝি আমি যে দুঃখ তোমার,
পঙ্কজিনী বিনে তব গৃহ অন্ধকার।
এ হেন কুসুম শোভে যেই পরিবারে,
সুখ-সরোবর সেই সংসার মাঝারে,
শান্তির সুগন্ধ আর ভক্তি পরিমল
সেই পরিবারে সদা থাকে অবিচল।
স্বর্গের সম্পদসম আছিল তোমার
পঙ্কজিনী পুত্রবধূ গুণের আধার;
লক্ষ্মী সরস্বতী দুটী মিলে একাকারে
স্বর্গসুখে সুখী সদা করিত তোমারে;
কন্যাজ্ঞানে ছিল যাতে স্নেহ অনিবার,
মাতৃজ্ঞানে পূজিয়াছ দেবত্ব যাহার,
সে যে কি পদার্থ ভাই, বুঝে কি সকলে?
হেন মাতৃরূপ হায় মর্ত্ত্যে ক'টী মিলে?
হৃদয়ের স্নেহ আর ভক্তির মিলনে
আসক্তির আবিলতা নাহি থাকে মনে;
সুখ সদ্গতির ভাই, এমন সহায়
দুঃখের সংসারে বল সহজে কে পায়?
পেয়েছিলে তুমি, তাই হারায়ে এখন,
মাতৃহীন শিশু সম করিছ ক্রন্দন!

সন্তাপনাশিনী সেই পরম জননী,
তোমারে সান্ত্বনা ভাই, দিবেন আপনি:
জরা মৃত্যু রোগ শোকে কাঁদে বটে প্রাণ,
অমঙ্গলে সুমঙ্গল তাঁহারি বিধান।
পঙ্কজিনি মা আমার সংসার ছাড়িয়া,
গিয়াছ বন্ধুর গৃহ আঁধার করিয়া।
সহিষ্ণুতা, প্রীতি আর প্রিয়সেবালয়ে
আছিলে বঙ্গের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে;
পুণ্যের প্রতিমা তুমি, তোমার লাগিয়া
বিষাদে কাতর প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া!
ঠিক যেন শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা প্রায়,
কয়টী বৎসর মাগো আছিলে ধরায়;
সকলে করিয়া সুখী দেবত্বের গুণে,
দহিলে মা, অবশেষে শোকের আগুনে।
ভবিষ্যৎ বাসগৃহ ছিল মা তোমার,
বুঝেছিলে সংসারের কতটুকু সার;
ভক্তির সুগন্ধ মাখা হৃদয় কোটরে
কত ভাব, কত আশা রেখেছিলে ভরে,
পূরিবে তোমার আশা গিয়ে দেবলোকে,
আকুল আত্মীয় যত মা তোমার শোকে!
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অজ্ঞান আঁধারে,
পড়ে আছে বঙ্গনারী দুঃখের আগারে,
নীচ বুদ্ধি, নীচ সুখ, নীচ প্রাণ লয়ে
পড়ে আছে দেবী যেন পিশাচী হইয়ে!
এ সময়ে পঙ্কজিনি, তোমার মতন
দেখা দিলে দেব কন্যা দুই চারি জন
হয় মা, সান্ত্বনা বড় তাপিত অন্তরে;
তোমার বিয়োগে মাগো, হৃদয় বিদরে!
পঙ্কজিনি, মা আমার, গিয়ে দেবলোকে,
দেবতার সহবাসে থাক তুমি সুখে;
বিধাতার কাছে এই আমার প্রার্থনা,
আত্মজনে কৃপা করে দিউন সান্ত্বনা।

শোক-সন্তপ্ত
আনন্দ চন্দ্র মিত্র।

সমন্বয়ভাষ্যের সমালোচনা।(১)

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় ঋষিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ভগবদ্গীতার যে সমন্বয়-ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এতদূর বিস্তৃত,পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পূর্ণ যে,মাসিক-পত্রিকার এইরূপ দুইএকটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাহার পূর্ণ-সমালোচনা হওয়া অসম্ভব। তথাপি এই ভাষ্যটী আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ভাষ্যে বহুবিধ মত ও সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে বিন্যস্ত ও যুক্তি তর্কদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, আমরা তাহারই মধ্যে হইতে দুই চারিটী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গৌরগোবিন্দ বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পাঠকবর্গকে দেখাইব। এই একটীমাত্র ভাষ্যেই পাঠক কেবল প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নব্য টীকাকৃৎদিগের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের বিরোধিমতের সামঞ্জস্য কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ইহাতে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। গীতার এ পর্য্যন্ত বহুবিধ সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত এ দেশে আর কেহ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। নববিধানমণ্ডলীর অর্থব্যয়, কান্তি বাবুর উদ্যোগ ও উৎসাহ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে।

Subject এবং Object, Thought এবং Being, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়,—এতদুভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে একটা মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় দর্শন, সর্ব্বত্রই এই গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ; কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। আর কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞেয় জ্ঞাতারই রূপান্তর মাত্র। জ্ঞেয় পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীতে একমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞাতাই বর্ত্তমান; যাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা সেই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (modified states)মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞেয় পদার্থ রাশির মূলে একটা অজ্ঞেয় পদার্থ আছে। সেই অজ্ঞেয় পদার্থের (Substratum) ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা একই ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় পথে উপস্থিত হইলে, জ্ঞেয়কে নানা ভাবে উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। শেষোক্ত দুই প্রকার দার্শনিক মতের মধ্যে, প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকেরা জ্ঞেয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহারা বলেন যে, যাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, উহারা জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ামাত্র। জ্ঞেয়-পদার্থের অন্তস্তলে আর কোন বস্তু বা (Substratum) স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের মতে গুণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; এই গুণগুলি দ্রষ্টার অন্তরে; ইহারা বাহ্যবস্তু নিহিত নহে। যদি কাহারও সত্বা স্বীকার করিতে হয়, তবে আত্মারই সত্বা স্বীকার কর, বাহ্য-সত্বা স্বীকা-

রের প্রয়োজন নাই। Primary এবং Secondary গুণ সকল, আত্মারই বিকারভূত অবস্থা মাত্র। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। বৃক্ষ কি? বৃক্ষ আর কিছুই নহে, কতকগুলি প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মিলন মাত্র। এবং এই প্রত্যক্ষ ক্রিয়াগুলি আন্তরিক,—আত্মারই অবস্থা-ভেদ; উহারা বাহ্যিক নহে। বৃক্ষের প্রত্যক্ষ ও বৃক্ষ একই পদার্থ; প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বাদ্ দিলে, বৃক্ষের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। বর্ণ, কাঠিন্য, গন্ধ, স্পর্শাদি তোমারই অন্তঃকরণে;—উহারা জ্ঞানেরই বিকার মাত্র। বৃক্ষের প্রত্যক্ষ সময়ে তোমার জ্ঞানেরই ঐ ঐ রূপে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব জগতে রূপবান্, গন্ধবান্ এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নাই; অস্তিত্ব আছে কেবল তোমার জ্ঞানের এবং জ্ঞানের ক্রিয়া বা আকার সমূহের। শব্দ স্পর্শ কাঠিন্যাদি সমস্তই তোমার আন্তরিক পরিবর্ত্তন মাত্র। অতএব প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার অনুভূতি ব্যতীত বস্তুর পৃথক্ সত্ত্বা নাই, এবং এই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া গুলি অন্তঃকরণের, বাহ্যিক নহে। শব্দ স্পর্শাদি গুণ গুলিকে একত্র ধরিয়া রাখিবার জন্য বাহ্যিক কোন Substratum এর সত্ত্বা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; কেননা উহারা মানসিক বিকারমাত্র এবং অন্তঃসত্ত্বাতেই অবস্থিত আছে। এই আন্তরিক ক্রিয়াগুলিকে লোকে ভুল করিয়া বাহ্য পদার্থে আরোপ করিয়া থাকে। বিষয়ের জ্ঞান হয় না; বিষয়ের আকারের (Ideas) জ্ঞান হয় মাত্র। এই ideaর মধ্যদিয়াই বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে; মন বা জ্ঞান, বস্তুর এই আকার মাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং আন্তরিক যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, আমরা তাহারই মাত্র জ্ঞানলাভে সমর্থ। এই আকার বা পরিবর্ত্তন গুলি মনে, বাহিরে নহে। Berkley, Fichte, Hegel প্রভৃতি দার্শনিক বৃন্দ এইরূপ মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আর এক সম্প্রদায় দার্শনিক আছে, তাঁহারা বাহ্যিক্ Substratum বা গুণ গুলির আধারকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ইঁহারা বলেন যে, শব্দস্পর্শ-রূপ রসাদি মানসিক পরিবর্ত্তন বটে, কিন্তু এই মানসিক পরিবর্ত্তন জন্মাইবার একটা বাহ্য "হেতু" থাকা একান্ত আবশ্যক। মনে কর, তোমার একটী অশ্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এস্থলে তুমি কি বুঝিতেছ? তুমি বুঝিতেছ যে বাহ্যিক 'একটা কিছু' তোমার ইন্দ্রিয়ের পথে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে এবং সেই ক্রিয়া গুলি উৎপন্ন হইবা মাত্র, সেই 'কোন কিছু' টাকে অশ্ব বলিয়া বুঝিতে পারিলে। অবশ্য এই বাহ্যিক হেতুটীর স্বরূপ আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অজ্ঞেয়ই থাকিয়া গেল। আমাদের জ্ঞানে কেবল শব্দ স্পর্শাদিরই জ্ঞান হওয়া সম্ভব; সেই জন্য যাহা হইতে বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদি উৎপন্ন হইল, সেই শব্দস্পর্শাদি ভিন্ন অন্য কিছুরই জ্ঞান লাভ করিবার উপায় আমাদের নাই। তাহা হইলেই, দেখা যাইতেছে যে, এরূপ মতে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পদার্থ নহে। বাহ্যিক অজ্ঞেয় হেতু (cause) হইতে, নিরন্ত আমাদের মনে কতকগুলি ক্রিয়া উত্তেজিত ও উদ্ভূত হইতে থাকে, সেই ক্রিয়ার জ্ঞানই আমাদের বস্তুজ্ঞান। সেই সেই শব্দ স্পর্শাদি ক্রিয়ার জ্ঞান ভিন্ন, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান লাভের অধিকার আমাদের নাই। তুমি

একটী আম্রফল চক্ষুদিয়া দেখিলে, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিলে,—এইরূপে তুমি বুঝিলে যে তুমি আম্র ফলের জ্ঞান লাভ করিয়াছ। এ জ্ঞান কিরূপ? ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ঐ ফলটী তোমার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির উপর যে যে ক্রিয়া জন্মাইয়া দিল, সেই ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া সমূহের জ্ঞান মাত্র। অতএব ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও বস্তুর স্বরূপজ্ঞান এক কথা নহে। যদি তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিত, তবে কি হইত? তখন ঐ ফলের একটী গুণ (অর্থাৎ রূপ) কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইত অর্থাৎ ফলটীর আর রূপ দর্শন ঘটিত না। আবার মনে কর, তোমার গন্ধ ও স্বাদেন্দ্রিয় নাই;—এবারে কি হইল? হইল এই যে, তোমার ফলের জ্ঞান হইতে আর দুইটী গুণ বা ক্রিয়া কমিয়া গেল। সুতরাং এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের বস্তুজ্ঞান ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্র। যতটী ইন্দ্রিয় তোমার যতদিন আছে, ততদিন সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেইরূপ জ্ঞান হইতেই থাকিবে। একটী দুইটী করিয়া তোমার ইন্দ্রিয় কমাইয়া দেও, তোমার বস্তু বিষয়ক জ্ঞান ও সেই সেই ভাবে কমিয়া যাইবে। আবার যদি তোমার আরো কয়েকটী অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে ঐ ফলটী সম্বন্ধে আরো অন্তবিধ কয়েকটী অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে। এক এক ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তু যেরূপ ক্রিয়া করে, যতদিন ঐ ইন্দ্রিয় মানুষের আছে, ততদিন সেই সেই ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান হইবেই। ইহাই আমাদের বস্তুজ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব। এতদতিরিক্ত জ্ঞান-পরিগ্রহে মানুষাদির অধিকার নাই। অতএব, বস্তু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর যে ক্রিয়া উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ার জ্ঞান ভিন্ন, বস্তু-জ্ঞানের অন্য উপায় আমাদের নাই। তবেই এ মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পদার্থ নহে। অগ্নিতে তোমার হস্ত দগ্ধ হইল, দগ্ধস্থানে তুমি যাতনা অনুভব করিলে; তুমি কি বলিবে যে অগ্নি ও যাতনার অনুভূতি একই পদার্থ? যদি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে চেতন প্রাণী সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইত, তবে অগ্নির এই যে যন্ত্রণাজনকত্ব গুণ, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কেননা যন্ত্রণানুভূতি মনেরই একটা পরিবর্ত্তনাত্মক বিকার মাত্র। এইরূপ, আলোক, উত্তাপ, শব্দ, যন্ত্রণাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিলে, সে গুলির জ্ঞান জন্মিবে কি প্রকারে? উত্তাপ অগ্নিতে নাই, উহা আমাদের মনে। মিষ্টতা চিনিতে থাকে না, উহা আমাদের মনে। যতদিন ঐ ঐ গুণের গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান আছে, ততদিন ঐ ঐ প্রকারের জ্ঞান হওয়া অনিবার্য্য। ঐ ঐ ইন্দ্রিয় না থাকিলে, ঐ ঐ প্রকারের জ্ঞানও হইতে পারিত না। অগ্নি কাগজকে পোড়াইতে সক্ষম, কিন্তু কাগজে যন্ত্রণার অনুভূতি জন্মাইতে পারে না। চিনি জলে মিশিয়া যায়, কিন্তু চিনি জলেতে মিষ্টতার অনুভূতি দিতে পারে না। এইরূপ তাপ, বর্ণ প্রভৃতি সমস্তই আমাদের ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়াত্মক অনুভূতি মাত্র; আমরা ভ্রমবশতঃ অগ্নিতে তাপের ও পুষ্পে বর্ণের আরোপ করিয়া থাকি। বাস্তবিক অগ্নি ও পুষ্প কি পদার্থ,—উহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে জানিবার উপায় নাই। গুণগুলি ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়ামাত্র, উহারা মনেরই সম্পত্তি (Subjective)। অন্যরূপ ইন্দ্রিয় থাকিলে, এই সকল

বস্তুই অনুরূপ জ্ঞান আমাদের মনে উৎপাদন করিতে পারিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কেবল শব্দ স্পর্শরূপাদির জ্ঞান লাভ করিতেই সমর্থ, তদতিরিক্ত বস্তুজ্ঞানে সমর্থ নহে। অতএব এই সকল দার্শনিক পণ্ডিতবর্গের মতে, শব্দ স্পর্শাদির অন্তরালে, তাহাদের হেতুভূত একটা পদার্থ আছে; সেই পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়ের উপরে যে যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইতেছে, আমরা কেবল তাহাই বুঝিতেছি। অতএব ইহা এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহাঁরা এ জগৎটাকে উড়াইয়া দেন নাই। Lock এবং Kant প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতের পরিপোষক ও অগ্রণী।

এখন আমরা দেখিব, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই দ্বিবিধ মতের কোন্ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমাদের বিশ্বাস, শঙ্করাচার্য্য এই শেষোক্ত মতটীকেই সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, কি দেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই শঙ্করাচার্য্যকে অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। "মায়া" শব্দটীর প্রয়োগ দেখিয়াই, অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তিও, শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী রূপে অনেকেই দোষ দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শঙ্কর সেরূপ মায়াবাদী নহেন। আমরা দুইটী মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তিনি জগৎকে এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দেন নাই।

"প্রাণি কর্ম্মাণি ক্রিয়াবাৎ সংস্কারং জনয়ন্তি। সংস্কার বশাদেব যোগাদ্যানে জীনকার্য্যসংস্কার রূপ শক্তিবলাৎ উজ্জয়ন্তিঃ পুর্ব্বেহই সদাভৌয়কা ভবতি। অন্যথা সংস্কার-প্রলয়ে জগদ্বৈচিত্র্যস্তাকস্মিকত্বং স্যাৎ"।

অন্য আর একস্থলে তিনি বলিয়াছেন যে—

"নন্থ বিষয়াকারং জ্ঞানং ন বিষয়ো। * * * সত্যংহি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি।"

আর একস্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিতেছি:—

"Again you can not argue that there are no outward objects, on the ground that idea takes the form of outward object, for if there were no outward object in existence, the idea could not take the form of an outward object. You will have to admit then that the reason, that the idea and the object perceived are always presented simultaneously, is *not that the object is one and the same with the idea, but that the object is the occasion of the perception.* (A. E. Gough's translation.)

পাঠক দেখুন, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে? বস্তুর জ্ঞান (idea) এবং বস্তুর স্বরূপ যে এক নহে, ইহা অপেক্ষা আর কি স্পষ্ট উক্তি হইতে পারে? পাঠক এখন বুঝিবেন যে, আমরা উপরে যে দার্শনিক মতটীর কথা বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি, সেই মতটী, ও শঙ্করের মতটী ঠিক্ একরূপ। যিনি স্বকৃত ভাষ্যের নানা স্থানে প্রলয়ে জগতের শক্তিময়রূপ স্বীকার করিয়াছেন, যিনি অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই, যিনি বস্তু এবং বস্তুর idea কে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার মতে এজগৎ অলীক পদার্থ, বলা অতি দুঃসাহসের কার্য্য। পণ্ডিতপ্রবর Maxmuller শঙ্করকে প্রকৃত রূপে বুঝিয়া বলিয়াছেন যে,—"The danger with Sankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal, should be taken for purely fictitious. There is however a great difference between the two, maya is the cause of a phenomenal, not of a fictitious world; and if Sankara adopts the বিবর্ত্ত instead of পরিণাম doctrine, there is always something on which the বিবর্ত্ত is at work and which can not be

deprived of its reality." সুবিখ্যাত পণ্ডিত Jones বলেন—"The fundamental tenet of Vedanta consisted not in denying the existence of matter *i, e.* of primary and secondary qualities but in contending that it has no essence independent of mental perception." শঙ্কর জগৎকে phenomena মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু phenomena হইলেই তাহার মূলে কোন Real বস্তুর সত্বা না থাকিয়া পারে না। Kant এর মতে সেই বস্তুটী অজ্ঞেয়; শঙ্করের মতে তাহা সেই ব্রহ্মপদার্থ।

মহাত্মা পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায়, শঙ্করের এই মিথ্যা মায়াবাদের কলঙ্ক, তাঁহার সমন্বয় ভাষ্যে উত্তম বিচারের সহিত ক্ষালিত করিয়াছেন। এই সকল স্থানেই এই নবীন ভাষ্যকারের অসাধারণ কৃতিত্ব ও বিচার-চাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। তিনি শঙ্করকে প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন। এবং প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়াই জগৎটাকে তিনিও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই বলিয়াই রামানুজ-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে তিনি কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। যে শঙ্কর matter কে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে সেই শক্তিবশে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে পরিণত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। এইরূপেই শঙ্কর, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা-রূপে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাষ্যকার পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, শঙ্করাচার্য্যের এই মধুর তাৎপর্য্য ও অতি চমৎকার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

ভরসা।

সে দিন বসিয়া আছি নৈহাটী ষ্টেশনে,
দেখা হ'লো এক পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী সনে।
তাড়াতাড়ি বন্ধুবর বাড়াইয়া কর,
'হ্যাণ্ড-শেক্' করিলেন সানন্দ অন্তর।
গলে ঘড়ী হাতে ছড়ি কি উৎসাহ তার,
বিমলিন জীর্ণ বস্ত্র কটীতে আমার।
কে কোথায় কর্ম্ম করি, কত বা বেতন,
যখন এ আলাপের হ'ল সমাপন,
কহিলেন বন্ধু মোরে "এত লিখে প'ড়ে,
শেষকালে র'লে কি না গুরু-গিরি ধ'রে!
এ সামান্য বেতনেতে দিন চলা ভার;
কি আশা ভরসা, সখে, এ কর্ম্মে তোমার?"
অণুমাত্র না ভাবিয়া কহিনু সহসা—
"বাঁচিব না বেশী দিন এই তো ভরসা।"

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুকুমণি।

১

দেবতার দেশে তুই ছিলি দেবরাণী,
তোর ঐ রাঙ্গা ঠোঁটে,
স্বরগের ফুল ফোটে,
মুখে আধা কথামৃত চোকে মন্দাকিনী।

২

হৃদয়-স্বরগে তুই স্নেহের-নন্দন,
তোর হাসি মুখে খুকী
রাঙ্গা রবি দেয় উঁকি,
হাসি মুখে বসন্তের নব-ফুল-বন।

৩

অনন্তের মহাদান অমূল্য রতন
তোমার অঙ্গের বায়
পথে ঘাটে পাওয়া যায়,
পাকা হরিতকি ফল রজত কাঞ্চন।

৫

তোরি সরলতা ছাঁচে গড়া বুল্ বুল্
মূর্ত্তিমতী দয়া প্রেম
ফুলদলে গড়া হেম,
পুণ্যালোকে করুণার অশ্রুর পুতুল।

৬

কে ফুটালো এ অরণ্যে নব ফুল-কলি
কমনীয় কলেবর,
গোলাপ ফুলের থর
পবিত্রে পুরাণ বেদ, সৌন্দর্য্যে বিজলী।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

টডের মহত্ত্ব।

১

মহারাষ্ট্র দাপে সোণার মিবার,
দলিত—নিষ্পিষ্ট, হ'লো ছার খার;
নাগরিক যত করে হাহাকার!
জনমভূমির দুর্গতি হেরি!
সমর-সাগরে করি' সন্তরণ,
সে সমর সিংহ—অমূল্য জীবন
দৃষদ্বতী-তটে দিল বিসর্জ্জন
যার তরে, হায়, আ' মরি মরি!

২

সংগ্রাম, প্রতাপ—প্রতাপে তপন,
যাঁদের প্রতাপে কাঁপিত ভুবন;
রক্ত বিনিময়ে স্বাধীনতা-ধন
রক্ষিলেন যাঁরা যতনে কত;
তাঁদের জননী কনক-মিবার,—
বিদেশীয় দলে দলি' অনিবার,
করিয়াছে আহা! কত অত্যাচার!
কত নর নারী হয়েছে হত!

৩

বাপ্পা রাওলের পূত সিংহাসন,
মিবারের শুভ্র বিজয়-কেতন,
আজি কাপুরুষ ভীম অভাজন,
কালিমা ছড়া'য়ে দিয়াছে তায়।
তাই সে পাষণ্ড মহারাষ্ট্রগণ,
চরণে পেষিছে মিবার ভুবন;
হিন্দুজাতি করে হিন্দু নির্যাতন,
হেন বিসদৃশ কোথায় হায়!

৪

"যায়-যায় আজি যায় রসাতলে
সোণার মিবার," এ' মহীমণ্ডলে
গাও এ কাহিনী মিলিয়া সকলে,
ঢাল অশ্রুবারি মিবার-শোকে!
ভারতের দুঃখে ভারত-সন্তান,
একবিন্দু অশ্রু করে না প্রদান;—
হায়রে, বিধির বিচিত্র বিধান!—
কি ঘোর কলঙ্ক ভারত-বুকে!

৫

সবে মত্ত স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণে,
নিজ পরিবার-উদর পোষণে;
স্বদেশের তরে, হায়, একজনে
নাহি করে বিন্দু শোণিত দান!
"এ মহাবিপ্লবে কে রক্ষিবে আর
রাজস্থান-রাণী-কনক-মিবার?
আজি এ' ভারত হ'ল ছারখার!"
অশ্রুনীরে তিতি গাহ ঐ গান!

৬

নিস্তেজ আজিরে ভারত-তপন,
তাই সে উদার বৃটন-নন্দন,
চিতোর-দুর্গতি করিতে মোচন,
সপ্ত সিন্ধু-পারে এসেছে হেথা।

ধন্য হে বৃটন! ধন্য তব দয়া!
পরস্ব রাখিতে কার কাঁদে হিয়া?
স্বজাতি বোঝেনা স্বজাতির মায়া!
তব মহিমার তুলনা কোথা?

৭

এসেছ সাধিতে মিবার-কল্যাণ,
টড্ মহোদয়, য়ুরোপ-সন্তান!
ভারত-বান্ধব কে তব সমান?
এমন মহত্ত্ব কোথায় মিলে?
বিদ্রোহী সামন্ত তব প্রতিভায়,
আজি সভাস্থলে হইয়ে উদয়,
গায় সমস্বরে—"ভারতের জয়"
নির্যাতন-স্পৃহা গিয়াছে চ'লে!

৮

প্রতিহিংসা-বহ্নি গিয়াছে নিবিয়া,
স্বদেশের তরে কাঁদিয়াছে হিয়া,
সবাই রয়েছে সবারে চাহিয়া,—
রাখিতে মিবারে মাহাট্টা-করে,
হে বৃটন! তব প্রতিভার বলে,
দুরন্ত—দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র দলে,
হয়েছে বিনীত তব পদতলে!
লুপ্ত দ্রোহ-বহ্নি অনন্ত তবে!

৯

আজি 'ভিলবারা' অট্টালক চূড়ে
হয়েছে শোভিত; চরাচর যুড়ে
নাগরিক যত গায় সমস্বরে,—
"জয় দয়াময় বৃটন জয়!"
সুখে নিদ্রা যায় আজি রে মিবার!
থামিয়াছে যত শোক-অশ্রুধার!—
আর না শ্রবণে পশে হাহাকার!—
হর্ষে বৃটনের মহিমা গায়।

১০

ভারত-বান্ধব বৃটন নন্দন!
ছাড়িয়াছ কবে এ' মরভবন!
আজো তব নাম হইলে স্মরণ,
ভক্তি মদে মাতি নাচয়ে প্রাণ!
'রাজবারা' নাম র'বে যতদিন,
কালের গরভে না হ'বে বিলীন;
ভারত-নিবাসী সবে ততদিন,—
গাহিবে তোমার মহিমা গান!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজাবিধি। (৩)

(সাধু জেম্‌সের সাধারণ পূজা-বিধির শেষভাগ)।*

আচার্য্য। এই মুহূর্ত্তটী কি ভয়ঙ্কর! প্রিয়জনগণ, যে মুহূর্ত্তে পরমাত্মা, জীবিত ও পবিত্র আত্মা, সর্ব্বোন্নত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই পুণ্য স্থানে আসিয়া, পরম প্রসাদের উপর আন্দোলিত হইয়া, উহাকে উৎসর্গ ও পবিত্র করেন, সেই মুহূর্ত্তটী কি

* গত পূর্ব্ব মাসের নব্যভারতে খ্রীষ্টীয় স্তোত্রটী "আইস আমরা" (Venite) সম্পূর্ণ ভাবে না দিয়া * * * চিহ্ন দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য নহে কোন অংশ লোপ করা বা আধুনিক ভাবে কোন ভাব প্রকটিত করা। কোন দূষ্য মত সাধু জেম্‌সের সাধারণ পূজা বিধির মধ্যে, যদি থাকে, সে মতটী অপলাপ করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। ভাল হউক, মন্দ হউক, পূজা বিধিটীর যথাযথ অনুবাদ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। লুপ্ত অংশটী এই—

"যেমন ঈশ্বরকে কোপান্বিত করিবার দিনে, যেমন অরণ্যের প্রলোভনের দিনে, করিয়াছিলে, যখন তোমাদের পিতৃগণ আমাকে পরীক্ষা করিয়া ও করিয়া মাজিয়া, আমার কীর্ত্তি দেখিতে পাইল। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি এই বংশের উপর ক্রুদ্ধ ছিলাম, আর বলিয়াছিলাম, এই জাতি হৃদয়ে প্রান্ত হোর। আমার গতিবিধি ইহারা বুঝিল না, যাহাদিগের সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি শপথ করিয়াছিলাম, উহারা যেন আমার শান্তিতে প্রবেশ না করে।" সি-গো-মু।

ভয়ঙ্কর! আইস আমরা সসম্ভ্রমে ও সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি।

পুরোহিত। [প্রণিপাত পূর্ব্বক পবিত্র পরমাত্মাকে এই বলিয়া আহ্বান করেন]

হে প্রভো, সর্ব্বশক্তিমান পিতা, আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের উপর এবং এই স্থানে প্রদর্শিত নৈবেদ্য-দ্বয়ের উপর, জীবনের যিনি প্রভু ও বিধাতা, যিনি আপনার সিংহাসনোপরি, পিতা পরমেশ্বর যে আপনি আপনার ও আপনার পুত্রের সহিত সমতুল্য, রাজ্যে তুল্য ক্ষমতা বিশিষ্ট, সম-বস্তু সম্পন্ন, সমনিত্য, যিনি ব্যবস্থাতে প্রকাশিত, দৈবজ্ঞ দল দ্বারা প্রকাশিত, আপনার নূতন সন্ধি বন্ধনেও প্রকাশিত, যিনি আমাদের প্রভু যীশু মশিহের উপর যর্দ্দন-নদোপকূলে কপোতাকারে অবতীর্ণ হয়েন; যিনি সাধু শিষ্য দলের উপর দীপ্তিমান রসনার আকারে অবতীর্ণ হয়েন, সেই পবিত্র পরমাত্মাকে আপনি প্রেরণ করুন।

হে প্রভো, আমার এই প্রার্থনার উত্তর আপনি দান করুন।

লোকেরা। হে প্রভো, দয়া করুন।

পুরোহিত। এই নিগূঢ় পদার্থের উপর অবতীর্ণ ও বিস্তীর্ণ হইয়া তিনি যেন আমাদের শরীর ও আত্মার ক্ষমার জন্য ইহাকে একটী জীবিত দেহে, পরিত্রাণদায়ক দেহে, স্বর্গীয় দেহে, আমাদের প্রভু যীশু মশিহের দেহে, পরিণত করেন; যেন যে কেহ এই পদার্থ গ্রহণ করিবে, সে পাপের মোচন ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে গ্রহণ করে।

পুরোহিত। আর এই পান পাত্র * যেন নূতন নিয়মের রক্তে, ত্রাণদায়ক রক্তে, জীবনদায়ক রক্তে, স্বর্গীয় রক্তে, আমাদের আত্মা ও শরীরের পূর্ণ পরিশুদ্ধির উপযোগী রক্তে, প্রভু ঈশ্বরের ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু মশিহের রক্তে, পরিণত হয়, যেন যে কেহ ইহা গ্রহণ করিবে, তাহারা যেন পাপের মোচন ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। যেন এই পদার্থদ্বয় আমাদের জন্য, আর যে কেহ ইহাদের গ্রহণ বা ইহাদের সহভাগী হইবে, তাহাদের জন্য, আত্মা ও শরীরের পবিত্রতা বিধান করে, সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দান করে; আর যমালয়ের দ্বারদেশ যেন সফল মনোরথ না হয়, এই জন্য আপনি যে পবিত্রমণ্ডলীকে বিশ্বাসরূপ গিরির উপর স্থাপন করিয়াছেন, সেই মণ্ডলী যেন দৃঢ় সংস্থাপিত হইয়া বিরাজ করেন। জগতের পূর্ণাবস্থা যত দিন না উপস্থিত হয়, ততদিন আপনি মণ্ডলীকে তাবৎ উপধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করুন। আপনার অদ্বিতীয় পুত্রের আশীর্ব্বাদ, দয়া ও মনুষ্য জাতির উপর করুণা দ্বারা এইরূপ ঘটুক, যাঁহা দ্বারা ও যাঁহার সহিত আপনার মহিমা ও সম্মান একত্রে জড়িত।

লোকেরা। তথাস্তু।

[এই সময়ে আচার্য্য মণ্ডলীর জন্য ও মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষদের জন্য লোকদিগকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন।]

পুরোহিত। [প্রণিপাত হইয়া]

হে প্রভো, আমরা এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর অথচ রক্তপাতবিহীন বলি, যে সকল পুণ্য স্থানকে আপনার পুত্র মশিহের আবির্ভাব দ্বারা আপনি মহিমান্বিত করিয়াছেন, ঐ

* কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "এই পান-পাত্র স্থিত ভিন্ন পদার্থ" এই কথাগুলি দৃষ্ট হয়।

সকল স্থানের ক্ষেমার্থ উৎসর্গ করিতেছি। বিশেষতঃ তাবৎ মণ্ডলীর প্রসূতি পবিত্র জায়নের * জন্য এবং সর্ব্বভূমণ্ডল ব্যাপিয়া যে মণ্ডলী বিরাজ করিতেছেন, সেই সনাতন মণ্ডলীর জন্য, যেন, হে প্রভো, আপনি উঁহার উপর পবিত্র পরমাত্মার বহুমূল্য দান সকল অর্পণ করেন। হে প্রভো, আমাদের ঈশ্বরপরায়ণ গুরুদেবদিগকে স্মরণ রাখিবেন, যাঁহারা সত্যের বচন আমাদিগের নিকট প্রকৃতরূপে বণ্টন করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমাদের পিতৃগণকে আমাদের ধর্ম্ম পাল ....কে এবং অবশিষ্ট সকল সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুগণকে। হে প্রভো, আপনি উঁহাদিগকে সম্মানসূচক বার্দ্ধক্যে ভূষিত করুন, ধর্ম্ম ও পুণ্যে অনেককাল ধরিয়া আপনার লোকদিগের পালন করিবার জন্য আপনি উঁহাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রভো, আপনি এই পুরোহিত মণ্ডলীকে এবং আর আর স্থানের পুরোহিত মণ্ডলীকে এবং খ্রীষ্টের আচার্য্য মণ্ডলীকে, এবং পবিত্র সেবায় নিযুক্ত আর আর দলকে, এবং মণ্ডলীর প্রত্যেক সেবক-পর্য্যায়কে স্মরণে রাখিবেন। হে প্রভো, আমার দারিদ্র্য আপনি স্মরণে রাখিবেন; আমি আপনাকে আহ্বান করিবার অযোগ্য হইলেও আপনি আমাকে যোগ্য করিয়া লইয়াছেন। আমার যৌবন কালের পাপ সমুদায়, আমার অজ্ঞানতা সমুদায় স্মরণ না করিয়া, আপনার স্বকীয় দয়ার প্রাচুর্য্যে আপনি আমাকে স্মরণ করুন। কারণ, হে প্রভো আপনি যদি কদাচরণ নিরীক্ষণ করেন, তবে কে আপনার দৃষ্টির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম? কিন্তু আপনার নিকট প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যমান থাকিবার কারণ আপনি আমাকে দর্শন দিয়া আমার হৃদয় শুদ্ধ করুন; যেন পাপ যেখানে আপ্লুত করিয়াছিল, সেখানে গভীরতর ভাবে আশীর্ব্বাদ আপ্লুত করিয়া থাকিতে পারে। হে প্রভো, যাঁহারা বন্ধনে বা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন, যাঁহারা নির্ব্বাসনে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সকল ভ্রাতৃগণকে, পীড়িত ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে, যাঁহারা অসদাত্মা দ্বারা উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া আছেন, সেই সকল লোককে, আপনি স্মরণে রাখিবেন। হে প্রভো, বায়ু, বৃষ্টি, শিশির, ভূমিজাত শস্য এবং মুকুট ধারণরূপ বৎসরের যে শস্য ছেদনকাল, এই সমস্ত আপনি স্মরণে রাখিবেন; কারণ সকলের দৃষ্টিই আপনার আশাপথ লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে এবং আপনিও তাহাদিগকে যথাসময়ে আহার দান করিবার জন্য আপনার হস্ত উন্মুক্ত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্তি দান করেন, এবং তাবৎ জীবকে আপনার মঙ্গলময় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি দ্বারা পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

* সাধু জেম্‌সের পূজা বিধির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই আর একটী নিদর্শন। রোম বা এণ্টিয়ক বা এডেসার মণ্ডলী তাবৎ মণ্ডলীর প্রসূতি বলিয়া এস্থলে গ্রাহ্য হয় নাই। এখনও জগৎব্যাপী সনাতন মণ্ডলী জেরুসালেম বা জায়নকে মণ্ডলীর কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এখনও পিটার জেরুসালেমে থাকিয়া মণ্ডলীর বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিতেছেন, এখনও প্রেরিতগণ জেরুসালেম কেন্দ্র হইতে পশ্চিমে স্পেন ও ব্রিটন, দক্ষিণে আবিসিনিয়া, উত্তরে পারস্য ও মেসোপোটেমিয়া এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও চীন পর্য্যন্ত সুসম্বাদ প্রচারে বাহির হইতেছেন। এখনও জেরুসালেম ধ্বংশ হয় নাই, রোম অথবা এণ্টিয়ক জেরুসালেমের স্থান অধিকার করে নাই। এখনও ক্রুশ চিহ্ন ভাবটীর গুরুত্ব জ্ঞাপক বলিয়া বলিতে হইবে। জেরুসালেম মণ্ডলী প্রমুখ সনাতন মণ্ডলী যে এক অভিন্ন সমাজ, এই গুরুভাবটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

74/5 710

LIBRARY ... 419 ... WRITERS ...

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (১)

[ভাষা-ব্যাকরণ-বর্ণমালা]

ভাষার কি অবস্থায় কোন্ স্তরে সাহিত্যের সংগঠন হইতে আরম্ভ হয়?

ব্যাকরণ-বিধি ও বর্ণমালা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিকাশ লাভ করার পূর্ব্বে সাহিত্যের সংগঠন স্বভাবতই সম্ভাবিত হইতে পারে না।

সাহিত্য কি?

সদ্ভাবের বা ভাবের সপ্রকাশ শরীরই, এক কথায়, সাহিত্য। চিন্তা-প্রবাহের প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকেই সাহিত্য বলি। চিত্তের ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার বাক্য-চিত্রই সাহিত্য। সাহিত্য অন্তঃপ্রকৃতির বহিঃস্ফুরণ ও বহিঃপ্রকৃতির পুনঃ মুদ্রণ। স্বভাবের ও ভাবের সুনির্ম্মিত শব্দ-শরীরই সাহিত্য বটে।

অশরীরী সাহিত্য যাহাই হউক বা যাহা হওয়া সম্ভব হউক;—শরীরী সাহিত্য ভাষার সহিত ভাবের শোভনীয় শুভ পরিণয় সম্মিলন।

অতএব ভাব প্রকাশোপযোগী ও স্বভাব-অঙ্কনোপযোগী ভাষার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাহিত্যের আবির্ভাব অসম্ভব। অর্থযুক্ত শব্দের সৃষ্টি এবং বাক্যের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে সাহিত্যের সংগঠন সম্ভবে না। পরন্তু তদ্রূপ শব্দের বা বাক্যের লোক-পরিগৃহীত ও মনুষ্যের বোধগম্য সংযোজনা-প্রণালী যাহার আর এক নাম ব্যাকরণ-বিধি, পরিব্যক্ত বা প্রস্তুতীকৃত এবং প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও সাহিত্য সংগঠন অসম্ভব। অপিচ, শব্দের স্বরূপাদি পরিব্যঞ্জক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিচায়ক প্রতিনিধি বা প্রতিরূপ—লিপি অঙ্কনোপযোগী চিহ্ন-বর্ণ—যাহাবরর বা অক্ষরাবলীর অভিব্যক্তি ও বিকাশ ব্যতীতও বিশুদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যের সংগঠন হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে না।

ভাষায় যত কাল বহুবিধ ভাব পরিজ্ঞাপক বহু সংখ্যক শব্দের সৃষ্টি না হয়, ভাষা যতকাল ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক সূত্রে দৃঢ়ীকৃতা, সংযতা ও স্থায়ী-সংবদ্ধ হইয়া, অপরিবর্ত্তনশীলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা-বিহীন না হয় এবং যতকাল কোনও না কোনও আকারে বর্ণমালা অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল সাহিত্য মনুষ্যের মানস কুক্ষি অভ্যন্তরে, ভ্রূণবৎ বিদ্যমান বা বিলীন থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু, সাহিত্যের সংযোজনা ও রচনা, সাহিত্যের সম্প্রকাশ ও বহিঃবিকাশ ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত থাকে। ভাবার্থযুক্ত শব্দাবলী, ব্যাকরণবিধি ও বর্ণমালা গঠিত বা সৃজিত হইবার পূর্ব্বে, ভাষা বিশেষে গ্রাম্য-গাথা বা তৎসদৃশ অবিশুদ্ধ হর্ষ বিষাদ পরিজ্ঞাপক ও ভয় ভক্তি পরিব্যঞ্জক, প্রকৃত ভাবার্থ ও ছন্দ যতিঃ বিরহিত অব্যয় ও অস্থায়ী শব্দ মাত্রে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সংযোজিত, বাক্য বা পদাবলী বিরচিত ও লোকে তাহা বিস্মৃত না হওয়া অবধি কিয়ৎকাল মাত্র ব্যবহৃত বা গীত হওয়া সম্ভাবিত ও সংঘটিত হয়; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে সাহিত্য বলা যায়, তাহা রচিত ও গঠিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব থাকে।

বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে, সমগ্র শব্দ-শাস্ত্র ব্যাকরণ বিজ্ঞান ও অলঙ্কার-সংহিতা পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত হওয়ার পর তবে সাহিত্যের অঙ্কুর

হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে সাহিত্যের সূত্রপাতই হয় না। না—উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য আদৌ তাহা নয়;—বরং তাহার বিপরীত।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র সম্যক অবয়ব লাভ করার পর তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় নাই। প্রত্যুত ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র ভাষার ও সাহিত্যের নিয়ামক ও পরিচালক হইলেও তাহারা ভাষা ও সাহিত্যের সংগঠিত শরীর হইতে আপন আপন অবয়বের অনেকখানি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে এবং করে।

ফলতঃ এক পক্ষে, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য সমালোচনারই ফল। ভাষা ও সাহিত্যের ছেদন, বিশ্লেষণ শ্রেণী গঠন, নিয়ম বন্ধন ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়া এবং করিবার নিমিত্ত, ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি সৃষ্ট, সংগঠিত ও ক্রমশ জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। কেন না শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শৃঙ্খলা সংবর্দ্ধক জ্ঞানই বিজ্ঞান।

কিন্তু, তাই বলিয়া, ব্যাকরণাদি বিজ্ঞান ও শব্দালঙ্কারাদি শাস্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচন ও শৃঙ্খলাকরণ হইতে উদ্ভূত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক সৃষ্টি ও বিকাশ হইবার পর তবে ব্যাকরণাদি সৃষ্ট হইয়াছে, এমন কদাচ বলা যায় না। বলিলে সে বাক্যে বাতুলতাই বর্ত্তে।

ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনার ফল হইলেও সে সমালোচনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ভাষাদি সম্যকরূপে সংগঠিত ও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার ছেদন বিশ্লেষণাদি হইয়া ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের ও গ্রন্থের সঙ্কলন হয় বটে। কিন্তু ভাষাগত ব্যাকরণাদি প্রণালী তাহার বহু পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ ভাষা ও ব্যাকরণের সম্বন্ধই দেখুন। ভাষা ও ব্যাকরণের পরে পরে নহে,—একত্রে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই, আবির্ভাব হয়। এবং উভয়ে একত্রে ক্রম বিকাশ ও উন্নতির সহিত, স্তরে স্তরে বিস্মৃতি ও ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে থাকে। যখন যেমন ব্যাকরণ তখন তেমনি ভাষা; অথবা যখন যেমন ভাষা, তখন তেমনি ব্যাকরণ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যাকরণে ও ভাষায়, শব্দ এবং অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ। ব্যাকরণ অর্থে কেবল গ্রন্থ বিশেষ নহে; ভাষার বোধগম্যতা, সংযোজনগ্রন্থি, কথনও লিখনের রীতিই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বই লিখিত ও কায়দা কানুন সঙ্কলিত হইবার বহু পূর্ব্বে ব্যাকরণ জন্মিয়াছিল।

যখন ব্যাকরণ কাঁচা, তখন ভাষা ও কচি,—নেহাত না-বালিকা—সূতিকা গৃহের খুকী। যখন ব্যাকরণ শিথিল ও বন্ধনে অপটু, তখন ভাষাও আলগা অস্থিমজ্জাহীনা, আত্ম-বিস্মৃতা, উত্থান শক্তি রহিতা; কোনও প্রকারে তৃণ-শয্যায় শায়িতা থাকিয়া, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ন্যায় দুই চারিটী অর্দ্ধ সংবদ্ধ বা আদৌ অসংবদ্ধ এবং অসংলগ্ন, অস্ফুট, অবোধ্য ও সদা পরিবর্ত্তনশীল শব্দ উত্থিত করিয়া, কখনও বা রোদন করিয়া, কখনও ইশারা ইঙ্গিত করিয়া,—হাত পা মুখ নাড়িয়া, তখন তিনি স্বকার্য্য সাধন করেন। তখনকার সেই অস্ফুট অসংবদ্ধ আওয়াজ, ক্রন্দন, ও অঙ্গাদির সঞ্চালনের মধ্যে ভাষার, অতএব সেই সেই ভাষার ব্যাকরণের ভ্রূণ বিদ্যমান থাকে। পরন্তু

ভাষা, যখন সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গতা, হাঁমাদিতে বা হাঁটিতে শিখিয়াছেন, তখন ব্যাকরণ ও একটী বর্দ্ধনশীল বালক;—ভাষা-বালিকা দুই হাত ধরিয়া "হাঁটি হাঁটি পায় পায়" করিতেছে; সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে, কখনও আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে; কভু বা ভাষা-বালিকাকে আদরে অগ্রে করিয়া, ব্যাকরণ-বালক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। তখন বালক বালিকায় মেলা মেলি গলাগলি,—দলাদলি ঠেলাঠেলি নহে। বালিকার সহিত বালকের একত্রে অবাধ গতি বিধি; বালক বালিকার গতি বিধি চালায় ও বুঝিয়া চলে; বালিকার অঙ্গ মার্জ্জনা, কেশ-বিন্যাস করিয়া দেয়, খেলা-ঘর সাজাইয়া দেয়। তখন তথাকথিত "ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ" এর ভূত বাহির হয় নাই। তখন স্বভাবজা ভাষার স্বাভাবিক ব্যাকরণ, তাহার সহজ, সরল ও সাদর সাহচর্য্যে সমুত্থায়মান।

ক্রমে যখন ভাষা কৈশোর চাঞ্চল্যে, অতিমাত্র চঞ্চলা বা উন্মেষ যৌবনে উদ্দাম গতিশীলা; উঠিতে ও ফুটিতে, লুটিতে ও ছুটিতে শিখিয়াছে; দিগ্বিদিক হাসিনা দামিনীর মত অতিদ্রুত দৌড়িতে পারে, তরুণ বয়সের বৈদ্যুতিক তেজে "অভাগা" অশ্বিনীর ন্যায় দিগ্বিদিক্ না মানিয়া, উধাও ছুটিতে চায়; শৃঙ্খলা ও সংযম অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় ধাইতে যায়;—ভাষা-ভগিনীর যখন এই ভাব—সদা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও অপাঙ্গ হেলন, বিস্ফারিত বক্ষ, কুঙ্কুম গণ্ড ও চঞ্চল চরণ এবং নিরত নিত্যলীলা মগন; তখন ভ্রাতা ব্যাকরণও বিলক্ষণ একজন বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ভগিনী ভাষা রূপিণী তরুণ অশ্বিনীর অসংযত গতি, উদ্দাম বিকৃত বেগ বারণার্থে, তাহার সুন্দর অধর বিবরে, ভ্রাতা ব্যাকরণ তখন ধীরে ধীরে অপ্রকাশ্যে অদৃশ্যে একটী সুবর্ণময় বল্গা আঁটিয়া, তাহার শ্লথ রজ্জু স্বয়ং ধরিয়া রহিয়াছেন। "পাগলী! কত ছুটবি ছোট্, কত ফুটবি ফোট;-কিন্তু খবরদার, আপথে কুপথে যেতে পারবি না। আমি বাম হস্তে বল্গা ধরে' আছি।"

বিচক্ষণ ভ্রাতা উদ্ভ্রান্তা ভগিনীকে তখন যেন ঐরূপ বলিতেছেন। ভ্রাতা মাত্রেই বলিয়া থাকেন। কথা কটী ও কার্য্যটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপযুক্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই বটে। কিন্তু, অনেক অবস্থায়, কনিষ্ঠেও জ্যেষ্ঠের মত কার্য্য মত কার্য্য করিয়া থাকে। ব্যাকরণ ভাষার জ্যেষ্ঠ না হইলেও কনিষ্ঠ নহে। ভাষা ও ব্যাকরণ যমজ ভগিনী ভ্রাতা; যুগপৎ স্বভাব ও শিল্প হইতে অভিব্যক্ত।

উপরি অঙ্কিত অবস্থায়, বা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন অবস্থাতেই ভ্রাতা ব্যাকরণ ভগিনী ভাষার স্বাধীনতার ও স্বাভাবিক উন্নতির বিরোধী নহে। প্রত্যুত সকল সময়েই ও সর্ব্ববিষয়েই তাহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং পৃষ্ঠপোষক। সদা অঙ্কুশ হননে বা অযথা বল্গা আকর্ষণে ভগিনীর স্বাভাবিক গতি-রোধ করা—শরীর মনের সঙ্কোচতা সাধন করা ভ্রাতার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যকর সম্প্রসারণ করাই তাহার লক্ষ্য। ভাষার বেগ-শীলতার বৃদ্ধি, উচ্ছ্বাসের স্বাভাবিক স্বাধীনতা, নিত্য নূতন পরিচ্ছদ, নূতন ভঙ্গিমা, নূতন লীলারঙ্গ—নিত্য নূতন শক্তি-সম্পদ, সম্ভারের সংগ্রহে ব্যাকরণ উৎকর্ষ লাভ করে—উপকৃত হয়; ব্যথিত হয় না;

বাধাও দেয় না। ব্যথিত হইবার বা বাধা দিবার ত কথাও নয়। তবে, ব্যাকরণ বৃক্ষে, একাল সে কাল, সর্ব্বকালেই বানরে যাইয়া ও বাসা বাঁধিয়া থাকে বটে। সে বাসা তখনও ছিল, এখন হয়ত বেশি হইয়া থাকিবে। ব্যাকরণ-বৃক্ষের সেই বানর গুলাই ব্যাকরণের সংরক্ষক সাজিয়া, ভাষার অভিনব গতি শক্তি দেখিবা মাত্র আঁত্‌কে উঠে, তাহাতে বাধা দিবার জন্য দুপাটি দন্ত বাহির করিয়া ব্যাকরণের বৃথা দোহাই দেয়, লাঙ্গুল আছড়ায়, মুখ ভ্যাঙ্গচায়। যে আঁত্‌কাণি, আছড়ানি, খিচড়ানি ও ভ্যাঙ্গচানি দেখে ব্যাকরণ-ভায়া নিজেই হাঁপিতে হাসিতে ওষ্ঠাগত-শ্বাস;—ভাষাকে বলেন—"ভগিনী, তুমিই এখন আমায় বস্ত্রাঞ্চলের একটু বাতাস দিয়া বাঁচাও। এই বানর গুলা, আমার হইয়া তোমায় বাধা দিতে যাইয়া আমায়ই যে আগে খুন করে বসিল।"

বলা বাহুল্য, বৈয়াকরণ বানরের বাঁদরামির দৌরাত্ম্যে ব্যাকরণের ও ভাষার কিছুই আসিয়া যায় না। জানোয়ারে মনুষ্য জাতির সাহিত্যের অঙ্গে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া, শত সহস্র নখাঘাত ও লাঙ্গুল পাত করিয়াও কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে পারে না।

ফলতঃ ব্যাকরণ, ভাষার সকল স্তরেই, তাহার উন্নতির সাধক;—বাধক কেবল তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার। উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতি নয়। উন্নতি অতীতের সংরক্ষণ সাপেক্ষ। ব্যাকরণ ভাষাকে তাহাই করায়। তজ্জন্য, যে শাসনের প্রয়োজন, আবশ্যক স্থলে, কেবল সেই শাসনই করে। সে শাসনের পরিমাণ প্রসার কি, ব্যাকরণ নিজে তাহা বিলক্ষণই বুঝেন। বৈয়াকরণগণ কোন কোন সময়ে তাহা না বুঝিলেও পারেন। কিন্তু, কেবল ব্যাকরণবাহী বলদদের, কোন কালে, কিছুতেই, তাহা বুঝিবার কথা নয়। ব্যাকরণ নিজে তাহা বুঝিয়া, ভাষার নব নব ভঙ্গিমায়, নিজ ভবনের সংস্কার করেন—সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন করেন।

পক্ষান্তরে, ভাষা যদি কখন উচ্ছৃঙ্খলতায় উদ্ধতা ও আত্ম বিস্মৃতা হইয়া নিজ দেহে ব্যাকরণ নির্ম্মিত অতীতের দৃঢ় দুর্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া নাশের সোপানারোহণে প্রবৃত্তা হন, ব্যাকরণ তখনি স্বহস্তে, ঠাকুরাণীর শশাঙ্ক-বদন-সংলগ্ন সুদীর্ঘ সুবর্ণ "লাগাম" টী সজোরে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ভাষার স্বাস্থ্যকর স্বাধীনতায়, অভিনব শক্তি সঞ্চালনে, বা সাময়িক গতি পরিবর্ত্তনে, ব্যাকরণ, এক বিন্দুও ব্যাঘাত করেন না। ব্যাকরণ প্রতিবাদ করেন, বাধা দেন, প্রতিবন্ধক হন কেবল ভাষার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতায়। কেন না স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক বস্তু নয়; সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। স্বাধীনতায় উন্নতি;—স্বেচ্ছাচারিতায়,—পতন ও ধ্বংস। স্বাধীনতা অতীতের শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব অর্জ্জন বা সৃজন করিতে অগ্রসর হন। আর স্বেচ্ছাচারিতা শৃঙ্খলা-ভ্রষ্ট হইয়া ও স্থায়িত্ব নষ্ট করিয়া, এক পাদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অধঃপাতে যায়। তফাৎ এই।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাকরণ একদিকে ভাষার সেবক ও সংবর্দ্ধক এবং অপর দিকে শাসক ও সমালোচক। একই সঙ্গে ব্যাকরণের এই উভয়বিধ অধিকার;—সেবার অধিকার এবং শাসন ও সমালোচনার অধিকার। এই দুই অধিকারেই

ব্যাকরণের বিধি ও নিষেধ নির্ম্মিত। পুনশ্চ, আমরা আরও দেখিতেছি যে, ভাষা এবং ব্যাকরণ মূলতঃ একটীর পর অপরটীর জন্ম নহে; উহারা উভয়েই একত্র উদ্ভূত; এবং ভাষায় ও ব্যাকরণে নিত্য সম্বন্ধ।

ভাষা ও ব্যাকরণকে পৃথক করিয়া, স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিলেই, ঐ কথা বলিতে হয়। নতুবা আর এক দিক দিয়া দেখিলে ভাষা ও ব্যাকরণ মূলতঃ একই বস্তু; উভয়ের একই দেহ একই প্রাণ; পার্থক্য ও দূরত্ব কিছু মাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থক্য হইতেই পারে না। যেহেতু ব্যাকরণ বিরহিত ভাষা, বিশেষতঃ বোধ্য ও বিশুদ্ধ ভাষা, আদৌ অসম্ভব; আদৌ হইতে পারে না। কেন? একটু বিচার করা যাউক।

ভাষা কাহাকে বলে?

অর্থযুক্ত ও ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ এবং সেই শব্দ পরম্পরার বিন্যাসকেই ভাষা বলি। সংক্ষেপে বলিলে, ভাষা আর কিছুই নয়,—বহু প্রকারে সংযোজিত বহুপ্রকারের শব্দ-সমষ্টি মাত্র। শব্দ সকলের ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টির প্রয়োগ-বিন্যাস বা সংযোজনার তারতম্যানুসারে, বাক্য বা বাক্যাবলী প্রস্তুত হইয়া, মনুষ্য মনের সাধারণ এবং বিশেষ বিশেষ ভাব পরম্পরা প্রকাশিত হয়। যে শব্দের দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করিতে হয়, সেই শব্দ সেই ভাবের স্বরূপ-সমন্বিত বা ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া আবশ্যক এবং উচিত। অন্যথা, শব্দ অর্থশূন্য ও তাহার প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র হয়। প্রথমতঃ শব্দের অর্থোপযোগিতা এবং দ্বিতীয়তঃ শব্দের প্রয়োগ-পন্থার কার্য্যকারিতার উপর বাক্যের সুফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। যে যে স্থলে শব্দ সমূহের অর্থ-বৃত্তি বা অর্থ-বহন-শক্তি উপযুক্ত এবং সেই সেই শব্দের বিন্যাস রীতি সুসমর্থ, সেই সেই স্থলেই বাক্য ভাব প্রকাশক্ষম হইয়া, ভাষা নাম প্রাপ্ত হয়। তদ্বিপরীত স্থলে তাহা হয় না। অন্ততঃ হওয়া উচিত হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শব্দ ও তাহার অর্থ-বৃত্তি এবং দ্বিতীয়, শব্দ-বিন্যাস ও বিন্যাসের বৈচিত্র্য।

এখন দেখা যাউক ব্যাকরণ কি?

শব্দের অর্থ-বৃত্তির নির্দ্ধারণ ও শব্দ-বিন্যাস বিধিই, এক কথায় ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বস্তুটা আর কিছুই নয়। বাঘও নয়, ভালুকও নয়, টিকি বা টোপর মাথে, বেত-হাতে "গুরুমশাইও" নয়; আর তাহা মেছুনী-মুখো ময়লা ভুকো জন্মু হন্যা জানোয়ারও নিশ্চয়ই নয়। ব্যাকরণ—ব্যাকরণই। যদিও ইদানীং বঙ্গদেশে গাছবানরে ও জন্তু-জানোয়ারে ব্যাকরণ টোল খুলিয়া ছোঁছো-ন্দরিক "ষত্ব বিধান" ও 'নৈষ্ঠীবনিক' "ণত্ব বিধান" হুঙ্কার করিয়া রাজপথ নোঙ্গরা করিতেছে।

অর্থবহ শব্দ বিন্যাসই ভাষা। শব্দার্থ সংযোজন ও শব্দ প্রয়োগ নিরাকরণই ব্যাকরণ। অতএব ব্যাকরণ-বিরহিতা শাব্দিক ভাষা সম্ভবে না। ভাষার অভ্যন্তরে ব্যাকরণ স্বতঃ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ভাষার ভাষাত্ব সৃজনই ব্যাকরণ। ভাষার আত্ম-প্রকাশ রীতিই ব্যাকরণ। অতএব এক সময়ে ভাষা ও আর এক সময়ে তাহার আত্ম প্রকাশ রীতি সৃষ্টি হওয়া যেমন সম্ভবে না; তেমনি এক সময়ে ভাষা ও অপর সময়ে বা ভাষা সৃষ্টির পরবর্ত্তী সময়ে, ব্যাকরণের আবির্ভাব কল্পনা করা সম্পূ

হইতে পারে না। যে হেতু ভাষার আত্ম-প্রকাশ-রীতি বা প্রয়োগ-বিধিই মূলতঃ ব্যাকরণ।

ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহাকে ভাষা বলা যায়, তাহা ব্যাকরণের সাহচর্য্য ও সহায়তা ভিন্ন কথনই সংগঠিত ও সৌষ্ঠবান্বিত হইতে পারে না। প্রয়োগ-বিধি-বিবর্জ্জিত ও অসংলগ্ন কতকগুলি শব্দকে ভাষা বলা যায় না। যেহেতু তদ্দ্বারা মনোভাব পরিব্যক্ত হয় না। ভাষার উদ্দেশ্য মনোভাব ব্যক্ত করা এবং তাহা করে বলিয়াই, সেই করাকে ভাষা বলে। ভাষার যে স্বরূপ ও স্বভাব থাকিলে মনোভাব ব্যক্ত হয়, সেই স্বরূপ ও স্বভাব ব্যাকরণ কর্তৃক গঠিত, নিয়মিত ও বর্দ্ধিত হয়।

ব্যাকরণ, এক দিকে, যেমন ভাষার ছেদন, বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রণালী নির্দ্দেশ করেন, অপর দিকে তেমনি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া ভাষার সম্যক্ সংগঠনও করেন। ব্যাকরণ, যে পরিমাণে, ভাষার সমালোচক, ঠিক সেই পরিমাণে তাঁহার সংগঠন কার্য্যেরও অবিভাবক, নিয়ামক।

ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ এই। ইহার অধিকও নয়, অল্পও নয়।

ব্যাকরণের বিধি-ব্যবস্থা রূপ রাজকীয় মুকুট মস্তকে পরিয়া, তাহার অনুশাসন সংহিতা কক্ষে ধরিয়া এবং তাহার সাহচর্য্যের এবং সেবার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি এবং স্মৃতির শত শত অখণ্ড ও খণ্ড চিহ্ন বক্ষে করিয়া, ভাষা যখন পরিপূর্ণ-শরীরা, অতুল শক্তিশালিনী; অপরিমেয় ধন রত্নের অধিকারিণী, নানা দিক্‌দেশের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভাগিনী, সর্ব্বলোক সংপূজ্যা, সুসংযতচিত্তা, ধীর গম্ভীর সমুন্নত সৌন্দর্য্য-বিকাসিনী এবং সাহিত্য-রাজ্যের সিংহাসনারূঢ়া জননী পাটরাণী, তখন ব্যাকরণ কোথায়? তখন ব্যাকরণ কি? তখন ভাষা-পাটরাণীর "প্রাইম মিনিষ্টার"—প্রধানতম মন্ত্রী, তখন ব্যাকরণ সেই সাহিত্য সাম্রাজ্যের মহা পার্লামেণ্টের "লর্ড কমন্স" উভয় গৃহেরই "প্রেসিডেণ্ট" "স্পিকার" পরিচালক। মহামন্ত্রীর মন্ত্রণা ও "মিনিট" "মেনিফেষ্টো" এবং "ম্যানডেট" মতেই মহারাণীর রাজকার্য্য পরিচালিত ও রাজশক্তি সমর্থিত হয়। সাহিত্যের সাধারণ-তান্ত্রিক সভায় শত শত সদস্য। ব্যাকরণ-রূপী সভাপতির শত শত সহযোগী এবং প্রতিযোগী। শত শত শিল্পী, শত শত সমালোচক দ্বারা সে মহা পার্লামেণ্টের আবার "অপোজিসন বেঞ্চ" গঠিত। 'অপোজিসন বেঞ্চ' 'মিনিষ্টিরিয়াল বেঞ্চের' প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদকারী। 'মিনিষ্টিরিয়াল বেঞ্চ' প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার 'ক্যাবিনেট মিনিষ্টার' অর্থাৎ সহকারী মন্ত্রী-সম্প্রদায়ের আসন। পরন্তু 'অপোজিসন বেঞ্চ' প্রেসিডেণ্ট ও প্রেসিডেণ্ট প্রমুখ মন্ত্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত নীতি ও বিধি ব্যবস্থায় আপত্তিকারী সম্প্রদায়ের আসন। উভয় আসন বা বেঞ্চ বেড়িয়া সহস্র সহস্র সদস্য বা "এম-পি;—(মেম্বর সাহিত্য-পার্লামেণ্ট) অবস্থিত। মেম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ, মন্ত্রী সম্প্রদায়ের সমর্থক, এবং কিয়দংশ আপত্তিকারী-সম্প্রদায়ের বা 'অপোজিসন বেঞ্চের' অনুগত ও দলভুক্ত। উভয় আসনেই মহা মস্তিষ্কবিশিষ্ট মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও প্রবল প্রতিভাশালী প্রতাপান্বিত সাহিত্যাচার্য্যগণ উপবিষ্ট। —ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ মহর্ষি, "মনস্তত্ত্ববিদ্ মনীষী

দার্শনিক, কলা-বিদ্যাবিদ্ কবি, আলঙ্কারিক, শিল্পী ও সমালোচক, বিপুল জড় বিজ্ঞানের বহু ভাগ ও বিভাগীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, তথা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৈয়ায়িক, তার্কিকগণ, বিভিন্ন শ্রেণীর বৈয়াকরণ, ও মহাবাগ্মী বাচস্পতিগণ তথায় স্থির নেত্রে, গম্ভীর বদনে, প্রগাঢ় চিন্তায়, গভীর ধ্যানে, যেন সমাধি নিমগ্ন সমাসীন।

ভাষা মহারাণীই সাহিত্য-রাজ্যের চির অধিশ্বরী। কিন্তু, সাধারণ তান্ত্রিক নীতি ও নিয়মে সে রাজ্যের সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত ও চালিত হয়।

ভাষা মহারাণীর সাহিত্য সাম্রাজ্য রক্ষার্থে, এবং সে রাজ্য নিত্য নবার্জ্জিত রাজৈশ্বর্য্যে বিপুল বর্দ্ধিত ও বিভূষিত করণার্থে,—মহারথী, রথী, সেনাপতি, সেনা-নায়ক অসংখ্য অসংখ্য, স্বতঃনিযুক্ত। সাহিত্য-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং কেন্দ্রে, দেশে এবং প্রদেশে, ইহঁাদের অধীনে এক একটী অতি বৃহৎ বাহিনী বা সৈনিক-রেজিমেণ্ট। ইহঁারা,—গ্রন্থকার, লেখক, চিন্তক, চালক, শিক্ষক, পরীক্ষক, সমালোচক, পর্য্যটক, আবিষ্কারক এবং ভাবুক;—সাহিত্য রাজ্যের শস্ত্রধারী সেনা, সংগ্রামকারী "ষ্ট্যানডিং ফিল্ড ফোরস্"—যুদ্ধক্ষেত্রে, নিয়ত দণ্ডায়মান সৈনিক বল। ইহঁারা জয়াশায় দিবা নিশি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সাহিত্যরাজ্যে, নিত্য নূতন ভূমি, নবীন সম্পদ সম্পত্তি জিত ও সংযোজিত হইতেছে। জ্ঞান-রাজ্য, বিজ্ঞান-রাজ্য, তত্ত্ব-রাজ্য, ভাবরাজ্য, বহু রাজ্যই সাহিত্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সকল রাজ্যেই সৈন্যবাহিনী ও কৃষিবল আছে। সকল রাজ্যেরই ভূমি সৈনিক বলে বর্দ্ধিত হয় ও কৃষি-বল দ্বারা কর্ষিত হয়।

এই সকল সৈনিক বাহিনীর "ফিল্ড মার্শাল, জেনেরল, ও মহারথী অতিরথী হইতে "কমন সোলজার"—সামান্য সিপাহী পর্য্যন্ত এবং কৃষি-বলের জমিদার তালুকদার হইতে কৃষক "কালটিভেটর" পর্য্যন্ত সকলেই সাহিত্য-পার্লামেণ্টের স্বাধীন সদস্য। কেহ মন্ত্রী সম্প্রদায়ের অনুগত, আশ্রিত, কেহ বা উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দীদিগের দলভুক্ত।

প্রাইম মিনিষ্টার ও তৎপ্রমুখ মন্ত্রী ও লিডিং মেম্বর সম্প্রদায়েরই সমর্থক বেশী, লোক বল ও ভোট-বল বেশী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দী দলের অপোজিসন বেঞ্চেরও শক্তি নিতান্ত অল্প নহে। মিনিষ্টিরিয়াল বেঞ্চের মেম্বরগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সদস্যগণ সকলেই "ইম্পিরিয়ালিষ্ট" অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক এবং সংরক্ষণশীল, কি-না—কনজারভেটীব। পক্ষান্তরে "অপোজিসন বেঞ্চ" উদার নৈতিক সাধারণ তান্ত্রিক লইয়া গঠিত। ইহঁারা অত্যুন্নতিশীল "লিবারাল"—ইহঁাদের মধ্যে "আলট্রা-লিবারাল," "র‍্যাডিকাল" এবং অতিরিক্তর‍্যাডিকাল পর্য্যন্ত আছেন। এমন কি, সংরক্ষণ সংহারবাদী "সোসিয়ালিষ্ট" ও নিহিলিষ্টও ইহঁাদের দলে আছেন। সংরক্ষণশীল মন্ত্রী সম্প্রদায় ও মেম্বরগণ ভাষা মহারাণীর রাজশক্তি সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষণ করিতে ও রাজকীয় প্রথা সকল ষোল আনা অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিয়ত সচেষ্টিত। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় উন্নতিশীল আপত্তিকারীগণও যে ভাষা রাণীকে রাজ্যচ্যুতা করিতে অভিলাষী, তাহা নহে। তাঁহারাও রাণীর রাজভক্ত ও রাজ্য-ভুক্ত প্রজা, 'সেবাইত,' সৈনিক এবং কৃষি-বল। তাঁহারা রাণীর রাজ-সিংহাসনের অনুরক্ত বটে। তবে-কিনা তাঁহারা রাণীর রাজক্ষীয় সাবেক

রীতি নীতি প্রথা এবং কায়দা কানুন অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবর্ত্তন করিতে এবং কোন কোনও স্থলে একেবারে উঠাইয়া দিতে উৎসুক।

এক দিকে, উদার নৈতিকদিগের নব্য উন্নতিশীলতার এই সম্প্রসারণ-প্রিয়তা, অপর দিকে, বৃদ্ধ ব্যাকরণাবর্ত্তী বিরাট বল-শালী-সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংর-ক্ষণশীলতার আকুঞ্চন-প্রবণতা,—এই দুই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সামঞ্জস্যে ও সমা-চারে সমাগত, এবং ভাষা রাণীর অভিনব উন্নতি ঐশ্বর্য্যের সমাগম হয়, সুদৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী শ্রী ও সম্পদ এবং পুরানতায় পবিত্র ও চিরপ্রচলিত রাজকীয় রীতি-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অসংযম ও উচ্ছৃ-ঙ্খলতার পথে পরিবর্ত্তিত হইতে পায় না। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের ঘাত প্রতি-ঘাতে, ক্রিয়ায় ও প্রতিক্রিয়ায়, প্রজা তান্ত্রিক রাজনীতিক ক্ষেত্রের ন্যায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও ভাষার রাজ্যে অতি স্বাস্থ্যকর সুফল উৎপন্ন করে।

ভাষার চির অপরিবর্ত্তিত, প্রাইমমিনিষ্টার' ও ভাষা-পার্লামেণ্টের চিরস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট অতি বৃদ্ধ ব্যাকরণ মহাশয় নিয়ত নবীন যুবার জ্বলন্ত তেজে "অপোজিসন বেঞ্চের" বড় বড় বাগ্মী ও দুরন্ত দুরন্ত "ডিবেটিয়া"-রদের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং সময় বিশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া, ভাষা রাজ্যে চিরকাল আত্ম প্রভুত্ব ও ভাষার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সমুন্নত করিয়া আসিতে-ছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে "মিনিষ্ট্রির" বদল হয়। কিন্তু, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাকরণ-মহাত্মার প্রধান মন্ত্রিত্ব ও সভাপতিত্ব কোনও কালে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; হইবার সম্ভা-বনাও কোনও কালে নাই।

ভাষা রাণীর মন্ত্র-ভবনে, প্রধান মন্ত্রী-ব্যাকরণ মহাশয়ের দুই জন সর্ব্বপ্রধান সহ-যোগী আছেন। তাঁহাদের পদ গৌরব ও কার্য্য-মাহাত্ম্য ব্যাকরণের অব্যবহিত নিম্নেই, তাঁহারাও ক্যাবিনেট মিনিষ্টার। মন্ত্র-গৃহের গঠন এই রকম;—

নাম	পদ
ব্যাকরণ	...প্রধান মন্ত্রী—প্রাইম মিনিষ্টার।
ন্যায় বা লজিক	. দ্বিতীয় মন্ত্রী লর্ড চান্সালার বা বাক্-বিচার ব্যবস্থাপক।
অলঙ্কার বা রেহ্‌টরিক	...তৃতীয় মন্ত্রী দেওয়ান তোসা-খানা বা লর্ড চাম্বারলান।

এই মন্ত্রীত্রয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, ভাষা মহা-রাণীর সাম্রাজ্যের ও শরীরের সংরক্ষক এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য-শুদ্ধি-সৌন্দ-র্য্যের এবং কুশল মঙ্গলের মন্ত্রণাদাতা। ভাষার বিশুদ্ধি, সুসঙ্গতি এবং লাবণ্য-প্রসা-ধন-কলা, যথা ক্রমে তিন মন্ত্রীর একাধীন। মন্ত্রীত্রয়, এক যোগে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে, কার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ।—শব্দের বিভক্তি ও বিমিশ্রণ, ঐক্য এবং অনুশাসন, সংযোজন ও অর্থ সামর্থ্যের সঙ্গতি নিয়মিত করিয়া, ব্যাক-রণ, ভাষার সংসারে সুস্পষ্ট, সুবোধ্য ও বিশুদ্ধ বাক্য গঠন করিয়া দেন। বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব, যৌক্তিকতা বা অযৌ-ক্তিকতা ব্যাকরণের বিবেচ্য নহে। ব্যাক-রণ বিশুদ্ধ ও বোধগম্য বাক্য গঠন করিয়া দিয়াই খালাস। ব্যাকরণের গঠন করিয়া দেওয়া বিশুদ্ধ ও বোধ্য বাক্য সত্য হইলেও হইলেও পারে, মিথ্যা হইলেও পারে। সঙ্গত হইলেও পারে, অসঙ্গত হইলেও পারে। সম্যক বা অসম্যক হইলেও হইতে পারে। সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তোপযোগী হইলেও পারে।

না হইলেও পারে। এ সকল হইল বা না হইল, ব্যাকরণ ও তাহার আইন কানুন তাহা দেখেন না। তাহা দেখেন, যুক্তি বা ন্যায় দর্শন। ব্যাকরণ দেখেন কেবল ভাষার বিশুদ্ধতা ও বোধযোগ্যতা এবং শব্দের শক্যার্থ ও সার্থকতা।

ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র।—বিষয়ের বা বাক্যের প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, পরীক্ষা, সংশয়, সিদ্ধান্ত, নির্ণয় ও নিরূপণাদি নিয়মিত করিয়া ভাষার যৌক্তিকতা, সঙ্গতি ও সংস্থান সম্যক্‌তা-প্রতিপন্ন করেন ন্যায় শাস্ত্র বা তর্ক বিদ্যা। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের ও তাহাদের সম্বন্ধ পরম্পরার বিচার, বিবেচনা ও সমালোচনা করিয়া প্রমাদ শূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দেন। ন্যায়ের নিয়ন্ত্রিত্বে ভাষা-প্রকাশিত এবং সাহিত্যগত সিদ্ধান্ত সকল ভ্রম প্রমাদ শূন্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সিদ্ধান্তের যথার্থতা বা সত্যতা ন্যায় শাস্ত্র অঙ্গীকার করেন না। প্রতিজ্ঞা ও প্রমাণাদির যথার্থতার উপরেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে। ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা ও মিথ্যা প্রমাণ হইতে ভ্রান্ত ও অসত্য সিদ্ধান্তই উৎপন্ন হয়। ন্যায় শাস্ত্র কেবল সাধনা ও সমালোচনা প্রণালীর পথেই অভ্রান্ত ভাবে কার্য্য করেন। প্রমাণাদির পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। কিন্তু, কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য কি পরিমাণ ও কি প্রকার প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা দেন না; সেই সেই বিষয়ক শাস্ত্রই তাহা শিক্ষা দেন। ন্যায় শাস্ত্র অভ্রান্ত বিচার প্রণালীই প্রদর্শন করেন।

অলঙ্কার।—শব্দের শক্যার্থ বা অভিধাবৃত্তি লইয়া ব্যাকরণ। শব্দের লক্ষণ ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি বা লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ লইয়া অলঙ্কার। শব্দের ঐ সকল অর্থ বৃত্তি কিরূপ, তাহা বিদ্যালয়ের বালকেও জানে। অতএব তাহার আলোচনা আর এখানে করিব না। ভাষার সম্প্রসারণে ব্যাকরণের অতি নিষ্ঠ নিয়ম যে স্থলে নিরস্ত হন, অলঙ্কার শাস্ত্র সেই স্থলে কার্য্য আরম্ভ করেন। অবিমিশ্র ব্যাকরণ সঞ্জাত ভাষা সম্বোধন করেন মনকে ও জ্ঞানকে। অলঙ্কার বিভূষিতা ভাষা উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত ও বিমোহিত করেন হৃদ্‌বৃত্তি নিচয়কে। ভাষার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য ও রসময়তা অলঙ্কার সঞ্জাত। অলঙ্কার বহুবিধ।

ভাষার সহিত ব্যাকরণের সঙ্গ সূতিকাগার হইতে শ্বাস-নিবৃত্তির শেষ-শয্যা-পর্য্যন্ত। অপর মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গ ব্যাকরণের পরবর্ত্তী। কাজেই ব্যাকরণের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অধিক। তর্কশাস্ত্র আসিয়া যখন ভাষার সহিত মিলিত হন, তখন ব্যাকরণ ভাষাকে অনেকটা গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে। অলঙ্কার-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী—; কিন্তু বিজ্ঞান রূপে নহে;—মনুষ্য প্রকৃতির মৌলিক প্রবণতা রূপে। অলঙ্কারে আত্ম-শোভার বর্দ্ধন ও বিকাশ ও অলঙ্কারে আত্ম-ভাব প্রকাশ, মনুষ্য-প্রকৃতির প্রবল প্রবণতা এবং মনুষ্য-সমাজের ও মনুষ্যের অতি আদিম অবস্থা ও সময় হইতে কোনও না কোনও আকারে অলঙ্কারের আবির্ভাব। এমন কি, শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক ভাষা-জন্মিবার বহুপূর্ব্বে, মনুষ্যের মনোভাব প্রকাশার্থে, অলঙ্কার—একই মাত্র অবিমিশ্র অলঙ্কার কার্য্য করিত ও ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, সে অলঙ্কার শব্দালঙ্কার, বাক্যালঙ্কার, ভাবালঙ্কার বা বাক্যালঙ্কার নহে।

শব্দগত ভাষার সহিত তাহার অতি কমই সংস্রব ছিল বা এক সময়ে কোন সংস্রবই ছিল না। সভ্যতার চক্ষে, তখনকার সেই আদিম অলঙ্কারে, শিল্প শোভা নৈপুণ্যও কিছুমাত্র ছিল না। অথচ তাহা অলঙ্কারই বটে। তাহা অলঙ্কারের অঙ্কুর ;—বর্ণমালার বীজ ;—চিত্রবিদ্যার সর্ব্ব প্রাথমিক আভাস, —শিল্প-শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাহা ভাষার অলঙ্কার বা সাহিত্যালঙ্কারের এবং বহু পরবর্ত্তী অলঙ্কার বিস্তার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ আদি পুরুষ। কিন্তু সে অলঙ্কার কিরূপ ছিল ও অদ্যাবধি অরণ্যবাসী অসভ্য ও আদিম জাতি নিচয়ের মধ্যে কি আকারে আছে? তাহা, সেই আদিম অলঙ্কার, মনুষ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশিত বা বাহ্যাবয়বে অঙ্কিত জড় ও জীব প্রকৃতির অনুকৃতির অনুলিপি দ্বারা মনোভাব অভিব্যক্তির আলেখ্য —পরিচিহ্ন, চিত্রপট, বা প্রতিনিধি। শব্দ, অর্থ, ভাষা, শিল্প ও শিল্প কৌশল এবং অলঙ্কার ইত্যাদি বাহ্য-ব্যক্ত যাহা কিছু ও যত কিছু বিদ্যা, তাহাদের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ও পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যের মনোভাব ও মনোবৃত্তি। ভাব না থাকিলে ভাষা জন্মিত না, ভাষার প্রয়োজনই হইত না। মনুষ্যের মনোবৃত্তির অস্তিত্ব হেতুই যাবতীয় বিদ্যার—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পাদির আবির্ভাব।

যতই শৈশব অবস্থায় থাকুক, মনুষ্যের শাব্দিক ভাষা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও, মনুষ্যের মনোভাব ও মনোবৃত্তি ছিল। এবং তাহা ব্যক্ত করিবারও আবশ্যক হইত। কিরূপে তাহা ব্যক্ত হইত? হর্ষ, বিষাদ, ভীতি, প্রীতি, করুণা, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবৃত্তিব্যঞ্জক, স্বভাবের আবেগ হইতে স্বতঃ-উত্থিত স্বর বা ধ্বনি দ্বারা হইত। পরন্তু, ইশারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইত। তখনকার বৈয়াকরণিক ভাষা ঐ স্বর ও ধ্বনি এবং আলঙ্কারিক ভাষা ঐ ইসারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গ-ভঙ্গি আদি। এ উভয়েরই আবির্ভাব একত্রে বলা যাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উপরি উক্ত সুখ শোকাদি বৃত্তি-ব্যঞ্জক স্বতঃ-উত্থিত ধ্বনি হইতে,—ধ্বনির বহু বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন হইতে, সুনির্দ্দিষ্ট,অর্থযুক্ত, শব্দগত ভাষার সৃষ্টি এবং মনোভাবের পরিচায়ক ও প্রকাশক শব্দ-বিহীন বহিঃ চিহ্ন ইসারা, ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি এবং তদনুরূপ বহুবিধ সঙ্কেত হইতে ও সঙ্কেতের সম্প্রসারণ ও ক্রমবিকাশ হইতে অলঙ্কার-শিল্পের, এবং চিত্রের, শব্দের স্মারক সঙ্কেতের এবং বর্ণমালার সৃষ্টি। ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি আদি দ্বারা প্রকৃতির অনুকরণ বা অনুবর্ত্তন করিয়া, প্রকৃতিগত ভাব প্রবৃত্তি ও ঘটনাদি প্রকাশের প্রয়াস। চিত্রাদি অঙ্কিত পদার্থ প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির আলেখ্য—অনুলিপি ; তাহাতেও সেই প্রয়াস। এ উভয়েই অলঙ্কার এবং ভাষালঙ্কারের অঙ্কুর ;—মনুষ্যপ্রকৃতির অলঙ্কার-প্রবণতা হইতে উদ্ভূত। অলঙ্কার শিল্পজ হইলেও মনুষ্য স্বভাবের সহজাত। স্বভাব উহার মূলে সজীব ভাবে বিদ্যমান। সাহিত্যালঙ্কার শব্দের বা শব্দশক্তির স্বাভাবিক সম্প্রসারণ মাত্র।

এখন বিবেচ্য হইতেছে, কখন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। আমরা বলিয়াছি, ভাষার অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্টি ও আপেক্ষিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, প্রকৃত প্রস্তাবে, সাহিত্যের সংগঠনারম্ভ সম্ভবে না।

পুনঃ বিবেচনা কর, সাহিত্য কাহাকে

বলে ? সাহিত্যের শরীরের গঠন কিরূপ, গঠনের উপাদান কি কি ?

সুস্পষ্ট, সঙ্গত, সুশৃঙ্খলা-সমন্বিত, বোধ্য ও বিশুদ্ধ ভাষায়, সারবান সদ্ভাব নিচয় সুন্দররূপে, পরিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করাকে যদি সাহিত্য বল,—কেননা তাহাকেই সচারাচর সাহিত্য বলে,—তাহা হইলে, সাহিত্যের জন্য, ভাবপরিব্যঞ্জক, পরিপুষ্ট ও ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদির বিধি বিধান নিয়ন্ত্রিত, বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ এবং বাক্য-বৈচিত্র্যোৎপাদন-সমর্থ, ভাষার অবশ্যই আবশ্যক হয়। কাযেই, ভাষা জন্মিতে, জন্মিতেই ব্যাকরণ যেমন জন্মে, সাহিত্য সে রূপ জন্মে না। আত্ম-প্রকাশোপযোগী ভাষা প্রাপ্তির অপেক্ষায়, সাহিত্যকে কিছু কাল বিলম্ব করিতে হয়। বর্ণমালার আবির্ভাবের জন্যেও অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া, ভাষার পূর্ব্বোক্ত রাণীত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্তও, অব্যক্ত ও অব্যয় অবস্থায় সাহিত্যকে শুইয়া থাকিতে হয় না। ভাষার ভ্রূণাবস্থায়, সাহিত্য অবশ্য অসম্ভব। কিন্তু, ভাষার বালিকা কাল হইতেই, সাহিত্য কিছু কিছু জন্মিতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায়। তাহার পর, ভাষা ঠাকুরাণীর যখন যেমন গতি, সাহিত্য ঠাকুরের তখন তেমনি প্রকৃতি। সাহিত্য ভাষাকে ভর করিয়া যেমন উঠে, ভাষাও আবার তেমনি সাহিত্যের সহায়তায় ও সাহচর্য্যে, পরিপুষ্ট হয় ও পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। ভাষার উন্নতি সাধনও সাহিত্যের অনেকানেক উদ্দেশ্যের মধ্যে এক প্রধান উদ্দেশ্য।

মনুষ্য, মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে, সদাই ব্যস্ত। মনুষ্য, মনোবৃত্তির সঞ্চালন ও দৃষ্ট বস্তুর বিবৃতি করিবার উদ্দেশে, অহর্নিশি অস্থির। এই অস্থিরতা, ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা কতক মানুষের স্বভাবে এবং কতক অনিবার্য্য প্রয়োজনে। জীবন ধারণের প্রয়োজন প্রবল এবং গুরুতর। সেই একই প্রয়োজনে শত শত প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আরও কত শত অষ্ট দিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারে। মনোভাব প্রকাশ,—মনোবৃত্তি ব্যক্ত না করিলেই চলে না। জীবন ধারণ, কঠিন জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। একের সহিত অপরের, পরিবারের সহিত পরিবারের, সমাজের সহিত সম্প্রদায়ের,—সমষ্টির সহিত সমষ্টির ও সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির, মনোভাবের আদান প্রদানের ও চিন্তার সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এবং অনেক সময়ে সেই সকল মনোভাব ও চিন্তাদির কোনও না কোন প্রকার স্থায়ী আকার দিয়া, স্মৃতির অর্গলে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরকার করে। নহিলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করা চলেই না। তাহার প্রায় সকল কার্য্যই অচল হইয়া পড়ে।

মনোভাব ব্যক্ত করার এবং তাহা যেরূপে হউক বাঁধিয়া, ধরিয়া, আঁকিয়া রাখার এই ঘোরতর প্রয়োজন এক দিকে; অপর দিকে উহা ব্যক্ত করা ও বন্ধন, অঙ্কন করার প্রয়াস পাওয়া মনুষ্য স্বভাবের এক অনিবৃত্ত বৃত্তি বা বাতিক। মানুষ, যাহা দেখে, ভাবে, অনুভব করে, তাহা প্রকাশ করিতে এবং সময়ে সময়ে তাহার কতকাংশ প্রকটিত করিয়া রাখিতে তাহার এক অসংযমনীয় ও দুর্দ্দমনীয় ঝোঁক। সে ঝোঁক তৃপ্তি করার জন্য মানুষের নিয়তই নানারূপ চেষ্টা।

একদিকে, অভাবগত অত্যন্ত প্রয়োজন, অপরদিকে স্বভাবগত অত্যন্ত আকিঞ্চন; অতএব আর অধিক বলা বাহুল্য যে, মনুষ্য জাতি তাহার সকল অবস্থাতেই, মনোভাব ব্যক্ত ও বন্ধন করিবার উপায় অনুসন্ধানে, অনুধ্যানে, অনুধাবনে নিয়তই নিরত।

এস্থলে একটা বন্ধনীর অভ্যন্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে—উল্লেখ করা কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অনিষ্টকর হইবে না যে, মানুষের ঐ "অভাবগত প্রয়োজন" ও "স্বভাবগত আকিঞ্চন" হইতেই ভাষার, সাহিত্যের, সর্ব্ব শিল্পের ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও আরম্ভ।

"অভাবগত প্রয়োজন" হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পের (useful arts) বিজ্ঞানের (material science) এবং বৈষয়িক বা সাংসারিক সাহিত্যের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে "স্বভাবগত আকিঞ্চন" হইতে, শরীর ধারণের ও ঘরকন্নার অপ্রয়োজনীয় অথচ অন্য দিকে অত্যুচ্চ, সুকুমার সাহিত্যের, সূক্ষ্ম শিল্পের (Fine arts) এবং অধ্যাত্ম তত্ত্ব মূলক দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু এসব কথার অধিক আলোচনার স্থান এটা নয়!

আমরা বলিতেছিলাম, মনুষ্য, মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য, এবং তাহা আবদ্ধ ও অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য, দিবা নিশি পাগল। তাহা করিবার একটা কিছু উপায়ে উপলক্ষ পাইলেই হয়। উপায়, অনুপযুক্ত হউক, অপ্রচুর হউক, মনোভাব ব্যক্ত করার কোন একটা উপায় পাইবা মাত্র মানুষে তাহা মহা আগ্রহে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। উপায় পাইলেত কথাই নাই। তাহা না পাইলেও নিবৃত্তি নাই। ভাষার অভাব বা অনভিজ্ঞতা ঘটিলে এবং ভাষায় কুলাইয়া না উঠিলেও, মানুষে ছাড়ে না। নানা কলে কৌশলে, ইসারা ইঙ্গিত ও অঙ্গ ভঙ্গিতে, অনুকরণ ও অভিনয়াদি দ্বারা "যেন তেন প্রকারেণ" যতটা হউক আর যতটা পারুক, মানুষে, মনোভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়া, অভাব-ঘটিত প্রয়োজন পূরণ ও স্বভাবগত উদ্বেগ ও আকিঞ্চন প্রসমন করিবার প্রয়াস পায়। ইহা যে কেবল অতি আদিম কালের কথা, তাহাও নয়;—ইহা এখনও আমরা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এবং আবশ্যকে পড়িলে আমরা নিজে নিজেও ইহার আশ্রয় লইতে বাধ্য হই।

অতএব, দেখা যাইতেছে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভাষার অঙ্কুর উদ্ভব হইতে হইতেই, মানুষে তাহার পূরা ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। সে অবস্থায়, যদি সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইত, তাহা নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় সাহিত্য সম্ভব হইতে পারে না। সাহিত্য সূতিকা গৃহেও তখন শায়িত নন; ভূমিষ্ঠই হন নাই। সাহিত্যের শৈশবোপযোগী, সূতিকা গৃহোপযোগী ভাষারই যে কেবল তখন অভাব, তাহা নয়; প্রত্যুত সাহিত্যের শৈশবোপযোগী সম্ভাব বা ভাব নিচয়ও মানুষের তাদৃশ আদিম ও বন্য অবস্থায়, বুদ্ধির ও হৃদ্বৃত্তির বীজ হইতে অঙ্কুরিত, উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। ভাষার ন্যায় ভাবের বিকাশ প্রাপ্তিও সময় ও আপেক্ষিক সভ্যতা সাপেক্ষ।

ফলতঃ সাহিত্য ভূমিষ্ট হয়, সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়—হওয়া সম্ভাবিত হয় তৎকাল হইতে, যৎকালে, মনুষ্যের মনোভাব, হৃদ্বৃত্তি নিচয়, কথঞ্চিৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অন্ততঃ

তৎকালোচিত গীতি ও গাথাদি সাহিত্যে, (কেননা মনুষ্য জাতির সাহিত্যের ইতিহাস যেরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে গীতি গাথাদির অল্লাধিক অনুরূপ বাক্যাবলী বা পদ নিচয়কে সাহিত্যের শৈশবাস্থার সর্ব্ব প্রথম ফল বলিয়া অনুমান করিতে বা ধরিয়া লইতে হয়) প্রকাশোপযোগী অবস্থা সম্পন্ন হয়। এবং তাদৃশ হৃদ্বৃত্তি সকলকে, বুদ্ধি-শক্তি, যথোপযুক্ত প্রসারিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির উপাদান ও উপলক্ষ্যাদি সহযোগে, বিন্যস্ত ও বিকৃত করিতে সক্ষম হয়। অপিচ সেই বিবৃতির বা বর্ণনার অল্লাধিক উপযোগী, ও শব্দ সংযোজন প্রণালী ভাষায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু, ভাষার এবম্বিধ অবস্থা ও ভাবের সংঘর্ষেই প্রস্তুত হয় ; আপনা হইতে হয় না। অন্য কেহও ইহা করিয়া দেয় না।

মনুষ্যের মনোভাব আপেক্ষিক বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ভাষার আপেক্ষিক বিকাশ হয়। * ভাব আবেগ-যুক্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া অভিব্যক্তির পন্থা অনুসন্ধান করে ;—প্রয়াসের পর প্রয়াসে, যে আকারে বা যে অধিকারেই হউক, সে পন্থা প্রস্তুতও করে। ভাবের আবেগে ভাষা উৎপন্ন ও উন্নত হইয়া চলিতে থাকে। এবং তাহার দ্বারা ধীরে ধীরে সাহিত্যের শৈশব কাকলী ধ্বনিত হয়। তাহা সর্ব্ব প্রথম হয় সম্ভবতঃ স্বর-সঙ্গীতে। স্বর-সঙ্গীতের বাক্যাংশ সাহিত্যাধিকারে অবস্থিত বটে।

স্বর সঙ্গীতের স্বরাংশ, অন্যতম এবং অত্যুচ্চ সূক্ষ্ম শিল্প (Fine art) বলিয়া, পরিগণিত। অথচ তাহাই শৈশব সাহিত্যের ও শিশু সূক্ষ্ম শিল্পের সর্ব্ব প্রথম সরল কোমল কাকলী। সর্ব্ব প্রথমেই সর্ব্বোচ্চের সংস্পর্শ—অত্যুচ্চের আভাস! কিছুই অস্বাভাবিক নয়! ভাবের উদ্বেলিত অবস্থা স্বভাবতই উচ্চারিত হয় স্বর-সঙ্গীতে বা সঙ্গীত সূচক স্বরে। আদিম মনুষ্যের উচ্চতর হৃদ্বৃত্তি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত অবস্থাতেই অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। অতএব তাহার অভিব্যক্তি স্বর সংগীতে। সুতরাং, সর্ব্ব প্রথমেই, অত্যুচ্চের আভাস। আত্মার ক্রম বিকাশ, যত স্তরে, যেরূপেই হউক, আত্মা, তাহার আত্ম শক্তি বলে, সর্ব্ব প্রথম বিকাশেই সর্ব্বোচ্চে সংস্পৃষ্ট হয়। যতই উচ্চ হউক, সূক্ষ্ম শিল্প, শাব্দিক সাহিত্য ত তুচ্ছ কথা। যিনি সর্ব্বোচ্চতম—সর্ব্ব-শক্তিমান স্রষ্টা, পাতা পরমেশ্বর, স্বভাবের শিশু তাঁহারই সত্বা অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

ভয়, বিস্ময়, প্রণয় স্বভাবতই মানুষের মানস-উদ্যানে ফুটে। ভাষা যাইয়া তাহা ব্যক্ত করে ও বাহিরে বহন করিয়া আনে। অথবা ভাব তাহার ভাষা গঠন বা নির্ব্বাচন করিয়া বাহিরে ব্যক্ত হয়।

ভাষার যখন যেরূপ অবস্থা, ভাবও ভাবাবেগ তখনি তাহার উপর ভর করিয়া আত্ম প্রকাশের "আতি-বিথি" করে। সেই "আতি-বিথি"র ফলেই, ভাষার প্রসার ও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। সেই ক্রমোন্নতির কোনও এক প্রাথমিক স্তরে, প্রতিভা কর্ত্তৃক, ভাবে ভাষায় অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত রূপ সংমিশ্রণ,—ফল সাহিত্যাঙ্কুরের উদ্ভব। তাহার পূর্ব্বেও অবশ্য ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার বহু চেষ্টা, বিস্তর প্রয়াস পুনঃপুনঃই হয়। সে পৌনপুনিক প্রয়াস,চেষ্টা ও যত্ন ভাব

* ভাষা ও ভাবের পরবর্ত্তিতা লইয়া মতভেদ বিস্তর আছে।

ও ভাষাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যে পরিণত করিতে না পারিলেও, গৌণ ভাবে তাহারই পথ প্রসারিত, পরিষ্কৃত ও প্রস্তুত করে ;— যাহাতে করিয়া, পশ্চাৎ, সাহিত্য-প্রতিভার আবির্ভাব ও সাহিত্য-বীজ হইতে সাহিত্যাঙ্কুরের উদ্ভব হয়।

সাহিত্যের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির উন্নতি হইতে থাকে। সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি ব্যতীতও তাহা হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ও সহায়তা দ্বারাই তাহা হয় ; হইয়া পরবর্ত্তী সাহিত্যেরই পুনঃ সহায়তা করে। ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পারিক সম্বন্ধ-গত ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বিবেচনা করি। যদিও এ সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভাব ও ভাষার আবির্ভাব ও লক্ষণ ও ব্যাকরণাদির নিয়ম সম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান।

বলা আবশ্যক যে, ভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে যে সকল কথা বলা হইতেছে, তাহা আদিম ও মৌলিক এমন ভাষার উপরেই প্রযোজ্য, যে আদিম ও মৌলিক ভাষার সবিশেষ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে বিস্তীর্ণ ও বহুবিধ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইয়া গিয়াছে। সে ভাষা এ সময়ে প্রচলিত থাকিলেও পারে ; না থাকিতেও পারে। কেননা, বর্ত্তমান কালে, ইয়ুরোপে, এসিয়া ও অন্যদেশে যত ভাষা সুপ্রচলিত ও সজীব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের অধিক সংখ্যকই অনাদিম ভাষা। ভাষান্তর হইতে তাহাদের অনেকেরই উৎপত্তি। পক্ষান্তরে আদিম ও মৌলিক এমনও কত ভাষা ছিল বা আজও আছে, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। অরণ্যবাসী অসভ্যদের মধ্যে ভাষার পরিবর্ত্তন ও অস্থায়িত্ব প্রায়ই হইয়া থাকে। একটা ভাষা ভাসিয়া উঠিয়া কত দিন থাকিয়া কোথায় উড়িয়া পলায়, আবার একটা আসিয়া তাহার স্থল অধিকার করে। ভাষার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নহে। বলিতে চাই যে, আমরা কোনও অনাদিম, অসভ্য, অল্পকাল স্থায়ী, অনুন্নত ও অমার্জ্জিত এবং সাহিত্য-বিহীন ভাষার কথা বলিতেছি না। যদিও আমরা কোনও ভাষা বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই, তথাচ আমরা যে আলোচনা করিতেছি, তাহাতে এই বুঝাইতেছে ও এই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের উদ্দিষ্ট ভাষা আদিম, মৌলিক, মার্জ্জিত, উন্নত, সভ্য ও সুবিস্তীর্ণ এবং বহুবিধ ও বিপুল সাহিত্য-সমন্বিত। তাদৃশ ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইতেও তাহার স্তরে স্তরে অসংখ্য প্রকারের সাহিত্যের সংগঠন হইতে শত শত শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল বা হইতে পারে।

অতঃপর ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বর্ণমালার সম্বন্ধ-ঘটিত কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক হইতেছে।

বর্ণমালার বিকাশ ব্যতীত সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; ভাষাও দীর্ঘ কাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। অতএব আমাদের এই স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণগুলি বড় সাধারণ ব্যক্তি নহেন। বর্ণ বা অক্ষর দেখিতে এক একটী সামান্য চিহ্ন মাত্র বটে। কিন্তু বলে, বিক্রমে ও কার্য্য মাহাত্ম্যে ইঁহারা এক একটী জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। বর্ণবিরহে সাহিত্য অসম্ভব ; ভাষাও অচিরস্থায়ী।

আমাদের "শ্রুতি" এবং স্মৃতি, ঠিক অলিখিত সাহিত্য ছিলেন বলিয়া, এবং ঋষি বংশপরম্পরার শ্রবণে ও স্মরণে জীবিত ও প্রবাহিত থাকিতেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম "শ্রুতি" ও "স্মৃতি" হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু, যথার্থই যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, কাযে কাযেই, কেবল ইহাই মানিয়া লইতে ও বলিতে হয় যে, তখনকার ঋষিগণ ও তাঁদের বংশধরগণ, নিশ্চয়ই এক একটী সুবিশাল শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ছিলেন এবং তাঁহারা কেহ কখনও কেবল 'শ্রুতি" "স্মৃতি" ভিন্ন, সাহিত্যান্তরে এবং বিষয়ান্তরে মনসংযোগ করিতে বাধ্য হইতেন না। পরন্তু, তৎকালে, সাহিত্যও তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু, সে 'সত্য যুগের' কথা। তখন ত সবই সম্ভব ছিল এবং এখানকার হইতে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়াই শুনিতে পাই। কিন্তু, এই কলিকালে, বর্ণাশ্রয় না পাইলে, শ্রুতি স্মৃতি, বেদবাক্য ঋষিবাক্য হইয়াও যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

ইহা সত্য বলিয়া কথিত হয় বটে যে, পুরাকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মনুষ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক রচনা বা রচনাবলী বংশ পরম্পরার মুখে মুখে চালিত ও স্মৃতিপট মাত্রে অঙ্কিত হইয়া, সংরক্ষিত হইত; এবং ইহাও সত্য হইতে পারে যে, তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে, বর্ণের আবিষ্কারে, বহুগ্রন্থের প্রচারে, বা লিপিকরের অত্যাচারে, মনুষ্যের স্মৃতি-শক্তি, ক্রমশ শক্তিহীন ও খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, তাহা সত্বেও, ইহা স্থির যে, মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি, কোন ক্রমেই, অসীম নহে। পরন্তু, স্মৃত বস্তু ও বিষয়াদিরও প্রসার পরিমাণগত একটা নির্দিষ্ট সীমা না হইলে চলে না। কাযেই, বলা বাহুল্য যে, কেবল এক মাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া, সাহিত্য স্থিত হইতে ও সজীব থাকিতে কোন ক্রমেই পারে না। বর্ণাশ্রয় ব্যতীত, সৃষ্ট হইয়াও তাহাকে বিলুপ্ত হইতে হয়।

ফলতঃ অক্ষরের আবিষ্কার এবং বর্ণলিপির প্রচারেই, সাহিত্য বিজ্ঞানাদির সংস্থিতি ও সম্প্রসারণ। উহার অভাবে, মনুষ্যের অতীত ও বর্ত্তমান কি ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন থাকিত, তাহা কেবল মাত্র অনুমেয়ই হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, বর্ণ বা অক্ষরমালা, অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইয়া বা কেবল মাত্র কৌশলের কল-কারখানায় গঠিত নির্ম্মিত হইয়া বা কোন দৈব শক্তি প্রভাবে, প্রকাশমান হইয়া, মনুষ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। ভাষা এবং সাহিত্যেরই ন্যায় বর্ণমালার সৃষ্টি সংগঠন ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন কল্পে, যুগ যুগান্তরে, বহু বহু যুগ ধরিয়া, বহু বহু জাতির ও বহু বহু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, আবশ্যকতা ও বুদ্ধিমত্তা, কল্পনা ও সমালোচনা, সৃষ্টি-কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য একত্রে কার্য্য করিয়াছে। বহু বহু কালের অনুশীলনে, বিবর্ত্তনে এবং বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে, বর্ণমালা স্তরে স্তরে, বিনির্ম্মিত, ও বিবর্দ্ধিত ও বিশোধিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে। এবং তাহাদের ক্রম বিকাশ-প্রবাহ এখনও প্রবাহিত। বর্ণমালার বয়ঃক্রম, বহু বহু কাল, কোটি কোটি কল্প হইলেও, তাহার বর্দ্ধনশীলতা, অদ্যাবধিও, বিদ্যমান আছে। জগতের সর্ব্ববিধ স্বভাবজ সৃষ্টি ও শিল্পজাত সৃষ্টির ন্যায়, বর্ণমালার সৃষ্টিতেও ক্রমে-বিকাশ-

প্রক্রিয়া, সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। যে কোনও ভাষার বর্ণমালার ইতিবৃত্ত ও আকারাবয়বের পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করিলে, এই ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়া, নিসংশয় অনুভূত ও স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতে পারে।

অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনা, এস্থলে আমাদের অভিপ্রেত না হইলেও, কেবল প্রসঙ্গত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, শব্দের প্রতিনিধি বা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির পরিচায়ক আমাদের বর্ত্তমান বর্ণমালা অর্থাৎ (Phonetic Letters) ধ্বন্যাত্মক অক্ষরাবলী, বিকাশ লাভ করার পূর্ব্বে, মনুষ্যের স্মৃতির সহায় স্বরূপ, মনোভাব বাহক বা পদার্থাদির জ্ঞাপক বা গণনাদির ব্যঞ্জক অন্যান্য প্রকারের চিহ্ন, চিত্র বা স্মারক লিপি, প্রচলিত ছিল। এবং সেই সকল হইতেই, ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়া, ধ্বন্যাত্মক বর্ত্তমান বর্ণাবলী বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অক্ষর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, অক্ষরের অর্থাৎ স্মারক-চিহ্নের বিকাশের ক্রম, সাধারণতঃ চারিটী প্রধান স্তরে, বিভক্ত করেন। এই বিভাগ, মনুষ্য জাতির আদিম অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায়, সুনির্দ্দিষ্ট এবং সূক্ষ্ম না হইলেও, আদিম কালের ঐতিহাসিক নিদর্শনের উপর স্থাপিত। স্তর চারিটী এইরূপ—

১ম স্তর ;—	দ্রব্য-লিপি।
২য় স্তর ;—	চিত্র লিপি।
৩য় স্তর ;—	চিহ্ন লিপি।
৪র্থ স্তর ;—	শব্দ লিপি।

অক্ষরের বিকাশ ক্রম ঘটিত এই স্তর চতুষ্টয়ের বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা এখানে আদৌ অসম্ভব ; অনাবশ্যকও বটে। ইঙ্গিতে কেবল এই বক্তব্য যে, প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ের এবং তৃতীয় হইতে চতুর্থের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। চতুর্থ স্তর অক্ষরের ধ্বন্যাত্মক লিপি চিহ্ন ; যাহার অন্যতম বিকাশ অক্ষরের অধুনাতন বা উপস্থিত অবস্থাও অবয়ব।

১ম স্তরে, বাহ্য বস্তুর নিদর্শন দ্বারা, ২য় স্তরে, চিত্রের দ্বারা, এবং ৩য় স্তরে, চিত্র পরিব্যঞ্জক চিহ্নের দ্বারা, স্মৃতি লিপি। শাব্দিক ভাষার অভাবে বা অবিদ্যমানে, এবং শাব্দিক ভাষার পরিবর্ত্তে, ইহারা কিঞ্চিন্মাত্রায় মনুষ্যের মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ। অতএব, ইহারা, কেবল ভাষার স্মারক লিপি নহে ;—পরন্তু, অস্পষ্ট ও অপ্রচুর ভাবে, মনোভাব প্রকাশের ও অপরাপর উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহারা ভাষা এবং ভাষার স্মারক-লিপি উভয়তই কার্য্য করিত। ইহারা অগ্রে ভাষা, পশ্চাৎ হইয়াছিল স্মারক লিপি। ইহারা পর্য্যায়ক্রমে পদার্থ বা বস্তুগত, চিত্রগত, এবং চিহ্নগত, পরন্তু বস্তু, চিত্র ও চিহ্নে প্রকাশিত মনুষ্য-ভাষা। এ ভাষা ছিল দর্শনীয়, শ্রবণীয় নহে।

আমরা এখন ব্যবহার করি জিহ্বা-বিনিসৃত, বাক্যে প্রকাশিত এবং কর্ণে শ্রুত শাব্দিক ভাষা। শাব্দিক বা শ্রবণীয় ভাষার ন্যায়, চাক্ষুষ চিত্রাদিগত ভাষাও ব্যবহার্য্য বটে। পরন্তু, এখনকার ধ্বন্যাত্মক বর্ণের ন্যায় পুরাকালে বাহ্য বস্তু, চিত্র এবং চিত্রাদির চিহ্ন স্মারক লিপি-স্বরূপ বা মনোভাবের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

বলাবাহুল্য, শাব্দিক ভাষা ও মূল্যাত্মক বর্ণই সাহিত্যের উপাদান। চাক্ষুষ ভাষাও চিত্র-লিপি শিল্পের উপাদান, সাহিত্যের নহে। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (২)

ব্রহ্ম যখন কার্য্যের কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই অবস্থায় ইনি "ঈশ্বর" পদবাচ্য। আমরা "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। "সৎপদার্থ যখন তাঁহার মধ্যস্থ শক্তি বিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন এই সৎই *কারণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শক্তিই* "অব্যক্তকার্য্য" রূপে অবস্থিত থাকে। * * * * সমুদ্রের জলরূপ উপাদান কারণে যেরূপ পরে প্রকাশিত ফেন, তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে ব্রহ্মও তদ্রূপ পরে প্রকাশিত বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে। এ অবস্থায় অব্যক্ত মায়া নিতান্ত অসৎ বা অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেন না, সায়নাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎ সৃষ্টির আদি নাই। এক প্রলয় সময়ে যাহা অব্যক্ত ভাবে লীন ছিল, পর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই গুলিরই ক্রমে বিকাশ হয়।' সুতরাং এই অব্যক্ত মায়াতে পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদয় পদার্থই অতি সূক্ষ্মভাবে বিলীন অবস্থায় নিহিত ছিল। সেই গুলিরই সৃষ্টির সময়ে পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে বিকাশের নামই "সৃষ্টি"। * * * ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান স্বরূপ। তাঁহার শক্তি জ্ঞানেরই ক্রিয়া মাত্র। জ্ঞানের এই ক্রিয়ার সুতরাং তিনটী অবস্থা। ক্রিয়োন্মুখ বা অব্যক্তাবস্থা এবং ক্রিয়ার স্থূল বা ঘনীভূত অবস্থা। ক্রিয়োন্মুখাবস্থায় জ্ঞান নির্ব্বিশেষ; গাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ সত্তামাত্র অনুভব করে, এ অবস্থায়ও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সত্তাত্মক জ্ঞান মাত্র। ঈশ্বর এ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। যেহেতু তিনি এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ কালে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছেন। তিনি এ অবস্থায় *সর্ব্বনিয়ন্তা (actuator)। যেহেতু যে যে প্রাণী* ও বস্তু যে যে শক্তি লইয়া তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, তিনি এই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থায়, সেই সেই প্রাণী ও বস্তু প্রভৃতির সেই শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করেন। এই ঈশ্বর যেমন সৃষ্টিকালে পূর্ব্ব নিহিত শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করাইয়া দেন, তেমনি তিনি সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত শক্ত্যাদিকে নিজের আলোকে আলোকিত করিয়া থাকেন।" এইরূপে জগৎ ও জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া ব্রহ্ম "ঈশ্বর" পদবাচ্য হন। অতএব এভাবে ঈশ্বর অলীক পদার্থ নহেন। উপাধ্যায় মহাশয় উত্তম বিচার বলে, এই ঈশ্বরকে জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ বিশ্বাতীত রূপে প্রমাণ করিয়া, ইহাঁকেই গীতার উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সর্ব্বানুভাবক হইয়াও সর্ব্বাতীত। উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত-বলে, গাফ্ (Gough) সাহেব তাঁহার প্রণীত "The philosophy of the upanishads" নামক গ্রন্থে যে বলিয়াছিলেন যে,—"Iswar can hardly be conceived to have

any *separate* personality apart from the souls he permeates and vivifies".—এই ভ্রমাত্মক উক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত; ইহাই শঙ্করাচার্য্যেরও অভিপ্রায়। উপাধ্যায় মহাশয় এইরূপভাবে শঙ্করকে এস্থলেও বুঝিয়াছেন বলিয়া, রামানুজের সবিশেষবাদ এবং শঙ্করের তথা-কথিত নির্ব্বিশেষবাদ তাঁহার চক্ষে এক হইয়া গিয়াছে। এলতঃ গৌরগোবিন্দ বাবুর গীতা ভাষ্য একখানি আশ্চর্য্য গ্রন্থ। আমরা দুই তিনটী মাত্র প্রধান সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিলাম। এরূপ আরো অনেক চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত তাঁহার ভাষ্যে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের ভাষ্যটী উল্লেখ করিতে পারি। নীলকণ্ঠ নামক টীকাকার পরমেশ্বরের, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশকত্ব মাত্র স্বীকার করিয়া, পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরকত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন।

আমরা আর একটী স্থলের ব্যাখ্যা-কৌশল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। নবমাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে "প্রকৃতের্বশাদবশং" এই পদটীর অনেকেই "প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎস্বভাববশাদবশং"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রাচীন কর্ম্ম স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য (২।১।৩৭) হইতে সেই দোষ দেখাইয়া, তিনি "সৃষ্ট্যশক্তির স্বাভাবিক বিচিত্র স্বভাব বশতঃ অবশ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে একটী উত্তম ফল হইয়াছে। Rev. K. M. Banerjee কৃত প্রণীত "Dialogues" নামক গ্রন্থে শঙ্করের এই ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া, ইহার সহিত শঙ্করের লিখিত, বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যাংশের সহিত, অনৈক্য ও বিরোধ দেখাইয়া,শঙ্করকে দোষ দিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু গৌর গোবিন্দ বাবুর এই ব্যাখ্যায়, এখন ইহা বুঝা গেল যে, শঙ্করের অভিপ্রায়ও এইরূপ; বাস্তবিক পক্ষে বিরোধ নাই। শঙ্কর-লিখিত ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যোক্ত কর্ম্মশব্দের অর্থও—সৃষ্ট্য শক্তির স্বাভাবিক বিচিত্রতা। এইরূপ অর্থ করিলেই, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে কোন বৈষম্যাদি দোষ আসিতে পারে না। এইরূপ, এই ভাষ্যে যে কত চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীমাংসা আছে, সেগুলি স্থানাভাব বশতঃ উল্লেখ করিতে না পারিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। এই সমন্বয় ভাষ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ গবেষণা, অনন্যসামান্য বহুদর্শিতা এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। একালে, ইহাঁর মত সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি এ দেশে বড় নাই।

আমরা এখন এই ভাষ্যের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত ভাষার উপরে উপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার। প্রাঞ্জল অথচ সরল ও মিষ্ট সংস্কৃত লিখিতে, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি, দ্বিতীয় পাওয়া কঠিন হইবে। ভাষা এত চমৎকার যে, পড়িলে মোহিত হইতে হয়। এই ভাষ্যে তিনি সর্ব্ববিষয়েই যেরূপ অনন্যসাধারণ-

পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। হিন্দুর সমস্ত দর্শন, প্রায় সমস্ত পুরাণ, সংহিতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি যেন তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। এ বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিতা অসাধারণ। তাঁহার হস্তে সমস্ত শাস্ত্রভাণ্ডার হিতৈষী কামধেনুর ন্যায় আচরণ করিয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ পন্থাগুলি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, উহাদের একতা সম্পাদনে তিনি যে কৃতিত্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের গৌরবের বিষয়। তাঁহার মত পণ্ডিত এ দেশে আছে, একথা মনে হইলেও পুলকে ও জাতীয় গৌরবে আমাদের শরীর কণ্টকিত হয়। তাঁহার এই ভাষ্য দ্বারা এদেশের যেরূপ মহোপকার সাধিত হইল, তাহা প্রশংসা করিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। বিধাতা ইঁহাকে সুস্থ শরীরে রাখিয়া দেশের মঙ্গল করুন।

আমরা এই সমন্বয় ভাষ্যের একটী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটী কথা বলিব। আশা করি, উপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। জীবের পারলৌকিক গতি বলিতে গিয়া, উপাধ্যায় মহাশয়, জীবের মৃত্যুর পর, কর্ম্মভাবের, আমাদের এই মনুষ্য লোকে পুনরাবর্ত্তন হইবে না,—উপনিষদাদির এইমত, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে, অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। এ বিষয়ে আমাদের চারি প্রকারের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। (১) যদি মৃত্যুর পর জীবের এ লোকে আর পুনরাগমন হইল না, তবে অধিকাংশ জীবনিবহ শীঘ্রই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, অথবা নূতন নূতন জীবের জন্ম নিতান্তই আকস্মিক ও অহৈতুকী হইয়া পড়ে। (২) যদি অন্য লোকেই গতি হয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তবে এই মনুষ্যলোকে গতি হইবার বাধা কি? (৩) তাহার এরূপ ব্যাখ্যা কিছু কষ্ট কল্পিত হইয়াছে। (৪) শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে অতি সুস্পষ্টবাক্যে জীব এই মর লোকেই পুনরাবর্ত্তন করে, একথা বলিয়াছেন। পণ্ডিত গৌর বাবুর সিদ্ধান্ত সুতরাং শঙ্করের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আমরা সম্মানের ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যিনি সমন্বয় ভাষ্য লিখিতে যাইতেছেন এবং যাঁহার ভাষ্য আর্য্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের জিনিষ হইবে, সে ভাষ্য শঙ্করের বিপরীত মত পোষণ করিলে, তাহার আদর হইবে কি? পরলোকগতি সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সন্দেহ হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। ভরসা করি, আমরা বুঝিয়া থাকিলে, মাননীয় উপাধ্যায় মহাশয় দয়া করিয়া, আমাদের সে ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কানীনতা।

কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার বিরহানলে অল্প বয়সে দগ্ধ হইয়াছিলেন। এই অকাল মৃত্যুর কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অয়ং হি কামরাগ মোহ ময়াদম্ম সারং স্ত্রীবীর্য্যাদেব কেবলাৎ উৎপন্নঃ। ইনি কেবল স্ত্রীর কাম আসক্তি ও অজ্ঞানতা-

প্রধান অল্পসার বীর্য্য হইতে জন্মিয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈশম্পায়নের জন্মের নিমিত্ত পুরুষ-সংযোগ ঘটে নাই। বৈশম্পায়নের জননী লক্ষ্মী ছিলেন। এইরূপ, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে আর এক দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের পুরাণে অন্য প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বশিষ্ঠ অগস্ত্য, দ্রোণ, কৃপ, কার্ত্তিক প্রভৃতি অনেকে কেবল পুরুষের শুক্র হইতে জন্মিয়াছিলেন।

ইহঁাদের জন্মবৃত্তান্ত পৌরাণিকী কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু জীব-রাজ্যে কেবল স্ত্রী হইতে সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব নহে। বরং কোন কোন জীবে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। কন্যা বা কুমারী হইতে জাত বলিয়া এরূপ সন্তানকে কানীন বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রের কানীন সন্তান বলিলে পুরুষ সংযোগাভাব বুঝায় না, কেবল স্বামী সংযোগাভাব বুঝায়। এখানে আমরা কানীন শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিলাম।*

পৌরাণিকী কথা ছাড়িয়া দিলে, মানব জাতির মধ্যে কানীন সন্তানের দৃষ্টান্ত নাই। উহার বিশেষ দৃষ্টান্ত পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রথমে ডারউইন নাকি বলিয়া গিয়াছেন যে, মধুমক্ষিকার অনিষিক্ত ডিম্ব (অর্থাৎ যে ডিম্বকে পুং মক্ষিকার শুক্র নিষিক্ত করে নাই, তাহা) হইতে মক্ষিকা জন্মাতে পারে। আর এক ব্যক্তি একটা স্ত্রী রেশমকীট কাচপাত্রে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কীট-প্রসূত ডিম্ব হইতে কীট জন্মিয়াছিল। ইহাও বহু পূর্ব্বকালের কথা, তখন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শন ছিল না।

কিন্তু অনেক কীট আছে, যাহাদের পুং আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, (Rotifers)। কতকগুলির পুং এত ক্ষুদ্র ও বিকৃত যে, তাহাদের দ্বারা ডিম্বনিষেক (fertilisation) প্রায় সম্পন্ন হয় না। কর্কট-গণের মধ্যে কয়েকটী জাতিতে কানীন সন্তানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গাছে এক জাতীয় ছোট ছোট পতঙ্গ (Aphides) দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে কানীনতা সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

কোন কোন উদ্ভিদেরও কানীন সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। গুড়ূচী লতার (গুলঞ্চ) স্ত্রী ও পুং লতা পৃথক্। অস্ট্রে এক জাতি গুড়ূচীর স্ত্রীলতা এমন স্থানে রোপিত হইয়াছিল যে, সেখানে পুং লতার পরাগ আসিতে পারিত না। তথাপি স্ত্রী-লতাটির বীজ হইত, এবং সেই বীজ হইতে অপর লতা জন্মিয়াছিল। নিম্নশ্রেণী উদ্ভি-

---

* কানীন অর্থে parthenogenetic ধরা গেল। Asexual অর্থে কেহ কেহ অযোন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচন ভাল হয় না। বৈশম্পায়ন অযোন ছিলেন না, কিম্বা তাহাকে asexually produced বলা যাইতে পারে না। বশিষ্ঠাদি অযোন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উৎপত্তির নিমিত্ত sexdifference আবশ্যক হইয়াছিল। Asexual অর্থে অমৈথুন, এবং asexually produced অর্থে অমৈথুন্য ধরা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে অলৈঙ্গিক করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইবে, যথা, asexual generation অলৈঙ্গিক পুরুষ বা সন্তান। যে জীবের পুং স্ত্রীভেদ আছে, তাহা লৈঙ্গিক; যাহার নাই, তাহা অলৈঙ্গিক। এইরূপে, একলিঙ্গ জীব unisexual, দ্বিলিঙ্গ জীব bisexual. পুং স্ত্রী যোগে জাত সন্তান, মৈথুন্য. অযোগে জাত অমৈথুন্য। অমৈথুন্যের মধ্যে asexually produced এবং parthenogenetic উভয়ই থাকিবে। কেবল স্ত্রী হইতে জাত অমৈথুন্যের নাম কানীন ধরা গেল।

দের মধ্যে কানীনতার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু সকল স্থলে প্রত্যক্ষ করা সহজ নহে।

উপরের দৃষ্টান্তে কানীন সন্তান সর্ব্বদা ঘটে। সময়ে সময়ে অপর জীবের কানীন সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপে রেশম কীট সময়ে সময়ে কানীন সন্তান প্রসব করে। সমুদয় পতঙ্গের এইরূপ হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে কানীন সন্তান সর্ব্বদা দেখা যায় না, রোগ বিশেষে তাহাদেরও এইরূপ সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন বিচক্ষণ দ্রষ্টা ভেক ও কুক্কুটের কানীন সন্তান জন্মিতে দেখিয়াছেন।*

মধু মক্ষিকার জীবনেতিহাস অনেকে অবগত আছেন। মধুমক্ষিকার 'রাণী' উড়িতে উড়িতে 'রাজা' কর্ত্তৃক নিষিক্ত হয়। রাজার পুং কোষাণু সমূহ (sperm cells) তৎকালে রাণীদেহে সযত্নে রক্ষিত হয়, এবং রাণী মধুচক্রে যেমন ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে, রক্ষিত পুং কোষাণু সেগুলিকে নিষিক্ত করিতে থাকে। এইরূপে কিন্তু সকল ডিম্ব নিষিক্ত হইতে পারে না। যে গুলি হয় না, সেগুলি নিষ্কর্ম্মা রাজা হইয়া কানীনতার পরিচয় দেয়। যে গুলি হয়, তাহাদের মধ্যে রাণী ও দাসী জন্মে। আহার গুণে রাণী ও দাসীর প্রভেদ ঘটে; রাজভোগ্য ভোজ্য ভোজন করিয়া কোন ডিম্ব রাণীরূপে (অর্থাৎ স্ত্রী) এবং আহার দোষে কোন ডিম্ব দাসী (অর্থাৎ বন্ধ্যা স্ত্রী) রূপে পরিণত হয়।

স্ত্রী মধুমক্ষিকা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল বড় কৌতুকাবহ। রাণীর ডানা কাটিয়া দিয়া তাহাকে উড়িতে অক্ষম করিলে, কিম্বা সে বৃদ্ধা হইয়া পুং-কোষাণু রক্ষণে অসমর্থা হইলে, নিষ্কর্ম্মা মক্ষিকাদলের জন্ম হয়। যে অঙ্গে রাণী পুং কোষাণু রক্ষা করে, তাহাকে সরাইয়া লইলেও প্রসূত ডিম্ব নিষিক্ত হইতে পারে না, ফলে রাজপুত্রগণের জন্ম হয়।

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা সহজ নহে। জীব বিদ্যার প্রত্যেক বিষয়ই দুরূহ, তাহার মধ্যে দুরূহ জনন ক্রিয়া, তাহার মধ্যে দুরূহ কানীনতা। জীবনের অনেক ব্যাপার নিত্য দেখি বলিয়া তাহাতে বিস্ময় জন্মায় না। নতুবা প্রত্যেক ব্যাপারই বিস্ময়জনক হইত। সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাই মিথুনের আবশ্যকতায় বিস্মিত হই না। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের সংযোগ কেন আবশ্যক, স্ত্রী ও পুংসৃষ্টি দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে,—ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক।

দাম্পত্য প্রেম বিকাশের নিমিত্ত পুং স্ত্রী সৃষ্টি বলিলে উত্তর একদেশদর্শী হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রাণীতেই দাম্পত্য প্রেমের লক্ষণ দেখা যায়, অথচ বহু নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে মৈথুন সন্তান জন্মিয়া

* যাহারা প্রাণিহত্যা পাপ ভয়ে নিরামিষাশী, অথচ দেহের পুষ্টিসাধন সংকল্পে হংস কুক্কুটাদির অসিক্ত ডিম্ব (বায়াডিম) অম্লান বদনে ভক্ষণ করেন, এই সকল বিষয় তাঁহাদের স্মরণ করা আবশ্যক। আমার কোন বন্ধু মৎস্য মাংস ভোজন করেন না, কিন্তু ডিম্ব ভক্ষণের সময় মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি স্থির করিয়াছেন, ডিম্বের চৈতন্য নাই, সুতরাং বধে পাপ নাই। বোধ করি, তিনি নড়নচড়নেই চৈতন্যের লক্ষণ দেখিতে পান। কিন্তু জীবন অর্থেই যে নড়নচড়ন। বায়া ডিম অবশ্য মৃত নহে।

থাকে। সুতরাং প্রেমবিকাশ নিমিত্ত পুং স্ত্রীসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। জীব বিদ্যার নীতিশাস্ত্রীয় বা ভাব সম্বন্ধীয় বিচার চলে না।

পুরুষ সন্তান প্রসব করিতে পারে না কেন? —সন্তান প্রসবের আবশ্যক সাধন তাহার নাই। কিন্তু স্ত্রীর ত আছে। তবে, পুং সংযোগ কেন আবশ্যক হয়?—স্ত্রীর সাধন আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ সাধন নাই। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী ডিম্ব প্রসব করিতে পারে, এবং করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ডিম্বকে স্বয়ং সন্তানবহ করিতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ সংযোগ ব্যতীত যে ডিম্ব জাত হয়, তাহাতে এমন কোন পদার্থের অভাব থাকে, যাহা কেবল পুরুষেই দিতে পারে। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে সে অভাব কিসের? সে অভাব কি কোন দ্রব্যের, না কোন শক্তির, না উভয়েরই? পুরুষ যাহা দেয়, তাহার ধর্ম্ম কি, ডিম্বের প্রতি তাহার ক্রিয়া কি?

যাঁহারা জীবনকে রসায়ন শক্তিবিদ্যার (Physics) বহির্ভূত মনে করেন, তাঁহারা অবশ্য ঐ সকল প্রশ্ন ত্যাগ করিতে বলিবেন। পূর্ব্বে জীববিদ্যা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা বোধ হইত। এক্ষণে উহা ক্রমশঃ জড়বিদ্যার (Physical sciences) অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। জড়বিদ্যাই বা বলি কেন, রসায়ন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিলেই বা দোষ কি। জীবদেহ ত নূতন বস্তুতে নির্ম্মিত নহে। রাসায়নিকের দ্বিসপ্ততি সংখ্যক মূল পদার্থের অতিরিক্ত কোন পদার্থ জীবদেহে নাই। সুতরাং জীবন ক্রিয়াও রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্তর বলিতে হইবে।

কিন্তু জৈব রসায়ন (organic chemistry) অতিশয় কঠিন, অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। এজন্য জীবনক্রিয়াকে রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষে পরিণত করিতে বহুকাল বিলম্ব আছে। যদি কোন দিন জীবন ক্রিয়াকে রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষ নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়, সেই দিনই স্ত্রী পুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

এই সূক্ষ্ম দর্শন এক্ষণে সম্ভাব্য নয়। বর্ত্তমান স্থূল দৃষ্টিতেও অনেক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরও প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, স্ত্রী ও পুরুষ এক প্রকার বোধ হইলেও এক প্রকার নয়। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া মিথুন। স্ত্রী ও পুং দেহে কি প্রভেদ আছে, দেহগঠনগত, দেহ ব্যবচ্ছেদ গত, সাধনগত, ক্রিয়াগত, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের নির্দ্ধারণ আবশ্যক। সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত এক জাতীয় (species) জীব মিথুন আবশ্যক। সিংহ ও বিড়াল, কিম্বা ব্যাঘ্র ও বিড়াল মিথুন হইলে চলে না। পুং ব্যাঘ্র ও স্ত্রী ব্যাঘ্র, পুং বিড়াল ও স্ত্রী বিড়াল,—এইরূপ মিথুন আবশ্যক। তার পর, পুং বিড়ালের শুক্রস্থিত পুং কোষাণু বা বীজ কোষাণু (Sperm cells) এবং স্ত্রী বিড়ালের স্ত্রী-কোষাণু বা ডিম্ব কোষাণু (ovum cells) আবশ্যক। তার পর, জীবকোষ ও ডিম্ব-কোষের মিলন ও একীভবন; তার পর, ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভ্রূণ। যে পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা গেল, তাহা অত্যন্ত জটিল। উহার কতকটা জানা থাকিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য, এবং লেখকের ভাষার ক্ষমতার

বহির্ভূত। তথাপি দেখা গেল, এক জাতীয় জীবের বীজকোষ ও ডিম্বকোষের মিলন না হইলে সন্তান হয় না। অর্থাৎ বীজকোষ হইতে ডিম্বকোষ এমন কিছু পায়, যাহার ক্রিয়াবশতঃ ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং যে পরিবর্ত্তনের ফলে ভাবী সন্তানের অবয়ব উদ্ভূত হইয়া থাকে। মৈথুনিক জনন ক্রিয়ার এই স্থূল ব্যাখ্যা।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রশ্ন মনে আসে। পুং স্ত্রী ভেদ হইল কেন? কেবল পুং কিংবা কেবল স্ত্রী থাকিল না কেন? সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অন্য বহুবিধ কৌশল থাকিতে পারিত। নিম্ন শ্রেণী জীবের পুং স্ত্রী ভেদ নাই, অথচ তাহাদের বংশ চলিতেছে। উচ্চশ্রেণী প্রাণীতেই বা সে নিয়ম রহিল না কেন?

এই প্রকার বিভেদে সৃষ্টিকার্য্যের অবশ্য সুবিধা হইয়াছে। এ কথা বলাই বাহুল্য। সৃষ্টিকার্য্যে সুবিধা না হইলে বিভেদটা থাকিতেই পারিত না, জীববংশ ধ্বংস হইবার সহিত বিভেদটাও চলিয়া যাইত। ইহার সহিত জীব বিদ্যার আর একটা প্রধান কথা যোগ করা যাইতে পারে। মৎস্য অপেক্ষা পক্ষী উচ্চশ্রেণীর, কিংবা মৎস্য নিকৃষ্ট, পক্ষী উৎকৃষ্ট,—অথবা পক্ষী অপেক্ষা স্তন্যপায়ী উৎকৃষ্ট। এই প্রকার উক্তির মূলে যাহা আছে, পুং স্ত্রী ভেদের মূলেও তাহাই। এক জীব হইতে অন্য জীব উচ্চ কি নীচ, এক মানব সমাজ হইতে অন্য মানব সমাজ উন্নত কি অবনত, তাহা নির্দ্ধারণের মূলে যাহা আছে, মৈথুন ও অমৈথুন জন্মের মধ্যে তাহাই আছে। মৈথুন জননের মূলে সৃষ্টি কার্য্যবিভাগ আছে, এবং কার্য্য বিভাগেই উচ্চ নীচ নির্দ্ধারণের মূল নিয়ম। বিষয়টা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না। তবে, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, নারীদেহ পুষ্টির আধার, নরদেহ ক্ষয়ের আধার। স্ত্রী জীবন সঞ্চয়ের, পুং দেহ ব্যয়ের। নারীদেহ অর্থেই পূরণ, নরদেহ অর্থেই ক্ষয়। পুরুষ চঞ্চল, অসহিষ্ণু, ব্যগ্র, পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী; নারী স্থির, নিশ্চেষ্ট, সহিষ্ণু, পরিবর্ত্তন-বিরোধী। এই দুই বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত জীব মিথুনের যোগে জীব প্রত্যহ রক্ষিত হইতেছে।

এই মূলনিয়ম অঙ্গীকার করিলে কানীনতার কতকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, অসিক্ত ডিম্বে পুংকোষাঙ্কুর প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। পুরুষ সংযোগ একবার ঘটিলে তাহার ফল পুরুষানুক্রমে বংশ পরম্পরায় চলিতে থাকে। কিন্তু যদি পুংকোষাণু ব্যতীত কেবল ডিম্ব কোষাণু হইতে সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সামান্য ডিম্বকোষাণু হইতে সেরূপ ডিম্বকোষাণু ভিন্ন। যেমন অমৈথুন্য সন্তানোৎপাদনে একটী কোষ—না পুং, না স্ত্রী,—সন্তান জন্মাইতে পারে, তেমনই ডিম্বকোষাণুও পারে। বস্তুতঃ কানীনতা না থাকিলে মৈথুন্য ও অমৈথুন্য উৎপাদনের দুইটী ব্যাপারকে স্বতন্ত্র মনে করিতে হইত। প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন ব্যাপার নাই, যাহা কেবল একটী, যাহা অন্য হইতে একেবারে ভিন্ন, যাহাকে অপরের সহিত যোগ করিতে পারা যায় না। এরূপ না হইলে জীবের ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তন বাদ মিথ্যা হইত। পুং স্ত্রী দুইটী এক লিঙ্গ পৃথক জীব যেমন আছে, তেমনই পুং স্ত্রী অঙ্গ ও সাধন সহ দ্বিলিঙ্গ জীব আছে; আবার তাহাও গিয়া পুং স্ত্রী সাধন বিহীন

অলৈঙ্গিক জীব আছে, যাহার শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় অঙ্গ বিশেষ হইতে সন্তান জন্মে; শেষে তাহাও গিয়া অঙ্গ বিশেষও থাকে না, দেহের সর্ব্বাঙ্গ হইতেই সন্তান জন্মিতে পারে।

এই ভাবে দেখিলে, কানীনতায় বিস্ময় হয় না। যদি দেহের সর্ব্বাংশ বা অংশ বিশেষ হইতে সন্তান জন্মিতে পারে, তাহা হইলে পুং অভাবে স্ত্রীর সন্তান না হইতে পারিবে কেন, কিংবা স্ত্রী অভাবে পুরুষেরই বা সন্তান না হইতে পারিবে কেন? শৈবাল শ্রেণীর কোন উদ্ভিদের পুংকোষ হইতে সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু এই প্রকার ঘটনা আছে বলিয়াই পুং স্ত্রী ভেদ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বস্তুতঃ মৈথুন্য পরবর্ত্তী সৃষ্টি, অমৈথুন্যই পূর্ব্বের।

যদি স্ত্রীকোষাণু হইতে সন্তান জন্মিতে পারে, তবে পুং কোষাণু সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? কানীন সন্তান দ্বারা কোন কোন জীবের বংশরক্ষা পাইতেছে, তবে আর নিষেক ক্রিয়ার কি আবশ্যকতা ছিল? এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মিথুনের মিলন বা নিষেক ক্রিয়া দ্বারা জীবজাতি নূতন বল প্রাপ্ত হয়। ইহাঁদের অনুমানে অমৈথুন উৎপত্তি জীব জাতির অপকর্ষ হইয়া থাকে। এমন কি, জাতি ধ্বংসও হইতে পারে। অমৈথুন্য উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু মৈথুন্য উৎপত্তিই অধিক। দেহ বিভাজন বংশ রক্ষা বহু কাল চলিতে পারে না, পুং স্ত্রী কোষাণুর মিলন দ্বারা নবযৌবন লাভ হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী কোষাণুই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য কোষ মরিয়া যায়।

কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধেও কেহ কেহ বলিয়াছেন। জীববিদ্যাবিৎ জর্ম্মাণ বাইসমান (Weismann) ইঁহাদের অগ্রণী। তিনি বলেন, "অমৈথুন উৎপত্তির যে সীমা আছে, তাহার প্রমাণ কই? পুনর্জন্ম বা নবযৌবন লাভ, এই একটা কথার মধ্যে সমস্ত বিষয়টা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রাখিলে চলিবে কেন? যে কীট (Infusoria) পুনঃ পুনঃ সেই বিভাগ দ্বারা ক্ষীণবল ও অপকৃষ্ট হইল, তেমন দুইটী ক্ষীণবল জীবের মিলনে নবযৌবন লাভ হইতে পারে কি? অভাব হইতে, ভাব হইতে পারে না।" ইত্যাদি।

বোধ হয়, ইনিও এক দেশ দেখিয়াছেন। অথবা ইঁহার যুক্তি সত্য হইলেও সম্পূর্ণ নয়। অমৈথুন দেহ বিভাগ দ্বারা বংশ চলিতে পারে বটে, কিন্তু সে বংশের উন্নতির দিকে গতি লোপ পায়। যদি জীব বিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই বিবর্ত্তনের নিমিত্ত কোন বেগ থাকা আবশ্যক। সেই বেগ পুংকোষ দেয়। জীবনের মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়াই দেখা যাক্ না, তৎসমুদায়কে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। একটী স্বদেহ পোষণ; অন্যটী সন্তান জনন। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দেহ পোষণ চলে, তার পর তাহার শেষ, অথবা জনন ক্রিয়া আসে। পোষণে নিজের স্থিতি, জননে নিজের লোপ ও অন্যের আগমন। কিংবা যে পোষণে নিজের স্থিতি সম্পাদন করে, তাহাই সন্তানরূপ অপর দেহের স্থিতি আনয়ন করে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এই দুই ক্রিয়া স্ত্রীদেহে ও পুংদেহে কতকটা পৃথক্ হইয়াছে। স্ত্রীদেহ মৃত্তিকাদি যুক্ত ক্ষেত্র, পুংদেহ বেগরূপ বীর্য্য। পুংকোষই

জীবজাতি পরিবর্ত্তনের প্রধান সহায়। স্ত্রী পরিবর্ত্তন আনে না, পুরুষ সতত পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। এই স্থিতি শক্তি, ও গতি শক্তির সমবায়ে জীবোৎপত্তি। কেবল স্থিতি শক্তি দ্বারা গতি হয় না, এবং কেবল গতিশক্তি দ্বারা স্থিতি হয় না। স্থিতির পর গতি, এবং গতির পর স্থিতি,—এই নিয়মে জীব জগৎ চলিতেছে। স্ত্রীরূপ স্থিতিশক্তি দ্বারা স্থিতিই হইত, তাহাতে পুরুষ রূপ গতিশক্তি বেগ সঞ্চারিত করিলে অগ্রগতি হয়।

এতদ্ বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরিদর্শনলব্ধ ফল আছে। উক্ত জাতীয় (Infusoria) একটী কীটকে বৎসরাধিক কাল রাখিয়া তাহার বংশবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে তাহার ২১৫ পুরুষ অমৈথুন দেহ বিভাজন দ্বারা জন্মিয়াছিল। অবশেষে বংশটী ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইতে দেখা গেল, যেন বৃদ্ধ হইয়াই জন্মিতেছে। এখানে অমৈথুন জননের শেষসীমা বলা যাইতে পারে।

এই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে কয়েকটাকে লইয়া অন্য বংশের সহিত রাখা হইয়াছিল। এই প্রাণী স্ববংশের কোন সন্তানের সহিত মিলিত হয় না। ভিন্নবংশ পাইয়া প্রথম বংশের প্রাণী দ্বিতীয় বংশের প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহার মিলনোৎপন্ন একটীকে পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আবার পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, পর পর সন্তান জন্মিতে লাগিল। বিভিন্ন সময়ে এই সকল সন্তানকে অন্য বংশের সন্তানের সহিত রাখা হইল। উহাদের মধ্যে মিলন হইল। এইরূপে ১৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। তখন আবার তাহাদের ক্ষীণাবস্থা দৃষ্ট হইল, এবং অন্য বংশের সহিত রাখাতেও সন্তান হইল না। যখন প্রায় ১৮০ পুরুষ হইয়া গিয়াছে, তখন দেখা গেল, সেই বংশের বিভিন্ন সন্তান পরস্পর মিলিত হইতেছে। কিন্তু কোন ফল হইল না, বংশটী ধ্বংস হইল।

তবেই বলিতে হইবে, কোন অজ্ঞাত কারণে অমৈথুন জনন দ্বারা উক্ত প্রাণিগণ ক্ষীণবীর্য্য হয়। উহাদের দেহ প্রথমে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে, ক্রমশঃ দেহের আকার প্রায় চতুর্থাংশ হয়। দেহমধ্যে অনেক বিকার জন্মে, শেষ আকারহীন হইয়া সূক্ষ্ম পিণ্ডে পরিণত হয় এবং জীবন ধারণ ও সন্তানোৎপাদন অসম্ভব হয়। তবেই, এই সকল নিকৃষ্ট প্রাণীতেও সময়ে সময়ে মৈথুন জন্ম আবশ্যক হয়, নচেৎ বংশ প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, অমৈথুন কিংবা কানীন জন্ম জীব প্রবাহ রক্ষা বিষয়ে উপযোগী নয়। মৈথুন জনন দ্বারা জীবের যে অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ফলে একদিকে তাহার বংশ অক্ষুন্ন থাকে, অন্য দিকে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা ঘটে। ইহার অতিরিক্ত বলিতে গেলেই কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

জাতিভেদ হিন্দু শিক্ষা-প্রণালী।

হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ এই, যিনি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ গুণসম্পন্ন হইয়াছেন, ইহজন্মে তাঁহার তদনুরূপ জাতিতে জন্মলাভ হয়। জগতের কিছুই যখন একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত

হয় না, তখন পূর্ব্বজন্মের বিশেষ গুণসম্পন্ন চিত্তপুরুষই বা বিনষ্ট হইবে কেন? এজন্মে যেস্থানে আসিয়া যিনি শেষ করিলেন, পরজন্মে সেই স্থান হইতে তিনি আরম্ভ করিবেন, ইহাই নিয়তি, পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রারব্ধ। এই নিয়মানুসারে ধরিয়া লইতে হয় যে, যাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, জন্মাবধি তাঁহার চিত্তপুরুষ তজ্জাতীয় গুণসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ জাতি সত্ত্বগুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহাতে অপর দুই গুণের প্রাদুর্ভাব একেবারেই নাই। সত্ত্বগুণ প্রধান চিত্তপুরুষে তম ও রজোগুণ আছে বটে, কিন্তু সত্ত্বগুণেরই আধিক্যবশতঃ তাহা ব্রাহ্মণ জাতীয় হইয়াছে। এই রজ ও তমোগুণের বিনাশ সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ ঋষি সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণতায় আসিলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। এইরূপ সম্পূর্ণতা সাধনার্থ বৈদিক আর্য্যধামে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি। সেই সম্পূর্ণতা সাধন জন্যই ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ। এইরূপ ব্রতে ব্রতী বলিয়া আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ জাতি জগতের অপর দেশীয় সত্ত্বগুণ-প্রধান লোকমণ্ডলী হইতে পৃথক হইয়াছেন। পৃথক্ হইয়া উপবীতধারী হইয়াছেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ জাতীশ্বর হইয়া সেই গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। আর্য্য সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, এই যজ্ঞোপবীত তাহারই চিহ্ন। সুতরাং চিহ্নিত হইয়া তিনি সমাজ মধ্যে (Covenanted) জাতি। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই তাঁহার (Covenant)। ব্রাহ্মণ দুই কারণে জাতীশ্বর; তিনি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর বর্ণভেদের মূলকারণ তিনি; কারণ, অপরাপর জাতি মূল ব্রাহ্মণ জাতি হইতে সমুৎপন্ন। কিরূপে সমুৎপন্ন, তাহা আমরা "ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ" নামক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তই গ্রহণীয়। হিন্দু সমাজে কেন, সকল সমাজেরই এই নিয়ম। গীতাও সেই কথা বলিয়াছেন। তাই সেই শ্রেষ্ঠ জাতির জাতীয় নিয়ম অপরাপর জাতির পক্ষে শাস্ত্রে নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। কোন্ বিষয়ে আদর্শ স্থানীয়? ব্রাহ্মণ যে সাত্ত্বিকগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার সেই সাত্ত্বিকতাই সর্ব্ব জাতির আদর্শ স্থানীয়। যেহেতু সাত্ত্বিকতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সেই শ্রেষ্ঠ গুণ ভিন্ন আর কি আদর্শ হইতে পারে?

ব্রাহ্মণ জন্মাবধি সত্ত্বগুণ প্রধান হইলেও তাঁহার রজ ও তমোগুণ যে একেবারেই নাই, এমত নহে। সেই দুই গুণ অপ্রধান মাত্র। অপধান বটে কিন্তু তাহাদের যথেষ্ট প্রাবল্য থাকে। এই দুই গুণের অত্যধিক প্রাধান্য হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন। এই দুই গুণের বিনাশ সাধন করাই ব্রাহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ এই দুই গুণের বিনাশ কিরূপে সাধন করেন? ব্রাহ্মণ ব্রতধারী হইয়া যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, সেই জাতীয় শিক্ষা প্রভাবেই সেই গুণদ্বয়ের ধ্বংস সাধন হয়। প্রাচীন কালে যে চারি আশ্রম নিয়ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধানিত ছিল, এই চারি আশ্রম নিয়মই সেই শিক্ষা-প্রণালী। এক্ষণে আর চারি আশ্রম নিয়ম নাই বটে, কিন্তু এক সংসারাশ্রমেই সেই চারি আশ্রম-নিয়ম প্রতিপালিত হইতে পারে। সংসারাশ্রমে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থের নিয়ম-পালনের কোন বাধা হইতে পারে

না। এক্ষণকার চতুষ্পাঠী প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যের ছায়ারূপে আজিও বিদ্যমান।

জ্ঞান, ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য সম্পূর্ণ জীব। এই ত্রিবিধ শক্তির পূর্ণানুশীলনে তাহাদের উন্মেষ হয়। সেইরূপ উন্মেষ-সাধনই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানবৃত্তির তৃপ্তি, কামনার অনুশীলনে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার তৃপ্তি, কর্ম্ম সেই জ্ঞান ও ইচ্ছার পরিণাম। জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম। এই ত্রিবিধ শক্তির সম্বন্ধ এইরূপ। তুমি সরোবরে একটী পদ্ম ফুল দেখিলে, সেই পদ্ম ফুলের জ্ঞান হইল, জ্ঞান সেই পদ্মফুল লাভেচ্ছা উৎপাদন করিল। শেষে কর্ম্মশক্তি সেই সরোবর হইতে পদ্মফুল আনিয়া দিল। সুতরাং জ্ঞানই সর্ব্ব কর্ম্মের মূল। কামনা জ্ঞান দ্বারা শাসিত হয়, কামনা শাসিত হইলেই কর্ম্ম শাসিত হয়। আর্য্য জাতির শিক্ষা প্রণালী তাই প্রথমে এই জ্ঞান-শিক্ষার প্রতি নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যই জ্ঞানানুশীলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। সেই ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানানুশীলন হইবে, সংসারে তাহাই কামনার উৎপাদক হইয়া ক্রিয়াশীল হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যে কিরূপ জ্ঞানের অনুশীলন হইত? সে জ্ঞান বেদাধ্যয়নে এবং গুরুর কঠিন সংযম-নিয়মে অর্জ্জিত। এই সংযমের প্রধান শাসন গুরুভক্তি। গুরুভক্তি-প্রভাবেই সংযম-শিক্ষা এবং সংযমের সহিত বেদশিক্ষা। এরূপ শিক্ষা প্রণালী ক্রমে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইত, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; সেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ সংসারের বিশাল প্রবৃত্তি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন।

এই সংসারই ব্রাহ্মণের যজ্ঞভূমি। এই যজ্ঞভূমিই প্রবৃত্তি অনুশীলনের বিস্তারিত ক্ষেত্র। জ্ঞানানুশীলনের পর প্রবৃত্তির অনুশীলন। এই প্রবৃত্তির অনুশীলন শুধু পুত্র কন্যা লইয়া নহে সে সংসারভুক্ত জগতের সকলেই—পশু, পক্ষী, অতিথি, সজ্জন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, আত্মীয়, স্বজন, দাস, দাসী, ভাই, ভগিনী, ভাগিনেয়, মাসী, পিসী, কুটুম্ব, সাক্ষাৎ—সবাই সংসার ভুক্ত। ভক্তিতে, স্নেহে, মমতায়, ক্ষমায়, আদরে, দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, ধৈর্য্যে, লজ্জায়, খাতিরে আর কত মত প্রবৃত্তির অনুশীলনে তবে সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ব্রাহ্মণের সংসার পশু সেবা নহে, তাঁহার সংসার দেব-সেবা। তাঁহার সংসারাশ্রম মহা যজ্ঞক্ষেত্র, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞের মহা শ্রীক্ষেত্র। সে আশ্রম তাই মহা ধর্ম্মক্ষেত্রের পবিত্র দেব মন্দির। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ও দেবমন্দিরের দেব কার্য্য সাধনে তাঁহার জ্ঞান কামনাকে চরিতার্থ করিয়া এরূপ নিয়মিত করে, যদ্দ্বারা তাঁহার পশুত্বের হ্রাস হয় ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞান, সংসারের প্রবৃত্তি পথকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করে, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপযোগী হইতে পারেন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের এইরূপ অনুশীলনেই মানুষ দেবত্বে উপনীত হয়েন। পশু মানুষ হয়, মানুষ দেবতা হয়। দেবত্বই সাত্বিকতার পূর্ণত্ব। সাত্বিকতার পূর্ণত্ব প্রাপ্তিই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। এই চরমোৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে এই দেবত্ব ও চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ্য লাভ

করিতে হইলে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইলে ইহলোকে সাত্বিক গুণের অনুশীলন করিয়া সাত্বিক গুণাধিক্য লাভ করা চাই। সাত্বিক গুণের অনুশীলন করিতে হইলে সাত্বিক কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সাত্বিক কার্য্যানুষ্ঠান সাত্বিক প্রবৃত্তি ব্যতীত সমুৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তিকে সাত্বিক পথে আনিতে হইলে,সংযম ও স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক। প্রেমকে স্বার্থ হইতে যতই পরার্থ করা যায়, ততই প্রবৃত্তি সাত্বিক পথে আইসে।

ব্রাহ্মণ সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্তি-স্রোতকে এইরূপ স্বার্থপথ হইতে পরার্থ পথে আনিয়া সাত্বিকতা লাভ করেন। তিনি স্বজাতি নিবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বজাতিতে নিজ প্রেম প্রসারিত করেন। সমদর্শিতাই ব্রাহ্মণ্য লাভের প্রশস্ত পন্থা। তাই ব্রাহ্মণের প্রেম সর্ব্ব জাতিতে, সর্ব্বভূতে বিস্তৃত। তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য শুধু মানুষ জাতির প্রতি নহে, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম বর্ত্তমান বলিয়া সকলেরই ব্রাহ্মণ জাতীয়ত্ব হেতু সর্ব্বজীবে তাঁহার প্রেম। মনুষ্যের সর্ব্ব জাতীয় লোকের সহিত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ। শুধু গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নহে, সমদর্শিতার নিদানভূত বিশ্ব-প্রেমের সম্বন্ধ। সর্ব্ব জাতিকে না ভাল বাসিতে পারিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করা দুষ্কর।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ —এই সমস্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সুশিক্ষিত হওয়াই ব্রাহ্মণের জাতীয় শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ আত্মসেবী ও সমাজ-সেবী। সমাজসেবা না করিতে পারিলে তাঁহার :আত্মসেবা ও আত্মার পরাগতি লাভ করিবার যো নাই। সুতরাং প্রকৃত-পক্ষে আত্মসেবা করিতে হইলে সমাজ-সেবা করা চাই। দুই এক কাজ হইয়া দাঁড়ায়। আত্ম ইষ্টের সহিত সামাজিক ইষ্ট এক সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহে সুশিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ একদা আত্মসেবী ও সমাজসেবী। সমাজ সেবা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের অপরাংশ মাত্র। এইরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করাই ব্রাহ্মণের জাতীয় শিক্ষা।

ব্রাহ্মণকে স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিয়া আনা যেমন তাহার জাতীয় শিক্ষা, তেমনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি সমূহকে নিজ নিজ ব্যবসায় ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্য আর্য্যসমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা। নিজ নিজ ব্যবসা ও বৃত্তিতে নিপুণতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষা জাতীয় ভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে কার্য্যে জীবনব্যাপী শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাতেই পটুতা অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য হিন্দু সমাজে কুল-ক্রমাগত ব্যবস্থা। গুণানুসারে ও লোকের প্রকৃতি অনুসারে সমাজকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি বিভাগের প্রকৃতি ও গুণানুসারে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জাতি-ভেদ। ছাত্রগণের অধিকার অনুসারে যেমন বিদ্যালয়ে বিবিধ শ্রেণী বিভাগ, জাতিভেদও তদ্রূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। স্বস্ব বৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত এই বিভাগের অবস্থা। নহিলে সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন? সকল ব্যবসা বৃত্তির সুদক্ষ লোক সমাজে সুলভ হইবে কি প্রকারে? ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র

শ্রেণীর লোক। মেষপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে চলিতে পারে না। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকার্য্যের গৌরব সামান্য শ্রমজীবি লোকের উপরে স্থাপিত। শূদ্রজাতীয় শ্রমজীবিলোক হিন্দুসমাজে বড়ই সুলভ, এত সুলভ অন্য সমাজে নহে। অন্য সমাজে শূদ্র জাতীয় স্বতন্ত্র শ্রেণীস্থ এতবৃহৎ লোকাবণ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। অপর সমাজের শ্রমজীবি লোক এবং দাসব্যবসায়ীদিগের দর বড়বেশী। অন্য সমাজে হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতির নীচ ও ঘৃণাকর কার্য্যে কে নামিতে চায়? কিন্তু হিন্দুসমাজে জাতিভেদ কুলক্রমাগত হওয়াতে এখানে সর্ব্বজাতীয় ব্যবসাবৃত্তির লোক অতিসুলভ। হিন্দুসমাজের বিশালশূদ্র জাতি সমূহ সমাজের মহাবল ও স্তম্ভ স্বরূপ।

স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য হিন্দু সমাজে যে জাতিভেদের সৃষ্টি, তাহা প্রতি জাতির ধর্ম্মশিক্ষা পথেরও অনুকূল ছিল। সকল আর্য্য ব্যবস্থারই মূল ধর্ম্ম। জাতিভেদের উদ্দেশ্যও সেই ধর্ম্ম। জাতিভেদ যে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী,সেই শিক্ষা প্রণালীরও উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম। সাধন ধর্ম্ম এবং সমাজধর্ম্মভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রতি ব্যক্তির হিতার্থ সাধন ধর্ম্ম এবং সমাজের হিতার্থ সমাজ ধর্ম্ম। জাতিভেদ এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম-সাধক। প্রতিব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধান করা প্রতি ব্যক্তির ইষ্ট এবং সমাজের পুষ্টি সাধন করাই সমাজের ইষ্ট। জাতিভেদ একদা এই দ্বিবিধ ইষ্ট সাধক। স্ববৃত্তিতে সুশিক্ষিত হইতে পারিলেই সামাজিক ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। জাতিভেদ কুলক্রমাগত হওয়াতে সর্ব্বজাতীয় লোক নিজ নিজ বৃত্তিতে সুশিক্ষিত হইয়া যেমন নিজ নিজ জীবিকা লাভের সুবিধা করিতে পারেন, তেমনি সমাজের সর্ব্বজাতীয় সুশিক্ষিত লোক সুলভ হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বলোপায় হয়। তজ্জন্য প্রাচীন কালে আর্য্য সমাজ এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বলসম্পন্ন ও সমুন্নত হইয়া পৃথিবীতে সভ্যতা ও ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পাছে এই সমাজধর্ম্মের ত্রুটি হয়, তাই আর্য্য শাস্ত্রে স্ববৃত্তি পরিত্যাগের পাপ ঘোষিত হইয়াছে। নিজ জাতির মধ্যে স্ববৃত্তিতে থাকিয়া যিনি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, হিন্দুমতে তিনি তজ্জাতীয় কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, "বৃত্তি" কুললক্ষণের মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতিই বেদাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং তজ্জন্য যে রূপ বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা সাধিত হইত, সেই পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে সকলেই আপন আপন বৃত্তির উন্নতিসাধনে সমর্থ ছিলেন। তাই আর্য্য সমাজে সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও কলার ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। এতদূর উৎকর্ষ যে আজিও তাহার সমতুল্য হওয়া সুকঠিন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে তাই স্ববৃত্তিতে থাকিয়া লোকের যে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা থাকিত না, এমন নহে, তদ্দ্বারা অনেকে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া দান ধ্যান পূর্ব্বক সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে পূর্ব্বে ধনগৌরবই প্রধান গৌরব ছিল না, ধন কেবল ধর্ম্মের জন্য, দান ধ্যানের জন্য। বেশি দিনকার কথা নহে, ইদানীনকালেও, আমাদের বাপ-পিতামহের কালেও,ধর্ম্মগৌরবই সমাজের প্রধান গৌরব রূপে গণ্য হইত। এক্ষণকার মত তত ধনলোভ না থাকাতে সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া সংসার যাপন করিত। যে

জাতীয় লোকের জাতিকুল যাহা হউক না কেন, তাহাতে বড় আসিয়া যাইত না। যে যেমন ধার্ম্মিক, সমাজে তাহার তত মান সম্ভ্রম। সুতরাং সামাজিক উচ্চনীচত্ব এই ধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিত। এই ধর্ম্মানুরাগই সর্ব্বজাতীয় লোককে নিজ নিজ সাধন-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিত। জাতিভেদ দ্বারা সমাজিক বিভিন্নতা থাকিলেও সাধন-ধর্ম্মপথের পথিক সকলেই। যে সাত্বিকতা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ও গৌরব, সেই সাত্বিকতা লাভের অধিকারী সবাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় সকলেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণের উপদেশে সেই সাত্বিকপথে আসিতে পারিতেন। শূদ্রগণও গুরু পুরোহিতের উপদেশে নীয়মান হইয়া এবং পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তদ্রূপ ভক্তি পথে সমুন্নত হইতে পারিতেন। দান ধ্যান, যাগ-যজ্ঞে, বার ব্রতে এবং পূজাদিতে সকলেই সমান অধিকারী। এই বিষয়ে বিভিন্নতা কাহারই নাই। পুরাণাদি শ্রবণ ও পাঠে শূদ্র জাতীয় লোকের ভক্তিপথ আরও সহজ ছিল। এই সাত্বিকতা লাভ করা যখন সাত্বিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে,—সংযম ভিন্ন, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন কোন প্রকারেই ধর্ম্মলাভ করা যখন সাধ্য নহে, তখন কেবল বিশেষ গ্রন্থাধ্যয়নে অধিকারী থাকা আর না থাকা সমান কথা। যাঁহারা বেদের অধিকারী, তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান যেরূপ গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ, আর যাঁহারা কেবল পুরাণাদির অধিকারী, তাঁহাদের ও ধর্ম্মজ্ঞান তদ্রূপ গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। কারণ, হিন্দুধর্ম্মের সমুদায়ই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। গুরুর উপদেশ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য। শূদ্রের গুরু যে ব্রাহ্মণ, অপর জাতীয় লোকেরও গুরু সেই ব্রাহ্মণ। সুতরাং ধর্ম্মপথের নেতা একই থাকাতে শাস্ত্রের অধিকার ভেদের বিভিন্নতায় কিছুই আসিয়া সাধন-ধর্ম্মে সর্ব্বজাতীয় লোকপ্রায় যাইত না। সাধারণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত, সাধারণ শূদ্র ও মূর্খজাতীয় লোক শিক্ষা, এবং অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য এই অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিবার বিশেষ কারণও ছিল। একইরূপ ভক্তিশিক্ষা প্রাপ্ত হইত। বেদের উপদেশে যে ধর্ম্ম, পুরাণাদিরও উপদেশে সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের নানাবিধ সাধনপথ সকল শাস্ত্রেই সমান। সকল পথই মোক্ষ সাধক। সাধনপথ যদিও বিভিন্ন, কিন্তু সকল পথেরই উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থল একই। সকলই সংযম-মূলক চিত্তশুদ্ধি পথ। চিত্তশুদ্ধি সাধন না হইলে কোন পথেই সাত্বিকতালাভ করা যায় না। সাত্বিকতালাভ না করিতে পারিলে, কোন পথেই মুক্তিলাভ সুসাধ্য নহে। এরূপ স্থলে, সকল আনুষ্ঠানিক পথই সদ্‌গুরু সাপেক্ষ। সেই সদ্‌গুরু একমাত্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং যিনি যে জাতীয় হউন না কেন, তাঁহার ধর্ম্ম গুরু ও শিক্ষক সেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিয়া সর্ব্ব জাতীয় লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতেন। জাতীয় বিভিন্নতা থাকিলেও ধর্ম্মসাধন-পক্ষে কিছুই বিভিন্নতা ঘটিত না।

তবেই দেখা যাইতেছে, সমাজস্থ প্রতি ব্যক্তিকে তাহার স্ববৃত্তি এবং কুব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করাই জাতিভেদের উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষা প্রতি ব্যক্তির শুধু ঐহিক মঙ্গলের কারণ নহে, তদ্দ্বারা সমাজেরও সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। অথচ এরূপ শিক্ষার সহিত যাহাতে প্রতি ব্যক্তির

আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন হয়, তাহাও সামাজিক ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইয়াছে। আর্য্যধর্মের সামাজিক নিয়ম এরূপ, যাহাতে সর্ব্ব জাতীয় লোক ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিয়া ক্রমশঃ রজ ও তমোগুণের বিনাশ হেতু সাত্ত্বিক গুণে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা বলে প্রাচীনকালে অনেক ক্ষত্রিয় রাজ রাজভোগে থাকিয়াও রাজর্ষির পরমগুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। অন্য লোকের পক্ষে ত সেরূপ গুণলাভ করা আরও সহজ হইবার কথা। অতএব কি সামাজিক উন্নতি, কি প্রতি ব্যক্তির লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, সর্ব্ববিধ উন্নতির সদুপায় হিন্দু জাতিভেদের শিক্ষাপ্রণালী। এই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজ সভ্যতা, ধর্ম্ম, এবং লৌকিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া কিরূপ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, ভারতীয় ইতিবৃত্ত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। আজি সেই সভ্যতা ও ধর্ম্মোন্নতির নিদর্শন ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া শতমুখে প্রাচীন ভারত-গৌরব প্রচার করিতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

[শ্রীপরমহংসদেব—অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। *এই প্রথম দর্শন।* মাষ্টার দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা বলিতেছেন। ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন।

[কর্ম্মত্যাগ কখন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন। বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো। "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন; সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াতে এসেছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে তাই বেড়াতে এসেছেন। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন 'গঙ্গার

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখতে যাবেন ? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়াছিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন "আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ। কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়িতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসিব"।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে। মাষ্টার দ্বাদশ শিব মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটী রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা হয়। আর অনেক অতিথি কাঙ্গাল আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁগা সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন ?

বৃন্দে। হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হোলো।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন ?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি কি খুব বই টই পড়েন ?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার। সবে পড়া শুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার।—আচ্ছা ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা কর্‌ছেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে ?

বৃন্দে। তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঘরে আর কেহই নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজ্যাতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় থাকো,কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া

মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না, এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলাম, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন একবারে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইতেন। এরই নাম ভাবসমাধি।

মাষ্টার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করিবেন, তা হলে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না—সন্ধ্যা—এমন কিছু নয়। আর কিছু কথা বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন এ সৌম্য কে—যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো। কাল কি পরশ্ব সকালে আবার আসিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গুরু—শিষ্য।]

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskin এর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারায় সালু দিয়া মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা এখানে বসো।

একথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত; সেই বারাণ্ডায় তিনি কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার; পায়ে চটী জুতা; সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞে, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওই ঈশেনের বাড়ী।

(শ্রীকেশবচন্দ্র সেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁগা, কেশব কেমন আছে? শুনেছিলুম, বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে, আমিও শুনেছিলুম বটে; এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাক্‌লে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।

(মাষ্টারের প্রতি) হাঁগা কুক্‌সাহেব না কি একজন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছ্‌ল, সেই জাহাজে কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে এই রকম শুনিছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না

[গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম্ম নাই। বলে আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুর বাড়ীতে রেখেছে। অনেক গুলি ছেলে পিলে। আমি বকলুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলে পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও পাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, ওদের শ্বশুর বাড়ী ফেলে রেখেছে। আমি অনেক বকলুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

মাষ্টার। আজ্ঞে হঁা।

(মাষ্টারের প্রতি) তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হঁা।

মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া, রামলালের প্রতি) ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ? মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল, আমি কপাল চোক এসব দেখ্‌লে বুঝতে পারি। তোমার চক্ষু বেশ ছিল।*

* রামলাল—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারি।

আচ্ছা, তোমার স্ত্রী কেমন বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা শক্তি?

(জ্ঞান কাহাকে বলে?)

মাষ্টার। আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। সে অজ্ঞান? আর তুমি জ্ঞানী? তোমার জ্ঞান হয়েছে?

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল—তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর যখন বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী' তখন মাষ্টারের আবার অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস না 'নিরাকারে' বিশ্বাস?

(প্রতিমা-পূজা)

মাষ্টার আবার অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি আবার নিরাকারে বিশ্বাস হয়? না ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিষ, যেমন দুধ, সে কি আবার কালো হইতে পারে?

মাষ্টার (অনেক চিন্তার পর)। "আজ্ঞে নিরাকার আমার এইটী ভাল লাগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটা বিশ্বাস থাক্‌লেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাও

* মাষ্টারের বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাইশ।

জানই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না, এই সত্য আর সব মিথ্যা। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস সেটীই ধরে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। একথা ত তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই! মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা মহাশয়,তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হইল। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত নন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

(Lecture ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক্‌। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, মানুষ জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় করেছেন, পালন করবার জন্য মা বাপ করেছেন, মা বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না। যদি বোঝাবার দরকার হয়, তিনিই বোঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তাহার চেষ্টা কর।"

এইবারে মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,"ইনি যা বলছেন তাতো ঠিক! আমার বোঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে। 'আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।' কিছু জানি না শুনি না পরকে বোঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ সন্দেহ নাই। একি অঙ্ক শাস্ত্র,না ইতিহাস,না সাহিত্য যে পরকে বুঝাইব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, আমার মনে বেশ লাগছে।" মাষ্টারের ঠাকুরের সহিত এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন। অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করছেন যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। আবার কাহারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি,

মাছ ভাজা, এই সব, করেছেন। যেটী যার ভাল লাগে। যেটী যার পেটে সয়। বুঝলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(মাষ্টারের প্রতি উপদেশ।)

(ভক্তির উপায়।)

মাষ্টার। মহাশয়, ঈশ্বরে কি করে মন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ করতে হয়—যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। কিন্তু সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরেতে মন হয় না। তাই জন্য মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়া তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেতে মন রাখা বড়ই কঠিন হয়।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা বিচার করবে সদসৎ বিচার। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার সর্ব্বদা করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?

(গৃহস্থ সন্ন্যাস।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী পুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে,কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের যেন আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, 'আমার হরি।' কিন্তু মনে মনে বেশ জানে 'এরা আমার কেউ নয়।"

"কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান ? আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে, বিপদ শোক তাপ এ সবতাতে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত সংসারের কাজ করবে, যতই বিষয় চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তানা হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজ হাত দিতে হয়।

(উপায়—নির্জ্জনে সাধন।)

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখম তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তার পর নির্জ্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখম তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে কেবল ফেলে রাখলে ঐ মন

নীচ হয়ে যায়, কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা করে।

সংসারে যেন জল আর মনটী যেন দুধ, দুধ যদি জলে ফেলে রাখ তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, আর খাঁটি দুধ খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধকে দইপেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হলে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখম লাভ করবে। তার পর সেই মাখম সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবেনা, ভেসে থাকবে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়? ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার যায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তু বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তু বিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চরবি নাড়ি ভুঁড়ি মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে, কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস, তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু বিচার, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে?

গান।—ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে। ইত্যাদি

'ব্যাকুলতা হইলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান এবং সতীর পতির উপর টান, এই তিন টান যদি কাহারও একসঙ্গে হয়, তাহলে সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, আর বিষয়ী লোক যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা একত্র করলে যতখানি ভালবাসা হয়, ততখানি ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা' কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখন হেঁশালে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকে, আর কিছু জানেনা, মা যেখানেই থাকুক, এ মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত।)

গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত, তাহাতে রাধাশ্যামের সেবা নিরত, তাহাতে পণ্ডিত ও রসগ্রাহী। চৈতন্যভাগবতের সংস্করণ করিতে এমন উপযুক্ত লোক আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের হিতোপদেশের পরে বাঙ্গালা পুস্তকের এমন সুন্দর সংস্করণ আর দেখি নাই।

গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। বারখানি পুঁথি মিলাইয়া, পাঠান্তর দেখাইয়া, পাঠ নিরূপণ করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতশ্লোকগুলির আকর নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দিতে হইয়াছে। অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থ, গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও স্থান সকলের ভৌগলিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লেখা হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা ভাল, বর্ণাশুদ্ধি সামান্য। সুতরাং গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যভাগবত বাঙ্গালা ভাষার আদি মহাকাব্য। যখন চরিতামৃত লেখা হইতেছিল, তখন বৃন্দাবনে ভক্তসমাজে ইহা গীত হইত। তখন ইহার নাম চৈতন্যমঙ্গল। পড়িবার সুবিধার জন্য বা অন্য কারণে কিছুদিন পরে গীতগুলি বাদ দেওয়া হয়। তদবধি ইহার নাম চৈতন্যভাগবত। এখন যে গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল নামে প্রচারিত হইতেছে, তাহার রচয়িতা লোচন দাস। আজ কাল কেহ কেহ লোচনের নূতন নামকরণ করিয়া ত্রিলোচন বলিতে চাহেন, কিন্তু আমাদের লোচন 'লোচন' নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। এখন আর বৃদ্ধবয়সে নূতন নামকরণের প্রয়োজন নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কথাও শুনা গিয়াছে।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। শ্রীচৈতন্যের কথা লিখিতে গিয়া নিত্যানন্দের কথা তাঁহার মনে পড়িত, নিত্যানন্দের কথা লিখিয়াই গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া গেল। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা আর লেখা হইল না, অন্ত্যলীলার বিবরণ জানিতে হইলে চরিতামৃত পড়িতে হইবে।

বৃন্দাবন দাস আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভসম্ভূত, একজন টোলের পণ্ডিত। এমন শুষ্ক তরুতে এমন অমিয় ফল কোথা হইতে আসিল? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রেমের অমিয় মন্দাকিনী"। কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। এ অমিয়মন্দাকিনী কঠোর পাষাণে কিরূপে উৎপন্ন হইল? বৈষ্ণব মহাজনগণ তাহার অনেক কারণ দেখাইয়াছেন। কতকগুলি অদ্ভুত রহস্যে বৃন্দাবন দাসের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ। তখন নিজের হাতে নিজের জীবনচরিত লিখিয়া "জন্মভূমিতে" ছাপিবার জন্য পাঠাইতে লোকে শিখে নাই। দীনাতিদীন বৃন্দাবন দীনতায় আপন ব্রহ্মণ্য গোপন করিয়া "দাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাছে আত্মপরিচয়ের কোন কথা পাওয়া যাইবার আশা ছিল না। ছেঁড়া কাঁথাখানা তাঁহা-

দের সহ্য হইত না, তাঁহারা আপনার বা আত্মীয় স্বজনের গৌরবসূচক কোন কথা বলিবেন, তাহার আশা কোথায়? বস্তুতঃ কবে জন্ম, কোথায় জন্ম, কবে মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু, কাহার পুত্র, বৃন্দাবন সম্বন্ধে একটী কথাও নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

কিন্তু তাহাতে কি? চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবের প্রাণধন, সাহিত্যপিপাসুর অমৃত-ধারা। ইহা ধর্ম্মের দর্শন, সমাজের ইতিহাস, একটী অপূর্ব্ব চরিত্রের অপূর্ব্ব ইতিহাস। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কাব্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহা গাইয়া ও গাওয়াইয়া, পড়িয়া ও পড়াইয়া অপবর্গ লাভ করিয়াছেন। আমরা ইহার সম্মান করিয়া কৃতার্থ হই। চৈতন্যভাগবত চৈতন্যের ন্যায় বৃন্দাবন দাসেরও জীবনচরিত বটে।

ইতিপূর্ব্বে ভক্তিভাজন শিশির কুমার ঘোষ চৈতন্যভাগবতের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশির বাবুর সংস্করণের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণের তুলনা করিতে স্বতঃই বাসনা হয়। শিশির বাবুর সংস্করণও সুন্দর। নির্দ্দোষ হইলে, বোধ হয়, গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণের আবশ্যক হইত না। দুঃখের বিষয়, সে সংস্করণ খানিতে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয় শিশির বাবু নিজে দেখিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি যাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা উচিতমত কর্ত্তব্যপালন করেন নাই। আমরা কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছি।

৬ পৃষ্ঠা

"শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরু করি স্কন্ধে" সংস্কারক ভাবিয়াছিলেন নারদ গোসাঞি গান গাহিবার সময় তম্বুরাটা কাঁধে করিয়া ফিরিতেছিলেন। কিন্তু আসল কথা তুম্বুরু নামে আর একটী ঋষি তখন গোসাঞির সঙ্গে ঘোরাফিরা করিতেছিলেন, তাই বৃন্দাবন লিখিয়াছিলেন।

শ্রীনারদ গোসাঞি তুম্বুরু করি সঙ্গে

৩৫ পৃষ্ঠা

রাহু-কবল ইন্দু   পরকাশ নাম-সিন্ধু
কলি-মর্দ্দন বাজে বানা

শিশির বাবুর গ্রন্থে আছে "বাজে বানা"। মর্দ্দন-কে 'মর্দ্দল' লিখিয়া, বোধ হয় মাদল বাজিবার অনুমান করা হইয়াছে। সে কথা ঠিক হইলে "বানা" শব্দের অর্থ হয় না।

৩৮ পৃষ্ঠা

দুন্দুভি ডিণ্ডিম   মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর বিমানে।
বেদের অগোচরে   আজি ভেটবাবিলম্বে
নাহি আর কো জানে॥

এটী এইরূপ হইবে।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম   মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর রসাল রে
বেদের অগোচর   আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে॥

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করিয়া বিষ্ণুপূজার জন্য নানা নৈবেদ্য আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য শিশু চৈতন্য বায়না ধরিলেন যে, সেই সকল নৈবেদ্য তিনি খাইবেন, বায়না শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র মহাগোলে পড়িলেন, শিশুকে কতই বুঝাইলেন, শিশুর জিদ আরো বাড়িতে লাগিল। তখন জগন্নাথ বন্ধুদ্বয়কে সে কথা জানাইলেন। তাঁহারা মহা পরিতোষে নৈবেদ্যগুলি বিপ্রশিশুকে উপহার দিলেন। এই কথা বর্ণনা করিয়া বৃন্দাবন লিখিয়াছিলেন।

হেন প্রভু বিপ্রশিশু রূপে ক্রীড়া করে।
চন্দ্র ভরি দেখে জন্মজন্মের কিঙ্করে॥

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম জন্মের কিঙ্কর। ত্রেতা ও দ্বাপরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করতা করিয়াছিলেন। তাই বৃন্দাবন তাঁহাদিগকে "জন্ম-জন্মের কিঙ্কর" এই মনোজ্ঞ উপাধি দিয়াছেন। শিশির বাবুর সংস্করণে ইহাদিগকে "জগন্নাথের কিঙ্কর" বলা হইয়াছে, জিনিসটা তাই রহিল বটে, কিন্তু সে সুরটুকু রহিল না।

৮৬ পৃষ্ঠা

প্রভু দেখি ভক্তমোহ স্বভাবেই হয়
বিনি অনুভবেও বাসর চিত্ত নয়।

"চিত্তে নয় র স্থলে "চিত্ত লয়' হইবে

৮৭ পৃষ্ঠা

আত্মা বিনে পুত্র বালক নহে বন্ধুগণ
গৃহ হইতে বাহির হইল ততক্ষণ ॥
অতএব পরমাত্মা সভার কারণে
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে।

প্রথম লাইনটী এইরূপ হইবে।—

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ

তৃতীয় লাইনটী এইরূপ হইবে।—

অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।

শিশির বাবুর গ্রন্থে মৌড়েশ্বরকে 'গোড়েশ্বর' করা হইয়াছে, তীর্থযাত্রা বিবরণে ভৌগলিক নাম অনেকগুলি অশুদ্ধ হইয়াছে।

১১৯ পৃষ্ঠা

ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান
অঙ্গে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান

এ দুটী লাইন এইরূপ হইবে,—

ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র মাত্র পরিধান
অঙ্গে পানিতোলা পীত পট্টের সমান।

১৯৮ পৃষ্ঠা

সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি

এইরূপ হইবে,—

তাহা পাছে বিপ্র আর কহ কাহা প্রতি

তোমার আমার [দেহ ও] শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী চৈতন্যের দেহে প্রভেদ কি? বৈষ্ণব দর্শনে বলে তোমার আমার "অপ্রাকৃত দেহ" কিন্তু লক্ষ্মী চৈতন্যের "অপ্রাকৃত দেহ"।

ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে।
নিজ প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে

তৃতীয় লাইনের "প্রাকৃত দেহ" "প্রতিকৃতি দেহ" হইবে।

৬৩৬ পৃষ্ঠার অদ্বৈত 'দ্বৈত' হইবে।

৬৩৭ পৃষ্ঠার "ব্যাখ্যা" "কক্ষা" হইবে। পূর্ব্ব পক্ষ করাকে কক্ষা করা বলে।

৫৬৭ পৃষ্ঠার "লীলাতত্ত্ব" "লীলাতনু" হইবে।

৫৬৮ আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্গের বন্ধনে।

এই পংক্তিটীর কোন অর্থ হয় না। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য করিবার নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। তাই প্রভু বলিতেছেন।

আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।

৬১৬ পৃষ্ঠায় একটী হাস্যকর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। একদিন মুরারি গুপ্ত ভাবাবেশে অনেক ঘৃতান্ন প্রভুকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মুরারি যাহা দেন, প্রভু তাহাই খান, অস্বীকার করিতে পারেন না। সে দিন ভাবের আবেশে মুরারি অনেক অধিক অন্ন নিবেদন করিয়াছিলেন; খাইয়া প্রভুর পেটের অসুখ হয়। পেটের অসুখের নাম 'বিষ্টম্ভ'। শিশির বাবুর গ্রন্থে পেটের অসুখকে 'মিষ্টান্ন' করা হইয়াছে।

এইরূপ আরো অনেক ভুল আছে। অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।

এইখানে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ কি শূদ্র ছিলেন? এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি একবার সে কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। শিশির বাবুর

গ্রন্থে "শূদ্রাধম" শব্দটী আছে। গোস্বামী মহাশয় "ক্ষুদ্রাধম" লিখিয়াছেন। শূদ্রাধম শব্দ প্রকৃত হইলেও কথাটী দীনতার পরিচায়ক, জাতির নহে। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান বৈষ্ণবী দীনতায় আপনাকে চণ্ডালের অধম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন সন্ন্যাসী হইত না, ঈশ্বর পুরীকে বারবার "সন্ন্যাসী গোসাঞী" বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসী ভিন্ন "ভিক্ষা" গ্রহণে অন্য কাহারও অধিকার নাই।* বৃন্দাবন দাস আদি খণ্ডের শেষ ভাগে ঈশ্বরপুরী ও চৈতন্যের, তখন প্রভু অপ্রকট, পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরপুরী "ভিক্ষা" করিতেছেন, চৈতন্য "ভোজন" করিতেছেন। চরিতামৃতে লেখা আছে যে, ঈশ্বর পুরী শূদ্র গোবিন্দকে শিষ্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই রামানন্দ বিস্মিত হন।

পুরী যদি শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের বিস্ময়ের কি কোন কারণ থাকিত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ কি শূদ্র ছিলেন, এ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। তথাপি এ কথাটা উল্লেখ করিবার একটু আবশ্যক হইয়াছে। মোক্ষ মুলারের ন্যায় সাহেবেরা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিলে তত দোষ হয় না। তাঁহাদের কাছে মিত্র ও মিশ্র শব্দ দুটী বড় কাছাকাছি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে বসিয়া কেহ এরূপ ভ্রম করিলে একটু কৌতুক অনুভব হয়। আমার যেন বোধ হয় কোথাও কোথাও একটু চেষ্টা করিয়া এরূপ ভুল করা হইতেছে। একদিকে নিম্নশ্রেণীকে উচ্চতর আসনে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। যুগী এখন যোগী, কৈবর্ত্ত এখন মাহিষ্য, ইত্যাদি। অন্য দিকে ব্রাহ্মণকে উচ্চতর স্থান হইতে টানিয়া নীচে নামাইবারও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ সম্পাদক। তিনি উৎসাহী যুবাপুরুষ, বিশ্বকোষ সম্পাদনে বেশ সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। দেখিলাম, তিনি বঙ্গের জাতি নির্ণয় করিতে একখানি পুস্তক ছাপাইইয়াছেন—নাম দিয়াছেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। তাহাতে বলা হইয়াছে, কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশ শূদ্র বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কায়স্থ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেন বংশীয় রাজাগণকে কায়স্থ করিতে কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কায়স্থ রাজা হইয়াছিল প্রমাণ করিতে পারিলে তিনিও রাজবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন। নগেন্দ্র বাবুও কায়স্থ। এক কলমের খোঁচায় ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় হইতে পারিলে ছাড়িবেন কেন? নগেন্দ্র বাবু জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ খণ্ড লিখিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বকোষের সম্পাদক বলিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। আমি বারান্তরে তাঁহার পুস্তকখানি একটু স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করিব, ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং এখানে আর অধিক কথা বলিব না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

"কালনিদ্রা।"

মা, মা, এ কি গভীর স্বপন,
নাহি সংজ্ঞা নাহি চেতনার লেশ;

এ কি ঘোর ঘুমে মুদিত নয়ন,
এ কি ধূলিম্লান এলো থেলো বেশ!

মা, মা, ওমা হের চক্ষু চেয়ে,
কত বল মাগো ঘুমাইবে আর;
নবীন আলোকে ফেলিয়াছে ছেয়ে,
আকাশ অবনী নদী পারাবার।

হের চারিদিকে জেগেছে ধরণী,
বিহঙ্গ গাহিছে সুললিত গান;
ফুটেছে কুসুম অনন্ত বরণী,
তুমি মাগো শুধু ঘুমেতে অজ্ঞান!

বিশ্ব প্রকৃতির জাগরণ মাঝে,
তোমার কি মাতা, সাজে এ স্বপন?
রত যে যাহার আপনার কাযে,
জাগো মা জননি, খোল মা নয়ন।

নব জ্ঞান, নব উন্নতি আলোকে,
নূতন বিজ্ঞান নব ধর্ম্ম বলে,
জাগিয়াছে ধরা হের চারিদিকে,
তুমি কেন এই আঁধারের তলে?

ওই দেখ মাতা, দূর সিন্ধুপারে
কিবা শোভা আজি-কিবা জাগরণ;
স্নাত নব জ্ঞান-আলোকের ধারে
নর নারী কিবা প্রসন্ন বদন!

কীর্ত্তি রশ্মি কিবা জ্বলিছে ললাটে,
কিবা নেত্র মাঝে মহিমা রঞ্জিত;
স্বরগের শোভা হাটে মাঠে বাটে,
কুবেরের ধন ভাণ্ডারে সঞ্চিত।

অনল অনিল সিন্ধু সৌদামিনী,
আজি বাঁধা সেথা তোরণ দুয়ারে;
রত্ন মণিমালা আজি এ মেদিনী,
ঢালিছে চরণে প্রীতি উপহারে।

অনন্ত বিমানে উঠে জয়গান,
সসাগরা ধরা কাঁপে পদভরে;
ভূধরে সাগরে উড়িছে নিশান,
সুর নরে জয় গায় সমস্বরে।

হের গৃহদ্বারে 'জাপান' বালিকা
আজি রাজরাণী নিজ মহিমায়;
দীপিছে ললাটে সৌভাগ্যের টীকা,
কত উচ্চাসনে জগত-সভায়!

ক্ষুদ্র 'শ্যাম' সেও নিদ্রা পরিহরি,
জেগেছে আপন সাধিতে কল্যাণ;
কঠোর কর্ত্তব্য আজি শিরে ধরি,
উন্নতির তরে সঁপেছে পরাণ।

শুধু তুই মাগো স্বপনের ঘোরে,
থাকিবি পড়িয়া হীন অচেতন?
সুসভ্য জগত ঘৃণা ভরে তোরে
করিছে বিদ্রূপ, কত নির্য্যাতন।

অয়ি সভ্যতার আদি লীলাভূমি,
কেন মা তোমার এ কলঙ্ক আজ?
অসভ্য বর্ব্বর নীচ হেয় তুমি
নাহি তব স্থান জগতের মাঝ!!

তোমার রতনে রত্ন প্রসবিনি,
কত লোকে আজি হল ধনবান;
কাঙ্গালিনী তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী,
অন্নবিনে তোর মরে মা সন্তান!

তোমার সভ্যতা তব জ্ঞান ল'য়ে,
কত জাতি আজি সাধিল উন্নতি;
তুমি জগতের পদানত হ'য়ে,
ভিক্ষা ভাণ্ড করে জানাও দুর্গতি।

আজি পরদ্বারে কি পাবি মা বল্?
নিজ দোষে তুই মা গো ধনহীন;
আজি আঁখি বারি মা তোর সম্বল,
শত লাঞ্ছনায় কেটে যায় দিন!

কি ছিল না তোর আপনার ঘরে ?
তোর সম কার ছিল এ ধরায় ?
আজি শত ধারে তোর আঁখি ঝরে ;
মা গো আমাদের বুক ফেটে যায়।

এখনো তো সব যায়নি ফুরায়ে,
এখনো জাগিয়ে হও সচেতন ;
নতুবা বিদেশী নেবে মা কুড়ায়ে,
তোর অঙ্গনের অমূল্য রতন।

—আছে হিমালয় রতন মণ্ডিত,
আছে ভাগিরথী জীবনদায়িনী ;
আছে কোমলতা ভূমিতে সঞ্চিত,
আজিও মা বঙ্গ শস্য-শালিনী।

ওই ভাগ্যদেবী তোমার আকাশে ;
এখনো ছড়ায় কনক কিরণ ;
আর যদি মোহে ছাড় অবকাশে,
চির অন্ধকার—অদৃষ্ট লিখন !

জেগেছে সকলে নবজ্ঞান বলে,
মেলেছে নূতন আলোকে নয়ন,
আর পুরাতনে ধরি বক্ষঃস্থলে
হারাইওনা মাতঃ, কল্যাণ আপন।

কুসংস্কার রূপ উন্নতি জঞ্জাল
ভ্রান্ত লোকাচার, মোহের ছলনা,
তাই নিয়ে মাগো রবে চিরকাল ?
কবে আর তবে জাগিবে বল না ?

আমরা তোমার দীন হীন ছেলে
ডাকি সকাতরে উঠ মা জননি ;
থেকোনা ধূলায় আর অঙ্গ ঢেলে,
পরিহাস করে নিখিল অবনী।

কিছুতেই নাহি চেতনার লেশ।
মা ! মা ! একি গভীর স্বপন !
একি কাল ঘুমে ছেয়েছে নয়ন !
এ নিদ্রার হয়ে ! নাহি বুঝি শেষ !!

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

পৌরাণিক পূজা।

আর্য্য অনার্য্য, মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী মঙ্গলকারী মাতা পিতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা শ্রেষ্ঠ ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় করিয়া থাকেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মাবলম্বী নেতা নীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়,সামাজিক কল্পিত স্বার্থ ও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতা পিতা গুরু আত্মা, তিনিই সারভাব বা সত্য। তাঁহাকে চিনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরণার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন কর, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্তু বোধ হয় না। বস্তু বোধ বিনা জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শান্তি নাই। যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে। যাহার জ্ঞান আছে, তাহার শান্তি আছে।

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়া, বিজয়া, দুর্গা, কালী,

স্বরস্বতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা ঈশ্বর গড আল্লা ও খোদা পরমাত্মা ব্রহ্মা ভগবান প্রভৃতি অসংখ্যনাম কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ অশান্তি ভোগ করিতেছ, সে কি একই ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার নাম? না বহু ইষ্টদেবতার বহু নাম।

শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমাদের যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, দুর্গামাতা ঈশ্বর আল্লাহ প্রভৃতি মিথ্যা না সত্য, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে সকলেরই ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই, অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্পাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। এবং সকলেরই একই ধর্ম্ম মিথ্যা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপ মাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার হন, অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নাম রূপক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, অথবা সৃষ্টি করিতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থূল নাম রূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন, তখন নানা নাম রূপ বোধ হয়, যাহাকে সৃষ্টি বলে। যখন নানা নাম রূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তখন তাঁহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য কর—ইহা সৃষ্টি; আর যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক, তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নির্গুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সত্য ও যাহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ, তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া পূর্ণসর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটী শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত, অপর, প্রকাশ সাকার সগুণ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই। যেমন তোমাদের সুষুপ্তি অবস্থায়।

সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ গ্রহ দেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়া বা দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগল ওঁকার রূপ, সাকার নিরাকার ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড আল্লাহ খোদা, ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা প্রভৃতি নানা নাম কথিত আছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন, তাঁহারই এক কল্পিত নাম বিরাট ব্রহ্ম। তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। যদি থাকেন ত ইহারই অন্তর্গত আছেন।

এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। ইহার চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব স্নান ও পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত, রস নাড়ী। মুখ্য শক্তি বা দেবতা অগ্নি হইতে জীবের ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইতেছে এবং পান আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। প্রাণ শক্তি বা দেবতা বায়ু হইতে জীবের নাশিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহার মস্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের ছিদ্রে শব্দ গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃ—স্বরূপ শক্তি বা দেবতা জীবের মনোরূপে অবিরত সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন "ইহা আমার, উহা তোমার" ইত্যাদিরূপ বোধ জন্মাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীবের মস্তকে চেতনরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশে জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। যখন বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক ও নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন, তখন জীবের জ্ঞানাতীত সুষুপ্তি বা নিদ্রার অবস্থা ঘটে। যে জীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন, সে জীব শুইয়া থাকে। যাহাকে জাগাইয়া রাখেন, সে জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরূপ বা শক্তি হইতে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ইহাঁর কোন একটী অঙ্গ বা শক্তির অভাব বা কার্য্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত্ত কাল থাকিতে বা নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতে

পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে এক ত শরীরই উৎপন্ন হইতে পারে না, অধিকন্তু অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়। সময় মত এক গেলাস জল না পাইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর শীতল ও নিস্তেজ হয়। তখন সেক আদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহির্ম্মুখী অগ্নির দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য্য চলে। বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আকাশের অভাবে শ্রবণ শক্তির বিনাশ। চন্দ্রমা বা মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্য্যনারায়ণের তেজ সঙ্কুচিত হইলে জীবের জ্ঞান লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তোমাদের উৎপত্তি স্থিতি গতির একমাত্র নিদান এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতা পিতা হইতে তোমরা হইয়াছ, তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি না করিয়া, যে নাই এইরূপ কল্পিত মাতা পিতার উদ্দেশে নিষ্ফল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা কতদূর লজ্জা, দুঃখ ও ঘৃণার বিষয়! সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি তোমরা ইহাঁকে বিশ্বাস না করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি কোথায়, কি বস্তু—আমাকে বুঝাইয়া দেখাইয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাহি।

আরও বুঝিয়া দেখ, যদি প্রকাশমান মাতা পিতা গুরু আত্মা সাকারকে পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রকাশ গুরু মাতা পিতা আত্মা নিরাকারকে বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া সাকারকে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান সাকার কর, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণ বা সর্ব্বশক্তিমান হইবেন না। উভয়েই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন হইবেন। কি সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী, কাহারও পূর্ণরূপে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতার উপাসনা হইতেছে না। অপ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়া অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ। মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা ফল ফুল তিক্ত মিষ্ট নানারূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া বৃক্ষ পূর্ণ। এই সকল নাম রূপ গুণের কোন একটীকে ত্যাগ করিলে বৃক্ষের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়া অঙ্গহানি হয়। বৃক্ষরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ। এই পূর্ণভাব জানা ও জানিয়া তাহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়া বিজয়া বলে। অর্থাৎ দুর্গামাতা বা বিরাট পরব্রহ্মের এই দুইটী শক্তির নাম জয়া ও বিজয়া।

পরব্রহ্মের শক্তি বা মায়া বা জয়া বিজয়া, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকারের জয় বিজয়কারিণী। জয়া চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। জীব বা ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয়। বিজয়া সূর্য্যনারায়ণ। নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হওয়াকে বিজয়ার সিদ্ধি জানিবে। বিজয়াতে কোলাকুলী করিতে হয়, ইহার

অর্থ এই যে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত জীব চরাচরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়া পরস্পরের উপকার বা হিত সাধন করেন। বিজয়াতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শনের ভাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্ব্বত্র চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এক অখণ্ডভাবে দৃষ্ট হন। তাঁহার কণ্ঠে নীল আকাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব বা ব্রহ্মকে অভিন্ন একভাবে দর্শন করার নাম নীলকণ্ঠ দর্শন। চরাচর জগৎরূপী বিষকে পান করিয়া অর্থাৎ আপনার অন্তর্গত করিয়া শিব নীলকণ্ঠরূপে বিরাজমান।

ষষ্ঠি সপ্তমী নবমী দশমীতে দুর্গা মাতার পূজা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিকে লইয়া ষষ্ঠির পূজা। ইহার সহিত সূর্য্যনারায়ণকে লইয়া সপ্তমীর এবং জীব বা আত্মাকে লইয়া অষ্টমীপূজা। জীব দেহের নব দ্বারকে নবমী পূজা ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী। দশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া দুর্গা মাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম দশভুজা হইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভুজ দ্বারা চরাচর চেতন অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন, তাহার নাম জয়া বিজয়া ও দুর্গা মাতার প্রকৃত পূজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরূপিণী দুর্গা মাতাকে কামধেনু বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের সমস্ত অভাব মোচন করেন। যতদিন তুমি আছ, ততদিন তোমার ইন্দ্রিয়াদির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন, তত পাইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাক্ শক্তি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি দিবা রাত্র জ্ঞানের কথা কহ বা শাস্ত্র রচনা কর, তাহা হইলেও বাক্য ফুরাইয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বা দুর্গা মাতার দশ ভুজের সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

ইন্দ্রিয়াদি লইয়া নিরাকার সাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার পূজা সমাপ্ত হয়, নচেৎ কখনও কোন মতে দুর্গা মাতার প্রকৃত পূজা হয় না। এই মঙ্গলকারিণী মাতা পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে ব্রহ্মময়ী পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রাম লক্ষ্মণ সীতার বনবাস। লক্ষ্মণ অর্থে জ্ঞান। যাঁহার সমদৃষ্টিরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রাম অর্থে যিনি সর্ব্বত্র রমণ করিতেছেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বা ভগবান। সীতা অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎ জননী, সৃষ্টি পালন-সংহারকারিণী ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। ইহাঁকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক মায়া জানিয়া ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের শক্তি একই, পৃথক নহে। এইরূপ সমভাবে সম্যক দর্শনের নাম সমস্ত দুর্বুদ্ধির সহিত অহঙ্কার রাবণের সদলে মৃত্যু ও সতী সীতার উদ্ধার। পরব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক জ্ঞান করিয়া জগতে কষ্টের সীমা নাই। উভয়কে অভিন্ন একইভাবে দেখিলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহা ধ্রুবসত্য জানিবে। যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা

কিছু নাই, তখন সত্য ব্যতীত মায়া কি বস্তু? ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে একই সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন মায়া, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই দৃষ্টি হয় না।

এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকার বিরাট ভগবান জগতের মাতা পিতা চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীরূপে বিস্তার হইয়াও সর্ব্বকালে এক অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্মেরই একটী কল্পিত নাম গায়ত্রী। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণ ও সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণকে লইয়া চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী। ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাহৃতির অর্থ যে, জ্যোতিরূপ একই বিরাট পুরুষ ওঁকার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া স্বয়ং নানারূপে বিরাজমান। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহারই নাম, উপাসনা ও প্রার্থনা। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ; ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির অর্থ পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ—এই সাতটী।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিতমুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়া অভিমানী সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ সর্ব্বমঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে মায়া বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন ও অপরকে পুড়াইতেছেন। মুখে সকলেই মায়া ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন। কিন্তু ত্যাগ বা মায়া কাহার নাম, সে বিষয়ে বিচার নাই। এজন্য মায়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা একটা সাংঘার আস্ফালনে দাঁড়াইয়াছে। এবোধ নাই যে, যাঁহাকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে প্রকাশমান জীব বা জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাষা সত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময়, এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়াত্যাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তিনিই নামরূপ জগৎ বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই;—জগৎ নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা, তাহা মিথ্যা, ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞের পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, মেঘ, বরফ, ফেন, বুদবুদ, তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে মিশাইয়া যায়, তখনও তাহা জল এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান, তখনও তাহা জল। জ্ঞানী বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন, ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জলই দেখিবেন, অজ্ঞ মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। জলরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ জগৎ বা জীব ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে

প্রকাশমান হইয়াও তিনি নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন—এইরূপ অনুভব হওয়াকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা স্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজে মায়া ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র পড়িলেও পরমাত্মার জ্যোতিঃ স্বরূপের নিকট শরণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে বিরত থাকিলে, কখনই মায়া ত্যাগ বা সে ত্যাগের ভাব বোধ হইবে না—কখনই কোন প্রকারে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ধীর ও নম্র ভাবে যিনি মঙ্গলকারী যথার্থতঃ আছেন, সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর হও। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করা, প্রীতি পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র রাখা, ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আলস্য ছাড়িয়া তীক্ষ্ণভাবে ইঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ও সর্ব্বপ্রকারে হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হও, ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

মনোহরপুকুর, ঢাকুরিয়া পোঃ, কলিকাতা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তরল রজত ধারে দুটী নির্ঝরিণী
বাহিরিল হেসে খেলে প্রফুল্ল প্রভাতে ;
শৈলপথে চলে দুঁহে দোঁহার সঙ্গিনী,
অনুরাগে একসাথে ধরি হাতে হাতে।
নিজ হাতে বনদেবী বুকে দুজনার
পরাইয়া দেন শুভ্রমালা তিলকার।
লুকাচুরী বনচ্ছায়ে, কিম্বা ছুটাছুটি,
কখনো উপল তলে কোঁদল ক্রন্দন,
কিম্বা রবি করে কভু হেসে কুটি কুটি,
কখনো মিলনে হয় সুখ-আলিঙ্গন।
ঐ যায় নির্ঝরিণী ছুটে কলকলে ;
প্রভাত জীবনে সুখ এমনি উছলে।
ছাড়িল পর্ব্বত গৃহ—বাড়িল যৌবন—
নামিল দুজনে ধূলাময় ধরাতলে ;
দুজনা বিভিন্ন পথে করিল গমন।
আপনা তরঙ্গ ভঙ্গে আপনি উছলে।
আপনি বাসক-সজ্জা যখন রমণী,
ভুলে যায় বাল্যলীলা বাল্যের সঙ্গিনী।
নবরাজ্য, নবদেশ, নব শোভা কত ;
নিত্য নিত্য কর্ণে বাজে নব প্রেম ধ্বনি।
বাসনা-তরঙ্গ হৃদে খেলে অবিরত ;
আপনা সম্ভোগ-সুখে বিভোল আপনি।
বাড়ে দিন দূর পথে ; ভাবে মনে মনে :—
"যায়রে যৌবন যায়, রোধিব কেমনে ?"
"একেলা সুদীর্ঘ পথ কেমনে কাটাই ?
"কোথা আমি,কোথা সখী,আজি পথহারা ;
"কার তরে, একাকিনী কোথা লয়ে যাই
"এত যত্নে কাদামাখা বাসনার ধারা ?"
শতেক যোজন দূরে আজি দুইজন,
পথহারা, ডেকে সারা, করিছে রোদন।
দূরে দূরে কর্ম্মক্ষেত্রে এমনি কি হারে
কাটাই যৌবন মোরা ? বসি নিরজনে
পঙ্কিল জীবন-ধারা ধূলার সংসারে ?
স্মরি বাল্যসুখ, যাপি জীবন রোদনে ?
যে যার নির্জ্জন পথে বহিয়া জীবন
একাকী সাগরে দূরে করিব অর্পণ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

একা।

মোরে, কেহ ভালবাসিল না।
যার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
আঁধার হইল আঁখি,

সেও, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া
চলে যায় আঁখি ঢাকি।
কেহ বুঝে না আমার বেদনা;
মোরে কেহ কভু ভালবাসে না।

২

আমি, জানি কি তখন এত?—
এ বিশ্ব মাঝারে সকলি সুন্দর
সকলি সৌরভময়,
কেন, মানুষই কেবল এতই প্রখর,
এতই নিদয় হয়!
হায়, তাপিতের ছায়া সম সেত
অনায়াসে হইতে পারিত।

৩

যা'রে বেঁধেছিনু বুকে বুকে;
য'ার আঁখি জল নিজে মুছা'য়েছি;
ভগ্ন হৃদয় যা'র
যতনে সোহাগে যুড়িয়া দিয়াছি,
বয়েছি দুখের ভার;
হায়, নিজ হাতে যার শুখান মুখে
দিয়াছি গ্রাস; সেওত আমাকে—
কেন, সেওত আমাকে দেখে,
দূরে চলে যায় ভ্রূকুটি করিয়া;
সেওত আমারে বাম;
কাণে হাত দিয়া উঠে যে জ্বলিয়া
শুনিলে আমার নাম।
হায়, সে কথা কহিব কাহাকে?
শুধু মরমে সিহরি চমকে।

৫

হায়, আমার নিশ্বাসে বায়ু
তপ্ত হইয়া উঠিয়া ছুটিয়া
সরি যায় সেথা হ'তে;
আমার চলনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
চাহে, মেদিনী সরিয়া যেতে।
বিধি, কত দিলা মোরে আয়ু?
কত দিলা, অস্থি শোণিত স্নায়ু?

৬

এই, জনতা পূর্ণ ধরা,
আমি যেথা যাই নীরবে সবাই
সরিয়া যায় যে কোথা;
শুনেনা আমারে, কাহারে শুনাই
মর্ম্ম বেদনা, ব্যথা।
আমার পরশে শুখায় মুকুল,
শুখায় সাগর, ভাঙ্গে দুই কূল,
আমি কহিব কা'রে সে কথা।
এই জনতা পূর্ণ ধরা;
আমি পড়িয়া রয়েছি একা একজন,
অর্দ্ধ জীয়ন্ত-মরা।
বিধি, কত দিলা মোরে আয়ু
হায়, কত দিলা মোরে অস্থি মাংস স্নায়ু?

শ্রীশশধর রায়।

প্রার্থনা।

গিয়াছে প্রভাত, গিয়াছে মধ্যাহ্ন,
সন্ধ্যাও নিকটে খাড়া,
ভাবি তাই মনে সাঁঝ ব'য়ে গেলে
কোথা রবে পুত্র দারা!
বেলা নাই ভে'বে সুদূর হইতে
দৌড়িয়া আলয়ে আসি,
জীবনের বেলা অবসান হ'লে
কোথা রবে পুরবাসী!
আমার আমার ধূলি কণা হ'তে
সুবর্ণ কণারে কই,
একবার মনে ভাবিয়া দেখিনা
আমার আমিও নই।
অতিথি সকলে জীব দলে দলে
সংসারে আসিয়া হয়,
গিয়াছে 'যোগেশ' গিয়াছে 'রমেশ'
'মহেশ'ও অমর নয়।
কেহ যায় আগে কেহ যায় সাথে
কেহ পাছে পাছে ছুটে,
সে আনন্দ ধামে যাবার বেলায়
'না' রব মুখে না ফুটে!
যাওয়া ও আসার শুধু অধিকার
সংসারে জীবের আছে,
অতিথিশালার আসবাব হেরে
কেবল আনন্দে নাচে?
হায় ভগবান এমন অজ্ঞান
জীবেরে করিও দয়া,
জীবনের ব্রত হ'লে উদ্‌যাপিত
দিওহে চরণ ছায়া।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺ বনলতা দেবী।*

বনলতা বনদেবি ! কোথা গেলে চলে
না হইতে জীবনের স্বর্ণসুপ্রভাত।
নিশীথে ফুলের সনে খেলে, খেলে, খেলে,
শ্রান্ত দেহে ঘুমে প'ল হেম পারিজাত।
নব উষা কনকের স্নিগ্ধ সমীরণ
না লাগিতে রবিতাপ শরীরে তাহার,
পাপ, তাপে দেহ ক্লিষ্ট না হইতে ক্ষীণ,
না হতে জীবন বেলা গভীর আঁধার,
লয়ে গেল তারে বুঝি দেবতার দেশে
নবোদিত অরুণের সে তরুণ আভা
উজ্জ্বল হইবে আরো দেবের পরশে
জাগিবে নরের মনে সে বিমল প্রভা।
কে আজি সাধিবে তার কর্ত্তব্য সরল,
বঙ্গ অন্তঃপুর মাঝে ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
বসন্তে কোকিল কণ্ঠ নীরব নিশ্চল
হেমন্ত শিশির সনে সে গিয়াছে ঝরে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা।

সিন্ধু।

অবিরত তব বুকে,
বলকি তরঙ্গ উঠে,
কিসের লহরী ছুটে,
বিপুল গর্জ্জনে কারে ডাক শত মুখে ?

নিস্তব্ধ তটতীর,
স্বরগের গীতিলয়ে,
যেন হেথা যায় ব'য়ে
বসন্ত মলয় ঢালি শান্তির মদির।

যেন দেব বালাগণ,
বসি হেথা সারা বেলা,
খেলিছে প্রেমের খেলা,
বিশাল সৌন্দর্য্যে বাঁধি মানবের মন।

যেন সুনীল গগন,
ওপূত সৌন্দর্য্যে মাতি,
চাহিতেছে দিবা রাতি,
সখ্য ভাবে করিবারে প্রেম আলিঙ্গন।

নীলে নীলে একাকার,
দুজনে দুজনে টানে,
দুজনে উন্মত্ত প্রাণে
দেখাইছে সৌন্দর্য্যের মহিমা অপার।

তব ও বিশাল বুকে,
কতকি রয়েছে ঢাকা,
না দেখে যায় না থাকা,
তাই তোতে সারা বিশ্ব ধায় শত মুখে !

তোমাতে বিভল সবে,
রবি শশি তারা দলে,
আনন্দে ডুবিতে চলে,
ডুবিয়া তোমাতে যেন কত সুখী হবে !

যথা যত নদ নদী,
সবাই উধাও প্রাণে
আসিছে তোমার পানে,
ভরসা তোমাতে ডুবে শান্তি পায় যদি।

তুমিও বিভল চিতে,
আশ্রিতের করে ধ'রে,
লতেছ সোহাগ ভরে,
আমাকে কি বিন্দু ঠাঁই পারিবে গো দিতে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

নিদ্রিত।

সংসারের শ্রম-ক্লান্তি, অবসাদ নিয়ে
ধরণীর স্নিগ্ধ বুকে পড়েছে ঘুমিয়া,
আসে নিশি বিষাদিনী,—শিয়রে বসিয়ে,
নীরবে ঝরিছে অশ্রু কপোল বাহিয়া ;
গাহেনা বিহগ সেথা—দূর নীলিমায়,
নত শিরে, চেয়ে চেয়ে নীবরে মিশায় ;
চুপি চুপি, ধীরে ধীরে বহিছে তটিনী
ঘেরিয়া তাহার সেই শ্যামল কানন,
নীরবে ফুটিছে ফুল, নীরবে চাঁদিনী
গগনের কোলে হাসে, বহে সমীরণ।
নীরবে বিলাপ গাথা, গাছে সে কাহিনী
পশিয়া কাতর করে তাহার শ্রবণ ;
নিদ্রিতা ধরার বক্ষে লাবণ্য-কুসুম
ভাঙ্গিওনা কেহ তার বিশ্রামের ঘুম।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

---

* অন্তঃপুর নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীর মৃত্যুতে কবিতাটি লিখিত হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৭। আমিষ ও নিরামিষ আহার।—শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। মহিলারা শিক্ষালাভ করিয়া বিলাসিনী হন, অশিক্ষিত লোকের এইরূপ ধারণা। আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী সম্রান্ত-বংশে সমুদ্ভূতা, ধনবানের দুহিতা, ধনবানের বনিতা, সুশিক্ষিতা, পুণ্য-সম্পাদিকা, অথচ তাঁহার মত সুগৃহিণী অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে বিভিন্ন রন্ধনীয় সমাবেশ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আপন অভিজ্ঞতা মিলাইয়া "আমিষ ও নিরামিষ আহার" রচনা করিয়াছেন। রন্ধন সম্বন্ধে আরো দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সে গুলি পুরুষের রচনা, গ্রন্থকারেরা কেহ স্বহস্তে রন্ধন করিতে জানেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। ইংরাজি গ্রন্থ দেখিয়া, পাচক ও বাবুর্চির নিকট শুনিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। "আমিষ ও নিরামিষ আহারের" নূতনত্ব এই যে, ইহার ব্যবস্থাপিত কোন কথাই অনুমান করিয়া বা শুনিয়া লেখা হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্রী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে খাওয়াইয়া সকলের সুখ্যাতি লইয়া তবে ব্যবস্থা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা দু একটী আহার্য্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া সুখী করিতে ও সুখী হইতে অভিলাষিণী হন বা পাচককে শিখাইয়া সুপাক করিতে চান, তাঁহারা প্রজ্ঞাসুন্দরীর আমিষ ও নিরামিষ আহারকে অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করিবেন। প্রণয়িনীকে প্রীতি উপহার দিবার এ গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশে এমন "বিলাত বাঁধান" এখন হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না। বাঙ্গালা বই এমন সুন্দর বাঁধান আমরা আর দেখি নাই।

মহিলা বিদ্যালয় সকলে পাকপ্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত আমিষ ও নিরামিষ আহার মহিলা বিদ্যালয়ের এবং অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা সকলের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

১৮। An Appeal for Mass Education. বারাসতের অধীন তেঘরা একটী সামান্য পল্লীগ্রাম। এই গ্রামে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা হইতেছে। বিধাতার কৃপায় দীর্ঘকালের চেষ্টায়, স্কুলে এবং রজনী বিদ্যালয়ে ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ১৮ জন বালিকা ভর্ত্তি হইয়াছে। কৃষি, শিল্প এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বাবু শশীভূষণ রায়চৌধুরী একজন আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় এই স্কুলটী কোনরূপে চলিতেছে। শশী বাবু একজন দরিদ্র ব্যক্তি; তাঁহার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু অর্থ নাই। সৎ ইচ্ছার সহায় ভগবান। তাই অশেষ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্য দিয়াও স্কুলটী চলিয়া আসিয়াছে। দরিদ্র, নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের মুখের দিকে তাকায়, এ জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। যেরূপ ভাবে শশীবাবু এই স্কুলটী চালাইতেছেন, তাহা পাঠ করিলে চক্ষে জল আইসে। ছাত্রদের বেতনে মাসে ৫৲ কি ৬৲ টাকার অধিক হয় না। বালিকাদিগের এবং অনেক ছাত্রের বেতন দেওয়া দূরে থাকুক, পুস্তকাদিও দিতে হয়। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড মাসিক ৮৲ সাহায্য করেন। ওয়েসলিয়ান ফণ্ড মাসিক ১৷৷০ দেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসিক ৫৲ দেন এবং চাঁদায় মাসিক ৪৲ আদায় হয়। এই আয় দ্বারা স্কুল কি চলিতে পারে? এই জন্য উদ্যোক্তা ঋণে ডুবিয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাধারণের সাহায্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যাঁহারা টাকার সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান উপস্থিত। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল, নানা সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, মহোদয়ের নিকট পাঠাইবেন।

১৯। **শ্রীঅদ্বৈত-বিলাস**।—প্রথম খণ্ড। শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক গ্রথিত। মূল্য ১৶০ আনা। ভারতমিহির যন্ত্র। ঈশার সহিত বাপটিস্টাখ্য যোহনের যে সম্বন্ধ, চৈতন্যের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যেরও সেই সম্বন্ধ। চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর তমোময় নবদ্বীপে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের অগ্রদূতরূপে অদ্বৈতাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহারই পুণ্য চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থে অবশ্য অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু সে সকলে যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারাও ইহা পাঠে কৃতার্থ হইবেন। কি জাতির ইতিহাস, কি ব্যক্তির ইতিহাস, আখ্যান-পরিপাটাই ইতিহাস-গ্রন্থের প্রাণ স্বরূপ। দুই চারিটী স্থান ছাড়া, বীরেশ্বর বাবুর আখ্যায়িকাও গঙ্গা স্রোতের মত চলিয়াছে; কোথাও প্রতিঘাত নাই—সর্ব্বত্রই তরস্বী, বলিষ্ঠ, মঙ্গল্য, মধুর। আমরা এ গ্রন্থের অন্তিম খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

২০। **আঁখি জল**। প্রকাশক শ্রীমৌলবী আবদুল গণি। ঐ যন্ত্র। মাটিয়া বুরুজ। বলা বাহুল্য, এখানি কবিতা পুস্তক। কবিতার একটা নমুনা দিই—

> ঘুরে ফিরে ফুলের ধারে
> যেমন যায়, চড় মারে মুখে।

তাই উচিত শাস্তি বটে। পুস্তকখানির ছাপা বড় সুন্দর; মূল্য কত, লেখা নাই।

২১।২২।২৩।২৪। **কাব্য-প্রসূন**, ১ম ভাগ। মূল্য ৵০ আনা। অশ্রুমালা, মূল্য।৵০ আনা। মালা। মূল্য ৵০ আনা। অঞ্জলি, ১ম খণ্ড। মূল্য ৵০ আনা। চারিখানিই কবিতা পুস্তক, চারিখানিই আবার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। কাব্য প্রসূন স্কুল-পাঠ্য পুস্তক, ছোট ছোট শিশুগণের পক্ষে অনুপযুক্ত নহে। অশ্রু মালার "প্রথম অশ্রু" হইতে "পঞ্চম অশ্রু" পর্য্যন্ত প্রত্যেক অশ্রুর কপালে গ্রন্থকারের স্বরচিত এক একটী পদ্যময়ী মটো এবং মধ্যে যাহা যাহা থাকিবার, তাব সকলই আছে। তথাপি কিন্তু এ কাব্যের চেয়ে ইহার ভূমিকা পড়িয়াই আমরা বেশী সুখ লাভ করিয়াছি। ইহাকে অরসিকতাই বল আর নিষ্ঠুরতাই বল, স্বীকার করিতে আমাদের লজ্জা নাই; কেন না কাব্যের এমন কৌতুককর ভূমিকা আমরা দুই চারি দশ বৎসরে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, দেখিলাম আর মজিলাম—গ্রন্থকার মহাশয়ের "জ্ঞাতসারে ঠিক এইরূপ দুইটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই।" বলিতে কি, "তাঁহারা অদ্যাপিও জীবিত আছেন!" দ্বিতীয়তঃ; "কাহাকেও ভালবাসিলে তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়, ইহাই নিয়ম;" কিন্তু গ্রন্থকার তাহার বিপরীত "চাক্ষুষ" করিয়াছেন। এক বিজ্ঞ "বাস্তবিকই যাহাকে ভালবাসেন, তাহার সহিত বিবাহ হওয়ার কথায় দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।" পুনশ্চ, ঐ বিজ্ঞ "প্রেমিক অবিবাহিত থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" তৃতীয়তঃ, বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে—কথাটা মিথ্যা না। কোনও প্রেমিকের ভালবাসা "ক্রমান্বয়ে এগারটী বালিকার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সকলকেই তিনি হারাইয়াছেন। আরও কিন্তু, "তিনি এখনও জীবিত, কিন্তু উন্মাদরোগগ্রস্ত।" গ্রন্থকার এ তিনটী ছাড়া "আরও অনেক সংসার পতঙ্গকে বহ্নিদগ্ধ" হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু "বিশেষ কারণ বশতঃ" পতঙ্গ গুলির ইতিহাস দিতে না পারায় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা যেটুকু পাইয়াছি, তাহাতেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। মালা ও অঞ্জলি, এই অশ্রু মালারই সহোদরা ও সহোদর। অঞ্জলির সবে ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে!

২৫। **চামেলী**।—কবিতা পুস্তক। ভূমিকা, সাময়িক কবিতা ও পরিশিষ্ট সহ। শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্র। মূল্য।০ আনা। ভূমিকায় অনেক-

জ্যাণ্ডুয়ার গম্বাগারধ্বংস আছে, ভিস্থভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত আছে, Divide and Rule নীতির কথা আছে; পরিশিষ্টে রঙ্গপুরের ভূমিকম্প আছে; কবিতায় পবিত্র প্রেমের পৌনঃপুনিক উচ্ছ্বাস আছে। সব আছে, কিন্তু চামেলীর সে গন্ধ কই?

২৬। কবিতা-কুঙ্কুম।—শ্রীশ্যাম লাল বসাক এল, এল প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। মহানন্দ প্রেস। এ পুস্তক খানিতে অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন আছে, কিন্তু কাব্যের নিশানা খুঁজিয়া পাই নাই।

২৭। কাব্যামৃত—১ম খণ্ড।—শ্রীকানাইলালনাগ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের সহিত সাত জন্মেও যার পরিচয় নাই, তার কাব্য যেরূপ হইতে পারে, কাব্যামৃতও সেইরূপই হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এব ের, সমালোচ্য সকল কবিতাপুস্তক গুলিরই ভূমিকা মনোহর। কাব্যামৃতের গ্রন্থকার বলিতেছেন, "যদি পাঠক তাহার কবিতা পাঠে কিঞ্চন্মাত্র সন্তোষলাভ করেন, তবে সে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সাহসিক হইবে।" কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত নিবেদন করি, এ অসম সাহসে আমরা তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু "২য় খণ্ড সে একটী বিষয় লইয়া লিখিবে, ইচ্ছা করিয়াছে।" তবুও না।

২৮। বিষাদ সংবাদ।—শ্রীভগবানচন্দ্র দাস প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। রাজসাহী তমোঘ্ন যন্ত্র। এ গ্রন্থের অধিকাংশই ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিত কীর্ত্তনে মণ্ডিত। কিন্তু কাব্য খানি শুধু রাজ প্রশস্তি নয়, ভূমিকম্প প্রশস্তিও বটে; কেননা, বিগত মহাভূকম্পের বিষয়েও একটা লম্বা কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বিষাদ সংবাদের মধ্যে আবার একস্থানে ঘোড়া, গরু, হাতী ও জাহাজের সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৺ রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর "উইলের বিচার" ও "সম্পত্তির আয়" প্রভৃতি মনোহর প্রস্তাব সকল কবিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে!

২৯। সঙ্গীত-কুসুম।—২য় খণ্ড-শ্রীরামজয় বাগছী প্রণীত। জয়ন্তী প্রেস। এই বৃহৎ পুস্তক বিবিধ বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ। বোধ করি, বলা বাহুল্য, ইহারও একটা ভূমিকা এবং একটা পরিশিষ্ট আছে। ভূমিকায় জীবিত গ্রন্থকারের জীবনচরিত ও পরিশিষ্টে সমালোচ্য গ্রন্থের ৩১ খানি সার্টিফিকেট প্রকাশিত হইয়াছে।

৩০। আবেগ।—মূল্য ১৲ টাকা। হরসুন্দর মেসিন প্রেস। আবেগ কোনও অপ্রকাশিত নাম্নী রমণীর রচিত গীতি কাব্য। যার বাড়া শোক আর অবলা জাতির সম্ভবে না, লেখিকাকে সেই শোকে ক্লিষ্টা বলিয়া বোধ হয়। নারীর প্রতি শ্বাসে যেন একটা স্তম্ভিত হাহাকারের পুটপাক হইতেছে।

শান্ত নদীবক্ষ মৃদুল বাতাস
 কেঁপে কেঁপে অতি বহিছে ধীরে।
সুদূর গগনে সার দিয়ে পাখী
 আঁকা বাঁকা পথে যেতেছে নীড়ে।

এতো শুধু বহিঃ সন্ধ্যার নয়, এ কবির মানসী সন্ধ্যারও চিত্র বটে। প্রদোষ তিমিরে বিগাহমানা ঐ পক্ষিণীর মত, আত্মার ঘোরা তমিস্রায় হাহা রবে তপস্বিনী নষ্ট নীড় অন্বেষণ করিতেছে। আবেগ সর্ব্বত্রই শোকাগ্নিশুদ্ধ, অতএব নির্ম্মল। ইহার স্থলে স্থলে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্যেরই আস্বাদ পাইয়াছি। লেখিকা অপরিপক্কা হইলেও মনস্বিনী, সন্দেহ নাই।

৩১। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। কাইসর মেসিন যন্ত্র। সুকবি এবং সাধক পুণ্ডরীকাক্ষের মধুর কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে, তাঁহাকে হারাইয়া ভক্তিপিপাসু মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার অভাবের শীঘ্র পূরণ হইবে না। আমরা সেই পথে, সেই ভাবে কালীনাথ ঘোষকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। সঙ্গীত শিক্ষা এবং সাধনায় কালীনাথ এখনও অনেক পশ্চাতে, কিন্তু ভাবে, বুঝিবা, কালীনাথ পুণ্ডরী কাক্ষের

সমতুল্য ব্যক্তি। ভাবের উচ্ছ্বাসে পুণ্ডরীকাক্ষের চক্ষের ধারা বহিত, কালীনাথের ভাবের উচ্ছ্বাসেও তেমনি হয়। রামপুরহাটের উৎসবে যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত, ভাব-বিহ্বল পুণ্ডরীকাক্ষ উপাসনায় বসিয়া গান গাইলেন—

"বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,
আমি নিদারুণ লাজে মরি,
আর ডেক না, ডেক না।"
কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয়েছে।
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি
সখা বলে ডাক তার হে। (একি ভালবাসা)
যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি
দেবদুর্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে।
(অবাক্ হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন,
তোমার প্রেমের রীত,
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে
সাধিয়ে কর সুহৃদ্।
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু)
আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে
কেন ডেকে পাগল কর মোরে।
(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)

এই সঙ্গীতে অশ্রুপাত হয় নাই, এমন লোক আমরা দেখি নাই।

কালীনাথও যখন ভাবে বিহ্বল হন, তখন তাঁহার গানে অশ্রুপাত হয় না, এমন লোকও বিরল। পুণ্ডরীকাক্ষের গানের ন্যায় একটী গান এই—

তবু ঘুম ভাঙ্গে কই!
(তুমি এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ,
আমি শুনেও বধির হই।
(তুমি) প্রতি পরীক্ষায়, প্রতি ঘটনায়
কত না ডাকিছ জাগাতে আমায়,
(আমি) দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না,
জাগিয়া ঘুমায়ে রই। ইত্যাদি

পুণ্ডরীকাক্ষের অকৃত্রিম গুরু ও শিষ্য, সুগায়ক বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কালীনাথের গান অতি সুন্দর, অতি মিষ্ট, অতি মধুর। আমরাও বলি, অতি সুন্দর এবং অতি মধুর। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, কালীনাথ দীর্ঘজীবী হউন।

৩২। গীত-মালা। ১ম,২য় ও ৩য় ভাগ, শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণিত, মূল্য ১৲ মেটকাফ প্রেস।

সংসার-মরুতে মানবের শুষ্ক প্রাণে শান্তি-ধারা বর্ষণ করে, একমাত্র সঙ্গীত। সঙ্গীতে রোগ-কষ্ট যায়, শোক যায়, অশান্তি যায়, বিপদ যায়, দুশ্চিন্তা যায়। সঙ্গীত এই মর্ত্ত্যে অমিয়ধারা। বাল্যকাল হইতে কত সঙ্গীত শুনিয়াছি, কত সঙ্গীত ভুলিয়াছি—কত শান্তি পাইয়াছি, কত শান্তি হারাইয়াছি; কিন্তু কোন কোন সঙ্গীত জীবনের চিরসঙ্গী হইয়াছে—তাহারা চিরকালই শান্তি বর্ষণ করিতেছে। মানবপ্রাণে এই রূপ চির উৎস খুলিয়া দিতে পারেন যাঁহারা, তাঁহারা মানব, না দেবতা? আমি কতবার ভাবিয়াছি—তাঁহারা মানব নহেন, দেবতা।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, এই বঙ্গে সেই দেবপদবাচ্য। কেননা, তাঁহার কত সঙ্গীত কত জনের জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে। দুই চারিটী নমুনা এই—

১। "তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখার আকার।" ইত্যাদি
২। "ভেবে দেখি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
ইত্যাদি
৩। "ওরে, আমার মন ভুলা'লে যে, কোথায়
আছে সে।"
৪। "তরু বলরে বল ও তরু বলরে
কে তোরে সাজালে দিয়ে গায়ে গায়ে
পত্রপুষ্প ফল রে।"
৫। "এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।"
ইত্যাদি—

বেচারাম বাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন,—আর যে দীর্ঘকাল এই ধরায় থাকিবেন, বোধ হয় না। তাঁহার পুণ্যময় জীবনের এই মধুরধারা বঙ্গের ঘরে ঘরে অক্ষয় অমিয়ধারা রূপে চিরপ্রবাহিত হউক।

৩৩। Songs to Myrtilla and other Poems. By Aurobind Ghose. Barada, Lakshmi Vilas Printing Press.

এই গীতি কাব্যের রচয়িতা প্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন ৺ কৃষ্ণধন ঘোষের প্রসিদ্ধ পুত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। বাঙ্গালীর রচিত এক উজন বাঙ্গালা কাব্যে যাহা পাইলাম না, বাঙ্গালীর রচিত এই ক্ষুদ্র ইংরেজী কাব্যে

তাহা পাইয়াছি। এমন মধুর, মধুমাদিনী, মোহকরী গীতি অনেক দিন শুনি নাই। এ কাব্যে বিরহ নাই, শুধু সম্ভোগ——শুধু crimson kisses, crimson pleasures, ——"মরণের তটপ্রান্তে বসি' জীবনের একান্ত সম্ভোগ," তেমনই সম্ভোগ। অরবিন্দের কাব্যে কেবলই মধু। রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, সকলে সমস্তাৎ মধু আহরণ করিতেছে—

Behold the rose her lovely birth,
What fires from the bud proceed,
As if the vernal air did bleed.

* * * *

The wide-world perfumes when she sighs
And burning all the winds, of love she dies.

* * * *

....·· unseen and near
The windlark gurgles in the golden leaves

অরবিন্দ মধু পান করিতেছেন—

* * * *

Emparadised in odours.....................

* * * *

In odorous gloom of trees...... ....

* * * *

In thy bosom's snowwhite walls
Softly and supremely housed

* * * *

Ruby-guided through a kiss
To the Sweet highways of bliss.

এত নেশা, তবু সে ছাই স্মৃতিটা যায় না—

'Are we more than summer flowers ?
Shall a longer date be ours,
Rose and springtime, youth and we
By the everlasting sea ?

যাইতে হইবেক ?যাবে—সে তো অনেক দিনই জানি—

.... as one who tasted all
Life's honey and must now depart
A broken prodigal from pleasure's mart..

তবে তাই হোক্—

With thy kisses chase this gloom
Thouhts, the children of the tomb.
Kiss me, Edith, soon the night
Comes and hides the light.

এমন মধু, এমন আনন্দ, এমন মোহ আমরা Keats এর কাব্য ছাড়া আর কোথাও পাই নাই। কিন্তু Keats এর আনন্দের মত এ আনন্দও ঐন্দ্রিয়িক, ঐহিক নাস্তিকতাগন্ধি। ঐহিক, তাই এ আনন্দে ভয় আছে—tomb এর নামে, night এর নামে শিহরিতে হয়। যাহা ঐহিক মাত্র, তাহাতে মানুষের ক্ষুধা মিটে কই ? যে আনন্দে ভয় নাই, যে আনন্দের ক্ষয় নাই, এ কাব্যে আমরা সে আনন্দের দেখা পাই নাই। অরবিন্দের কাব্যের অভাবও এই, কলঙ্কও এই। আর একটা কথা। নব্য-ভারতের অনেক পাঠকই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যিনি কেমব্রিজের Classical tripos যে অপার লাটিন গ্রীক সাহিত্যসাগর অগস্ত্য গণ্ডূষে পান করিয়াছেন, তিনিও মধুসূদন দত্ত আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভুলিতে পারেন নাই। এই ক্ষুদ্র কাব্যে মধুসূদন সম্বন্ধে একটী এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটী কবিতা আছে। বঙ্কিম সম্বন্ধে কবিতা দুইটীর দ্বিতীয়টীর উপসংহার এই—

He sowed the desert with the ruddy-hearted rose,
The sweetest voice that ever spoke in prose.

অরবিন্দের অমৃতবাণী নিখিল বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

৩৪। পারিজাত হরণ নাটক।—মণিকা প্রেস। শ্রীরামচন্দ্রনাগ প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা। পারিজাত হরণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, ইনি নাটক নহেন, যাত্রা। ইহাতে আত্মারাম আছে, বাঞ্ছারাম আছে, শ্রীকৃষ্ণ আছে, নারদ আছে, ভক্তিরাম আছে, গরুড় পক্ষী আছে। অধিকন্তু, ইহাতে স্বয়ং সর্ব্বংসহা পৃথিবী আছেন। তবে আর চিন্তা কি ?

৩৫। রমা-নাটক।—সেরিডান্ কর্ত্তৃক অনূদিত কোনও জর্ম্মান নাটকাবলম্বনে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আনা। প্রেসের নাম নাই। সাহিত্য সেবক সমিতি, ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট। দুই একটা ঘটনা এমনি আশ্চর্য্য যে, রমা Romance, রসিকতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ; স্বদেশহিতৈষিতা, বক্ষে ছুরিকাঘাত ও কান্তে অকান্তে গীত প্রভৃতি থিয়েটরে অভিনীত খাসা খাসা নাটক গুলির সকল গুণে ভূষিত হইলেও নাটক নহে! বস্তুতঃ গ্রন্থকার কাব্য ছাড়িয়া আর কিছু ধরিলে আমরা দুঃখিত হইব না।

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র। (২)

স্মারকাঙ্কনের সর্ব্বাদ্যস্তর—পদার্থগত নিদর্শন—অত্যন্ত আদিম ও অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। ইহার ভগ্নাবশেষ আজও কোনও কোনও স্থলে, কিছু কিছু, বিদ্যমান আছে। যেমন, বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন দ্বারা, কোনও কথার বা বিষয়ের স্মৃতি আকর্ষণ। পরন্তু ডোর বা সূত্রে, বিবিধ বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্রন্থি দ্বারা, গণিতাঙ্কের সংস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের বিজ্ঞাপনার্থে, লিপিকরণ। পুনশ্চ, দণ্ডে দাগ কাটিয়া, হিসাবাদির রক্ষণ প্রথাও এই প্রথম স্তরের স্মারক লিপি। বহুকালের কথা নয়, এ প্রথা বৃটিশ পার্লীমেণ্টে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশের পল্লী গ্রামাঞ্চলে, অদ্যাবধি, এই দাগ-কাটা-প্রথা, দুগ্ধ ও তৈলাদির হিসাব রক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে, পেরু রাজ্যে, এই প্রকার পদার্থ-লিপি প্রবল প্রচলিত ছিল। রাজ কার্য্যের যাবতীয় ব্যাপার এবং পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-পত্র প্রভৃতি, সূত্র-গ্রন্থির লিপি এবং তদনুরূপ কড়ি-ছড়া, পলাকাটি ও স্ফাটিক মালার স্মারক লিপিতে, সম্পাদিত হইয়া, রক্ষিত হইত। অন্যান্য পদার্থ, ও পদার্থের প্রতিরূপও এবম্বিধ লিপি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বহুকালের কথা নয়, পেরু প্রভৃতি রাজ্যের দপ্তর খানায় এইরূপ গ্রন্থি ও পদার্থাদি রূপ, অক্ষরে লিখিত, পুরাতন সন্ধি পত্রাদি, প্রাপ্ত হইয়া রহস্যাভিজ্ঞ লোক দ্বারা পঠিতও হইয়াছিল।

তৃতীয় স্তরের সাঙ্কেতিক চিত্র বা চিহ্নের লিপি, দ্বিতীয় স্তরের চিত্র-লিপি হইতে উদ্ভূত বা বিকাশ প্রাপ্ত বলিয়া, কথিত হইলেও প্রথমোক্ত শেষোক্তের উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ, সঙ্কেত অজ্ঞাত হইলে, সাঙ্কেতিক চিত্রে বা চিহ্নে অঙ্কিত লিপি আদৌ অস্পষ্ট, অপাঠ্য ও অবোধ্য হয়। পক্ষান্তরে, চিত্র-লিপি স্বভাবতই সুস্পষ্ট এবং সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই সহজ পাঠ্য ও সহজ বোধ্য বটে। এমন কি, অজ্ঞ নিরক্ষরদিগের পক্ষে, বা বিশেষ বিশেষ অক্ষরাবলীতে অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষে, শব্দ-লিপি অপঠনীয়; কিন্তু, চিত্র লিপি অনায়াসে বা অল্পায়াসে পাঠ্য। চীন ও জাপানী প্রভৃতি ভাষায়, শব্দাত্মক অক্ষরের সহিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন-লিপি এবং চিত্র-লিপি, অদ্যাবধি একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের মনোভাবের বিশিষ্ট ও বিচিত্র ব্যক্তাবস্থাই সাহিত্য। সাহিত্যকে সপ্রকাশ, ধারণ ও রক্ষণ করে, শব্দাত্মক ভাষা ও বর্ণই, সর্ব্বপ্রধান উপায় বা একমাত্র উপযুক্ত উপায়। উপরি উক্ত অন্যান্যবিধ ভাষা ও স্মারক-লিপি, তাহার কথঞ্চিৎ উপায় হইতে পারিলেও, সে উপায় সকল অপ্রচুর, অস্পষ্ট, অনুপোযোগী ও একান্ত অসুবিধাকর। তথাচ, শব্দাত্মক ভাষা ও ধ্বন্যাত্মক বর্ণের অবিদ্যমানে, মনুষ্যের চিন্তা ও মনোভব ও তাহাদের অভিব্যক্তি বদ্ধ থাকিতে পারে না। অতএব তদর্থে অপরাপর উপায় অবলম্বন করে।

সুসভ্য জাতি নিচয়ের মধ্যে, সাহিত্যের ন্যায়, চিত্র-শিল্পও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু, উহার বহু পূর্ব্বেও, অসভ্য অরণ্য-বাসীদের মধ্যে, চিত্র-শিল্পের অনুশীলন

ছিল। সে চিত্র—সে শিল্প, তাহার অনুশীলনকারীদিগের মত, অবশ্য আদিম অবস্থাপন্ন, ও নিপুণতায় নিকৃষ্ট রকমেরই ছিল। তা, যেরূপই হউক, চিত্র চিত্রই বটে। তাহাদের মধ্যে, চিত্র কেবল শোভন-শিল্প মাত্র ছিল না; তাহা অপেক্ষাও অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয়—চাক্ষুষ ভাষা ও ভাষার স্মারক লিপি স্বরূপ চিত্র-লিপি ব্যবহৃত হইত। অরণ্য-চারী, গুহাবাসী মনুষ্যগণ তাহাদের মনের কঠিন, কোমল ভাব নিচয়, তাহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, বীরত্বের উৎসাহ, প্রাণের কাব্য-কলা, চিত্র-পটে প্রকাশিত করিত এবং চিত্র লিপিতে অঙ্কিত করিয়া রাখিত। তাহার ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ এখনও পর্যটকদিগের নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে। জাতীয় ইতিহাস, জীবনচরিত, যুদ্ধকাহিনী, যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণ, মৃগয়া-বৃত্তান্ত, প্রণয়-কাহিনী, প্রণয়-পত্র, প্রণয়-সঙ্গীত প্রভৃতি আদিম মনুষ্য-জীবনের বিবিধ বিষয়ক বৃত্তান্ত, চিত্র লিপিতে, প্রকাশিত হইত। এই প্রকৃতির চিত্রের আদর্শ, আহরিত হইয়া, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ নিচয়ে সময়ে সময়ে, প্রকাশিতও হইয়া থাকে।

এখন কথা এই যে, মনুষ্যের মনোভাবের ব্যক্তাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থার বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতাই যদি সাহিত্য হয়, তবে এই চিত্রাদিকেও সাহিত্য বলি না কেন? চিত্রাদিতেও ত মনুষ্যের মনোগত ভাব সময়ে সময়ে, বিশিষ্টরূপে ও বিচিত্র ভাবে বিবৃত হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট চিত্রে, মনোভাবের অশরীরী মূর্ত্তি, যখন সশরীরে, সজীব ভাবে, অঙ্কিত হয়, এবং সে মূর্ত্তি নিরক্ষরেও চিনিতে পারে, তখন উৎকৃষ্ট চিত্রই ত উত্তম সাহিত্য।

না, তাহা নয়। তাহা হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট চিত্র,—উত্তম শিল্প;—সাহিত্য নয়। মনুষ্যের মনোভাব-ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পও কার্য্য করে। এবং তাহাদের সে কার্য্য, বিশিষ্ট, বিচিত্র এবং সুন্দরও বটে, পরন্তু, সে কার্য্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যও বটে। তথাচ, শিল্প শিল্প ভিন্ন সাহিত্য নয়। কেন? সে বিচার আর এখানে করিতে বসিব না। ইঙ্গিতে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শিল্প সাহিত্য নয় এবং সাহিত্য শিল্প নয় বলিয়াই, শিল্পের নাম শিল্প ও সাহিত্যের নাম সাহিত্য হইয়াছে। এই এক মাত্র নামকরণেই, উহাদের স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা ও স্বভাব সূচিত হইতেছে।

সূক্ষ্ম শিল্পের কার্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং কার্য্য-ক্ষেত্র, মনুষ্যের ভাব-রাজ্য। সাহিত্য বিশেষের কার্য্য এবং কার্য্য-ক্ষেত্রও তাই। অতএব শিল্পের এবং সাহিত্যের কার্য্য এক হইতে পারে; কার্য্যক্ষেত্রও এক হইতে পারে। শিল্প এবং সাহিত্য একই সাধারণ ভূমিতে, একই সাধারণ কার্য্যে, নিযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু, সে কার্য্যের উপাদান, উপকরণ, ও উপায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পুনশ্চ, সে কার্য্যের প্রকৃতি ও নীতিও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই শিল্পে ও সাহিত্যে সবিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কেবল তাহাই নয়; কার্য্যের উপাদান উপায়াদি ভেদে শিল্পে শিল্পেও পার্থক্য রহিয়াছে।

সাহিত্যের বাহ্য উপকরণ শব্দাত্মক ভাষা ও ধ্বন্যাত্মক বর্ণ। সাহিত্য শিল্প নহে,—শিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। তবে, সাহিত্যের অন্যতর উপকরণ অক্ষর—অক্ষরের অবয়ব শিল্পজাত বটে। এ হিসাবে,

শিল্প সাহিত্যের সহায়তাকারী। কেননা, ভাষার স্থায়, বর্ণের বিরহেও সাহিত্য—বিশেষতঃ সাহিত্যের সংবর্দ্ধন ও সংস্থিতি অসম্ভব।

সাহিত্যে, শব্দাত্মক ভাষা যেমন, ভাষায় ধ্বন্যাত্মক অক্ষর তেমনি, অবশ্যম্ভাবী। পুনশ্চ সাহিত্যকে ধারণার্থেই, ভাষার অক্ষর বাহন অনিবার্য্য। অতএব,সাহিত্য-সংগঠন কার্য্যে, অক্ষরের অংশ অত্যল্প নহে, উপেক্ষনীয়ও নহে।

অক্ষর সাহিত্য-শরীরের এক প্রধান উপাদান। সঙ্কেতাক্ষর বা চিত্রাক্ষর উপযুক্ত উপাদান নহে। ধ্বন্যাত্মক বর্ণাক্ষরই সাহিত্যের শরীরোপযোগী-উপাদান। এবং সে উপাদান ব্যতীত সাহিত্যের শরীর সম্যক সংগঠিত হইতে এবং সম্যক সচল থাকিতে পারে না।

সাহিত্যের ইংরেজী নাম "লিটারেচার" (Literature)। এই নামটীই অক্ষর মূলক এবং বক্তব্য বস্তুর বাহ্যাবয়বের সবিশেষ উপযোগী-ভাবে নির্ব্বাচিত। Literature শব্দ Letter শব্দ হইতে উদ্ভূত। Letter অর্থে অক্ষর এবং ধ্বন্যাত্মক অক্ষর। (Letter) "লেটার বিরহিত "লিটারেচার"—বর্ণাক্ষর বিহীন সাহিত্য স্বভাবতই অসম্ভব।

ইংরাজী Letter শব্দ, ফরাশী Letter হইতে আগত। উহার মূল ধাতু লাটিন Litum ; অর্থ—অঙ্কিত করা ;—to daub, to besmear. অতএব Letter অর্থে অক্ষর,—অঙ্কন বা আলেখ্য। অঙ্ক বা আলেখ্য কিসের? না, শব্দের বা শব্দাংশের।

শব্দ কি ?

শব্দই ধ্রুব। শব্দে ভাব। শব্দে ভাষা। শব্দেই সাহিত্য। ভৈতিক পদার্থের ও মানসিক চিন্তার—যুগপৎ দুয়েরই প্রতিনিধি শব্দ। শব্দ 'কর্ণ-চিত্র'। শব্দ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নিচয় বুঝাইয়া, অন্তরেন্দ্রিয়গত ভাব-পুঞ্জের ব্যাখ্যা করে। শব্দ প্রকৃতির আলেখ্য ;—স্বভাবের সহিত এক সূত্রের গাঁথা। মনুষ্য জাতির ক্রম-বিকাশ ও অতীত ইতিহাস, তাহার শব্দাভিধানে—প্রত্যেক শব্দের অভ্যন্তরে, অঙ্কিত রহিয়াছে। শব্দে অতীতের সাক্ষী, বর্ত্তমানের উপদেষ্টা ও উত্তেজক,ভবিষ্যতের পরিচালক। শব্দে অতীতের ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত, বর্ত্তমানের বিভূতি বিঘোষিত; শব্দের ভবিষ্য সম্প্রসারণ ও সম্পদ অপরিমেয়। শব্দ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সংযোগ-সূত্র ; অতীতকে বর্ত্তমানের সম্মুখে, শব্দেই আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। শব্দ অক্ষয় অমর রূপে, জীবিত থাকিয়া, সুদূর য়ুরোপ আমেরিকার সহিত আসিয়ার ইণ্ডিয়ার ভগ্নী সম্বন্ধের "শাফাই সাক্ষ্য" দিতেছেন। শব্দ, হাসিয়া, হাসিয়া হাততালি দিয়া, ধনবন্ত, শক্তিমন্ত শ্বেতাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ছি! শ্বেতাঙ্গ, রঙটা আজও শাদা আছে বলে কি এতই হাঁদা হ'তে হয়! তোমার শাদা রঙটা কেবল শীতের দরুণই বজায় আছে। নহিলে ঐ কৃষ্ণাঙ্গ কাঙ্গাল এবং তুমি একই পিতামহের পৌত্র। তোমরা একই জাতি, একই গোষ্টি ;—এই দেখ আমার গায়ে, তাহা লেখা আছে। আমি, তোমাদের আদি পুরুষের গৃহে, বহুকাল বাস করেছিনুম ; আজও বেঁচে থেকে, তোমাদের বাড়ী বাড়ী বেড়াচ্ছি,আর তোমাদের বিকৃতির আর বিস্মৃতির বীভৎস ব্যাপার গুলা, স্বচক্ষে দেখে দেখে কখনও কেঁদে, কখনও হেসে মোর্‌ছি। তা বাপু, ধলো! ঐ কালোটীকে, আর "নিগার" বলে লাথি মেরো না। ও যে তোমার জ্ঞাতি ভাই হয়। ও যদি নিগার হয়, তুমিও যে নিগার হও। আমি ত তোমাদের দুটীরই বাড়ী নক্ষত্রের, গোষ্টী গোত্রের সব খবরই রাখি। আমার অগোচর ত

কিছুই নাই। আমি যে তোমাদের উর্দ্ধতন শত পুরুষের সূতিকা গৃহের ফেরত। আমার কাছে ত বাপু, বড় একটা বাহাদুরি আর জারিজুরি খাটবে না। খবরদার! মুখ সামলে কথা কও। নহিলে মুখের উপর এখনি মুখের মত, একাল সে কালের সব গান গুলো গেয়ে দেবো।”

পুনশ্চ সেই সাংঘাতিক সাক্ষী শব্দ কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিতেছেন;—

“দেখ বাপু। বামুন ঠাকুর, একটু ঠাওর করে দেখলেই ভাল হয়। উহার কেহই ম্লেচ্ছ নয়, অশুচি, অস্পৃশ্য শক যবন নয়,—ঐ শাদা শাদা মানুষ মানুষী গুলি;—বুট পায় কোট গায়, টোপ মাথার লোক গুলি। উহারা তোমাদের জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি—শৌচাশৌচ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। উহারা, তোমাদেরই ঋষি বংশ;—কেহ কাশ্যপ গোত্র, কেহ শাণ্ডিল্য, কেহ বা ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভূত। আমি ত্রিকালজ্ঞ শব্দ, তাহার সাক্ষী আছি। আমি স্বচক্ষে সেই ঋষি ও ঋষি-পত্নীগণকে দেখেছি। সকর্ণে, তাঁদের সাম গান শুনেছি। তাঁদের হোমের হবিপ্রদান কালে, আমি সশরীরে তথায় উপস্থিত ছিলাম। স্বহা, স্বধা, সাবিত্রী, গায়ত্রীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম। তাঁদের দুহিতা বৃন্দের হস্তে আমি স্বহস্ত দ্বারা দোহন ভাণ্ড দিয়া দুগ্ধ দোহন করাইয়াছি। তাই বলি বাপু বটু, স্থির হও। চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে করিলেও ঐ মহদ্বংশাবতংস মহৎ ব্যক্তিদিগকে “ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ” বলে আর ঘৃণা করিও না। তা'তে তোমাদের মর্য্যাদাটাও বড় বেশি বাড়বে না। কেন না, তা হলে তোমরা নিজেও ম্লেচ্ছ জাতীয় বটে। তোমাদের আর্কফলার ভিতর যদি আর্য্যত্ব থাকে,তবে ওদের ঐ আলবার্ট টেড়ীর ভেতরেও সে বস্তুটা আজও থাকিতে পারে। একেই অধঃপাতে গিয়াছ। আরও বা-পু কেন যাও। আমি শব্দ কাকভূষণ্ডী। আমার সমুখে অতটা ভট্টাচার্য্যিগিরি ত ভাল দেখায় না। এখনি যে সব ভুর ভেঙ্গে দিতে পারি।”

ফলতঃ অতীতের অতীব সাংঘাতিক সাক্ষী শব্দ এবং ধাতু এবং ধ্বনি। বৃদ্ধ ব্যাকরণ, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষার বক্ষে এবং কক্ষে, আজও ইহাদের একতা রক্ষা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জাতির আদিম এক জাতীয়তা স্পষ্ট প্রতিপন্ন ও প্রত্যক্ষ করিয়া দিতেছে।

অপিচ, শব্দ এবং কর্ম্ম, একই প্রবাহে প্রবাহিত,—একই অর্থবোধক; উভয়ই এক,—দুই নহে। যে কর্ম্ম-বোধক শব্দ নাই, সে কার্য্যই নাই;—সে কর্ম্ম কৃত হয় নাই; অকৃতই রহিয়াছে। শব্দ ব্যতীত ক্রিয়া নাস্তি, ভাব নাস্তি, ভাবনা নাস্তি। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সংযোগ সাধনার্থে কার্য্য অপেক্ষা শব্দই অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর সক্ষম। কর্ম্ম ধ্বংস হইবার পরেও কার্য্যের চিহ্ন মাত্র না থাকিবার পরেও শব্দ থাকিতেও পারে।—

শব্দ সঙ্কেত মাত্র নহে। শব্দের শক্তি অপরিমেয়। শব্দ স্বভাবের সজীব আলেখ্য। আর্য্য ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন, শব্দ ব্রহ্ম;—ওঙ্কার রূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

শব্দ—শব্দাভিধান, সভ্য জাতির সমগ্র অনুশীলনের লিপি-চিত্র। সাহিত্য তাহার এক বিরাট রেজিষ্টার।

ভারতীয় আর্য্য জাতির এখন আর কিছুই নাই। শৌর্য্য বীর্য্য রাজ্য নাই, কার্য্য নাই, কীর্ত্তি নাই—কিছুই নাই। তথাচ তাহারা মনুষ্য সমাজে হেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, তাহাদের সাহিত্য আছে। পূর্ব্ব পিতামহগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সঙ্কলিত, বহু-পূর্ব্ব সঞ্চিত সাহিত্যই, আজ জগতে, পরিচয় দিয়া দিতেছে যে, আমরা মনুষ্য-সন্তান আর্য্য সন্তান। নহিলে লোকে এত দিন-আমাদিগকে পশু পর্য্যায়েই গণনা করিত।

অতঃপর বিবেচনা করুন, প্রভৃত প্রস্তাবে ভাষার কোন অবস্থা সাহিত্য।

যে অবস্থায় ভাষা, অপেক্ষাকৃত অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্তা;—যে অবস্থায় ভাষা স্বাভাবিক সরলতায় ও শিল্পজাত অলঙ্কারে ভূষিত, শব্দ-সম্পদ ভাব বৈভবের অধিকারিণী,—যে অবস্থায় ভাষা, প্রকৃতির রত্ন-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া, নানা জাতীয় মণি-রত্নে, অঙ্গে অঙ্গে, শোভাশালিনী; পুনশ্চ যে অবস্থায় ভাষা বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিবিধ বিজ্ঞান, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার ও সৌন্দর্য্য-কলার জননী,—সত্যের, তথ্যের, কার্য্যের এবং কল্পনার নিবাস ভূমি; ভাষার সেই অবস্থা বা অবস্থা সমষ্টিকে—সেই সৌর্য্য, বীর্য্য, ও ঐশ্বর্য্য সমষ্টিকেই, সাহিত্য বলে;—প্রকৃত প্রস্তাবে এবং সাধারণ ভাবে, ভাষার সেই বিবিধ ও বিচিত্র সম্পদ সমষ্টিই সাহিত্য। ভাষা সাহিত্যে পরিণত হওয়া সময় সাপেক্ষ—বহু উন্নতি, বহুকালের শান্তি, বহু বহু সংগ্রাম, আলোড়ন বিলোড়ন, বহু বিপ্লব বিপর্য্যয়, বহু যুগব্যাপিনী, বহুপুরুষব্যাপিনী, সভ্যতা ও স্বাধীনতা সাপেক্ষ,—অনুশীলন ও তপস্যা-সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে বহুকালের ও বহু স্তরের বিবর্ত্তনে, জগতে সর্ব্বাঙ্গীন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের বংশ পরম্পরায়, জাতি প্রবাহের ধারাবাহিক যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম, বুদ্ধি বৃত্তি, চিন্তা-শক্তি, কল্পনা, কার্য্যপরায়ণতা, আশা, নিরাশা, আবেগ অবসাদ, সুখ দুঃখ, পুরুষার্থ বীরত্ব, ভীরুতা, মনুষ্য, বৈভব বিলাস, দুর্ব্বলতা, কুটিলতা, নীতি-নিষ্ঠা, নৈতিক পতন, সরলতা ও সাধুতা ও প্রেম, সংযম এবং অসংযম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, উত্থান এবং পতন—জ্ঞান বল যত কিছু সমস্তই, তাহার সাহিত্যে। এবং এই সকলের শক্তি ও আকৃতি দ্বারা সাহিত্য গঠিত—এই সকলের সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সমষ্টি হইতে, সাহিত্য উদ্ভূত;—সাহিত্যের এবং ভাষার বিস্তীর্ণ বিরাট অট্টালিকা স্তরে স্তরে উত্থিত। অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মনুষ্য যে কিছু জ্ঞান লাভ করে—করিতে পারিয়াছে, তাহার সাহিত্যই তাহা প্রকাশ করে। এবং সেই সাহিত্য হইতেই সে জ্ঞানের প্রচার ও বিস্তার হয় এবং নিরাকরণ হয়। সাহিত্য ও ভাষা নির্জীব জড় পদার্থ নহে;—কৌশলের ও নৈপুণ্যের নির্ম্মিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাশিও নহে। সাহিত্য ও ভাষা স্বভাবের সজীব শক্তি;—সজীব দেহের সচল যন্ত্রবৎ উহারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্বথা সজীব ভাবেই কার্য্য করে।

মনুষ্য, অবিশ্রান্ত ভাবে, প্রকৃতির সাহিত্য-সংগ্রামে নিযুক্ত, সেই সংগ্রামের ফল সাহিত্য। মনুষ্য, অবিরত প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত, সেই সেবার ফল সাহিত্য। মনুষ্য অবিশ্রান্ত ভাবে প্রকৃতির উপাসনায় ও অনুকরণে নিযুক্ত, সে উপাসনা ও অনুকরণের ফল সাহিত্য। সাহিত্য, মনুষ্য জাতির মানস-বিকাশ;—মানস-বিকাশের ইতিহাস;—চিন্তা-প্রবাহের বিরাট সমষ্টি;—ভাব-বৈচিত্র্যের বিরাট অট্টালিকা। সাহিত্য, জড় প্রকৃতির সহিত জড় প্রকৃতির এবং জীব প্রকৃতির সহিত জীব প্রকৃতির এবং জড় প্রকৃতির সহিত জীব প্রকৃতির সংঘর্ষের, সম্বন্ধের ও সম্মিলনের জীবন্ত বাক্য-চিত্র;—সাহিত্য উভয় প্রকৃতির সজীব স্বপ্রকাশ-কাহিনী।

ইহা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ, বিশাল সর্ব্বদিক্স্পর্শী সাধারণ অধিকার। প্রকৃতি স্মৃতি,

সংহিতা পুরাণ, ধর্ম্মতত্ব, বিবিধ দর্শন ও বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য নাটক এবং সুকুমার শিল্প কলা ইত্যাদি সমস্ত ও যাবতীয় রচনারাশি সাহিত্যের এই সাধারণ অধিকার ভুক্ত।

সাহিত্যের এই সাধারণ অধিকার, উহার বিশেষ বিশেষ অধিকারের সমষ্টি ও বিশেষ বিশেষ অধিকারের এক সুমহান সুবিশাল কেন্দ্রভূমি। বিশেষ বিশেষ অধিকারের মধ্যে, সাহিত্যের এক সবিশেষ অধিকার সূচিত আছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্ধারণে, তথা পরবর্ত্তী সমালোচকগণের শ্রেণী-নির্ব্বাচনে, সাহিত্যের সবিশেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার কাব্য কবিতা নাটকাদি নানাবিধ বিচিত্র রস সৃজিনী ও হৃদয়-স্পর্শিনী কমনীয়া বিদ্যায়। এই বিদ্যাই সচরাচর সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ইহারই সরস ক্ষেত্রে আর্য্য আলঙ্কারিকগণের ন্যায় ইদানীন্তন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকগণ বিচরণ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যের এই সবিশেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট অধিকারও এক সুবৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্য আদৌ অসীম। ইহার ব্যাস পরিধি, ইহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এবং গভীরত্ব অপরিমেয়। এই রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য—ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্য, শিল্পের সাস্ত ও সাময়িক নিয়মাবলী দ্বারা, শৃঙ্খলিত ও শাসিত হইলেও, তাহার স্বাভাবিক সীমান্ত রেখা, অনন্তের সহিত সংমিশ্রিত। সমগ্র জীব ও জড় জগৎ ও অন্তঃজগতের এবং তদতিরিক্ত ও তদাদর্শে পরিকল্পিত কবি ও শিল্পী-সৃষ্ট অভিনব কাব্য-জগত নিচয়ের, বিবিধ ও বহুল ও বিপুল ভঙ্গিপুঞ্জ, বর্ণরাগ, লাবণ্য-সম্ভার—তাহাদের শরভাগ সমস্তই; —রস বৈভব ও ছন্দ, সুগন্ধ ও স্বর সম্পদ সমস্তই, এই রাজ্যের অধিকারাধীন। মনুষ্য-হৃদয়ের অগণিত ও অসংখ্য ভাব-প্রবাহে, চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে, অনুভবের ঘাত-প্রতিঘাত-পারাবারে, তথা, কল্পনার কমনীয়, কান্ত, অকৃত্রিম নীলোজ্জ্বল অম্বরে, সাহিত্যের এই স্বচ্ছ, সুবর্ণ রশ্মি রাগ-রঞ্জিত, সুললিত রমণীয় রাজ্য উদ্ভাসিত ও অভিব্যক্ত।

সাহিত্যের এই সবিশেষ বিভাগ পুনঃ বহু বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত। তাহাদেরও প্রত্যেক বিভাগ আবার এক একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য;—মনুষ্যের মানস কুসুম-সৌরভের অত্যুন্নত অমর কীর্ত্তি-স্তম্ভে বিখচিত। সভ্যতার যুগে যুগে, মনুষ্য জাতির মানসিক বিকাশে ও বিবর্ত্তনে, সাহিত্যের এই সকল খণ্ড রাজ্যের বিপুল বিস্তার হইয়া, সমগ্র সাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত ও প্রতাপান্বিত করিতেছে। যুগে যুগে, যুগ-শক্তি-প্রভাবে, নবীন প্রতিভায়, নব উপাদানে, সাহিত্যের স্বাধীন, সাধারণ তন্ত্র, যুক্ত রাজ্যে নূতন নূতন স্বারস্বত মন্দির পুনঃ পুনঃ উত্থিত, গঠিত, সজ্জিত হইয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজৈশ্বর্য্য, গৌরবশ্রী, অধিক হইতে অধিকতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর অগ্রসর করিতেছে। উন্নতির ইয়ত্তা নাই,—অন্ত হইবে না। উন্নতি অনন্তের পথে, অবিরত চলিতেছে—চলিয়া আসিয়াছে—চলিবে। পথে চলিতে চলিতে, কত জাতি পতিত হইতেছেন, পরিম্লান হইতেছেন; আবার কত জাতি উত্থিত ও উৎকর্ষিত হইয়া উন্নতির পুরাতন পথে বা স্ব স্ব খাদিত নূতন পথে চলিতে চলিতে, স্ব স্ব সৃষ্ট ও উপার্জ্জিত বৈভব রাশি দ্বারা

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

জগতের পুরাতন এবং নূতন বহু দেশ, বহু জাতি, বহু প্রণালী প্রকৃতি ও পন্থা দ্বারা এবং বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা দ্বারা

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্য

সংগঠিত ও সংযুক্ত। এই সংগঠন ও সংযোজন স্বভাবের স্বহস্ত-নিয়ন্ত্রিত জাতি নিচয়ের বা ব্যক্তি ও লোকবর্গের নির্ব্বাচনের ফল নহে—এই সাধারণ তন্ত্র। ইহা যদি নির্ব্বাচন-সম্ভূত হয়, তবে তাহা আদৌ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অতএব, রাজনৈতিক ও প্রজা-নৈতিক সাধারণ তন্ত্রের সহিত, সাহিত্যের সাধারণ-তন্ত্র, আদৌ তুলনীয় নহে। তাহা হইতে,ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাহা অপেক্ষা ইহা সমূহ সমুন্নত। সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সমুক্ত স্বাধীনতা। প্রতিপদ বিক্ষেপে, পরাধীন পার্থিব মৃত্তিকার উপরে,যদি আদৌ কোথায়ও পূর্ণ,অবাধ,অথচ সুনিয়ন্ত্রিত প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা আছে—পরিপূর্ণভাবে আছে কেবল সাহিত্যের এই সাধারণ তন্ত্র সাম্রাজ্যে। স্বাধীনতা এবং সম অধিকার এবং সার্ব্বজনিকতা কেবল এই খানেই সম্পূর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ স্বানুবর্ত্তিতার সহিত সংমিলিত।

এই সুন্দর,সুপবিত্র সাধারণতন্ত্র স্বারস্বত রাজ্যে, স্বাধীনতা সনাতন ধর্ম্ম, স্বানুবর্ত্তিতা মূলধন এবং সম অধিকার অবাধ রাজ্যবিধি। এ রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতার ও অনন্যতন্ত্রতার সমধিক সম্মান অথচ তদুৎপাদিত দ্রব্যজাতে —দ্রব্যজাতের সার ও শরভাগে, সকলেরই সমান অধিকার। সে অধিকার,অতীব উন্নত আধ্যাত্মিক অধিকার, যাহার অপেক্ষা সুদৃঢ় অবিসংবাদিত ও অবিচ্ছেদ্য সর্ব্বাধিকার মনুষ্য জীবনের আর কোনও অংশে আর কোনও আইনেই বিদ্যমান নাই, কখনও পরিকল্পিতও হয় নাই।

সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতা, কার্য্য করে, সর্ব্ব সাধারণেরই সেবার্থে, সাম্রাজ্যের সাধারণ রাজকোষেরই বৈভব বৃদ্ধির উদ্দেশে। অতএব, অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এরাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতার সার্ব্বজনিকতায় কখনও সংঘর্ষ ও সংক্ষোভ উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, স্বানুবর্ত্তিতা সার্ব্বজনিকতার জন্যই জীবিত থাকে। তাহারই শ্রদ্ধাদি প্রণোদিত হইয়া বা উৎসাহাদি উত্তেজিত হইয়া বা তাহারই অভাব আবশ্যকাদির অনুভব করিয়া, স্বানুবর্ত্তিতা, উদ্যমশীলা ও কার্য্যশীলা হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিভার পরিপুষ্টি ও বিকাশ করে। অন্য ক্ষেত্রে, স্বানুবর্ত্তিতা সংকীর্ণা ও স্বার্থপরায়ণা হইতে পারে ; কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে, উহা স্বভাবতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহিত্যের সাম্রাজ্যে, স্বানুবর্ত্তিতা উদার ও পরার্থপরায়ণা। সাহিত্য-রাজ্যে স্বানুবর্ত্তিতার সোপার্জ্জিত ধন উৎপন্ন হইবা মাত্রই তাহা সর্ব্ব সাধারণের, সর্ব্বজনের ও সর্ব্ব ভূমির হয়। স্বারস্বত রাজ্যের ব্যবস্থাই এই,—সনাতনাগত নিয়মই এই ; স্বাভাবিক লক্ষণই এই। রাজনীতির বা বাণিজ্য নীতির সংকীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি শর্কর বা শরাপ সংরক্ষণ আইনের ন্যায়, সাহিত্য বিকার সংরক্ষণ আইন, বিধিবদ্ধ করিতে পার এবং সেই বাণিজ্য নৈতিক বিধির বলে সাহিত্যকে বাণিজ্য পণ্যে পরিণত করিয়া সাহিত্য শুল্ক সংস্থাপন করিতে পার। কিন্তু, সাহিত্য আদৌ বাণিজ্য পণ্য নহে,

স্বভাবতই বাণিজ্য পণ্য হইতে পারেনা। সাহিত্য-নীতি তোমার বাণিজ্য বিধিকে উপেক্ষা করে, অন্তরের সহিত অশ্রদ্ধা করে। সাহিত্য, তোমার অবৈধ বিধিবদ্ধ শুল্ক সত্বেও, স্বকীয় স্বাভাবিক স্বরূপে ও শক্তিতে সাধারণের সম্পত্তি হয়। সে সম্পত্তির সুমহৎ ও সুন্দর সত্বা চিত্তের চিরানন্দ, চিত্তশুদ্ধির অনুপম উপকরণ, আত্মার অবিরাম উপভোগ্য এবং সচ্চিদানন্দের সামীপ্যানুভবের মধুর উত্তেজক। সাহিত্য সৌন্দর্য্য, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যেশ্বর সুন্দর ঈশ্বরের এক অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষা।

এক সময়ে এদেশের লোক স্ত্রীশিক্ষার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার নামে খড়্গহস্ত হইতেন। স্ত্রীশিক্ষা সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্র গণ্য হইত। প্রথম যখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বালিকা পাওয়া সুকঠিন হইয়াছিল। হিন্দু দলপতিগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছিলেন যে,যে ব্যক্তি বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিবে, তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) নিবাসী স্বর্গীয় হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিল্বগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহস পূর্ব্বক প্রথমে বেথুন বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় এই জন্য নিজ গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

এখন সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি নিজে বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকের ঘোরতর বিরুদ্ধ ভাব ছিল। যে পরিবারে আমার জন্ম, সেখানে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লোকের বিরুদ্ধ ভাব যে একেবারে গিয়াছে, এমন নহে; তবে অনেক পরিমাণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

বালিকাদের সামান্য শিক্ষায় অনেকের এখন মত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার নামে এখনও অনেকের গায়ে জ্বর আসে। এখনও অনেক শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত উহার আবশ্যকতা দেখেন না। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, পুত্র এম, এ, পাস করিতে না পারিলে, যিনি বিষ খাইয়া মরিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কন্যা কথামালা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন।

নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি শুনা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান আপত্তির সমালোচন করা যাউক।

প্রথম আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের শক্তির অনেক প্রভেদ। পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক কি তাহাই পারে? একথার উত্তর এই, কেমন করিয়া জানিলে যে, পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক তাহা পারে না? বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে, ফল দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক তাহা পারে না। সমগ্র মানবজাতির ইতিবৃত্ত কি সাক্ষ্য দিতেছে? শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সকল বিভাগে পুরুষের কার্য্যের সহিত স্ত্রীলোকের কার্য্যের

তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তুলনায় স্ত্রীলোকের কার্য্য অতি সামান্য।

কিন্তু এ কথার উত্তর আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিকে সুশিক্ষা সম্বন্ধে কখন কি সমান অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে? প্রাচীন কি আধুনিক, কোন কালেই নহে। তথাচ দেখ, প্রাচীন কালে, ইয়োরোপে, স্যাফো প্রভৃতি। বর্ত্তমান কালে, শ্রীমতী সমরভিল্, কুমারী মার্টিনো, কুমারী কব, জর্জ্জ ইলিয়ট, অর্থাৎ শ্রীমতী লুইস্, জোয়ান অব আর্ক, শ্রীমতী ষ্টো, শ্রীমতী ফসেট প্রভৃতি ইয়োরোপীয় মহিলা, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে সুসভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাহার পর স্ত্রীলোক এম, এ, এম, ডি তো সভ্য জগতে আজ কাল ছড়াছড়ি যাইতেছে। স্ত্রীলোক যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছে। জোয়ান অব আর্কের নাম করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্যারিবলডির সহধর্ম্মিনী, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন।

এ সকল ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোক। আমাদের দেশেও প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ গুণসম্পন্না নারীর দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। অতি প্রাচীন কালে অত্রি বংশীয়া বিশ্ববারা ঋগ্বেদের একটি সূক্তের রচয়িত্রী। "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" এই বচনটী অবলম্বন করিয়াঃ যাঁহারা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদের একটী বিশেষ অংশের রচয়িত্রী একটী স্ত্রীলোক। এতদ্ভিন্ন,খনা, লীলাবতী, অহল্যা বাই,রাণীভবানী, মীরা বাই,তরুদত্ত প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ সদ্গুণসম্পন্না নারী এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাবতী এবং ঝান্সির রাণী যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। হটু বিদ্যালঙ্কারের কথা অনেকেই জানেন। ইনি বীরভূম জিলায় কোন অধ্যাপকের কন্যা। পিতার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিয়া সুপণ্ডিতা হইয়াছিলেন। পরে কাশীতে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া তথায় ছাত্র পড়াইতেন। ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিতেন ও 'বিদায়' পাইতেন।

স্ত্রী ও পুরুষের শক্তি সমান কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিত লোকের মধ্যেও মতভেদ আছে। মিল্ বলেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশক্তি যে পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে যে পুরুষ অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, শিক্ষা সম্বন্ধে কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান কালে, পুরুষজাতি যেরূপ অধিকার ও সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে, স্ত্রীজাতি সেরূপ কখনই পায় নাই। কিন্তু অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, হৃদয় সম্বন্ধে, কোমল ভাব নিচয় সম্বন্ধে, স্ত্রী.জাতি শ্রেষ্ঠ হইলেও, বিচারশক্তি বিষয়ে সাধারণতঃ পুরুষ শ্রেষ্ঠ। মার্কিন দেশীয় একজন মহাজ্ঞানী বলেন যে, বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির মধ্যে প্রভেদ আছে। হৃদয়ের ভাব নিচয় ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিষয়ে সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিচারশক্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ পুরুষজাতি শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী জাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়গত পার্থক্য থাকিলেও, 'হরে দরে হাঁটু জল'; অর্থাৎ গড়ের উপর সমান, ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়!

যাহা হউক, স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে বুদ্ধি শক্তি সম্বন্ধে তারতম্য আছে কি না, সে বিষয় লইয়া এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক, যদি পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির বুদ্ধি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তজ্জন্য কি তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য? স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকে জ্ঞানের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিয়া আপনাদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নারীজাতিকে উচ্চশিক্ষার অধিকার দেও, যিনি যতদুর পারেন, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হউন। পুরুষের মধ্যে সকলেই কি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে? কেহ কেহ যে পাঁচবারেও এণ্ট্রান্সটা পাস করিতে পারে না! স্ত্রীলোকে সকলেই যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে, এরূপ বলিতেছি না। অধিকার দেও, যিনি যতদূর পারেন, শিক্ষালাভ করুন।

ইহারই নাম সাম্যবাদ। অধিকার দেও, যে যতদূর পারে, করিয়া লউক। সাম্যবাদ অর্থ ইহা নহে যে, সকলে ঠিক্ সমান হইবে। বড় ছোট থাকিবে না, এরূপ কখন হইতে পারে না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, শক্তিশালী, অশক্ত, ইত্যাদি প্রভেদ জগতে চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। এরণ্ড বৃক্ষ ও বটবৃক্ষ কখন সমান হয় না।

সাম্যবাদের অর্থ সমান হওয়া নয়, সমান অধিকার। সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, উহা বাস্তবিক ন্যায়বাদ। ন্যায় কি বলে? সকলকে সমান অধিকার দেও, যে যতদূর পারে, করিয়া লউক,—কাহাকেও বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিও না। ইহাই ন্যায়ের আদেশ।

একথা বলিওনা যে, স্ত্রীজাতির বুদ্ধি নাই, অতএব তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার অধিকার নাই। যখন অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাঁহারা উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন। যখন অধিকার দেওয়া হইল, তাঁহারা কার্য্যের দ্বারা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতা আছে; সুতরাং এই প্রথম আপত্তি যে সম্পূর্ণ অযুক্ত, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, উচ্চশিক্ষাদ্বারা নারীজাতীর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। একথা অমূলক। জ্ঞান, হৃদয়কে নষ্ট করে না, হৃদয়কে উন্নত করে। জগতের সকল জ্ঞানীগণ একথার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের স্বাভাবিক যোগ। ভাব, জ্ঞানকে মধুময় করে। আবার জ্ঞান, ভাবকে বর্দ্ধিত করে, উন্নত ও নির্ম্মল করে। জ্ঞান দ্বারা হৃদয় নষ্ট হয়, ইহা অমূলক কথা।

জ্ঞান কাহাকে বলে? সত্যের ধারণা। জ্ঞান বলিলে যখন সত্যের ধারণা বুঝায়, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, জ্ঞানদ্বারা হৃদয় নষ্ট হয়? সত্য কি হৃদয়কে নষ্ট করে? জ্ঞানী মাত্রেই বলিবেন যে, সত্য হৃদয়কে কোমল, প্রশস্ত, গভীর ও উন্নত করে।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃত জ্ঞান হৃদয়কে উন্নত করে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, উহাতে কি প্রকৃত জ্ঞান হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কি হৃদয়কে উন্নত করে? কয়েকটি পরীক্ষায় পাস করিয়া দিবার জন্য যে বিদ্যা গিলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কি প্রকৃত শিক্ষা হয়?

কেবল গিলাইয়া দিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, হৃদয়ের উন্নতি হয় না, একথা সত্য। কিন্তু সেই জন্ত কি করিতে হইবে? শিক্ষা প্রণালী ভাল করা আবশ্যক। যাহাতে গিলাইয়া দেওয়া না হয়, যাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীগণ চিবাইয়া খাইতে শিখে, এবং যাহা খায়, তাহা পরিপাক হয়, এরূপ সুব্যবস্থা করা বিধেয়।

কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে এ কথা কি সমভাবে খাটিতেছে না? শিক্ষা প্রণালীর দোষ আছে বলিয়া, যদি বল যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা চাই না, তবে সেই কারণে কেন বলনা যে, পুরুষেরও উচ্চশিক্ষা উঠিয়া যাউক। আমাদের স্কুল ও কালেজে, যে পরিমাণে শিক্ষা প্রণালীর দোষ আছে, সেই পরিমাণে উহার মন্দ ফল স্ত্রীজাতির পক্ষেও যেমন, পুরুষজাতির পক্ষেও সেই রূপ।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, শিক্ষা, প্রণালীর দোষ থাকিলেও পুরুষের উচ্চশিক্ষা বন্ধ হইতে পারে না। কেননা পুরুষ চাকুরি করিয়া টাকা আনিবে, স্ত্রীলোক তো চাকুরী করিবে না?

কে বলিল স্ত্রীলোক চাকুরি করিবে না? আর সেকাল নাই। অনেক দিন হইতে তো স্ত্রীলোক চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকার তো কথাই নাই। আমাদের দেশেও স্ত্রীলোক চাকুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোক মাষ্টার, স্ত্রীলোক ডাক্তার, এখন আর ভবিষ্যতের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষা যতই বৃদ্ধি পাইবে, স্ত্রীলোকের চাকুরির সংখ্যা ততই দিনদিন বাড়িতে থাকিবে।

কেবল চাকুরি কেন? উচ্চশিক্ষা, সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, শিল্প সাহিত্যের সাহায্যে স্ত্রীলোক নানা প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। ইয়োরোপ, আমেরিকায় তাহাই হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে দোষ থাকিলেও, ইহাতে উপকার হইতেছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয় জাতির পক্ষেই উপকার হইতেছে।

প্রণালীর দোষ থাকে, সংশোধন কর। দোষ আছে বলিয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কেহ কি ত্যাগ করে? আহারের দোষে অনেক সময় উদরাময় উপস্থিত হয়। সেই জন্য, কে আহার বন্ধ করিয়া দেয়? কে আহার না করিয়া করিতে যায়? যাহাতে পীড়া না হয়, এমন আহার কর।

আর এক কথা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে স্ত্রীজাতির হৃদয়ের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না, ইহা এক কথা, আর হৃদয় বিকৃত হইয়া যাইতেছে, ইহা আর এককথা। যে সকল মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় যে, বিকৃত হইয়া যাইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। যে সকল মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আমি জানি। সেই জন্য বলিতে পারি যে, উচ্চশিক্ষাদ্বারা যে, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ হৃদয়ের অবনতি হইয়াছে, এ কথার কোন মূল নাই। তবে আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোকের এমন এক প্রকার অতিরিক্ত কোমলতা আছে, যাহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। সেরূপ কোমলতায় মানুষকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। উহা এক প্রকার দুর্ব্বলতা।

স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে আর

এক আপত্তি এই যে, উচ্চশিক্ষা পাইলে তাঁহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। বাস্তবিক তাঁহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় কি না, সে কথার বিবেচনা পরে করিব। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, এমন এক সময় কি ছিল না, যখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষজাতির মধ্যে অনেকে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিতেন? প্রথম, প্রথম, যাঁহারা কোন একটা উচ্চ উপাধি বা উচ্চপদ লাভ করেন, সংখ্যায় অল্প বলিয়া, তখন তাঁহাদের মধ্যে কাহার মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ এমন মনে হইতে পারে, "আমি কি হইলাম গো!" স্ত্রীলোক কি পুরুষ, উভয় জাতি সম্বন্ধেই কাহার কাহার পক্ষে, ইহা সম্ভব হইতে পারে। প্রথম, প্রথম বি, এ, এম, এ, উপাধি লাভ করিলে কাহারও কাহারও ঐ প্রকার মনের ভাব হওয়া সম্ভব। শেষে যখন বি, এ, এম, এর ছড়াছড়ি হয়, তখন আর ঐ প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। যেখানে সেখানে বি, এ, এম, এ পাওয়া গেলে, ২৫৩০ টাকায় বি, এ; এম, এ পাওয়া গেলে, বি, এ; এম, এ; উপাধি পাইয়াছি বলিয়া কে অহঙ্কার করিতে পারে? প্রথম, প্রথম যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছিল।

এখন যে সকল উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের উপাধির জন্য অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছেন? এরূপ কথা কখনই বলিতে পারি না। সকলের সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু যাঁহাদের সহিত পরিচয় আছে, তাঁহাদের সরল ও নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া আমি অনেক সময় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাদের বিষয়ও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তাঁহাদের প্রকৃতি সরল ও বিনীত। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি উপাধি লাভ করিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছেন, তাহা হইলে উহা উপাধিলাভের দোষ নহে। যে স্ত্রীলোক বি এ, এম, এ, পাশ করিয়া ফুলিয়া উঠেন, তিনি মূর্খ থাকিলে হয় তো ভাল চড়্‌চড়ি রন্ধন করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। উহা স্বভাবের দোষ, উচ্চশিক্ষার দোষ নহে।

স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তি এই যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। একথা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান উন্নত, তিনি সংসারের বিষয় যেমন বুঝিবেন, অশিক্ষিতা, অবোধ নারী কি কখন তেমন বুঝিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা নারীগণ যে সংসারের কার্য্যে অপটু, প্রত্যক্ষ একথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে। এমন হইতে পারে, কেহ কেহ সংসারের কার্য্যে উদাসীন। কিন্তু তাহা তাঁহাদের শিক্ষার দোষ নহে, নিজের দোষ। অনেক অশিক্ষিতা নারীও তো অলস ও সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন। তাহাদের ঐ প্রকার স্বভাব কেন হইল?

কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ হইতে পারে যে, বিদ্যাচর্চ্চা এত ভাল লাগে যে, সেই জন্য সংসারের কাজ কর্ম্ম ভাল লাগেনা। ইহা যদি লেখাপড়ার দোষ হয়, তবে এরূপ দোষ কেবল লেখাপড়ারই আছে, এমন নহে, সকল ভাল বিষয়েরই এ দোষ আছে। ধর্ম্মচর্চ্চা, পরমেশ্বরের ভজন সাধনেও এ

দোষ আছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে এমন মানুষ দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মচর্চ্চা, পরমেশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি তাঁহাদের এত ভাল লাগে যে, জগতের কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না। এরূপ হওয়া ধর্ম্মচর্চ্চার দোষ নহে, মানুষের নিজের দোষ। যাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপযুক্ত রূপ বিকাশ হয় নাই, যাঁহারা কেবল মনের আবেগে চলেন, তাঁহাদের এপ্রকার হইয়া থাকে।

আমি একবার এক জন বি, এ, উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাকে বলিয়াছিলাম যে, লোকে বলে যে, যে সকল স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে অপটু। উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন, একথা অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে খাটে না। আমি সাংসারিক কার্য্য কি না করি, কিনা জানি? আমি মুড়ি ভাজিতে পর্য্যন্ত জানি।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে যে নিজের হাতেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। তাঁহারা সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু যিনি সুশিক্ষিতা, যাঁহার বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, তিনি সে কার্য্যের যেরূপ যোগ্য, একজন অশিক্ষিতা কিম্বা নিতান্ত সামান্য শিক্ষিতা নারী কি কখন সেরূপ হইতে পারে? অশিক্ষিতা অবোধ নারীদিগের দ্বারা কত অনিষ্ট হয়, তাহাদের বুদ্ধির দোষে কত অকল্যাণ ঘটে, কে তাহা না জানেন?

সন্তানপালন একটি অতি গুরুতর কার্য্য। ইহা কি মূর্খ নিরক্ষর ব্যক্তির কর্ম্ম? বিশেষতঃ মাতা সুশিক্ষিতা হইলে, সন্তানের শিক্ষা, মাতাদ্বারা যেমন সুসম্পন্ন হইতে পারে, এমন কি অন্য প্রকারে হওয়া সম্ভব? এই সন্তানপালন ও সন্তানদিগের শিক্ষা কি গৃহকর্ম্ম নহে?

অনেকের মনের ভাব এই যে, স্ত্রীলোকে সংসারের নিকৃষ্ট কার্য্য লইয়াই জীবন কাটাইবে। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি প্রার্থনীয়? মানবজীবনের প্রধান কার্য্য জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন। সে বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করা, যাহাতে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য করিয়াও জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য অবকাশ পান, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কি পুরুষজাতির কর্ত্তব্য নহে?

যে সকল পুরুষকে বাহিরের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না, গৃহকর্ম্মের ভার অধিক হইলে, তাঁহাদের উচিত স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করা। অনেক সৎপুরুষ ইহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের কিছুই করিবার নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া তাম্রকূট ফুঁকিতেছেন, তথাচ একগাছি কুটাও সরাইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন, কার্য্য ভিন্ন, জীবন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং একরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় জাতিই কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইবে? উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন অথবা ভিন্ন হওয়া উচিত। সুতরাং উভয় জাতির শিক্ষাও ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

এ কথার উত্তর এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির কতকটু পরিমাণে ভিন্নতা অবশ্য আছে।

কিন্তু নরনারী উভয়েই মানুষ। স্ত্রীলোকেরাও মনুষ্য এ বিষয়ে বোধ হয়, উচ্চশিক্ষা-বিরোধী মহাশয়গণের কোন সংশয় নাই। জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতিসাধন মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তবে স্ত্রীলোকেরা কেন উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিবে? স্ত্রীলোকের কি আত্মা নাই?

স্ত্রীলোকের বিষয়ে অনেকের এমনি একটা হীন ভাব আছে যে, সংসার সম্বন্ধে যেমন ঘটি, বাটি, কুলো, ধুচনি, প্রভৃতি, সেইরূপ স্ত্রীলোক। যেমন সংসার করিতে ঘটি চাই, বাটি চাই, কুলো চাই, ধুচনি চাই, সেইরূপ স্ত্রীলোক চাই। ঘটি চাই জল খাইতে, বাটি চাই দুগ্ধ প্রভৃতি পান করিতে, কুলো চাই চাউল প্রভৃতি ঝাড়িতে, ইত্যাদি। সেইরূপ, স্ত্রীলোক চাই রন্ধন করিতে, সংসারের বন্দোবস্ত করিতে, সন্তানপ্রসব ও পালন করিতে। ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য কি কিছু নাই?

স্ত্রীলোকেরা যখন মানুষ, যখন তাঁহাদের আত্মা আছে, তখন জ্ঞানোপার্জ্জন,—রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা, তাঁহাদের জীবনের অবশ্য প্রধান কার্য্য, পরমেশ্বরের অভিপ্রায়। তাহাতে বাধা দেওয়া কি পাপ নয়?

স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণী হউন বা না হউন, তাহাতে তত আসিয়া যায় না। কিন্তু এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

তবে স্ত্রীলোক যদি উপাধিধারিণী হয়, তাহাতে এত আপত্তি কেন? স্ত্রীলোক উপাধিধারিণী হইলে একটা উপকার স্পষ্ট দেখিতে পাই। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হইয়া অধিকতর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। যদি কামিনী, সৌদামিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে থাকেন, তাহা হইলে গোপাল, রাখাল, বিপিন, প্রভৃতি সে বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হইবার সম্ভাবনা। ভাই ভগিনীর মধ্যে, ভগিনী যদি উপাধিধারিণী হন, তাহা হইলে ভ্রাতার পক্ষে, উপাধি লাভের জন্য, অধিকতর উৎসাহী হইবার সম্ভাবনা। উহা না পাইলে লজ্জিত হইবার সম্ভাবনা।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্য। সুতরাং উভয়েই উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। সে বিষয়ে পার্থক্য করিলে চলিবে না। সে বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রভেদ ও তন্নিবন্ধন জীবনের কার্য্যের প্রভেদ কতক পরিমাণে আছে। যে টুকু প্রভেদ, তদনুযায়ী শিক্ষার প্রভেদ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে জ্ঞান লাভ করিয়া পারদর্শী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ঐ সকল বিষয় স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী। যেমন, সন্তানপালন ও শিশুদিগের শিক্ষা, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা, গৃহকর্ম্ম, রোগীর সেবা ইত্যাদি।

পুরুষছাত্রগণ সকলেই তো এক বিষয় শিক্ষা করেন না। জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। কেহ দর্শনশাস্ত্র, কেহ গণিত, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়া কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি হইয়া থাকেন। সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও, তাঁহাদের উপযোগী

বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

কিন্তু উচ্চ জ্ঞান লাভে সকলেই অধিকারী। কোন স্ত্রীলোকের যদি জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে, এবং তিনি উহা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে, উহা উচ্চ জ্ঞান বলিয়া কি তাঁহাকে জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে না? খনা, লীলাবতী ও শ্রীমতী সমরভিলের স্বজাতীয়া যিনি, তাঁহাকে কি জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে না? সকলকেই অধিকার দেও। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে সেইরূপ জ্ঞান লাভ করুক।

স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার অভাবে এ দেশে দুইটী গুরুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। প্রথম, পারিবারিক অশান্তি। সুশিক্ষিত স্বামীর মনের ভাব যে প্রকার, অশিক্ষিতা স্ত্রীর মনের ভাব সে প্রকার হওয়া কথনই সম্ভব নহে। সুতরাং সকল বিষয়ে উভয়ের মিল হওয়া, সকল কার্য্যে উভয়ের মতের ঐক্য হওয়া কথনই সম্ভব নহে। সেই জন্যই পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা। ইহা নিশ্চয় কথা যে, এ প্রকার অশান্তি সংঘটিত হইতেছে। পুরুষ যেখানে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে,সেখানে স্ত্রীলোকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, সমাজের একাংশ শিক্ষা লাভ করিলে এবং আর একাংশ সুশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিলে, সামাজিক বিশেষ অকল্যাণ ও অশান্তির সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় অনিষ্ট, সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত। কুসংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া শিক্ষিত যুবক উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, অশিক্ষিতা মাতা ও স্ত্রী তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠেন। নিজের উন্নতি বা স্বদেশের কল্যাণের জন্য কেহ বিলাত যাত্রা করিবেন সংকল্প করিলে, অশিক্ষিতা মাতা ও স্ত্রী সে বিষয়ে গুরুতর বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত করিতে থাকেন। কেবল কথামালা পর্য্যন্ত পড়িয়াই যতটুকু বিদ্যা হয়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে এ প্রকার অনিষ্ট নিবারণের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীজাতির উপযুক্তরূপ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, একান্ত প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। কেবল বি, এ, এম, এ, পাস করিলেই চলিবে না; সেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা যারপর নাই আবশ্যক। পুরুষের ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য চাই। কিন্তু এস্থলে স্ত্রীলোকের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন কোন বিষয়ে অনিষ্টও হইয়াছে। তন্মধ্যে এই একটী অনিষ্ট হইয়াছে যে, উচ্চশিক্ষা যেমন প্রচলিত উপধর্ম্মে বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেইরূপে অনেক স্থলে তাহার স্থানে কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ইহা দ্বারা প্রচুর অকল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষাদ্বারা যদি তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ এক ধর্ম্মবিশ্বাসবর্জ্জিত দলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা এক দল ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন Young Bengal হওয়াতে অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে, সেই প্রকার এক-দল Female Young Bengal সৃষ্টি হইলে সর্ব্বনাশ! ভগবান্ এই বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করুন। স্ত্রীজাতির পবিত্র প্রকৃতি, কতক পরিমাণে, এ অনিষ্ট নিবারণ করিবে।

কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

এ স্থলে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সাধারণ অংশ,সকল ধর্ম্মের সার, সেই ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। যাহাতে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি হয়, পরকালে বিশ্বাস দৃঢ় হয়, পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ উজ্জ্বল হয়, এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া আবশ্যক। নতুবা সকল স্থলে প্রার্থনীয় ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম চাই! ধর্ম্ম চাই! নতুবা প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে। ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইলে, উচ্চ শিক্ষা হইতে সকল স্থলে, শুভ ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা। (৩)

সমন্বয় ভাষ্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা গত দুই সংখ্যায় একরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছি। এই সমন্বয় ভাষ্য যে অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সকলেই একমত হইবেন। কিন্তু এ ভাষ্যের সমুদয় মতই যে সকলের সহিত মিলিবে, তাহাও বোধ হয় সকলে আশা করিতে পারেন না। এই ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের মত সম্বন্ধে যেরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে, আমরা তাহার কোন কোন অংশ দেখাইয়াছি। তাহাতে সমন্বয় ভাষ্যকারের কৃতকার্য্যতা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের স্থল-বিশেষের সমালোচনা করিতে গিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা গত-সংখ্যার শেষ অংশে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম। অদ্য আমরা সেইরূপ আর দুই একটী বিরুদ্ধ-অংশের কথা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমরা বহুদিন হইতে শঙ্করকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি,আমরা তাহাই দেখাইব। আমরা বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিতে পারি। আমরা আশা করি, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ মহোদয়, আমাদের ভুল থাকিলে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া বাধিত করিবেন।

পরকালে গতি সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন হয় না,এরূপ মত শঙ্করের নিতান্ত বিরোধী বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে, একথা আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি। আবশ্যক হইলে, আমরা শঙ্করের সেই স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইব। আর একটী স্থলে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ শঙ্করাচার্য্যের একটী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকের ব্যাখ্যায়,পণ্ডিত উপাধ্যায় মহোদয়, শঙ্করাচার্য্যের সেই স্থলের ভাষ্যের সহিত এবং তৎকৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস অন্যরূপ। আমাদের বোধ হয় শঙ্কর ঐ দুই স্থলে দুই প্রকার মতের উল্লেখ করিয়া কোনরূপ বিরোধী সিদ্ধান্ত করেন

নাই। শঙ্করাচার্য্যের দুই স্থলের তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য দুই প্রকার; তাহাতেই আপাততঃ অংশদ্বয় বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে গৃহীর মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল। মনুতেও এই শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের সময়ে ও গীতার সময়েও গৃহীর মধ্যে এইরূপ কয়েকটী শ্রেণীবিভাগ ছিল, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। শঙ্কর ছান্দোগ্যের ভাষ্যে গৃহীর সেই এক বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। গীতা-ভাষ্যে সাধারণ গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই এইমাত্র বলিয়াছেন। গৃহস্থের মধ্যে শ্রেণী বিশেষের যে উহাতে অধিকার নাই, এ কথা বলা শঙ্করের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ঐ স্থলে নিকৃষ্ট গৃহীই তাঁহার লক্ষ্য। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রাচীন কাল হইতেই,গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে চারি প্রকারের শ্রেণীবিভাগ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকারী গৃহস্থই গৃহীর সাধারণ লক্ষণ ছিল। তদ্ব্যতীত, গৃহীর মধ্যে চারিটী শ্রেণী ছিল। মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে সেই চারিটী শ্রেণীর এইরূপে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) "এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্র-বিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি"। এই সকল গৃহস্থ বাহিরে কোন রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চযজ্ঞ করিতেন। (২) "বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃতি মক্ষয়াং"। এরূপ গৃহীরা বাক্যেতে নিঃশ্বাসের বহন ও নিঃশ্বাসে বাক্যের বহন করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতেন। "জ্ঞানেনৈবা পরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞান মূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।" ইঁহারা আর একটু উন্নত গৃহস্থ। এই তিন শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলেন যে, "শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদ-সংন্যাসিনাং গৃহস্থানা মমী-বিধয়ঃ,"—অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর প্রতি এই সকল বিধি। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আর এক রূপ গৃহীর উল্লেখও মনুতে দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।" গীতাতেও ঠিক্ এই রূপে গৃহস্থের চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যে কেবল মাত্র সাধারণ-গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার মাত্র বলিয়াছেন। নতুবা গৃহীর সকল শ্রেণীর পক্ষেই যে ধ্যানযোগ নিষিদ্ধ,—এরূপ বলা শঙ্করের অভিপ্রায় হইতে পারে না। এইজন্যই আমাদের বোধ হয় যে, বাস্তবিক পক্ষে ভাষ্যদ্বয়ে কোনরূপ বিরোধ হয় নাই।

এখন আমরা অতি সংক্ষেপে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ মহোদয়ের আর একটী স্থলের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ আছে কিনা? এই বিষয়ের বিচার স্থলে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বলেন যে, "এ উভয়ের অত্যন্ত সাম্য করিতে গিয়া শঙ্কর সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।" আমাদের বিবেচনায়, একথা ঠিক্ নহে। শঙ্কর সত্যের অপলাপ করিয়াছেন,একথা প্রমাণ করা সহজ হইবে বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। রামানুজাদি

বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের ন্যায় শঙ্কর দ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বেদান্ত ভাষ্যে জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত-অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই রূপ মত ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই; এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শঙ্কর এইরূপ ঘোরতর অভেদই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিরতিশয় সূক্ষ্ম এবং অবিভাগাবস্থায় শক্তিরূপে বিলীন থাকা প্রযুক্ত, যেমন শঙ্কর, প্রকৃতিকে অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, জীবাত্মা-সম্বন্ধে সেরূপ নহে। যাহাকে স্থূল-শরীর বলিয়া স্থাবর-জঙ্গমে দেখা যাইতেছে, তাহারই নিতান্ত সূক্ষ্ম ও আকাশাদিভাবে অবিভাজিত অবস্থাকেই যখন তিনি,প্রকৃতি-শক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে এক ধরিয়া লইয়া, প্রকৃতিরই বিবর্ত্ত (বেদান্তপরিভাষার কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের টীকা দ্রষ্টব্য) হয়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে আর জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার সম্ভবে না। প্রকৃতিজাত খণ্ডদেহাদিলিপ্ত অবস্থার নামই তাঁহার মতে জীবাত্মা। নতুবা জীবাত্মা সেই পরমাত্মাই। পণ্ডিত গৌর-গোবিন্দ দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন:— (১) "নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎ প্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং," এবং (২) "সামু-দ্রোহি তরঙ্গঃ ন চ ন সমুদ্রস্তরঙ্গো ভবতি।" এই দুই শঙ্করোক্তির বলে, তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন' যে, শঙ্করাচার্য্যের মনো-ভাব জীবাত্মা সম্বন্ধে একরূপ দ্বৈতগ্রাহী। আমরা কিন্তু সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত বলি-তেছি যে, এস্থলেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের নিকটে অন্যরূপ বোধ হয়।"প্রকৃতি দ্বয় নিত্য" কি হিসাবে? আমাদের বোধ হয়, শঙ্করের ঈশ্বর যে হিসাবে নিত্য, প্রকৃতিদ্বয়ও কেবল সেই হিসাবেই নিত্য। শঙ্করের অভিপ্রায় এই-রূপ। ব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ যে মুহূর্ত্তে বিলীন-শক্তিপুঞ্জের স্ফূর্ত্তির আরম্ভ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্ম ঈশ্বর-পদবাচ্য এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই প্রকৃতিদ্বয়েরও নিত্যতা। নতুবা নির্গুণ ব্রহ্মে, ঈশ্বরেরও স্থান নাই এবং প্রকৃতিদ্বয়েরও স্থান নাই। শঙ্কর যে অন্যত্র জীবাত্মার জগৎস্রষ্টৃত্বরূপ কর্তৃত্ব থাকিবে না, বলিয়াছেন, সেও এই হিসাবে এবং এই অভিপ্রায়ে। ব্রহ্মেরই যখন সগুণ অবস্থা "ঈশ্বর," তখন বিলোমভাবে জীবের যখন মুক্তি আরম্ভ হয়, তখন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে যাইতে যাইতে, জীবাত্মারও অবশ্য "ঈশ্বরে" লয় হইতে থাকিবে। তার পরে, ঈশ্বর যখন ব্রহ্মই, তখন জীবাত্মাকে ও আবার গিয়া নির্গুণ ব্রহ্মেও পড়িতে হইবে। অতএব যখন জীবাত্মা ঈশ্বরে লীনা-বস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থাতেই কেবল তাহার স্রষ্টৃত্ব শক্তি থাকিবে না। অর্থাৎ কথাটা এই যে, সে অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ দ্বৈতভাব না থাকিয়া পারে না। কেন না, তখনও কিঞ্চিৎ গুণ ও ক্রিয়ার Concep-tion থাকিবেই। কিন্তু নির্গুণে পড়িলে, জীবাত্মা সেই সামান্য ভেদটুকুও থাকে না। শঙ্করের গূঢ়অভিপ্রায় এইরূপ। এইকথাটা পণ্ডিত Max-muller কতকটা বুঝিয়াছি-লেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ—

"Phenomenal God does not mean what is unreal and false. It is the most real God only as conceived by "*human understanding*," which can never form an adequate idea of impersonal self. Phenomenal Brahma is therefore nothing

but real Brahma. Human mind cannot conceive God except behind the veil of human thought."

আমরা সংক্ষেপে যে তত্ত্বের আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলাম, এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, শঙ্করের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন হইয়া যায়। বোধ হয়, এই ভাবে শঙ্করকে বুঝিলে, সাংখ্যের বহু পুরুষবাদেরও সঙ্গতি হইয়া যায়। প্রকৃতির দ্রষ্টৃত্ব রূপেই সাংখ্য-পুরুষের "পুরুষত্ব" সংজ্ঞা। যতদিন প্রকৃতির কার্য্যদর্শন, ততদিনই পুরুষ। প্রকৃতির আদিম-বিকারের স্ফূর্তি এই পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব-নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির আলিঙ্গন যতদিন, ততদিন প্রত্যেক বিকারের উপাধিযোগে পুরুষের মধ্যেও ভেদ। ততদিন পুরুষ নানা। প্রকৃতির আলিঙ্গন বিচ্যুত হয়, তখন আর পুরুষের নানাত্ব নাই। তখন সকলেই এক পুরুষমাত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু একথা বুঝিয়াছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর পদানুসরণ করিয়া একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এ কথার আভাষ দিয়াছেন।

"Kapil did not differ so much from Badarayan, because if "*Purushas*" were supposed to be many, they would not be "*Purushas*," and being Purush, they would by necessity cease to be many. By admitting Purush, he admitted a belief in something transcendant."—

এই জন্যই ত কপিল আর ঈশ্বর স্বীকারের স্বতন্ত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের লিখিত "ক্ষর" অর্থ প্রকৃতি, "অক্ষর" অর্থ প্রকৃত্যধিষ্ঠিত নানা পুরুষ এবং "উত্তম পুরুষ" অর্থ প্রকৃতি-বিনির্ম্মুক্ত পুরুষ, অতএব স্বরূপেক্ষ্য স্বতঃ ব্রহ্ম—এইরূপ অর্থ করিলেই, আমরা যাহা বলিলাম, গীতারও সেই মত স্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

তবে এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অদ্বৈত-তত্ত্বের হানি হয় না কেন? শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত ভাষ্যে এই প্রশ্নের ৪ প্রকারের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। (১) ব্রহ্মে তখন শক্তি বা মায়া "অবিভাগাবস্থায়" থাকে। যাহার বিভাগ হয় নাই, তাহা বস্তুন্তর হইয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? যেমন বীজমধ্যবর্ত্তী অঙ্কুর পত্র পুষ্পাদি। (২) বাহ্যবিষয়ের অন্তরালবর্ত্তী Substratum এবং আন্তরিক বৃত্তিনিচয়ের অন্তরালবর্ত্তী Substratum উভয়ই একই ব্রহ্মবস্তু। "স" এবং "অহং" একই পদার্থ। The thing that holds them (perceptions) and the soul that receives them are the same." শঙ্করের (৩) উত্তর এই যে, জ্ঞান জন্মিলে যখন এ গুলি আত্মাতে কিছুই প্রতিভাত হয় না, তখন মায়াকে ব্রহ্মের ন্যায় সৎপদার্থ বলা যায় না। বিশেষতঃ অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে বলিয়াই যখন শব্দ স্পর্শাদিময় জড়রূপে সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে, এবং ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিগুলি নিজেও যখন অসৎ, অর্থাৎ উহারাও যখন থাকিবে না, তখন, অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হইল কৈ? এ স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দর্শন কেবলমাত্র বাহ্য পদার্থের মাত্র সত্বা উড়াইয়া দিয়া, উহাকে phenomenal বলিয়াছেন, কিন্তু কেহই সাহস পূর্ব্বক অন্তঃকরণাদি বৃত্তিগুলিকে অসৎ বা phenomenal বলেন নাই। শঙ্কর কিন্তু তাহাও করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ইহারাও ঠিক্ তদ্রূপ অসৎ বা phenomenal মাত্র। শঙ্করের (৪) উত্তর এইরূপ:—যদিও অবি-

ভাগ ভাবে ও সূক্ষ্মরূপে শক্তি তাঁহাতে থাকে, তথাপি স্থূলাবস্থার ন্যায় সেই অতি সূক্ষ্মাবস্থাতেও, ব্রহ্ম সেই শক্তির মধ্যগত হইয়াও, তদতীত থাকেন। তিনি "শক্তি" হইতে সেইরূপে পৃথক্। নতুবা শক্তিকে তিনি নিয়মিত করিবেন কি প্রকারে? তাঁহাতে গুণ ক্রিয়াদি অবিভাজিত অবস্থায় লীন থাকিলেও, সর্ব্বাতীত বলিয়া, তাঁহার নির্গুণত্বের ক্ষতি হইতেছে না। "জীবো হি অবিদ্যাবশাৎ দেহাত্মভাবমিব গত্বা অবিদ্যাকৃতং সুখদুঃখোপভোগমভিমন্যতে, × × × নৈবং পরমেশ্বরস্য"। এ অবস্থায় তিনি ঈশ্বর হইয়াও নির্গুণ। আর এক স্থলে—"পরমাত্মনঃ স্বরূপ ব্যপাশ্রয় মৌদাসীন্যং, মায়াব্যপাশ্রয়ন্ত প্রবর্ত্ত কত্বং"। সুতরা দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদের হানি হইতে পারিল না। অবিভাগাবস্থায় একত্ব বিনষ্ট হয় না। একটী নর-বীজে—যেখানে কিছুরই বিভাগ নাই—তাহার এম্‌নি শক্তি নিহিত থাকে যে, সেই শক্তির বিকাশ স্বরূপ, চল্লিশবৎসর পরে, সন্তানে সেই রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়,—ষষ্ঠাঙ্গুলিটী পর্য্যন্ত সন্তানের হস্তে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পরে প্রকাশিত ঐ বিভাগগুলি, বীজে বহুপূর্ব্বে শক্তিরূপে লীন থাকিয়া যায়। জ্ঞানের স্ফূর্ত্তির নামই ক্রিয়া। সংকল্প ব্যতীত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্পের অভ্যুদয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রিয়ার আরম্ভ। কিন্তু সংকল্প প্রকাশের অবস্থাই, শঙ্করের মতে, ব্রহ্মের সগুণ ভাবাবলম্বন। অতএব ঈশ্বর হইতেই ক্রিয়ার আরম্ভ। ব্রহ্মে যাহা শক্তিরূপে একাকার ছিল, তাহারই ঈশ্বরে বিভাগ আরম্ভ হইল। কাজেই অবিভাগাবস্থায় অদ্বৈততত্ত্বের হানি হইতে পারিল না। এই জন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়াচ"—উক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই "ক্রিয়া" শব্দটীর সর্ব্বশেষে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বল বা শক্তি, জ্ঞানেরই অবস্থাভেদ। অবিভাগাবস্থাপন্ন "বলই" জ্ঞান। সেই একাকার ব্রহ্ম-শক্তির বিভাগাবস্থার স্ফূর্ত্তির আরম্ভই "ক্রিয়া" পদ বাচ্য। সেই ক্রিয়া হইতেই সংসার-প্রাদুর্ভাব। শঙ্কর এই অবস্থাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্রহ্মকে নির্গুণ ও সগুণ বলিয়াছেন। আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তি যতদিন আছে, ততদিন আমাদের নিকটে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ সগুণ ভাবেই প্রতীত থাকিবে। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মও সত্যপদার্থ। মনোবৃত্তিগুলি যে ভাবে সত্য, এই ঈশ্বরও সেই ভাবে সত্য। শঙ্কর মতে এইরূপে অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয় নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত, শঙ্কর অন্য কোন রূপে, কোথাও জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলেন নাই। এমতে তাঁহার পক্ষে, ভিন্ন বলাও অসম্ভব।

প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বক্তব্য আমরা এই স্থলেই শেষ করিলাম। এই সমন্বয়ভাষ্যের নামকরণ সম্বন্ধেও আমাদের কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। অনুগীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া গীতোক্ত মতের সমন্বয় হইতে যেরূপ উত্তম সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত সাধিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের সঙ্গতির চেষ্টা ইহাতে সেরূপ ভাবে করা হয় নাই। পরন্তু শিশুপালবধ মহাকাব্যের টীকায়, মল্লিনাথ, "ভাষ্য" শব্দের যেরূপ শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা প্রদান

করিয়াছেন, এ ভাষ্যটী সেই সংজ্ঞানুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দের ন্যায় একজন ঋষিকল্প, চিন্তাশীল, মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, এই ভাষ্যের রচয়িতা বলিয়া, আমরা ইহার স্থান বিশেষের সম্বন্ধে আপত্তি দেখাইলাম। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত ভাষ্য একটী অমূল্যরত্ন স্বরূপ হইয়াছে। এদেশে ইহার মত সারগ্রাহী মীমাংসক বর্ত্তমান রহিয়াছেন, একথা স্মরণ করিতেও আমাদের অন্তঃকরণ হর্ষ ও গৌরবে আপ্লুত হয়। আশা করি, পণ্ডিত মহোদয় আমাদের এই পতিত দেশের রত্নোদ্ধার কার্য্যে এইরূপে ব্রতী থাকিয়া, দরিদ্র ও বিলুপ্ত-গৌরব এই জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করুন্। পরিশেষে, বিনীত নিবেদন এই যে, যদি কোথাও আমরা তাঁহার উপরে অশিষ্টতাসূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে উপাধ্যায় মহাশয় তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরীর লড়াই। (শেষ)

রঙ্গমালা রাজচন্দ্রকে লাথি মারিতে চাহিল। চৌধুরী অমনি অগ্নির "হলকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া" রঙ্গ-মালাকে যে পাঁচশ টাকার গহনা দিয়াছিল,তাহা কাড়িয়া লইয়া গামছায় বান্ধিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন খুড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া "আগের পাও পাছে নামাই সেলাম করিয়া" বলিল আত্মারাম নড়ের (রঙ্গমালার বাপের) ১৪ বৎসরের খাজানা বাকী, আমাকে ৪ জন পেয়াদা দিন্, তাহাকে "মুগইরে ঠেঙ্গাইয়া" খাজানা আদায় করিয়া লই। খুড়া বলিলেন 'আচ্ছা বাপু'। তখন সেই পেয়াদারা গোলাপ রায়কে রঙ্গমালার সম্মুখে বান্ধিয়া আনিয়া চৌধুরীর নিকট হাজির করিল। চারি দিন অতীত হইল, তবু গোলাপ রায় খালাস হইল না, রাজচন্দ্রও রঙ্গমালার বাটীতে গেল না। তখন রঙ্গ মালা "হেকমত"করিয়া চৌধুরীকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এক প্রেমলিপি লিখিয়া পাঠাইল।

* * * * *

ওহে বন্ধুপ্রাণ সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটি বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
খাইট (১) গুণা অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥ ইত্যাদি

পত্র পড়িয়া চৌধুরী "মুখের মধ্যে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল" ও খুড়ার বাক্স হইতে তিনশ টাকা বাহির করিয়া নিয়া গোলাপের বাকী খাজনা শোধ করিয়া তাহাকে খালাস করিয়া দিল। খুড়া আবার সেই টাকা গণিয়া বাক্সে রাখিলেন।

একদিন সোণামালার মনে সাধ হইল, রঙ্গমালা কি রকম সুন্দরী দেখিব। তিনি হীরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া রাত্রে রঙ্গমালার বাড়ীতে গেলেন। তিনি কি দেখিলেন?—

"রঙ্গমালার ছুরত (২)যখন নয়নে দেখিল।
রূপে মগ্ন হইয়া কন্যা ঢলিয়া পড়িল॥
ষোল আনা রূপ ছিল প্রভুর দরবারে।

(১) খাইট গুণা—দোষ, অপরাধ।
(২) ছুরত—চেহারা, রূপ।

স্বতিমানা করি রূপ বাটিল সবারে।
দুই গুণ রূপ ছিল রঙ্গমালার গায়।
ভুবনমোহন কন্যা হইল উদয়।
এমন মোহন রূপ দিছে বিধাতায়।
থাকরে মনুষ্য যেন দেবতা পলায়।"

এইরূপে সোণামালা দ্বারা রঙ্গমালার রূপের প্রশংসা করাইয়া কবি বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, রঙ্গমালাকে রাজচন্দ্রের সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া সোণামালার ভয়ানক রাগ হইল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সদর দরজার উপরে একটা ঝাঁটা, ও তাহার নিজের ঘরের দরজার উপরে একখান জুতা বাঁধিয়া রাখিলেন। রাত্রিশেষে রাজচন্দ্র ঘরে আসিবার সময় ঝাঁটা ও জুতা উভয়ের সহিতই তাহার মস্তকের পরিচয় হইল, কিন্তু তাহার ফলে সোণামালার কপালে কিঞ্চিৎ প্রহার ঘটিল।

রঙ্গমালা একদিন বাহানা ধরিল—আমাকে তীর্থ দর্শনে লইয়া চল ও আমার আগ দরজার উপরে একটা বড় দীঘি কাট। কি করেন, উপায় নাই; রঙ্গমালাকে লইয়া রাজচন্দ্র চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিলেন। সেই তীর্থ-যাত্রার বিবরণে আমাদের কাজ নাই। এই দীঘি কাটা লইয়াই আমাদের কাজ। কি কুক্ষণে এই দীঘি কাটার প্রস্তাব উঠিয়াছিল—এই দীঘি কাটা ব্যাপারই চৌধুরী বংশের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। সেই রঙ্গমালার দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে।

রাজচন্দ্র চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিয়া আসিলেই রঙ্গমালা আবার দীঘিকাটার আবদার করিল। তখন রাজচন্দ্র টান দিয়া চিনের কাগজ বাহির করিয়া হিজলী পর্ব্বতে মগের সর্দ্দার রামা মগের নিকট চিঠি লিখিলেন। পত্র পাঠ মাত্র নয় শত মগ ধামা ও কোদাল হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজচন্দ্র হুকুম দিলেন, সাত দিনের মধ্যে দীঘি কাটা শেষ করিতে হইবে; দীঘিটা দেড় দ্রোণ (১) জমি লইয়া হইবে। আজ্ঞা মাত্রে মগেরা দীঘি কাটা আরম্ভ করিল। তখন রাজচন্দ্রের চিন্তা হইল, টাকা পাই কোথায়? আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, রাজচন্দ্রের এক রাম ভাড়ালা ছিল, ইনি চাঁদ ভাড়ালীর জুড়ীদার (দ্বিতীয় সংস্করণ)। তিনি পরামর্শ দিলেন, কেন টাকার ভাবনা কি? আমি বউ ঠাকুরাণীর (সোণামালার) নিকট হইতে টাকা আনিয়া দিতেছি। তখন রাম ভাড়ালী বউ ঠাকুরাণীর কাছে গিয়া খুব হাসিখুসী হইয়া বলিতে লাগিল "আজ্ঞে, আর কোন পরোয়া নাই; আমি কর্ত্তাকে রঙ্গমালার নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছি। এখন আপনার নামে একটী খুব বড় দীঘি কাটা হইবে, আপনার টাকাগুলি চাই।"

ইহা শুনিয়া সোণামালা খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, (এবার কবিবর অগ্নির হুলকার উপমাটা ভুলিয়া গিয়াছেন), বলিলেন, "আমার দীঘি পুষ্করিণীর কাজ নাই। রসো, দাঁড়াও একবার তোমাকে মজা দেখাইতেছি।" ইহা বলিয়া "পিছা" (ইনি শতমুখীরই রাজকীয় সংস্করণ) হস্তে রাম ভাড়ালীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; তখন—

"ধায় আর রাম ভাড়ালী পিছের দিকে চায়।
আর নি বউ ঠারাইনে আমার লাগ পায়।"

(১) ৬ কানিতে এক দ্রোণ; ৪ বিঘা ১৬ কাঠায় এক কাণি। দেড় দ্রোণে ১১৪ বিঘা, প্রায় ৩৮ একর।

এখন যে দীঘিটা রঙ্গমালার দীঘি বলিয়া পরিচিত, তাহার ক্ষেত্রফল অনুমান ১০ কাণি হইবে।

রাজচন্দ্র সেই রাম ভাড়ালী ভগ্ন দূতের বাচনিক সরেওয়ার অবগত হইলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া "প্রাণের খুড়ার" সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া দুই তোড়া টাকা লইয়া রঙ্গমালার বাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মঙ্গলবারে দীঘির জলতোলা হইবে, সেই উপলক্ষে চিড়া খাওয়ার জন্য রঙ্গমালার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণের পত্র পাঠান হইল। তখন "কাবুদ্ধিয়া মহারাজেরে কুবুদ্ধিয়ে পাইল," তিনি সেই নড় বংশকে ত নিমন্ত্রণ করিলেনই, অধিকন্তু দত্তপাড়া, খিলপাড়া,লামচর মাইজদী প্রভৃতি স্থানের রাজবংশকেও সেই চিড়া খাওয়ার নিমন্ত্রণের পত্র পাঠাইলেন। এমন কি, আপন খুড়া রাজনারায়ণকেও রঙ্গমালার নামে এক চিঠি পাঠাইলেন। ইহাই সকল অনর্থের মূল হইল।

খুড়া রাজনারায়ণ যখন সেই নিমন্ত্রণের পত্র পাইলেন, তখন তাঁহার "আসমান ভাঙ্গিয়া যেমন মস্তকে পড়িল।" তখন তিনি সুমিত্রাকে ডাকাইয়া সেই দুরন্ত আসমানের কথা বলিলেন। সুমিত্রা বলিলেন, রাজচন্দ্র আমার কাল পুত্র, তাহাকে কাটিয়া ফেল। শেষে চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে রাজচন্দ্রকে রঙ্গমালার বাটী হইতে কৌশল ক্রমে ডাকিয়া আনিয়া সেই নড়ের বংশ কাটিয়া ফেলা স্থির হইল। চাঁদ বীরের এবারত অনুসারে রাজনারায়ণ প্রাণের ভাতিজাকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন;—

"বাইশ মুলুকের জমীদার করিছ বর্তন (১)।
কি কি জিনিস তুমি করাইবা ভোজন॥
জানিতে বাসনা অতি হইয়াছে মনে।
পত্র পাই বাহাবাঁধ আইস তুরমানে (২)॥"

(১) নিমন্ত্রণ। (২) শীঘ্র।

সেই চিঠি পাইয়া রাজচন্দ্র অনেক কষ্টে রঙ্গমালার নিকট বিদায় নিয়া বাড়ী আসিল। রঙ্গমালা কোন মতে ছাড়ে না; সে মনে বুঝিয়াছিল—

সকালেতে মহারাজ লৈ যায় ডাকিয়া।
কাইল যেয়ানে দুঃখিনীরে ফেলিবে কাটিয়া॥

রাজচন্দ্র বাড়ী আসিয়া খুড়ার সঙ্গে দেখা করিলেন। সেই দিন রাত্রে চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে সোণামালা স্বামীকে "বদরঙ্গের গাঁজা" দিয়া শরবত বানাইয়া খাইতেদিলেন। রাজচন্দ্র অচেতন হইয়া রহিল। এদিকে চাঁদ ভাড়ালী একুশ হাজার সৈন্য লইয়া গিয়া রঙ্গমালার বাড়ী ঘেরাও করিল। (এত সৈন্যের কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝা যায় না, এটা বোধ হয় কবির হস্ত কণ্ডুতি)। চাঁদ গোলাপ রায়কে বান্ধিল, রঙ্গমালার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকেও বান্ধিয়া আনিল। তাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগাইল। মনুষ্যের রক্ত দিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইল, এবং জয়কালীর কাছে প্রথমে রঙ্গমালাকে ও পরে তাহার ভাইকে বলি দিয়া তাহাদের মুণ্ড রুমালে বান্ধিয়া রাজনারায়ণের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। রঙ্গমালার মুণ্ড দেখিয়া রাজনারায়ণ আক্ষেপ করিলেন—

কিরূপে বধিলা চাঁদ কন্যার পরাণ।
সুরতের বাথান দেখি বিদরে পরাণ॥
এমন সুন্দর রঙ্গে মাল্লি কিসের লাই।
ভাতিজা হইবে পাগল রঙ্গমালার লাই॥ ইত্যাদি

পরদিন প্রভাতে যখন রাজচন্দ্র রঙ্গমালার কাটা ধড় দেখিল, তখন যথার্থই পাগল হইল। সোণার বান্ধা তলোয়ার নিয়া খুড়াকে কাটিবে বলিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। এ দিকে অলক্ষিতে থাকিয়া চাঁদবীর

তাহাকে বজ্রমুষ্টি প্রহার দিল। তখন রাজচন্দ্র খুড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া, বরিশালে ইংরেজের নিকট গিয়া নালিশ করিল ও পাঁচ শত সিপাই লইয়া আসিল। এদিকে রাজনারায়ণ চৌধুরী ও যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। বক্তিয়ার সিং নামক এক ব্যক্তিকে তিনি সেনাপতি করিয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সে লোকটা নিতান্ত বেকুব; সে ইংরেজ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া হরিশ্চন্দ্র দীঘির নিকটে গিয়া রাজচন্দ্রের ভাই রাজকিশোরের মুণ্ড কাটিয়া আনিল। সেই কাটামুণ্ড দেখিয়া রাজনারায়ণ ও সুমিত্রা অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। রাজগঞ্জে ইংরেজ সৈনা রাত্রে অবস্থান করিতেছিল; চাঁদ ভাড়ালী অতর্কিতে কামানে আগুন দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। প্রাণ বাঁচাইতে সুবাদার দীঘিতে ঝাঁপ দিল; চাঁদ ভাড়ালী বাঁশ দিয়া তাহাকে টানিয়া উপরে উঠাইয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলিল।

ইংরেজ সৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, রাজচন্দ্র নিরুপায় হইয়া, গোপালপুরের জমিদার ঈশা চৌধুরীর শরণাপন্ন হইয়া বলিল—

শুন শুন মহারাজ কহি তোমার ঠাঁই।
ধরমের পিতা আমি তোমারে বোলাই॥
চারি আনা জমিদারী দিলাম লিখিয়া।
প্রাণের খুড়া রাজিনারাণ আনহে বান্ধিয়া॥

ঈশা চৌধুরী, তাহার ভাই মহম্মদ রাজার নিষেধ সত্ত্বেও সেই জমিদারীর প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না। রাজচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইল। রাজনারায়ণ যখন একথা শুনিলেন, তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইলেন। চাঁদ ভাড়ালীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তখন সময় পাইয়া বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল, যদি মোহন মালাকে(১) রাঙ্গাবাঘের (২) সঙ্গে বিয়ে দেও, তবে ঈশা চৌধুরীর গলা কাটিয়া ফেলিব। মহারাজ একথা শুনিয়া আপমানে ও দুঃখে কিছুই বলিলেন না। তিন দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ঈশা চৌধুরী বচ্ছুলপুর গ্রাম পোড়াইয়া চলিয়া গেল। অগত্যা মহারাজ মোহনমালাকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তখন চাঁদ ভাড়ালী আবার তাহার বুদ্ধির "চোঙ্গা খুলিল"। তাহার পরামর্শে ঈশা চৌধুরীর সহিত সন্ধি স্থাপন হইল। কিন্তু সে কৃত্রিম সন্ধি। একদিন চাঁদ ভাড়ালী বৈষ্ণবী সাজিয়া ঈশার বাড়ীতে রাত্রিযোগে গিয়া উঠানে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। কীর্ত্তন শুনিয়া ঈশা চৌধুরী ঘরের বাহির হইলে, চাঁদবীর খঞ্জরী ফেলিয়া তলোয়ার ধরিল ও এক কোবে ঈশার মাথা কাটিয়া ফেলিল। পরে একে ২ তাহার দুই ভাই ও স্ত্রী নুর বিবি যুদ্ধ করিতে আসিল, চাঁদবীর তাহাদেরও গলা কাটিয়া ফেলিল। তখন মহম্মদ রাজাকে ধরিল—সে পলাইয়া গিয়া ওয়াবাদে মনোহর গাজীকে সংবাদ দিল।

মনোহর গাজী ঈশার শ্যালক, একজন ক্ষমতাশালী জমিদার। ইনি পর্ব্বতের কুকীদিগকে ও আপন জাগীর্দারদিগকে লইয়া রাজচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলেন। এবার কিন্তু চাঁদ ভাড়ালীর ফিকির খাটিল না। চাঁদ ভাড়ালীর সৈন্যগণ মনোহরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা পড়িল।

(১) (২) ইহারা কে, জানা যায় না।

তখন চাঁদ ভাড়ালীর পরামর্শে রাজনারায়ণ পুত্র কন্যা লইয়া জঙ্গলে পলাইলেন। মনোহর গাজী আসিয়া তাঁহার বাড়ী দখল করিয়া বসিল, ও অনেক রকম অত্যাচার করিল।

রাজনারায়ণ টিপাবার পলাইয়া গেলেন। সেখানে মগের রাজা তাঁহার দুইটী সুন্দরী কন্যা উদয় তারা ও নয়ন-তারাকে দেখিয়া বলিল, ইহার একটী আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেও। রাজনারায়ণ অসম্মত হইলেন; তখন মগের রাজা ঢাকার ইংরেজের নিকট পত্র পাঠাইয়া রাজনারায়ণকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল। সিপাহীরা রাজনারায়ণের পায়ে দড়ী বেড়ী বান্ধিয়া নিয়া চলিল; চাঁদ ভাড়ালী তাঁহার কন্যা দুইটী সঙ্গে করিয়া নিয়া চলিল। চৌধুরী বাবুপুরে আসিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। রাজনারায়ণের পায়ে সেই দড়ী বেড়ী দেখিয়া ঠাকুরাণীর সহ্য হইল না। তিনি চাঁদ ভাড়ালীকে সোণারী বাড়ীতে পাঠাইয়া সোণা রূপার বেড়ী বানাইয়া আনিয়া মহারাজের পায়ে পরাইয়া দিলেন! (১)

রাজনারায়ণ ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব হুকুম দিলেন, ইহাকে হাতি দিয়া মার। রাজনারায়ণ কালীভক্ত ছিলেন; হাতী তাহার গায়ে পা তুলিল না। তখন সাহেব জল্লাদকে হুকুম দিলেন, ইহাকে তোপ দিয়া উড়াইয়া দেও। এবার জয়-কালী আসিয়া তোপের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কামান ভাঙ্গিয়া তেরজন খালাসী মারা পড়িল, রাজনারায়ণের কিছুই হইল না। তখন বড় সাহেব ও ছোট সাহেব মিলিয়া পরামর্শ করিয়া রাজনারায়ণকে বলিলেন, "এখনও আমাদের ফরাশডাঙ্গা দখল হয় নাই, তুমি এই যাদু বিদ্যা দ্বারা যদি সেই ফরাশডাঙ্গাটা আমল করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" রাজনারায়ণ বলিলেন, "সাহেব তোমরা আমার ধর্ম্মের বাপ, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি বাড়ী যাই। আমি সে সব বিদ্যা কিছুই জানি না।"

বড় সাহেব ভাবিলেন, এত ভাল কথা। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—সেই পুত্র যদি অনায়াসে মিলিয়া গেল, তবে কোর্টসিপের হাঙ্গামা ও পরে মেম সাহেবের শ্রীচরণে দাসখত লেখার মধ্যে আমি কেন যাব। বলিলেন "আচ্ছা বাপু, তুমি আমার বেটা, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তুমি বাড়ী চলিয়া যাও।" রাজনারায়ণ চৌধুরী সাহেবকে সেলাম করিয়া বাবুপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া গ্রন্থকার সকলকে আল্লা রছুল বলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পাঠকবর্গ এই লম্বা কেচ্ছা পড়িতে পড়িতে বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। ইহার উপর আর আমার গবেষণা করিয়া বিদ্যা প্রকাশের কোন প্রয়োজন দেখি না। মোটের উপর এই গল্পটী যতদূর অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সত্য বলিয়া বোধ হয়। গল্পের মধ্যস্থ ব্যক্তিগুলি সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঘটনাটাও এই রকম ঘটিয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে কবি-স্বভাব-সুলভ অতি-রঞ্জিত, অতি-প্রাকৃত, ঘটনারও সমাবেশ হইয়াছে। তাহা সুবুদ্ধি পাঠক সহজেই ধরিতে পারিয়াছেন। এই গল্পের মধ্যে যে কয়েকটী স্থান কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কবির কবিত্বের পরিচয়ও কতক কতক পাইয়াছেন। আরও কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) ইহা কিছু খাবা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা করিবার বড় রূপার চুড়ী গড়াইয়া দেওয়ার মত।

কবির কবিত্ব।

গ্রন্থারম্ভে কবি রঙ্গমালার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—

"কতবা কহিব কন্যার সুরতের বাখান।
চন্দ্রের রূপে কন্যার রূপে একই সমান॥
বেলইনে বেলিছে কন্যার হস্ত বাহু মূল।
চাম্পার কলিকা যেন এ পঞ্চ অঙ্গুল॥
হাত দুখানি রঙ্গের বেলুনে বেলিছে।
পদ দুখানি রঙ্গমালার কুন্দে তুলি লইছে॥
গিরপি নিশি হইছে কন্যার হরিষ গলায়। (১)
তাম্বুলের (২) রসাপিতে লাল দেখা যায়॥
নারঙ্গী কমলা যেন দুই পাও ধায়।
কালন্ত ভোমরা রঙ্গের চক্ষের উপর॥
কলিকার উপরে যেন বসেছে ভ্রমর।
বুকের উপরে জোড় কমলা দেখিতে বাহার॥
যদিস্যাৎ রঙ্গমালা কার দিগে চায়।
নয় হল্লিয়া (৩) কোঁচে যেন প্রাণ কাড়ি লয়॥"

শেষের দুই পংক্তির "নয় হল্লিয়া কোচের" উপমাটী ঠিক সেই কবির উপযুক্ত হইয়াছে। এ রকম আরও কত আছে।

এহেন রঙ্গমালার স্বামী রামগতিয়া গুজার (কুজার) বর্ণনাটাও একবার দেখুন—

মেরু (৪) দাড়া ভাঙ্গি গুজার বুক হইছে খাচা।
মুখের দিগে দেখিতে লাগে চোক খোরলিয়া পেঁচা।
এই মতে গুজার দাউদে খাইছে সর্ব্ব অঙ্গ।
দেখিতে গুজার রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ॥

রঙ্গমালার বেশ ভূষার বর্ণনাটা বেশ হইয়াছে।—

মেঘ ডোম্বরের সাড়ি জরির অঞ্চল।
কাচাসোণা খোপায় যেন করে ঝলমল॥
বান্ধিল মোহন চূড়া জাদের খোচনী। (৫)
মস্তকের চূড়া বেড়ি রয়েছে নাগিনী॥

(১) এই লাইনের অর্থ বুঝা গেল না।
(২) রসাপিতে—রস পান করিতে।
(৩) নয় হল্লিয়া—নয়টা লোহার শলাকা বিশিষ্ট কোঁচ অর্থাৎ মাছ মারিবার অস্ত্র।
(৪) মেরুদণ্ড।
(৫) মুসলমানদিগের বিবাহ কালে চুল বান্ধিবার ডোর বিশেষ।

ইহাতে তখনকার স্ত্রীলোকের বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়।

যখন রাজচন্দ্র খুড়ার পত্র পাইয়া রঙ্গমালার নিকট বিদায় নিতে গেল, তখন রঙ্গমালার উক্তি :—

খেলি করে অলি-রাজ পুষ্পেতে বসিয়া।
যাইবার কালে যায় বন্ধু সেই ডাল ভাঙ্গিয়া॥
খেলি করে হংসরাজে জলে হাসি বসি।
যাইবার কালে যায় বন্ধু সেইজল দুষি॥
বেপারি পলাইয়া যদি চৈলা যায় ঘরে।
ডুবাইয়া সোণার ডিঙ্গা গভীর সাগরে॥

ইঙ্গা চৌধুরী রাজনারায়ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এক বীরত্বসূচক পত্র লিখিয়াছিল—

মন ভয়ে যাও যদি কুপথের বন।
পক্ষীরূপ ধরি তথায় করিব গমন॥
মন ভয়ে যাও যদি দরিয়া মাঝার।
কুমির হইয়া যাব তোমার গোচর॥
পাতালে যাওরে যদি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
ছলে বলে সৈন্য লই তথায় কর্ব্বো গতি॥

রাজকিশোর হত হইলে তাহার শোকে সকলে কি রকম কাঁদিয়াছিল দেখুন—

মরিল মরিল বলি সবেধ (১) হইল ধুল।
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে বাগিচার ফুল॥
কান্দনের রোল শুনি কান্দে পশুগণ।
এই মতে বৃক্ষ আদি করয়ে রোদন॥
মাতা কান্দে পুত পুত ভৈন (২) কান্দে ভাই।
ঘরের রমণী কান্দে হারাইয়া গোসাই॥
হাতি কান্দে হাতি ঘরে আর কান্দে ঘোড়া॥
পেট্‌রাতে গড়াইয়া কান্দে পায়ের খাসা ঘোড়া॥
জলে কান্দে জল কুম্ভীর স্থলে কান্দে হাস।
পেটরাতে গড়াইয়া কান্দে হাতের(৩)গোলইম বাঁশ
জলে কান্দে জল কাঁমড়ী (৪) গর্ত্তে কান্দে উন্দ। (৫)
উদয়পুরের গোয়ালা কান্দে কারে দিব দুধ॥

(১) পাখী। (২) ভগিনী। (৩) অস্ত্র বিশেষ।
(৪) জল পক্ষি-বিশেষ। (৫) জন্তু বিশেষ।

স্থানে স্থানে কবির উপমাগুলির নূতনত্ব আছে :—

যদিস্যাৎ রঙ্গমালা কার দিকে চায়।
নয় হরিণয়া কোঁচে যেন প্রাণ কেড়ে লয় ॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
বাঁশ বিলে (৬) আগুন দিলে গিরা ফুটি যায়।
সে মতে গর্জ্জি উঠে চান্দাবীরের গায় ॥
(৭)বগুলার ঝাঁকে যেন খাবা দিল বাজে।
এই মতে পড়ে চান্দা সৈন্যগণের মাঝে ॥

পুস্তকের ভাষা।

এখন এই পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই প্রাচীন (archaic) বঙ্গ-ভাষা এখনও এই জেলার প্রচলিত। পশ্চিম বঙ্গের বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সহিত তুলনা করিলে এই ভাষাকে বাঙ্গলা বলিয়া চেনা কঠিন। ইংরাজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতার ভাষা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। আরও প্রভেদ হয় উচ্চারণের দোষে। পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত ভাষার সহিত, এই অঞ্চলের ভাষার যে যে বিষয়ে পার্থক্য, নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

প্রথমতঃ ব্যাকরণগত পার্থক্য।

(১) অসমাপিকা ক্রিয়া। করিয়া, খাইয়া, দেখিয়া শব্দের অপভ্রংশ কোরে, খেয়ে, দেখে। কিন্তু এই অঞ্চলে-করি, খাই, দেখি। উড়িয়া ভাষাতেও করি, খাই, দেখি; তবে সেখানে আবার সময় সময় এই সকল শব্দের উপরে একটা "কিরি" ব্যবহৃত হয়, যেমন খাইকিরি, যাইকিরি।

তুম্ প্রত্যয় দ্বারা যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাতেও প্রভেদ আছে। করিতে, খাইতে, দেখিতে, এখানে কর্ত্তাম, খাইতাম,দেখতাম,আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। "আমি করিতে পারিব না" এই দেশের ভাষায় হইবে, "আমি কর্ত্তাম পার্ত্তাম না।" বলা বাহুল্য তুম্ প্রত্যয়টা "করিতে" অপেক্ষা "কর্ত্তাম" শব্দে সহজে ধরা পড়ে।

(২) ভবিষ্যৎ কাল। করিব, খাইব, দেখিব—এই সকল ভবিষ্যৎকাল বোধক ক্রিয়া কর্ত্তাম, খাইতাম, দেখতাম্ এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৩) সতৃ প্রত্যয়। এই অঞ্চলের ভাষায় সতৃ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াতে সেই প্রত্যয়টী স্পষ্ট দেখা যায়। উঠৎ, বসৎ, খাড়ায়াৎ, শোয়াৎ। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় এক কথায় এইভাব প্রকাশ করা যায় না। "তাহাকে শোয়াৎ দেখিলাম"—ইহার অর্থ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় হইবে "তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিলাম।" "শয়ান দেখিলাম" বলিলে সংস্কৃত হইল।

(৪) 'লাঠি ধরে যে', কিম্বা 'লাঠি ধরা স্বভাব যার' এই অর্থ বিশিষ্ট একটী বিশেষণ সংস্কৃত 'শীল'প্রত্যয় দিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন মরণশীল, গমনশীল।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় দুই একটী ভিন্ন এরূপ এক কথার বিশেষণ নাই; কিন্তু এখনাকার ভাষায় আছে। "লাঠি ধরে যে"এক কথায় হইবে লাঠি-ধরণীয়া। এই পুস্তকের একস্থানে এই রকম কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে,যথা—

"আর এক কথা চৌধুরী কহি তোমার ঠাই।
বাপুরিয়ার (১) লাইল (২) লড়াইকরণিয়া, কাচ্ছদ কয়-

(৬) বাঁশের ঝাড়। (৭) বকের।

(১) বাবু পুরিয়া
(২) লাইন মত।

নিয়া, তীর-ধরণিয়া, বাঁশ-ধরণিয়া, গোলন—(৩) মারনিয়া, ছেল—(৪) মারনিয়া, বর্শা মারনিয়া, বন্দুক-ধরনিয়া, মহারাজ ত্রিজগতে নাই।"

পাঠকগণ দেখিবেন, এটী কিন্তু পয়ার-ছন্দের মিলযুক্ত দুইটী লাইন। উদ্ধৃত অংশে সেই সময়ে কি কি যুদ্ধের অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখিবেন। যাহা হউক, এই রকম ক্রিয়া যুক্ত বিশেষণ ইংরাজী ভাষায়ও আছে যথা। bone splitting labour, bread-winning ear-cutting ইত্যাদি।

(৫) কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি এদেশে এটার বড় ছড়াছড়ী। কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি এই অঞ্চলের ভাষায় এক রকম নাই বলিলেও চলে। রামচন্দ্র কহিল না বলিয়া ইহারা বলে "রামচন্দ্রে কহিল" সেই রকম আলিমন্দীয়ে কহিল, সোণাউল্লায় কহিল, ইত্যাদি। এই গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে—

"আবুদ্ধিয়া মহারাজেরে কুবুদ্ধিয়ে পাইল ইত্যাদি। ঠিক এই রকম উড়িয়া ভাষায়, সম্বোধনে সপ্তমী বিভক্তি হয়—হে দাসে মিশ্রে, চৌধুরীয়ে, গোমস্তারে ইত্যাদি।

(৬) বহুবচন। 'আমাদের' 'তাহাদের' প্রভৃতি বহুবচনান্ত শব্দ, আমার গো, তাহার গো, এই রকম আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাগো এই কথা আবার উচ্চারণ দোষে 'আঙ্গো' হইয়া পড়ে।

(৭) সপ্তমী বিভক্তি। বাড়ীতে, নদীতে, প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত শব্দ, 'বাড়ীৎ' 'নদীৎ' এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৮) "তুমি গিয়াছ নাকি ?" এস্থলে নাকি শব্দ স্থলে 'নি' ব্যবহৃত হয়। যাই পুনি, খাই ছনি, দেখছনি ইত্যাদি।

(৯) 'সে যাবেনা' এখানে না শব্দের পরিবর্ত্তে ঠিক মূল সংস্কৃত 'ন' ব্যবহৃত হয়। উড়িয়া ভাষায়ও এই রকম 'ন' অর্থে 'না,' তবে তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন মু ন-যিমি—আমি যাব না।

(১০) 'বাড়ী হইতে আসিল'—এই 'হইতে" বা থেকে স্থলে 'তুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাড়ী 'তুন' ঘবর তুন, ইত্যাদি। বিক্রমপুরে আবার এই 'তুন' 'তুনে' বা থনে এই আকার প্রাপ্ত হয়।

(১১)'তবেত রাজিন্দ্রেরে দিবাম ছাড়িয়া।' এস্থলে দিবাম অর্থে দিব। ঠিক সংস্কৃতের 'আনি, আব আম' প্রত্যয়ের আম। চলিত কথায় সচরাচর দিবাম স্থলে দিবঁা এই চন্দ্রবিন্দু যুক্ত পদ দেখা যায়।

(১২) তুই ভাত খাস "এখানে" খাস শব্দ খাইস শব্দের সংক্ষেপ। সংস্কৃত 'সি-অস্ থ'এর 'সি' প্রত্যয়ান্ত। এখানকার ভাষায় খা'স না হইয়া 'খাছ' ব্যবহৃত হয়। যেমন সোণামালা তাঁহার দাসীকে বলিতেছেন—

"বান্দী দাসীর জাতি তোরা সদায় পিছা খাছ।
কিল খুধা পাইলে তোরা আগে আগে ধাছ।"

খাছ—খাস; ধাছ—ধাস, দৌড়াইয়া যা'স।

(১৩) 'তুমি আমার একটা কথা রাখ দেখি' কিম্বা 'রাখত'। এস্থলে দেখি বা ত' স্থলে চাই বসে। যেমন—

"থোড়া একটী কথা মোর তুমি,রাখা চাই।
বহরমের খাঁজা দিয়া শরবত বানাও চাই।"

(১৪) খাইবার জন্য এস্থলে খাইবার 'লাগি' কিম্বা "খাইবার লাই" ব্যবহৃত হয়।

(৩) গোলইন—যুদ্ধের অস্ত্র বিশেষ। লোহ মাটির গুলী ছোড়ার জন্য বাঁশের বন্দুক বিশেষ।
(৪) ছেল—অস্ত্র বিশেষ।

(১৫) "সে সেখাতে গিয়া কি করিল? না এই কাজ করিল, এই কি করিল? স্থলে 'কোন ক'ম করিল' ব্যবহৃত হয় যথা—

এইমতে দাসীগণ কোন কাম করিল।
স্নান করাইয়া কন্যায় সাজাইতে লাগিল।

উড়িয়া ভাষাতেও ঠিক এই রকম প্রয়োগ আছে।

অনেকগুলি বিশুদ্ধ শব্দ কেবল উচ্চারণের দোষে অন্য রকম বোধ হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি—

(১) বর্গের প্রথম বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণের ন্যায়, দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আবার তৃতীয় বর্ণ চতুর্থ বর্ণের ন্যায়, ও চতুর্থ বর্ণ তৃতীয় বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

একদিন একটী বালক "কাল—কেশ, ভাল—বেশ" কে "খাল খেশ, বাল ভেশ" বলিয়া পড়িতেছিল।

(২) ক, খ, প, ফ, শ, ষ, স এই সকল বর্ণগুলি অনেক সময়ে 'হ' বলিয়া উচ্চারিত হয়।

পাঁচ টাকা—"হাঁছ ঠেহা" এই আকার প্রাপ্ত হয়।

একটী স্ত্রীলোকের নাম হাতেমা। এখন সেই হাতেমা প্রকৃতই হাতেমা, কিম্বা কাতেমা, সাতেমা, খাতেমা, ইহার কোনটার অপভ্রংশ তাহা ঠিক করা কঠিন।

বঙ্গদেশের এক প্রান্ত উড়িষ্যা হইতে, অন্যপ্রান্ত নোয়াখালী জেলা পর্য্যন্ত রজত মুদ্রার কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করা বড়ই কৌতুকজনক।

উড়িষ্যায়—টঙ্কা।
মেদিনীপুরে—তঙ্কা, ট্যাকা।
কলিকাতায়—টাকা।
ফরিদপুরে—টাকা, টাহা।
ঢাকায়—টেকা, টেহা।
নোয়াখালীতে—ঠেহা।

কতকগুলি শব্দ।

এখন এই অঞ্চলের প্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—

টাঙ্গন—ঘোড়া।
ধৈল্লা—ধবল, সাদা।
জাদ—মুসলমানের বিবাহকালীন কেশ বাঁধিবার ডোরা।
থোবানী—গুচ্ছ।
কেওয়াড়—কপাট।
মেঘডোম্বর—শাড়ী বিশেষ।
ছোলাঠার—কটাক্ষ, ইঙ্গিত।
বৈন—ভগিনী।
লগে—সঙ্গে।
জরপ—আঘাত।
টবক—উল্লম্ফন দেওয়া।
ধাড়ী কাটা—হোগলার অংশ যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
দায়াড়—উপরে উঠিবার ধাপ বা সিঁড়ি।
ফুকী মারা—peep উকি দিয়া দেখা।
পটপটীয়া কথা বলা—তাড়া তাড়ি কথা বলা।
নাটা—দুষ্ট।
থটথাইয়া হাসা—উচ্চ হাস্য।
গলার থাওর—কণ্ঠস্বারা অস্পষ্ট শব্দ করা।
কায়লানী—কাল, ভীষণ মৃত্যু।
নাসরা মসারা কথা—অপ্রিয় ভাব।
ফালাই—ফেলিয়া।
ফাল—লাফ।
পাত্তি—পত্র।

খোয়াখাই—শিশির ভোগ করি।
বর্ত্তন—নিমন্ত্রণ।
তুরমান—শীঘ্র, সত্বর।
উরু ধরা—কোমর ভিড়া।
কল্লা—মুণ্ড।
চাই চাকরিয়া—চাকর বাকর।
কিসের লাই—কি জন্য।
তার্গে—তাদের—
কোল—অঙ্গীকার।
আপনা জাগাত—নিজ জায়গায়।
চঙ্গ—মই।
ছোলান—টানিয়া বাহির করা।
ঘরের পিছাড়া ঘরের পশ্চাৎ।
হঁা জর—কম্প জর।
মাতিল না—কোন উত্তর দিল না।
আউলাইয়া—এলো মেলো করিয়া।
পোলা পান—ছেলে পেলে।
তৈনাত—শীঘ্র তলব তাগাদা করা।
ভাবইয়া—নর্ত্তক বিশেষ।
বেয়ানে—প্রাতে।
মতে মতে—গোপনে গোপনে।
হুলকা—শিখা।
হামইল—তাঁত বাঁধিবার খুটি বিশেষ।
বাইন দুয়ার—পাছের ছোট দুয়ার।
পিলাইয়া—যাহার প্লীহা রোগ হইয়াছে।
খাছিয়াত—স্বভাব।
বুরা—খারাপ, মন্দ।
হাউসে—সখে, আহ্লাদে।
জোনা—জাতিটাকা—মেয়ে মানুষ ও শিশুদিগের সঞ্চিত টাকা।
কল্লা—মাথা।
সোটান—তালাস করা।
জরপ—ব্যথা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বীর কি বঙ্গে অসম্ভব ?

পঞ্জাব-কেশরী মহাবীর রণজিৎ সিংহ তখনকার ভারতবর্ষের মানচিত্র মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির অধিকৃত প্রদেশ সমূহকে রক্তরঞ্জিত দেখিয়া বলিয়াছেলেন, "সব লাল হো যায়েগা"। বাস্তবিক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এখন আমরা কার্য্যে পরিণত দেখিতেছি। সে সময়ে শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, এখন সমগ্র এসিয়া মহাদেশের প্রতি তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিনা, অনেকেরই চিন্তা ও ভাবনার বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের এসিয়ার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব হইতে রুশিয়া, দক্ষিণ হইতে ইংরাজ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে ফরাসী জাতি যে ভাবে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র এসিয়াখণ্ড যে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পদানত না হইবে, এ কথা কে বলিতে পারে ?

অধুনা চীন সাম্রাজ্যের যে একটা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত, তাহার পরিণাম যে কি হইবে, বলা যায় না। অনেকেই দেখিতেছেন যে,উহা এখন যে আকারেই আপনাকে প্রকাশ করুক না, আসলে উহা এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম। এসিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা বিধাতার অভিপ্রেত কি না, সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই যেন এই চীন-বিপ্লবের অবতারণা। ইউরোপ বলিতে

এখানে আমেরিকাকেও উহার সঙ্গে বুঝিতে হইবে, কারণ আধুনিক আমেরিকা ইউরোপেরই এক অভিনব সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধারণ ভাবে আমেরিকা অর্থে উক্ত মহাদেশের যুক্ত রাজ্যটিকে মাত্র বুঝাইয়া থাকে।

ইউরোপীয় জাতিগুলি যে চীন সম্রাটের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারহেতু বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এ কথা অবশ্য কেহ বিশ্বাস করেন না। চীনের অধিবাসীগণ যে বিদেশীয়গণকে পরমশত্রু বোধে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তৎপ্রতিরোধই ইউরোপীয় শক্তি সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাহারই জন্য এই বিপুল শোণিতপাতের আয়োজন। চীনরাজ্যে মোড়োলী করিবার অধিকার থাকিলে ইউরোপের কি লাভ যে এত ছুটাছুটি, মারামারি, কাটাকাটির প্রয়োজন, তাহা দেখা যাউক। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত চারি কোটী টাকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে চীনে আমদানি হইয়া থাকে। এই বিপুল অর্থের মধ্যে কিঞ্চিদধিক এক কোটী টাকা জাপানী জিনিসে যায়, বাকী সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে চালান্ হয়। তন্মধ্যে ইংরাজ প্রায় ছয়ষট্টি কোটী টাকার জিনিস বিক্রয় করেন, আমেরিকায় প্রায় সাড়ে দশ কোটীর, রুষ পাঁচ কোটির কিছু উপায় মূল্যের, এবং জর্ম্মন, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি আর আর সকলে মিলিয়া প্রায় সাড়ে দশ কোটী টাকার মাল বেচিয়া থাকেন। চীন সাম্রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হইলে ইউরোপকে এই লোকসানটী সহ্য করিতে হইবে। তাহা ইউরোপ পারে না, বরং আরও বেশী মালের কাট্‌তি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে সমূহ চেষ্টা ইউরোপের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছে। এই হেতু সমগ্র ইউরোপ এক হইয়া চীনের বিদ্রোহীদলকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই তুমুল ব্যাপার সম্মুখে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতিগণের মনে কত প্রকার ভয় ভাবনা উদয় হইতেছে।

ইদানীং লণ্ডনের স্পেক্‌টেটর (Spectator) নামক পত্রিকা উক্ত বিষয়ের প্রস্তাবনা করিতে গিয়া বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি এক স্থলে এসিয়াবাসীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, উদ্যম, সাহসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"There is one race in Asia—the Bengalee—which openly acknowledges that it has not the heart to fight, though when in expectation of any form of non-contentious death it is more serene than the European."

অর্থাৎ এসিয়ার মধ্যে কেবল একমাত্র বাঙ্গালী জাতি প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিয়া থাকে যে, তাহাদের যুদ্ধ করিবার সাহস নাই। যদিও অন্য প্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে তাহারা ইউরোপীয় অপেক্ষা ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালী জাতি যুদ্ধ করিতে পারে কি না? পূর্ব্বকার কথা থাকুক, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এ বিষয়ে তাহার কিরূপ প্রমাণ দিয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। এখানে বাঙ্গালী মানে কেবল সুখের-পায়রা, ফিন্‌ফিনে-ধূতি চাদর পরা বাবুদিগকে মাত্র ধরিলে চলিবে না। পৃথিবীর সকল দেশে যে শ্রেণীর লোক চিরকাল লড়াই করিয়া থাকে, তাহাদের বিষয় বিচার

করিতে হইবে। যুক্তি তর্কাদি দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইব না, কেবল একটী মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি যে, বাঙ্গালা মুলুকের ছোট লোকেরা যুদ্ধের কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, সাহস, উৎসাহ ইত্যাদিতে কোন জাতীয় ঐ শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কিছুতেই কম নহে।

বহুকাল হইতে শান্তিপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গার চড়াতে প্রতি বৎসর সমস্ত বৈশাখ মাসে দুই দল যোদ্ধাতে তুমুল সংগ্রাম হইত, এ কথা অনেকেই জানেন। সেই লড়াই যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনা গিয়াছে যে, দুই দিকে ২০।২৫।৩০ হাজার লোক জমা হইয়া যে প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ হইত, তাহা দেখিলে ভয় হয়। মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, তখনই গাছগাছড়ার পটি বাঁধিয়া আবার সম্মুখ সমরে উপস্থিত।

এই যুদ্ধ ১লা বৈশাখ আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তিতে শেষ হইত। কোম্পানির আমল হইলে উহা নিবারণের অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যায় নাই। শেষে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলিকাতা হইতে একদল সিপাহী লইয়া একবার উপস্থিত হন—তাহার ফল এই হয় যে, সাহেব ও সিপাহীগণ বিলক্ষণ প্রহার খাইয়া পলায়ন করত প্রাণ রক্ষা করেন।

ব্লাকিয়ার (Blackier) সাহেব ঐ সময়ে ঠগীর কমিশনর ছিলেন। তিনি বাল্যকালে শান্তিপুরের কোন ব্রাহ্মণের গৃহে পালিত হন*। কোম্পানি বাহাদুর তাঁহাকেই এই বার্ষিক রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। ব্লাকিয়ার সাহেব এক মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্র মাসের প্রারম্ভে শান্তিপুরে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া থাকেন, এবং শান্তিপুর ও তাহার চারিদিকের সমস্ত গুণ্ডা গোয়ারদিগকে ক্রমে ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দেন। বৈশাখ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কয়েদ রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই বৎসর হইতে ঐ লড়াই বন্ধ হইয়া যায়; সে আজ ৭০।৭৫ বৎসরের কথা।

এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, কেবল মাত্র একটা সখের জন্য যে দেশের লোক এই প্রকারে প্রতি বৎসর আপোশের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে; তাহারা যে বিশেষ কারণে উত্তেজিত হইলে প্রাণকে অতি তুচ্ছ বোধ করিয়া বীরের

* ব্লাকিয়ার সাহেবের বৃত্তান্ত এক অদ্ভুত কাহিনী। তাঁহার পিতা কোম্পানি বাহাদুরের শান্তিপুরস্থ রেশমের কুঠির একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। লোকটা খুব উদার, সুতরাং বাঙ্গালী ঘেঁসা ছিলেন। তখনকার সাহেবদের মধ্যে অনেককেই ঐরূপ দেখা যাইত। পেন্সন লইয়া কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া না গিয়া এইখানেই অবস্থিতি করিতেন। এখনকার মত বিলাত যাত্রা এত সস্তা, সহজ ও সুবিধার ব্যাপার ছিল না। পালের জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে সময়ে সময়ে কুবাতাসে পড়িয়া ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত পথেই কাটিয়া যাইত। সুতরাং এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়া দেশীয় লোকের সহিত বেশী মেশামিশি ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়? স্বদেশীয়ের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল, কাজেই বাঙ্গালী ভদ্র লোকের সহিত বন্ধুতা না করিয়া উপায় ছিল না। বৃদ্ধ ব্লাকিয়ারের মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে কোন বাঙ্গালী বন্ধুর জিম্মা দিয়া যান। বালক ডাল ভাত খাইয়া তাঁহারই গৃহে প্রতিপালিত হন। পরে শ্বেত চর্ম্মের গুণে কোম্পানির সরকারে নিযুক্ত হইয়া উচ্চপদারূঢ় হয়েন। তিনি বাঙ্গালীদের, বিশেষ শান্তিপুর ও তন্নিকটস্থ লোক সমূহের, নাড়ী-নক্ষত্র খুব জানিতেন। কাজেই তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

ন্যায় সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইবে, ইহা আর বেশী কথা কি ?

বাঙ্গালীর অপবাদ, বিলাসী বাঙ্গালী বাবুদের জন্য ; নতুবা এ প্রদেশের বাগ্‌দী, ডুলে, কাওরা প্রভৃতি লাঠিয়াল জাতিগণকে যদি উত্তমরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহারা অনেক স্থলে শিখ, গুর্খা অপেক্ষা গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে ; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

আর ঐ কোমল প্রকৃতি বাবুদলের মধ্যে যে বীর জন্মিতে পারে না, সুরেশ বিশ্বাসকে দেখিয়া সে কথা কি প্রকারে বলি ? তবে এক কথা যে, সকল কাজেই উৎকর্ষতা লাভ করিতে গেলে অভ্যাস চাই। ক্রমে বাঙ্গালা মুলুক হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদির ব্যবহার রাজাজ্ঞায় উঠিয়া যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে কালে যে বাঙ্গালা প্রদেশে আর মোটেই বীর দেখিতে পাওয়া যাইবে না, তাহাতে বৈচিত্র্য কি ? যে সময়ে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীরা সর্ব্বদা লড়াই করিত, বিখ্যাত বীর আশানন্দ ঢেঁকি প্রভৃতি সেই সময়কার লোক।

সেকালে যখন ভয়ঙ্কর ডাকাতী হইত, তখনকার কথা শুনা গিয়াছে যে, ডাকাইতগণ বড় বড় মশাল জ্বালিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে ; গৃহস্থগণ সবাই পলাইয়াছেন, বৃদ্ধ কর্ত্তা পাছে পড়িয়া আটক্ হইয়া হাহাকার করিতেছেন ; বাড়ীর পাইক কর্ত্তাকে পৃষ্ঠে লইয়া বামহস্তে দশ বার খানা পিতলের থালা সহ তেতোলার ছাদ হইতে লম্ফপ্রদান করতঃ নীচে পড়িয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর উপর এক একখানা থালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অনায়াসে ডাকাতের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিল। ইহাদের প্রত্যুৎপন্নমতি ও শৌর্য্যবীর্য্যাদি কি শিখ, গুর্খা, ফরাসী, হাইলাণ্ডার প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে কম ? বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেও শুনা গিয়াছে যে, ঐ রূপ ডাকাইতদিগের দলের সর্দ্দারী কার্য্যে অনেক ভদ্রলোকও যাইতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিতে যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র সংগ্রাম বলিতে দ্বিধা করিব না, ভদ্রলোক অস্ত্রাদি ব্যবহারে ধরা পড়িয়া মেয়াদ খাটিয়াছেন, এরূপ অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও শুনা গিয়াছে।

এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত অপবাদ সম্বন্ধে সত্যাসত্যতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এস্থলে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, দুঃখ অভাবে পড়িয়া কি ইতর কি ভদ্র বিস্তর বাঙ্গালী অন্নবস্ত্রাভাবে পিতার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া বসিয়াছেন, বীরভাব বিস্মৃত হওয়াত অল্প কথা। জমিতে ভাল ফসল হয় না, গোধনাভাবে ঘৃত দুগ্ধের অনাটন, আমরা খাই কি ? যাহা কিছু উত্তম উত্তম দ্রব্য, পল্লিগ্রামাদি হইতে সহর বাজারে উপস্থিত হয়, সাহেব-সুবা বড় বড় বাবুরা দ্বিগুণ মূল্যে আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত সামগ্রীমাত্র মধ্যবিৎ ভদ্রলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাগ্যে জুটে। ধান,গম শস্যাদি প্রচুর হইলেও রপ্তানীর জ্বালায় চিরকালই মহার্ঘ্য। দরিদ্র লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তাহাদের পক্ষে বারমাস দুর্ভিক্ষ। অর্থাভাবে কদর্য্য আহার, কদর্য্য পরিচ্ছদ, গৃহাদির কদর্য্য ব্যবস্থা অন্ত দেশব্যাপী জ্বরাদি রোগ। এ ক্ষেত্রে বীর প্রসব ত দূরের কথা, কেবল নরাকার কঙ্কালমাত্র প্রসব করিয়াই বঙ্গমাতা ক্লান্ত হইতেছেন

এ ভাবে চলিলে দুই এক শতাব্দী মধ্যে বাঙ্গালীবংশ একেবারে লোপ পাইবে কি না,সে বিষয়ে অনেকের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। দেশের ক্ষমবান পুরুষগণ সম্পূর্ণ উদাসীন, রাজা বেশী কি করিতে পারেন, তাঁহারা ত এদেশে রথ দেখিতে আসেন নাই, কলা বিক্রয়ই উদ্দেশ্য; কাজেই আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। মধ্যবিৎ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল অবস্থার লোক, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার অবশ্য অনেকাংশে সুফল বলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের আদৌ অবকাশ নাই। হাকিমী, ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্যে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যায়; দিনান্তে যে টুকু ছুটি পান, গৃহিণীর মন যোগাইতে, কোম্পানির কাগজ অলঙ্কারাদির সংবাদ রাখিতেও কুলায় না। ইহার মধ্যে কাহারও কাহারও মিউনিসিপাল কার্য্য, রায় বাহাদুরী, রাজা বাহাদুরীর চেষ্টা, সাহেবদিগের দরবার, কন্‌গ্রেসাদি নানা জাতীয় সভাসমিতির পাণ্ডাগিরী ইত্যাদি বহুতর না-করিলেই-নয় কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং গরিবের দুঃখের কথা, দেশের দুরবস্থার কথা ভাবিবার অবকাশ কোথা? রামসিংহ জমিদারের * ন্যায় ইঁহাদের দুই হাত যোড়া, কাজেই কিছু করিবার উপায় নাই। আমরাও সেজন্য কোন প্রকার অনুযোগ করিতে পারিনা।

যাহা হউক, এখানে ও কান্না কাঁদিয়া আর ফল কি? এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, ভাল খাইতে পরিতে পাইলে উপযুক্ত শিক্ষার অধীনে ভদ্রেতর বাঙ্গালীও যুদ্ধকার্য্যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে অক্ষম নন। তবে স্ত্রীর আঁচল-ধরা অপদার্থ, হীনবীর্য্য জীবগণকে যে কোন কালে সংশোধন করিতে পারা যাইবে না, এ কথাও সত্য। কিন্তু ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে,ঐ শ্রেণীর সুমন্দ-সমীরণে দোদুল্যমান ফটিক চাঁদ বাবুর সংখ্যা কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ জনপদ সমূহে যেরূপ অধিক, বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে সেরূপ নয়। আশৈশব প্রকৃতির সঙ্গে যে জাতি যে পরিমাণে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয়,সেই পরিমাণে সে জাতির মধ্যে বীরভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যে সকল নগরবাসীর চক্ষে পর্ব্বতের বন্ধুর উচ্চতা, সমুদ্রের তরঙ্গ বা নদ নদীর তুফানের ন্যায় কোন দৃশ্য কখন পড়ে নাই, তাহারা ভীরু হীনমতি হইতে বাধ্য। অপর দিকে প্রকৃতির মৃদুমন্দ কোমলতা যাহারা কদাচিৎ অনুভব করিতে অবকাশ পায়, এরূপ পর্ব্বত, প্রান্তর, সমুদ্রতটবাসী লোক বলিষ্ঠ-হৃদয় দৃঢ়কায়, সহিষ্ণু হইবেই হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

* কোন ধনবানের গৃহে রাত্রিতে ডাকাইত পড়িয়া সব লুটিয়া লইয়া গেল, অথচ সে সময়ে রাম সিংহ জমাদার চাল তরওয়াল হাতে দেউড়ি পাহারা দিতেছিলেন। বাড়ীর বিধবা কর্ত্রী প্রাতঃকালে জমাদারকে ডাকিয়া অনুযোগ করাতে তিনি টেকফিরত দিলেন, "মা ঠাকুরুণ। আমি কি করি? আমার এক হাতে চাল, এক হাতে তরওয়াল, আমার দুই হাত যোড়া, কাজেই আমি নিরুপায়; দেউড়িতে উপস্থিত থাকিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না। আমার ইহাতে দোষ কি?" সাফ্‌কথা!!! বেকসুর খালাস।

বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য।

দ্বিজত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ আর্য্যানার্য্য সংশ্রবোৎপত্তি বশতঃ বর্ত্তমান হিন্দুর গাত্র চর্ম্ম কিরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। ঋগ্বেদে আর্য্যবর্ণের যে বর্ণনা পাই, তাহা শ্বেতবর্ণ; অনার্য্য বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। বর্ত্তমান ইংরেজের বর্ণ আর্য্যবর্ণ—শ্বেতবর্ণ। সাঁওতালদিগের বর্ণ অনার্য্য বর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ। এক্ষণ যদি ইংরেজের বর্ণবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ব্যক্তির শরীরে শত ফোটার শত ফোটাই আর্য্যরক্ত আছে, বিবেচনা করা যায় এবং সাঁওতালের বর্ণানুরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির শরীরের শত ফোটার এক ফোটাও আর্য্যরক্ত নাই ধরা যায়, তবে হিন্দুজাতি (caste) সকলের মধ্যে আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত কি, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আমরা একটী সবডিবিসনের প্রায় ২০০ স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণের গাত্রবর্ণের যে অনুপাত এই প্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নে তালিকাবদ্ধ করিলাম।

	জাতি		শতকরা যত ফোটা আর্য্যরক্ত আছে।
১।	ব্রাহ্মণ	...	২৩.৫
২।	কায়স্থ	...	২১.৬
৩।	ভূমিজ বা ভূমিহর ব্রাহ্মণ		২০.৬
৪।	কুর্ম্মী	...	২০.৬
৫।	ছত্রী	...	২০.৫
৬।	সুবর্ণবণিক	...	২০.৫
৭।	ময়রা (মোদক)		২০.২
৮।	সদ্গোপ	...	১৯.৭
৯।	বারুই (পর্ণজীবী		১১.৫
১০।	তাঁতী	...	১৮.৭
১১।	কংশবণিক	...	১৮
১২।	রাজপুত	...	১৭
১৩।	বৈদ্য	...	১৬.৮
১৪।	কুম্ভকার	...	১৬.৫
১৫।	গোয়ালা	...	১৬.১
১৬।	গাড়ূড়ী	...	১৬
১৭।	সো (শুঁড়ী)	...	১৬
১৮।	কোরাণিকহিন্দু	...	১৫.৮
১৯।	পুণ্ডরীক	...	১৫.৮
২০।	কর্ম্মকার	...	১৫.৬
২১।	নাপিত	...	১৫.৬
২২।	নাগর	...	১৫.৫
২৩।	শংখবণিক	...	১৫.
২৪।	কুরী	...	১৫
২৫।	কুড়ার গোয়ালা	...	১৫
২৬।	চাষত	...	১৫
২৬।	মালাকর	...	১৪
২৭।	তিলি	...	১৩.৩
২৮।	সোণার	...	১৩.২
২৯।	বৈষ্ণব	...	১২.২
৩০।	ধানুক	...	১২.
৩১।	তেলী	...	১১.৫
৩২।	লেট	...	১১
৩৩।	কৈবর্ত্ত	...	১০.৮
৩৪।	ডোম	...	১০.৫
৩৫।	মুচী	...	১০.২
৩৬।	রাজবংশী	...	১০
৩৭।	কাহার	...	৯
৩৮।	চাঁই	...	৮.৫
৩৯।	মেহানা	...	৮.৩

৪০।	কোনাই (কুডুন)		৮১
৪১।	মহাতা	...	৮
৪২।	রজক	...	৮
৪৩।	মালো, শুঁড়ী, পাণোয়ান		৮
৪৪।	মাল	.	৭৯
৪৫।	দোসাদ	.	৭১
৪৬।	বিন্দ	..	৭
৪৭।	কেওট	...	৬২
৪৮।	হাড়ী	...	৫৭
৪৯।	সাঁওতাল	...	৪৩
৫০।	বুনো	...	২
৫১।	বাদ্দী	...	১
৫২।	ভব	...	০

ইহাদের মধ্যে ভূমিজ বা ভূমিহর, কুর্ম্মী, ডোম, লেট, চাষত, মহাতা, পাবওয়ান, বিন্দ, বাদ্দী ও ভবের ছাত্র অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় নাই। তবে ঐ সকল জাতির চেহারা আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, উহাদের অধিক সংখ্যক লোক লইয়া পরীক্ষা করিলেও ফল বড় ভিন্নরূপ হইবে না।

পক্ষান্তরে কোরাণিক হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র অন্য প্রত্যেক বর্ণের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর্য্যরক্ত শতকরা ১৫৮ ফোটা দেখা যায়। কোরাণিক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কাজি মোল্লা ইত্যাদির শরীরে উক্ত অনুপাত ২০র কম হইবে না, কৃষক সম্প্রদায়ের অনুপাত ১০র কম হইবে। কোরাণিক বৈশ্য যথা জোলা, কাগজী প্রভৃতি জাতির গাত্রবর্ণ প্রায় তাঁতীর গাত্রবর্ণের তুল্য অর্থাৎ শতকরা ১৮.৭ ফোটা আর্য্যরক্ত প্রদর্শক।

ব্রাহ্মণ সংখ্যার মধ্যে অবশ্য বর্ণ-ব্রাহ্মণ ভুক্ত হইয়াছে। কায়স্থ সংখ্যায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থই অধিক ছিল। সো শ্রেণীর মধ্যে বঙ্গদেশীয় সো শ্রেণীকে একত্রে ধরা হইয়াছে।

যে মহকুমার স্কুলের ছাত্রের গাত্রবর্ণানুসারে এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, সে মহাকুমাটি বঙ্গ বিহারের সন্ধিস্থলে, রাঢ় ও বাগড়ী উভয়ত্র বিস্তৃত এবং বরেন্দ্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে বঙ্গ বিহারের জনসংখ্যা লইয়া বিস্তৃতাকারে পরীক্ষা করিলেও ফল বড় বিভিন্ন হইবে না।

উপরোক্ত তালিকানুসারে দেখা যায় যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির জাতীয় দেহেও অধিক মাত্রায় আর্য্যরক্ত নাই। হইতে পারে, কোন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ২।৪ জন ছাপ বর্ণের লোক নাই কোন্ জাতিতে? আমি চামারের মধ্যে অতি পরিষ্কার বর্ণের লোক দেখিয়াছি। ব্রাহ্মণের মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি, কায়স্থের মধ্যে দ্বারকানাথ মিত্র, বৈদ্যের মধ্যে দীননাথ সেন এবং তিলির মধ্যে যে অনেক কৃষ্ণদাস পাল আছেন, ইহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন?

তাহার পর, যাঁহার গাত্রচর্ম্ম আর্য্যবর্ণের সমতুল্য আছে, তাঁহার রক্তও যে কোন পূর্ব্বতন পুরুষে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের রক্তসংশ্রবের ভিতর হইতে আইসে নাই, ইহা বলাও বড় স্পর্দ্ধার কথা। ফলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্বিজত্ব বা সঙ্করত্ব বশতঃ ভারতীয় জাতি বৃন্দের মধ্যে যে কোন একটী বিশেষ জাতি নিরবচ্ছিন্ন আর্য্য রক্ত বিশিষ্ট বা অনার্য্য রক্ত বিশিষ্ট আছে, এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। এজন্য আমরা পূর্ব্বাপর

বলিয়া আসিতেছি যে অনার্য্য সংশ্রব মধ্যবর্ত্তী কালে নিন্দনীয় বিবেচিত হইলেও, এক্ষণ যখন সকল বর্ণের শরীরে অনার্য্য রক্ত প্রবহমান দেখা যায়, তখন একবর্ণ অপর বর্ণের অস্পৃশ্য এক বর্ণের অন অপর বর্ণের অখাদ্য, একের কন্যা অপরের অগ্রাহ্য এ অলীক সংস্কার যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই ভাল।

অনেকে বলেন, দীর্ঘকাল হইতে আর্য্যগণ ভারতে উপনিবিশিত হইয়াছেন বলিয়া, রৌদ্রাতপ বশতঃ তাঁহাদের গাত্রবর্ণ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ মলিনত্ব প্রাপ্ত হওয়া এক কথা, কৃষ্ণবর্ণ আর এক কথা। তার পর, পরিষ্কার বর্ণের ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে একেবারেই নাই, এমত নহে। যদি জল বায়ু বশতঃ (Climaatic influence) বশতঃ এই বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিত, তবে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৃষ্ণবর্ণ হইল না কেন? বিশেষতঃ এমন ঘটনা অনেক পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে পিতা মাতা যথাক্রমে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে প্রথম সন্তান কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় গৌর বর্ণ, তৃতীয় কৃষ্ণ বর্ণ, এবং চতুর্থ গৌরবর্ণের হইয়াছে। একই ভাই বোনের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের লোক এদেশে বিরল? এই সকল স্থলে কি বুঝিতে হইবে, কোন একটী সন্তানের উপর জল বায়ুর প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অপরের উপর হয় নাই? প্রথম সন্তানের উপর জল বায়ুর প্রভাব বর্ত্তিল, দ্বিতীয়ের উপর বর্ত্তিল না, ইহাই বা কি প্রকার কথা? এক পাড়ায়, এমন কি এক চতুঃশালের ভিতরে বাস করিয়া এক ব্রাহ্মণ গৌর বর্ণ রহিলেন, অপর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে কি কোন বোধগম্য জল বায়ুর কারণ অনুভূত হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণত্বের এত আধিক্যের কারণ অনার্য্য সংশ্রব ভিন্ন আর কিছুই নহে; জল বায়ুর আধিপত্য অল্পই বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আবার নাসিকার উচ্চত্ব ও পরিসরের অল্পত্ব অবলম্বন করিয়াও আর্য্যোৎপত্তির কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণের মধ্যেও চৈনিক নাসিকা দেখিয়াছি এবং মেথরের মধ্যে অল্প পরিসরের নাসিকার সংখ্যা কম নহে। কৈবর্ত্তের নাসিকার মত যে কোন ব্রাহ্মণের নাসিকা নাই, এই কথা কি কেহ বলিতে পারেন? কায়স্থগণের অত্যুচ্চ নাসিকা স্থির হইয়াছে। কিন্তু অনাচরণীয় পুণ্ডরীকগণের মধ্যেও অনেক উচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট লোক দেখা যায়। ফলে যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, ভারতীয় জাতিবৃন্দ কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি কায়স্থ, কি দোসাদ, কি বৈদ্য, কি বাগ্দী, সকল বর্ণেই আর্য্যানার্য্য রক্তের মিশ্রণ অনুভূত হইতেছে। অবিকৃত আর্য্যরক্ত কোথাও নাই।

আমরা যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতেও এই কথাই সমর্থন করে। তবে যাঁহারা আমাদের প্রদত্ত তালিকায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা আমাদের প্রদর্শিত পন্থানুসারে অথবা বৃহৎ বৃহৎ নিমন্ত্রণকালে কিম্বা অনুরূপ জনসমারোহের সময়ে জাতি সকলকে পৃথক করিয়া প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্ক সংখ্যাপাত করত গড় স্থির করুন। তার পর বলুন, অবিমিশ্রিত আর্য্যরক্ত কোন্ জাতির শরীরে আছে?

ফলতঃ এক্ষণ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে

প্রায় বর্ণ-সাম্য ঘটিয়াছে। সবর্ণ বিবাহ প্রথা তুলিয়া দিলে বর্ণ সাম্য সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। যে জাতি যত নিম্ন স্তরে, সবর্ণ প্রথার তিরোধানে তাহার তত ইষ্ট ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা। এক্ষণে যে প্রকার বিবাহ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উচ্চবর্ণের জাতিগণের মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, ব্রাহ্মণেরাই এই চেষ্টায় অগ্রগামী হইয়াছেন। বোধ হয়, একথা কাহার অবিদিত নাই যে, বিবিধ বর্ণের কন্যা সংগ্রহ করিয়া এক শ্রেণী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ স্থানে স্থানে উহাদিগকে দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্রাহ্মণদিগের নিকট অল্পপণে বিক্রয় করে এবং এই সকল ব্রাহ্মণেরাও অক্লেশে গৃহিণী পায়। এই রূপ জীবন্ত পণ্যকে "ভরার মেয়ে" বলে। 'ভরার ছেলের' কথাও বাজারে উঠিয়াছে। কায়স্থ প্রভৃতি জাতি হইতে ছেলে লইয়া ব্রাহ্মণ কুমারীগণের পাণিপীড়নের চেষ্টা হইয়াছে, এমন কথাও শুনিয়াছি। তবে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। "ভরার মেয়ের" যত প্রচলন বৃদ্ধি হইবে, তদ্দৃষ্টে "ভরার ছেলে" প্রচলনের আবশ্যকতা তত হৃদয়সঙ্গম ও সহজ বোধ হইবে। বর্ণ-ভেদ ও তৎশাখা কৌলিন্যপ্রথার ইহা একটী বিষময় ফল। এই বিষের কথঞ্চিৎ নিবারণই উক্তবিধ ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গৃহে দিন দিন যেরূপ কন্যাদায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে গোপনে অসবর্ণ বিবাহের উক্ত প্রকার প্রচলন বৃদ্ধির বিলক্ষণ কারণই আছে। ব্রাহ্মণগণই এই কার্য্যে অগ্রগামী হইয়াছেন, সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ প্রথায় মূলে কীট প্রবেশ করিয়াছে।

কায়স্থের মধ্যে যে অসবর্ণ বিবাহ নাই, এ কথা বলা যায় না। কোন কোন স্থানের কায়স্থ, বৈদ্য ও শৌণ্ডিকের কন্যা বিবাহ করে। অনেক স্থানে কায়স্থ ও শূদ্র একীভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে কায়স্থ ও শূদ্রে অদ্যাপি কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, কিন্তু এই পার্থক্যও দ্রুতবেগে বিলুপ্ত হইতেছে। উপবীত গ্রহণে সাহস করিয়া কোন কোন বৈদ্য শূদ্র হইতে যত বিছিন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মণের নিকট তত অগ্রসর হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে একটী প্রশংসার কথা। এক্ষণ দেবার্চ্চন স্বহস্তে গ্রহণ করিলেই উপবীতের কতক সার্থকতা জন্মে এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেও অপর একটী দ্বিজত্বের স্তরে উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ ২৫.৩ এ অবনত করত আকাঙ্ক্ষিত সাম্যতার দিকে লইয়া যাইতে পারে।

বঙ্গের কায়স্থকে বঙ্গের nation বলিলেও বলা যায়। কায়স্থ শব্দের অর্থও কতক nation শব্দের অর্থানুরূপ। কায়স্থ ও কায়স্থের ব্যবসায় সকল জাতির আশ্রয়স্থল ও আকাঙ্ক্ষার চরম সীমা। এজন্ত কায়স্থের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া যেমন ব্রাহ্মণগণ আচারে ব্যবহারে বহুসংখ্যায় কায়স্থভাবাপন্ন হইয়াছেন, তেমন নিম্ন বর্ণের বহুলোকও, যেমন ব্যবসায়ে প্রকাশ্যে, তেমন রক্তসংশ্রবে গোপনে,কায়স্থভাব ধারণ করিয়াছেন। ফলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে প্রণালীতে আমাদের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, অন্যান্য জাতির তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। অনেকেরই মত এই যে, বর্ণব্রাহ্মণ মধ্যে তত্তৎ বর্ণের লোকই অধিক, কিন্তু তাঁহারা ফলে ক্রমে ব্রাহ্মণের সীমায় অধিবাসী হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে

আদান প্রদান ও পানাহার করিতে না পারেন, তথাচ তাঁহারা যজন যাজন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য ভাব আশ্রয় করিয়া আছেন। স্পর্শদোষ প্রথা উঠাইয়া দিলে এই সকল ব্রাহ্মণ উচ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিশিয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। কায়স্থের প্রসার প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিমূলক। বঙ্গের আচরণীয় জাতির মধ্যে এমন জাতি নাই, যাহার কেহ না কেহ কায়স্থের সহিত রক্ত সংশ্রবে না আসিয়াছেন। অনাচরণীয় জাতির মধ্য হইতেও যে কেহ এই আকাঙ্ক্ষিত জাতির সহিত রক্ত সংশ্রবে আসিতে কখন চেষ্টা করেন নাই, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্র উন্মোচিত করিয়া দিয়া, নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ দাশরথি রামচন্দ্রের ন্যায় কায়স্থ সাম্যের প্রকৃত ক্ষেত্রে কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কি আচারণীয়, কি অনাচরণীয় সকল হিন্দুকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই প্রণালীতে যদি বৈদ্য শূদ্র, কামার কুমার, রাজপুত সংগোপ, তিলি তেলী, সোপুণ্ডরীক, চাঁই ধানুক প্রভৃতি জাতিবৃন্দ স্ব স্ব বর্ণের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে জাতি সমূহের মধ্যে কি নব তরঙ্গ লীলার উদ্ভব হইবে, তাহার মধুরিমা ভাবিতেও হৃদয় পুলকিত হয়। তবে গতি কেবল নিম্নাভিমুখী হইলে চলিবে না। কায়স্থ ব্রাহ্মণের, বৈদ্য কায়স্থের, শূদ্র বৈদ্যের, তেরশাক নবশাকের, তেলি তিলির ইত্যাদি প্রকারে কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এবং এই চেষ্টা গোপনে হওয়া নিন্দনীয়। এইরূপ করিতে পারিলেই আমরা পৌরাণিক হিন্দুর শ্যামবর্ণে গিয়া উপস্থিত হইব। বোধ হয়, উহা আদর্শ চরিত্র কৃষ্ণ ও রামের শ্যামবর্ণের মধ্যবর্ত্তী বর্ণ অর্থাৎ শতকরা ১৫৮ কোটা আর্য্য রক্তের জ্ঞাপক। ইহাই হিন্দুত্বের পূর্ণ বিকাশাবস্থা। ইহাতে দেশীয়তার প্রভাব যথোচিত স্বীকৃত হইয়া বৈদেশিকতাকে করায়াত্ত ও পরাজিত অবস্থায় রাখিবে। কবে এই দিন ভারতে আসিবে, তাহাই এক্ষণ হিন্দুর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

কেবল বর্ণেই আর্য্যভাব সিকি মাত্রায় কম, তাহা নহে, ধর্ম্মাচরণেও আর্য্যভাব সেইরূপ কম হইবে, সন্দেহ নাই। আজ কি কাহার গৃহে ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, অশ্বিদ্বয়, অর্য্যমা,পূষা প্রভৃতি আর্য্যদেবের পূজা প্রাপ্ত হন? কোন্ গৃহিণী আজ অদিতি দেবী, ইলা বা রমণীয়া উষাদেবীর অর্চ্চনা করেন? যদিও পূজাগ্রন্থ গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি বৈদিক দেবনামের উল্লেখ দেখা যায়, তথায় সেই মন্ত্রের অর্থে ও লোকের বিশ্বাসে সেই প্রাচীন আর্য্যভাব কত টুকু? বরঞ্চ অর্চ্চনা গ্রন্থগুলির আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যভাবের মধ্যে বহুল অনার্য্যভাব, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের মিশ্রণ সম্পাদনই এই গ্রন্থগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মাচরণের মধ্যেও সিকি মাত্রায় আর্য্যভাব নাই। যে চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রৌতযজ্ঞ, সপ্ত প্রকার পাকযজ্ঞ, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ এবং ষোড়শ প্রকার সংস্কারযজ্ঞ—এই দ্বিচত্বারিংশৎ কর্ম্ম আর্য্যদিগের সম্পাদনীয় বলিয়া সূত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন* ;তাহারই বা কয়টী আজ অনুষ্ঠিত

* বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দু শাস্ত্র, ৩য় ভাগ, ৩ পৃষ্ঠা।

হয়? ইহা বিবেচনা করিলেই হিন্দুর আনুষ্ঠানিক জীবনে আর্য্যানার্য্য ভাবের অনুপাত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কাহার গৃহে আজ অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, নিরূঢ় পশুবন্ধ, সৌত্রামণি প্রভৃতি হবির্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? কেই বা উক্‌থ্য, বাজপেয়, অতিরাত্র বা আপ্তোর্যাম প্রভৃতি সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন? যদিচ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ, শ্রাবণী প্রভৃতি পাকযজ্ঞগুলি কোন না কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তথায় এ গুলিও যে বহুল পরিমাণে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? কে ইহা জানেন যে, আশ্বযুজী যজ্ঞই এক্ষণ লক্ষ্মী পূজা? সেই প্রকারে পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ এবং ষোড়শ প্রকার সংস্কার যজ্ঞও সিকি পরিমাণে সেই প্রাচীন আর্য্যভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

পক্ষান্তরে কৃষ্ণ, কালী ও মনসার রঙ্গময়ী অর্চ্চনা, শিলাশ্রিত বিষ্ণুপূজা, প্রস্তরাশ্রিত বিষ্ণুপূজা, বৃক্ষাশ্রিত বহু দেবদেবীর পূজায় এবং এই সকল পূজার মন্ত্রাভ্যন্তরে অনার্য্য ভাবের এত আধিক্য অনুভূত হয় যে, অনার্য্য রক্তের প্রবাহের সহিত অনার্য্য ধর্ম্মকর্ম্ম ভাবের মিশ্রণ করিয়া লওয়া একদা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজনীতির মূলসূত্র ছিল। আর হতভাগ্য আমরা এই মূলনীতি বিস্মৃত হইয়া কেবল বর্ণপ্রাধান্য রক্ষা করার মানসে সংহারিণী ভেদশালিনী নীতিমূলে আমাদের পরম মুক্তির সংযোগ স্থল ভাবিয়া বসিয়া আছি। অহঙ্কারের উপর অহঙ্কারের স্তূপ সঞ্চিত হইতেছে, মৃত্যুর ছায়া সর্ব্বগ্রাসিনী রূপে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া আসিতেছে, আর আমরা নির্ব্বোধের স্বর্গবাসের ন্যায় বর্ণভেদ সমর্থন করিয়া আনন্দভোগ করিতেছি। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ হিন্দুর জাতীয় দেহে তাহাদের স্বীয় রক্তের প্রবাহ এবং ধর্ম্মে ও আচরণে তাহাদের স্বীয় বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের আধিক্য অনুভব করিয়া অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবেন, মাত্র এই একটী আশা বিদ্যমান আছে। এ আশা কি পূর্ণ হইবে?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

পৌনঃপুনিক অভিনয়।

যে উনবিংশ শতাব্দীকে লোকেরা স্বাধীনতার শতাব্দী বলিত, সেই উনবিংশ শতাব্দী সেদিন অনন্ত কালগর্ভে, অতীতের নির্ব্বাণ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বিংশের নব দুন্দুভিধ্বনিতে পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, উনবিংশ শতাব্দী কি বাস্তবিকই স্বাধীনতার শতাব্দী ছিল?

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, গারফিল্ড, থিওডোর পার্কার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, উইলবারফোর্স, ব্রাইট এবং গ্লাডোষ্টোনের আবির্ভাব-শতাব্দী এক হিসাবে যে স্বাধীনতার শতাব্দী, সে কথা সত্য, কিন্তু অনাবিল সত্য কি না, সে সম্বন্ধে এখন গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালি স্বাধীনতা পাইয়াছে, দাসপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পৌরহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে, এবং স্ত্রীলোকেরা অধিক অধিকার পাইয়া-

ছেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এই শতাব্দী-তেই মিসর সমর, ফিলিপাইন সমর, বুয়র সমর, বলিতে কি, চীনের সর্ব্বনাশ সাধনে সপ্তরথীর সমবেত চেষ্টার অভিনয় হইতেছে, এ কথা যখন ভাবি, তখন, নেপোলিয়ন বা সিজর, আলেকজান্দর বা তৈমুরকে পরিম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীকে আর স্বাধীনতার শতাব্দী বলিতে ইচ্ছা হয় না। যে শতাব্দীতে ষোড়শ সহস্র নির্দ্দোষী দরবেশ বধ করিয়া ও মেহেদীর মৃত দেহের অবমাননা করিয়া কিচনার মহা সম্মান "লর্ড" উপাধিতে এবং স্বাধীনতা-লোলুপ সহস্র সহস্র লোকের শোণিতপাত করিয়া রবার্টস্ মহা গোরবান্বিত "আরল" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, সেটা কি আসুরিক শতাব্দী নয়? হায়, নিরপরাধ ফিলিফাইনবাসীদিগকে অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সচেষ্ট ম্যাকিন্‌লি আজ কত সম্মানে ভূষিত, এবং মানব জাতির চিরবন্ধু ব্রায়ান্ট ম্লানমুখে নির্ব্বাচন-মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথে নীরবে প্রস্থান করিতেছেন! জাপানকে—নবোত্থিত জাপানকে কতরূপে কতজনে প্রশংসা করে, কিন্তু হায়, এই জাপানই কি চীনের সর্ব্বনাশের মূল কারণ নয়? জাপান, প্রকারান্তরে, আজ সপ্তরথীর দ্বারা চীনের সর্ব্বনাশ সাধনের পথে যে লীলা প্রকট করিলেন, সে লীলার যুগকে অধীনতার করাল মূর্ত্তি না বলিয়া থাকা কষ্টকর। আর হতভাগ্য বুয়রগণ যে শতাব্দীতে স্বাধীনতা হারাইয়া ধনে প্রাণে ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করিতেছে, সে শতাব্দীর কথা ভাবিতেও কষ্ট পাই। সকল দিকেই দেখিতেছি, জাতিজাতের, ক্ষমতা-প্রিয়তার, সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা। মহামতি গ্লাডষ্টোনের চেষ্টাতেও এই শতাব্দীতে আইরিশগণ স্বায়ত্তশাসন পান নাই, ইহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাদৃত বিষয়ের কিছু আলোচনা করি। রাজনীতির কথা বা রাজার কথার আলোচনা করিবার অধিকার হইতে আমরা এক প্রকার বঞ্চিত। যে শতাব্দীতে ভারতে সিডিসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সে শতাব্দীর ন্যায় স্বাধীনতা-অপলাপকারী শতাব্দী এদেশে আর হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন। একজন বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়া স্ত্রী জাতির মহদুপকার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; অন্য জন, নানা উপধর্ম্ম, ত্রিত্ববাদ বা তেত্রিশকোটীবাদের স্থলে, আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। উভয়েই, এজন্য, ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়েই স্ত্রীজাতির মহদুপকারের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং সতীদাহ নিবারণ এই শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা। সর্ব্বপ্রধান ঘটনা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান যে পৃথিবীর মধ্যে এই শতাব্দীর কি মহাব্যাপার, কালে তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল বিচ্ছেদ, সকল দুর্নীতি, সকল উপধর্ম্মের স্থলে—মধুর মিলনের, শান্তি ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা এই শতাব্দীতে হইয়াছে। আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা,—আমেরিকাতে ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম প্রচার, ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—এই শতাব্দীর

কি সুমঙ্গল ঘটনা। অন্তরে ডুবিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এমারসন, কারলাইল, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, পার্কার, ম্যাট্সিনি, সকলের হৃদয় এই মহা ধর্ম্মানুপ্রাণনে পবিত্র। আত্মা মুক্ত বায়ুর ন্যায় মুক্ত—কাহারও অধীন নয়, একমাত্র পরমাত্মার অধীন,—পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র এই ভারতে এই কথাটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া জগতের কল্যাণকর অতি সুন্দর ধর্ম্ম-বিধান-তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক নীতি—এক তত্ত্ব—সকল মানব এক পিতার সন্তান,সকল পরিবার এক,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ—সকলেই ভাই ভাই। বিচ্ছেদ নাই, কেবল মিলন; বিদ্বেষ নাই, কেবল শান্তি; পাপ সন্তাপ নাই, কেবল পবিত্রতা। কি সুন্দর এবং কি পবিত্র তত্ত্ব। দল থাকিবে না—সকল দল ভাঙ্গিয়া একাকার হইবে—মহানের সিংহাসন তলে সকল জাতিত্ব, সকল বৈষম্য, সকল ভেদবোধ তিরোহিত—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সম আসনে সমভাবে উপবিষ্ট হইবে। এই মধুর সংবাদ পাইয়া জগৎ নাচিয়া উঠিল। কত কি বিচিত্র লীলা প্রকটিত হইল, ভাবিতে এবং লিখিতেও শরীর মন পুলকে পূর্ণ হয়। কিন্তু কালের কি দুর্জ্জয় প্রভাব! বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণের পর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের কথা দিন দিন ঘৃণার কথা হইতেছে—আর ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে, রূপান্তরে দলাদলি, জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র-ভেদ ইত্যাদি কত কি দেখা যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, ততই ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন দল ধর্ম্মকে পোষাকরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন, কোন দল ধর্ম্মকেই সার করিতে চাহেন। কোন দল, বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর, কোন দল উশৃঙ্খলতার পথে স্বাধীনভাবে চলিতে সচেষ্ট। সে সকল মর্ম্মভেদী কথার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে কেবল এই মাত্র বক্তব্য—একতা ও মিলনের ধর্ম্মে যে মহা বিচ্ছেদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এ কথা এখন আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

মিলন ও একতার আর এক মধুর বাণী শুনাইয়াছিলেন, মহাত্মা হিউম। জাতীয় মহাসমিতি ভারতের মিলনের অতি পবিত্র ক্ষেত্র। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখানেও, অতি অল্প কালের মধ্যেই দলাদলি ও বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া কি স্বর্গীয় তেজেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গুরু মানি না, নেতা মানি না, পুরোহিত মানি না, উপধর্ম্ম মানি না, জাতিভেদ মানি না,—কেবল মানি বিধাতাকে,—তাঁহার পুত্র সব মানুষ ভাই ভাই,—ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বিধাতার চরণ-সিংহাসন-তলে সব ভাই ভাই। কি সুন্দর বাণী! স্বর্গ যেন এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অভেদ-সিংহাসন-তলে শত শত নরনারীর মধুর সম্মিলন—কি মধুর চিত্র! কিন্তু হায়, ক্ষমতাপ্রিয়তা, আভিজাত্য, পৌরোহিত্য,ধনের গরিমা কি সংসারকে স্বর্গে পরিণত হইতে দিবে—দরিদ্রকে সদ্ভাবের মালা উপহার দিয়া একতা ও সাম্যের সিংহাসনতলে বসাইয়া স্বর্গের মহিমা-গীতি কি গাইতে দিবে? না—তাহা সুদূর-পরাহত।

ব্রাহ্ম-সমাজ, সমাজ-সংস্কারের মেরুদণ্ড। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া শেষে নূতন ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিতে প্রোথিত জাতিত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নূতন পৌরোহিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছেন;—অনুষ্ঠান পূজা প্রণালীর জাল ছিন্ন করিয়া নানারূপ নব নব অনুষ্ঠান ও পূজা প্রণালীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা। হিন্দু সমাজ যে কন্যাপণে অবসন্ন, ব্রাহ্ম-সমাজ সেই কন্যাপণের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবেন, আশা ছিল। কিন্তু হায়, অল্পে অল্পে, জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে, কন্যাপণও, রূপান্তরে, প্রকারান্তরে, এই সমাজে দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে কাহাকে কাহাকে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে দেখিতাম, এখন ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদও লোপ পাইতেছে। পূর্ব্বে বংশগত মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি ছিল, এখন ধনগত মর্য্যাদার দিকে অধিক আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। চরিত্র তুচ্ছ, ধর্ম্ম তুচ্ছ, নীতি তুচ্ছ, পবিত্রতা তুচ্ছ—সার বস্তু ঐশ্বর্য্য এবং অর্থ। পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও, যাহারা ধর্ম্ম বা নীতির কোন ধার ধারে না, তাহাদিগের হস্তে কন্যার্পণ করিতেছেন; এবং অন্য দিকে যে ছেলেরা ধার্ম্মিক, তাঁহারাও পদ ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে সুযোগ্যা পাত্রী উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যা গ্রহণ করিতেছেন। চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং ধর্ম্মানুরাগ এখন আর যেন তেমন গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়, পদ হইলেই হইল। ঐশ্বর্য্যের জৌলুষে চতুর্দ্দিকের লোক আকৃষ্ট। দেখিতেছি, এইরূপে, অনেক ব্যক্তিই, এখন, কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন। বড় বড় মহা-রথী আকর্ষণ করিতেছেন, অসহায় ব্যক্তি-গণ আকৃষ্ট হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে বিবাহিত, অনেক বিলাত-প্রত্যাগতের গৃহ ধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত—ব্রাহ্মসমাজের সহিত যেন কোন সংশ্রবই নাই। এ সকল বিষয় প্রতি ধার্ম্মিক ব্যক্তির গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কারণ,ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ পশুত্বে উপনীত হইবে;—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা রূপ মহা অধীনতার মহালীলা আরম্ভ হইবে।

আর একটী সমস্যা—ধনী দরিদ্র সমস্যা। সম্ভ্রান্ত বংশের একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্রাহ্মের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার কাশীর উদ্বেগ হইলে তিনি ধনীর গৃহে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি উঠিয়া গেলে, ধনী অন্যের সমক্ষেই অকথ্য ভাষায় ঘৃণা বর্ষণ করিলেন,ও শেষে যথারীতি ফেনাইল ইত্যাদি দিয়া ঘর সংশোধন করিলেন। আর একদিন, আর একজন সম্ভ্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তি জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাস্তার জুতা ঘরে নিবার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই রূপ ঘৃণার দৃষ্টান্তের কথা পূর্ব্বে অনেক শোনা যাইত। লাটভবনে জুতার অসম্মানের কথা বিদ্রূপ-গল্পের মোহিনী ভাষায় এখন ঘোষিত হইয়া থাকে। এখনও বড় বড় রাজা রাজড়ার ঘরে এরূপ অসম্মানের কথা শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু সাম্যের ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। এই জন্যই বুঝিবা, ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে রেল চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপবেশন করেন। করাসিদেশে,

বর্ত্তমান যুগে, ব্যাসিলাস্ থিওরির প্রাবল্যে কত যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য লীলার অভিনয় হইতেছে, শুনিলে হাসি পায়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইলেক-ট্রিসিটির সংস্পর্শের কথা তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় বিশেষ রূপ শুনা যাইত। দরিদ্রের মলিন বস্ত্র বা জুতার সংস্পর্শে, কি ব্যাসিলাস্ বা কি ইলেক-ট্রিসিটি দেহে প্রবেশ করিবে, এই ভয়েই কি বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ সতর্ক হইতেছেন? অথবা আভিজাত্য এবং ধন-গৌরবের মত্ততায় উন্মত্ত হইতেছেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। দরিদ্রের প্রতি এইরূপ ঘৃণা ও উপেক্ষা-সমাজে বদ্ধমূল হইলে, সমাজের মঙ্গল নাই। একদিন একজন ব্রাহ্ম সিবিল সার্জ্জন বলিয়াছিলেন,"একথা এখন প্রকাশ্য ভাবে বলিতেও সঙ্কোচের কোন কারণ নাই যে, ব্রাহ্মসমাজ উচ্চ এবং নীচ—দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।" আর একদিন কয়েকজন সুশিক্ষিত চরিত্রবান উপাধিধারী যুবক বলিতেছিলেন—"বিলাত-প্রত্যাগত-দিগের এক শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে; ইহাতে আশ্চর্য্য হন কেন? ধর্ম্ম ও নীতি কি সকলেই মানিয়া চলিবে?" সত্য হইলে, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা। হিন্দু সমাজের যে সকল দুর্নীতিকে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বর্জ্জন করিয়াছিলেন,আভিজাত্যের প্রভাবে এখন ক্রমে ক্রমে সেই সকল দুর্নীতি কি অল্পে অল্পে প্রবেশ করিবে? এবং অর্থের মোহিনী শক্তি মন্ত্রে, ঔষধ-মুগ্ধ অহির ন্যায়, দরিদ্র-প্রতিবাদকারীদিগকে স্তব্ধ করিয়া যা-তার অভিনয় চলিবে। বড় বড় ধার্ম্মিক নাকি এখন দশ বিশ টাকায় খাতিরে, মদ্যপান চলিতেছে বা 'কল্যাণপ্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়াও, নির্ব্বাক থাকেন। যদি তাহা সত্য হয়, তবে 'আর আশা কোথায়?

পৌরোহিত্যের সমস্যা দিন দিন আরো কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এখন অনেক স্থলে উপাসনার প্রারম্ভে শুনা যাইয়া থাকে,উপা-সনা করিবেন কে? এ সমাজের লোকেরা ও সমাজের লোকের নাম শুনিলে ভ্রুকুঞ্চিত করেন, ও সমাজের লোকেরা এ সমাজের লোকের নাম শুনিলে বিরক্ত হন? ঈশ্বরের উপাসনা যে ভক্তই করুন, তাহাতেই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? ভক্ত মাত্রই আদ-রের পাত্র নন কি? ইনি বেদিতে বসিবেন, কি তিনি বসিবেন, সে সংবাদে প্রয়ো-জন কি? এত আর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ নয় যে, ক্ষমতা অনুসারে বিচার চলিবে? প্রকৃত সরল উপাসনা যিনিই করুন, তাহা-তেই প্রকৃত উপাসকের মন আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তুমি ভাল কি তিনি ভাল, সে বিচার করিতে বসিলে,বিসপ বা পোপ বা গুরু পুরোহিত মানার আর বাকী রহিল কি? একজন মহাত্মা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "যদি গাড়ীর নীচেই পড়িতে হয়, তবে ছ্যাকড়া গাড়ীর নীচে পড়িব কেন,চেরিয়টের নীচেই পড়িব। অবতার বা গুরু পুরোহিত মানিতে হইলে যাকে তাকে মানিব কেন, বড় জনকেই ধরিব।"নানা গুরু পুরোহিতের অভ্যুদয়ে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। একটু ভক্তির পথে যিনি অগ্রসর হন, তাঁহারই একটা কিছু হইয়া পড়িতে ইচ্ছা! এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ গেলেন, রামকুমার গেলেন,শিবনারায়ণ গেলেন,ভিতরে ভিতরে আরো কত জন কিছু হইবার চেষ্টায় আছেন। কতক লোক কেবল কার্ত্তা

করিবে, অন্য লোক সাংসারিক কাজ করিবে, এরূপ হইলে পৌরোহিত্য এবং সমাজে পশুত্ব না জাগিয়াই পারে না। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই;—এবং আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন পশুত্ব বিনাশের আর উপায় নাই।

আশা করা বৃথা। পৃথিবীর গতি অবিরাম প্রভুত্বপরায়ণতা এবং আভিজাত্যের দিকে চলিয়াছে। বৃথা ক্রন্দন, বৃথা আন্দোলন, বৃথা চীৎকার। কালের ধর্ম্মই যেন এই—ঐশ্বর্য্য এবং অর্থবল, প্রভুত্ব এবং শারীর বল সকলকে পরাজয় করিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেই করিবে। ধর্ম্মকথা—পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় একটা রাখিতে হয়, তাই রাখা; মর্ম্মস্পর্শী অভেদবাদের কথা, বা অনাবিল স্বাধীনতার কথা বলিতে চেষ্টা করাই বুঝি বা ভ্রান্তি!! ভাই, তুমি বল কি?

বলিবার কথা অনেক, কিন্তু বলিবার স্থান নাই, অধিকার নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। এখন একাকীত্বের গহন বনে যাইতে ইচ্ছা। সত্য কথা বলিলে, রাজ আইন ভ্রুকুটী দেখায়, সমাজের বিধি ব্যবস্থা ভয় দেখায়, বন্ধুদের ভালবাসা বিরক্তিতে পরিণত হয়। তাহাদের মতে মত দিয়া, প্রশংসায় প্রশংসা ঢালিয়া, মদ্যপায়ীর মদ্যপান, অত্যাচারীর অত্যাচার, এবং ব্যভিচারীর ব্যভিচারের পোষকতা করিতে পারিলেই লাভ আছে, সম্মান আছে, প্রশংসা আছে! তাহাতে উপাধি মিলে, সমাজের উপরকার দশজনের সঙ্গে আসনে স্থান পাওয়া যায়—আর শুনিয়াছি, টাকাও নাকি অনেক মিলে। আর স্বাধীন ভাবে সত্য ঘোষণা করিলে হয় জেল, নয় নিষ্পেষণ, নয় বন্ধুবিচ্ছেদ—অপরিহার্য্য লিখন। কাগজ চালান, এদেশে খোসামুদীর একটী ব্যবসা হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায়, এরূপ সময়ে, গত শতাব্দীর সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে কে অগ্রসর হইবে? অগ্রসর হইলেই বা শুনিবে কে? কঠোর এবং সত্য শ্রবণে, হায়, অনেকেই আজ কাল অনিচ্ছুক।

আমি ভাবিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম এবং প্রার্থনা করিতেছিলাম, এ ধরার অত্যাচার এবং অবিচার, অসত্য এবং অধর্ম্ম নিত্যই যখন নূতন ভাবে পুনরভিনীত হইতেছে, তখন এ সকল দেখিতে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ কি? বয়স বাড়িতেছে, কিন্তু জ্ঞান বাড়ে না; মস্তকের কাল কেশ শ্বেত হইল, কিন্তু ভক্তিতে নত হয় না; দাঁত পড়ে, মাংস শিথিল হয়, কিন্তু আসক্তি কমে না, বিশ্বপ্রেমের উদয় হয় না, রিপুর নিষ্পেষণ দূর হয় না,—পাপের বন্ধন ছিন্ন হয় না;—মহাপরাধীনতার রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। হাটিয়া হাটিয়া কতদূর আসিলাম—কিন্তু কেবলই পরাধীনতা! রাজা বলেন, তুমি আমার আইনের অধীন, ধনী বলেন তুমি আমার ক্ষমতার অধীন, সমাজ বলেন, তুমি আমার বিধির অধীন, পরিবার বলেন, তুমি আমার ভালবাসার অধীন, আমার রিপুরা বলে, তুমি আমাদের শাসনের অধীন। মুক্ত হইতে না পারিলে, সকল আসক্তির জাল কাটিতে না পারিলে, অতীন্দ্রিয়, অকথিত, অদৃষ্ট পরমাত্মার পথে চলিব কিরূপে? হাটিয়া হাটিয়া, খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত, পরিম্লান হইলাম, কিন্তু অধীনতার রাজ্য শেষ হইল না—যেন চির অসমাপ্ত। আমার চক্ষু কেবল কুদৃষ্টিপাতই করে, লেখনী কেবল কুকথাই লেখে, হাত

কেবল কুকার্য্যেই রত থাকে, পা কেবল কুপথেই চলিতে চায়। কু-য়ের রাজ্য যেন চির অসমাপ্ত। মহাপরাধীনতার মহান্ধকারে ডুবিয়াছি, যাই কোথা? আলো কই? একাকীত্বের গহন বনে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ কই? পাপ মোহের ত্রাসে প্রাণমন মলিন ও নিষ্প্রভ। আমি করি কি, যাই কোথা? জীবন শেষ হইয়াও হয় না কেন? যদি "সু"য়ের রাজ্যে পেঁছিতে পারিতাম, তবে বুঝি বা আমার দাসত্ব ঘুচিত—আমি মুক্ত হইতে পারিতাম। "সু"য়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কত চেষ্টা, কত আয়োজন করিলাম, কিন্তু তিনি ত ফিরিয়াও এ দীনের প্রতি চাহিলেন না। যদি বা কখনও চাহিলেন, আমাকে ধরিলেন না; যদি বা ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া এই অস্পৃশ্যকে ধরিলেন, আমাকে মজাইলেন না;—যদি বা কখনও একটু একটু মজাইলেন, আমাকে একেবারে বিশ্ব প্রেমসাগরে ডুবাইলেন না। যদি ডুবাইতেন, তবে বুঝি "কু"য়ের অসমাপ্ত রাজ্যে আমাকে আর আসিতে হইত না। বুঝি বা, আমাকে চাপিতে চাপিতে, আমার আমিত্বকে নিষ্পেষিত করিয়া "তিনিত্বে"র অপরাজিত সিংহাসন চির প্রতিষ্ঠিত করিতেন। আমিত্বের বিনাশ না হইলে অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে চিরবিদায় লাভের আর উপায় নাই, সেই জন্য "সু"-মহানের নিকট নিত্য প্রার্থনা, বয়স যেমন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তিনিও যেন সেইরূপ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে, আমাকে চাপিতে চাপিতে—আমিত্বের বিনাশ সাধন করিয়া তিনিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভবের নিত্য অবিচার ও অত্যাচারময় অধীনতার অসমাপ্ত রাজ্য হইতে নচেৎ আর উদ্ধারের উপায় নাই। হায়, তিনি কি এ দীনকে কৃপা করিবেন না?

১লা মাঘ, ১৩০৭।

সাবিত্রীতত্ত্ব সমালোচনার প্রতিবাদ।*

সবিনয় নিবেদন—

কার্ত্তিকের নব্যভারতে আমার সাবিত্রী তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনার আলোচনা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনার শুটিকত কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমার বুঝিবার অক্ষমতাই ইহার কারণ।

দেহের শক্তিতে যাহা না হয়, মনের শক্তিতে তাহা হয়।

দেহের শক্তিতে যাহা না হয়, মনের শক্তিতে তাহা হয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত কথা—ইহার সত্যতা সকলেই স্বীকার করেন—সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং এ কথা বলিয়া আমি কেমন করিয়া অপরাধী হইলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। মানসিক শক্তি বা একাগ্রতায় কুকর্ম্মও সাধিত হয়, ইহা অস্বীকার করি না। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—"ঠগ, ডাকাইত প্রভৃতিরও একাগ্র বিশ্বাস আছে।" কিন্তু আমিত কোথায়ও এমন কথা বলি নাই যে, মানসিক একাগ্রতায়

---

* সাবিত্রীতত্ত্বের সমালোচনা সম্বন্ধে এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে ইহা ছাপাইলাম। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

দুষ্কর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য; কেহ যদি বলে যে, দেহের শক্তিতে যাহা হয় না, মনের শক্তিতে তাহা হয়, তাহা হইলে সে মানসিক শক্তি দ্বারা দুষ্কর্ম্ম সাধনে প্রশ্রয় দিতেছে, বোধ হয় এমন্ কথা বলা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হয় না। আমি কি এমনি দুর্নীতিপরায়ণ বা কুনীতিপ্রচারক যে, ঠগ, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতির ন্যায় দুষ্কর্ম্মে প্রশ্রয় দিব?

সাবিত্রী তত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আমি কেবল সুসন্তান উৎপাদনের কথায় মানসিক শক্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি—কুসন্তান উৎপাদনের ঘোর বিরোধী বলিয়াই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমরা এখন ধর্ম্মভ্রষ্ট, অসংযমী ও অমিতাচারী হইয়া যে সকল দুর্ব্বল, রুগ্ন, মানসিক শক্তিহীন সন্তান উৎপাদন করিতেছি, আমার স্বজাতীয়দিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের অভিপ্রায়েই তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছি যে, তাহাদিগকে দেখিয়া "সমস্ত ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।" আপনি কেমন করিয়া একথার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলে বাধিত ও উপকৃত হইব। আমাকে দেহ অপেক্ষা মনের শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করিতে দেখিয়া আপনি কেমন করিয়া সমাজ সংহারক রূপে কল্পনা করিলেন, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব।

সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বিদ্রূপ বাক্য।

সমাজসংস্কারক বা সমাজ সংহারক?

সন্তান লাভার্থ এখন কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতি কি প্রকারে করা হয়, তাহার আলোচনা আমি করি নাই। যথোচিত প্রণালীতে হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কারণ এখন আমাদের ধর্ম্মভাব ধর্ম্মচর্য্যাদি সমস্তেরই বিকৃতি ও অবনতি হইয়াছে। আমি গোঁড়া হিন্দু নহি—আর্য্যামি যদি দোষ হয়, সে দোষ আমার নাই। সন্তান লাভার্থ মানসিক শক্তির প্রয়োগ যে এ দেশের চিরন্তন প্রথা, ইহারই বর্ত্তমান প্রমাণ স্বরূপ এখনকার কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহার পর বক্তব্য এই যে, এখন বারবনিতারাই যে কেবল পূজা করে, তাহা নয়। দুই চারি জন গৃহস্থও সন্তানলাভার্থ সংযমী হইয়া সাত্ত্বিক ভাবে ব্রত স্বরূপ কার্ত্তিক পূজা করে। বোধ হয়, আপনি এপ্রকার কার্ত্তিক পূজার নিন্দা করিবেন না। কারণ আপনিই বলিয়াছেন, 'কার্ত্তিক পূজা, যমপুকুর কি পুণ্য পুকুর করায় বা পুরাণ কথা শোনায় ভাবের উৎকর্ষ হয়। ভাবের উৎকর্ষ সাধনে এরকম কার্য্য প্রয়োজনীয়।" সংযমী হইয়া সাত্ত্বিক ভাবে ব্রতস্বরূপ দেবদেবী পূজা করিলেই অন্তর প্রকৃতির উন্নতি ও বিশুদ্ধি বা ভাবের উৎকর্ষ সাধন হয়। আমি বিদেশীয় নহি; এ দেশীয়, আমি জানি, কতকগুলি হিন্দু গৃহস্থ এই ভাবে কার্ত্তিক পূজা করেন, তবে কেন আপনি লিখিয়াছেন—"কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু ভাবের উৎকর্ষের জন্য কার্ত্তিক পূজা করিবেন না?" চন্দ্রনাথ বাবু কি এতই নীতিহীন বা দুর্নীতিপরায়ণ যে, যে পূজা সংযম, চিত্তশুদ্ধি ও দেবভক্তি ব্যতীত হইতেই পারে না, সে পূজা হইতে তিনি ঐ সকল উৎকৃষ্টগুণ সরাইয়া না দিয়া, সে পূজার কল্পনা করিতে বা উল্লেখ করিতে পারেন না? কোন বন্ধ্যা সন্তান লাভের জন্য কার্ত্তিক

আমি গোঁড়া হিন্দু নহি, আর্য্যামি দোষ আমার নাই।

পূজা করে। কোন বন্ধ্যা কার্ত্তিক পূজা না করিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবন করে।

যে কার্ত্তিক পূজা করে, সে ভাল, না, যে ঔষধ খায়, সে ভাল?

বলুন দেখি, যে কার্ত্তিক পূজা করে, সে ভাল বা শ্রেষ্ঠতর, না, যে ঔষধ খায়, সে ভাল বা শ্রেষ্ঠতর? যে ঔষধ খায়, সে জড়ের সাহায্য লয়, যে কার্ত্তিক পূজা করে, সে দেবতার সাহায্য লয়। যে ঔষধ খায়, সে নিকৃষ্ট প্রকৃতিসম্পন্না, যে কার্ত্তিক পূজা করে, সে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি সম্পন্না। দেবভক্তি ভিন্ন পূজা হয় না। বন্ধ্যার কার্ত্তিক পূজার সহিত ভাবের সংশ্রব নাই, আপনি কেমন করিয়া এইরূপ বিবেচনা করেন? আর আমাকেই বা কি দেখিয়া বা কি বুঝিয়া ঐ মত আরোপ করেন? আপনি লিখিয়াছেন—"কার্ত্তিক এখন বারবনিতার আশ্রয় লইয়াছেন, পুরাণ কথা বাবরারীতলায় স্থান পাইয়াছে।" এটা প্রকৃত কথা কি? গৃহস্থ কি কার্ত্তিক পূজা করে না, গৃহস্থের গৃহে কি পুরাণ কথা হয় না? আপনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, গালি দিবার পক্ষে উহা বেশ চটুকে ভাব বটে, কিন্তু ও ভাবে লিখিলে ভদ্র লেখককেও যে অভদ্ররূপে প্রতীয়মান করা হয়। আমি কি এতই নীচ ও নির্ঘৃণ যে, বারবনিতার কার্ত্তিক পূজার প্রশংসা করিয়াছি?

আমি হিন্দু সমাজের সহিত অন্যান্য সমাজের তুলনা করিয়াছি। আপনি বলেন, "এরূপ করিবার প্রয়োজন সামান্য ছিল।" আমি তাহা বিবেচনা করি না। এখন অন্য সমাজের রীতি নীতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল রীতি নীতির পক্ষপাতী হইতেছেন, অনেকে তাহা গ্রহণও করিতেছেন। এরূপ স্থলে আমাদের রীতিনীতির সহিত অন্য রীতিনীতির তুলনা করিয়া, কাহার রীতিনীতি ভাল, এদেশবাসীকে বুঝাইয়া

আমাদের রীতি-নীতির সহিত অন্য রীতিনীতির তুলনা করা কর্ত্তব্য।

দেওয়া এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানে আমি সাবিত্রীতত্ত্বে আমাদের দুই একটা সামাজিক রীতির সহিত ভিন্ন সামাজিক রীতির তুলনা করিয়াছি। আপনি যদি এদেশবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, বালিকার বিবাহ অপেক্ষা যুবতীর বিবাহ ভাল, আমি তাহাতে রাগ করিব কেন? আপনার কার্য্য সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, এরূপই বা মনে করিব কেন? তাহার পর আমার সামাজিক মতে যদিই একটু গোড়ামির ভাঁজ থাকে, তাহাতেই বা রাগ করেন কেন? যেখানে বিশ্বাস গভীর ও সুদৃঢ়, সেখানে বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে বোধ হয় যেন একটু গোড়ামির ভাঁজ থাকিয়াই থাকে। সেটা আমি দূষণীয় মনে করি না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাহারো কাহারো লেখাতে ঐরূপ গোড়ামির ভাঁজ দেখিতে পাই। উহা স্বাভাবিক—উহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইবার কিছুই নাই। তবে যাহা গোড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহা যথার্থই দূষণীয়। মনে হয়, সেইরূপ গোড়ামি আমার নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, তাহাতে এরূপ গোড়ামি একেবারেই নাই। আপনি যদি আমার সকল গ্রন্থ পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনিও তাহা জানেন। সাবিত্রীতত্ত্বেও এরূপ গোড়ামি নাই। যদি থাকে, দয়া করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিবেন, কোথায় আছে। 'যে

সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকেরবিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে ইত্যাদি' এই যে কয় পংক্তি আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাতে এরূপ গোড়ামি আছে, আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন? একথা আমি

কোন সম্প্রদায় বা সমাজ বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখি নাই।

কোন সমাজ বা সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখি নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে অনেকেরই মন যে বিচলিত হয়, অনেকেই যে ইহাকে উহাকে মনে স্থান দেয়, ইহা মানব প্রকৃতি। এ দেশের প্রকৃতি বা ও দেশের প্রকৃতি নয়, এ সমাজের প্রকৃতি বা ও সমাজের প্রকৃতি নয়, সমস্ত মানবের বিধাতৃবিহিত প্রকৃতি।

ইহাকে উহাকে তাহাকে মনে স্থান দেওয়া বিধাতৃ-বিহিত প্রকৃতি।

মানব মাত্রেরই বুভুক্ষা ভিন্ন কামের ন্যায় দুর্জ্জয়, দুর্দ্দমনীয় উগ্র প্রবৃত্তি আর নাই। ইহা এমনই দুর্দ্দমনীয় উগ্র প্রকৃতি যে, শারীরিক বিকাশে ইহার উন্মেষ হইলে পর, উহাকে

শারীরিক বিকাশে কাম উন্মেষ হইলে উহা পরাস্ত করিয়া রাখিতে পারে, এমন স্ত্রী কি পুরুষ নাই।

সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়া রাখিতে পারে, এমন স্ত্রী কি পুরুষ নাই বলিলেই হয়। তখন উহার বাহ্য-ক্রিয়া না হইলেও মনে উহার ক্রিয়া অল্পাধিক পরিমাণে হইবেই হইবে। ইহা মানব প্রকৃতি। এ কথা চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। মানব প্রকৃতি এইরূপ। আমার এই বিশ্বাস অতি দৃঢ় বলিয়া সাবিত্রী তত্ত্বে আমি এই Premiss বা বিশ্বাস হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, 'যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, ইত্যাদি' কোন সমাজ বা সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলি নাই। যে সমাজে দেশীয় হউক, বিদেশীয় হউক—যে সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, সেই সমাজ সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধেও খাটে। নিছক গোড়ামি বা আর্য্যামি ইহাতে আছে কি?

আপনি লিখিয়াছেন—অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের ন্যায় ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি কুৎসিত। ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে অতি কুৎসিত, সাবিত্রীতত্ত্বে কি প্রমাণ পাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইউরোপীয় রমণী বিবাহের পূর্ব্বে এ পুরুষ কি সে পুরুষকে মনে স্থান দিয়া পরে অন্য পুরুষকে বিবাহ করা প্রভৃতি যাহা বলিয়াছি, তাহা ইংরাজী নবেল বা উপন্যাসে বর্ণিত এইরূপ ঘটনা পাঠ করিয়াই বলিয়াছি।

উপন্যাস পাঠ করিয়া বলিয়াছি।

যদি বলেন, ইংরেজ উপন্যাস-লেখকেরা এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া লেখেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিন। আমিও সাবিত্রী তত্ত্বের পুনঃসংস্করণে তদনুযায়িক পরিবর্ত্তন করিব। যদি ইচ্ছা ও অবকাশ হয় অথবা আবশ্যক বিবেচনা করেন, অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সাবিত্রী-তত্ত্ব ও ক্ষীরোদ বাবু।

গত কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সাবিত্রী-তত্ত্ব পুস্তকের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

ক্ষীরোদ বাবু একজন বিজ্ঞ চিন্তাশীল লেখক ও প্রবীণ সমালোচক। বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। এই সকল গুণে তিনি বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম নেতা বলিয়া উপযুক্ত রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনায় তাঁহার এই সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাইব, এরূপ আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার সমালোচনা পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছি।

গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়ে এক-মতাবলম্বী না হইতে পারেন। উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটিলেও, সমালোচককে অবশ্যই গ্রন্থকার যে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা সেইভাবে ঠিক রাখিয়াই তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। সমালোচক অবশ্যই নিজের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থকারের কথা ও মতের পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সমালোচনা করিতে পারেন না। যে সমালোচক তাহা করেন, তাঁহার ন্যায়-পরতা ও সত্ততা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচনা এ সম্বন্ধে দোষশূন্য হয় নাই। আমি দেখাইব, তিনি সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনা প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর দ্বারা অনেক কথা বলাইয়াছেন যাহা তিনি আদৌ বলেন নাই এবং চন্দ্রনাথ বাবুকে সাধারণের চক্ষে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, তিনি যে অর্থে যে কথা বলিয়াছেন, ক্ষীরোদ বাবু তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

ক্ষীরোদ বাবু বিপরীত অর্থ করিয়াছেন।

সাবিত্রী-তত্ত্বের সপ্তম পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন।—

"কিন্তু যাঁহারা সন্তান লাভার্থে এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বড়ই দৃঢ়, বড় গভীর। সাধারণ উপায়ে যাহা হয় না, এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায় তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্মবলে—চিত্তের একগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতির ফলে,—তাহা সধিত হওয়া সম্ভব, অনেক স্থলে সাধিত হইয়া থাকে।"

উদ্ধৃতাংশে আমি পাঠকবর্গের দৃষ্টি নিম্নলিখিত বিষয়টীর প্রতি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি।

(১) "এ বিশ্বাস" অর্থে অবশ্যই "দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন" এইরূপ বিশ্বাস; অন্য কোন রকম বিশ্বাস নহে। "এইরূপ বিশ্বাসের" অর্থও তাহাই, অন্য কোন রূপ বিশ্বাস নহে। বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

ক্ষীরোদ বাবু কিন্তু "এ বিশ্বাস" অর্থ অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি উদ্ধৃতাংশ হইতে "এ" ও "এইরূপ" কথাগুলি একবারে উড়াইয়া দিয়া কেবল বিশ্বাস কথাটী

ধরিয়া তাহার নানা রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন "বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভাবনা হইতে পারে,—চন্দ্রনাথ বাবু এ কথা বলিয়াছেন" ইত্যাদি।

"বন্ধ্যার সন্তান হয়, মৃতব্যক্তি পুনঃর্জ্জীবন লাভ করে, মরা মানুষ ফিরে আসে ইত্যাদি। পরকালে সদ্‌গতি লাভ হইবে বিশ্বাস করিয়া বন্য প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতামাতাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে।"

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, এক কথা; ক্ষীরোদ বাবু বলাইলেন আর এককথা।

পাঠকগণ অবশ্য দেখিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন এক কথা; ক্ষীরোদ বাবু তাঁহাকে দিয়া বলাইলেন অন্যকথা। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন, এই বিশ্বাসের গভীরতায় সাধারণ উপায়ে যাহা হয় না, তাহা হওয়া অসম্ভব না। ক্ষীরোদ বাবু দেবতার প্রতি বিশ্বাসের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেবল বিশ্বাসের গভীরতা ধরিয়া বসিলেন। আর তাহা হইতে নানা রকম অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। পাঠক অবশ্যই দেখিবেন, দেবতার প্রতি বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন না করিয়া যদি কেবল বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি "এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায়" না লিখিয়া "বিশ্বাসের এইরূপ গভীরতায়" লিখিতেন। ক্ষীরোদ বাবু যে এই ভাষার পার্থক্যটুকু না বুঝিতে পারেন, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারি না।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, দেবতাদের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকিলে দেবতারা তুষ্ট হইয়া সন্তান দিতে পারেন। ক্ষীরোদ বাবু হয়ত তাহা স্বীকার করেন না। এক্ষণে চন্দ্রনাথ বাবুর মত ঠিক, কি ক্ষীরোদ বাবুর মত ঠিক, তাহা বিচার করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সেরূপ বিচারের দ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, চন্দ্রনাথ বাবুর উক্ত মত হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া ক্ষীরোদ বাবু ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

(২) উদ্ধৃতাংশে চন্দ্রনাথ বাবু বলেন— "শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবলে চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতির ফলে—তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব—অনেক স্থলে সাধিত হইয়া থাকে।"

পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু এস্থলে শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা মানসিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতেছেন। মানসিক সামর্থ্য দুই না এক? আর ধর্ম্মবল, এই দুই বস্তুর একত্র সংযোগ দ্বারা শারীরিক সামর্থ্যে বা শারীরিক ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন হইতে পারে। আবার ধর্ম্মবল কাহাকে বলে, চন্দ্রনাথ বাবু তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যেমন চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে ধর্ম্মবল বলিতে কেবল একাগ্রতা নহে বা কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা নহে, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

এখন উদ্ধৃতাংশকে ক্ষীরোদ বাবু বিকৃত করিয়া তুলিয়া দিয়া তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি।

ক্ষীরোদ বাবু বলেন,—

শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে বা ধর্ম্মবলে তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব। ক্ষীরোদ বাবু "এবং"কে "বা" করিয়া

নিয়া "মানসিক সামর্থ্য" ও "ধর্ম্মবল" এই দুইটী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে, চন্দ্রনাথ বাবুর মত এইরূপে দেখাইতে চাহেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর মতের বিকৃত আলোচনা।

এবং চন্দ্রনাথ বাবুর মত এইরূপ বিকৃত ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন,—

"চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দিবার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া একত্র করিয়া পোড়ায়। তাহাদের চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা থাকে। 'অনেক স্থলে' তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি না? প্রশ্নটী গুরুতর। কাপালিক কর্ত্তাভজা প্রভৃতির বিশ্বাসের একাগ্রতা যথেষ্ট আছে। যে বিশ্বাসে একাগ্রতা থাকিবে, তাহাই মঙ্গলপ্রদ কিনা, একথার মীমাংসা হওয়া উচিত। বিশ্বাস করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই ভাল, এরূপ মতের প্রচার হইলে হিন্দুসমাজ কেন, কোন সমাজ একদিন বাঁচিতে পারে না। ঠগ ডাকাইত তাহাদেরও একাগ্র বিশ্বাস আছে।" ইত্যাদি।

পাঠক অবশ্যই দেখিলেন, ক্ষীরোদ বাবু নিজের সুবিধার জন্য চন্দ্রনাথ বাবুর কথা ছাটিয়া ছুটিয়া দিয়াছেন। চীনেরা মৃত কুমার কুমারীর বিবাহ দেওয়ার জন্য কাগজে দুই জনের ছবি আঁকিয়া পোড়ায়,

হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্মবল নাই।

ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত ধর্ম্মবল কোথায়? ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র চিত্তের একাগ্রতাকেই চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মবল বলেন না। ইহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাকেও চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মবল বলেন না। ক্ষীরোদ বাবু বলেন, ইহাতে সাত্ত্বিকতাও থাকিতে পারে। হইতে পারে তাহা চীন দেশীয় সাত্ত্বিকতা; কিন্তু তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সাত্ত্বিকতা নহে। ক্ষীরোদ বাবু একজন অসাধারণ পণ্ডিত, তিনি সাত্ত্বিকতার অর্থ জানেন না ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। সাত্ত্বিকতার অর্থ জানিয়াও তিনি এই চীন জাতির কুসংস্কারের মধ্য হইতে যে সাত্ত্বিকতা বাহির করিয়াছেন, ইহা কেবল চন্দ্রনাথ বাবুর বিরুদ্ধে হাস্যরস সৃষ্টি করার কৌশল মাত্র। আর কাপালিক, কর্ত্তাভজা, ঠগ, ডাকাইতদিগের "বিশ্বাসের একাগ্রতা" ই

কাপালিক, কর্ত্তাভজার বিশ্বাসে ধর্ম্মবল নাই।

কি চন্দ্রনাথ বাবুর কথিত ধর্ম্মবল? এইরূপ অসংযত ভাবে লেখনী চালনা দ্বারা অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য পাঠকবর্গের চক্ষে ধাঁধা জন্মাইয়া, তাঁহাদের মনে কৌতুকের অবতারণা করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদ্দ্বারা সততা ও ন্যায়পরতার গৌরব বর্দ্ধিত হয় কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

ক্ষীরোদ বাবু আবার বলেন—

"চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে, সন্তানোৎপাদন ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া হিন্দুরা জানে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিতে তাহারা যেরূপ সংযত হয়, সন্তানোৎপাদন কার্য্য সেইরূপ সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে। তাই হিন্দুরা এমন সাধু ও মনিষী সন্তান উৎপাদন করিতেছেন যে, আমাদের সন্তান দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইউরোপের লোকে অসংস্কৃত ভাবে শারীরিক শক্তি নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তাই ইউরোপে কেবল যণ্ডামার্ক জন্মিতেছে।"

এখানেও চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলেন নাই, ক্ষীরোদ বাবু তাঁহার মুখ দিয়া সেই কথা বাহির করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু কোথায়ও একথা বলেন নাই যে, এক্ষণকার হিন্দুরা

চন্দ্রনাথ বাবু এক্ষণকার কথা বলেন নাই।

সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া জানে, এক্ষণকার হিন্দুরা

সন্তানোৎপাদন কার্য্য সাধু ও সংযত চিত্তে করিয়া থাকে। তিনি বলেন, প্রচীন কালে হিন্দুরা সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া জানিত, এবং সেইজন্য তাহাদের সাবিত্রী রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মহা যশস্বী সন্তান জন্মিয়াছিল। (সাবিত্রী-তত্ত্ব ২১—২২ পৃষ্ঠা) পরন্তু চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, আমরা এক্ষণকার নব্যবাঙ্গালীগণ এবিষয়ে "অসংযম অমিতাচার, অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া পড়িয়াছি * * * * * আর এই জন্য আমরা আজিকার দিনের বাঙ্গালীর স্ত্রী ও পুরুষ শারীরিক ও মানসিক বলে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহা শঙ্কিত হইয়াছে।" (২৫ পৃষ্ঠা)।

ব্যঙ্গোক্তি মাত্র।

এই শেষোক্ত উদ্ধৃত বাক্যটীকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া কে না বুঝিতে পারে?

ইহা কি কখনও সম্ভবপর যে ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ইহাকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া বুঝিতে ভুল করিয়াছেন? তাহা কখনই না, তিনি নিশ্চয়ই ইহাকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়া থাকিলেও বুঝাইয়াছেন অন্য রকম। এই রকম অতীত কালকে বর্ত্তমান বলিয়া

ক্ষীরোদ বাবু বুঝিয়া সুজিয়া প্রতারণা করিয়াছেন।

প্রতিপাদন করা ও ব্যঙ্গোক্তিকে বিপরীত ভাবে প্রতিপাদন করা কেবল চন্দ্রনাথ বাবুকে সকলের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা নহে কি? ক্ষীরোদ বাবুর মতে "চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতি, নীতি, চর্চ্চা" করেন নাই, সেজন্য পাশ্চাত্য সমাজের দোষ গুণের আলোচনা করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ক্ষীরোদ বাবু যে চীন জাতির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কি চীনদেশে পরিভ্রমণ করিয়া সে দেশের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? মোক্ষমূলর সাহেব যে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে কত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কি একবারও ভারতে আসিয়াছিলেন? কোন দেশে পরিভ্রমণ না করিলেও যে সে দেশের সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা তথাকার রীতি নীতির সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে, ক্ষীরোদ বাবু চন্দ্রনাথ বাবুর বেলায় একথা স্বীকার কহিতে রাজি নহেন কেন? মোক্ষমূলর সাহেব ভারতে একবারও আসেন নাই, আবার বিলাতের Daily Telegraph পত্রিকার লেখক পরলোকগত ষ্টিভেন্‌স (Steevens) সাহেব ত ভারতে আসিয়াও এদেশবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য লিখিয়া ছিলেন। এখন মোক্ষমূলর সাহেবের মত অপেক্ষা ষ্টিভেন্‌স সাহেবের মত ক্ষীরোদ বাবুর নিকট অধিকতর আদরনীয় হইবে কি? আর ইউরোপের মহিলার পতিপ্রেম সাবিত্রীর পতিপ্রেমের আদর্শে যে নিতান্ত হীন, তিনি যে একজনকে ভালবাসিতে বাসিতে আর একজনকে ভাল বাসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন, একথা জানিতে হইলে ইউরোপে কেন যাইতে হইবে, বুঝিতে পারি না। বিলাতী নভেল সকলে বিলাতী রমণীগণের যে সকল পতিপ্রেমের চিত্র অজস্র অঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, ক্ষীরোদ বাবু সে সকল মিথ্যা মনে করেন কি?

কোন জাতি চিনিতে হইলে তাহাদের নভেল পড়াই যথেষ্ট, দেশ দেখার প্রয়োজন নাই।

মোটকথা ক্ষীরোদ বাবু যে চন্দ্রনাথ বাবুর উপর চটা, তাহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর "আর্য্যামি" বাড়িয়াছে, "চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দু আচার পদ্ধতির পক্ষপাতী" ও তাহা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল বোধ হয় ক্ষীরোদ বাবুর রাগের কারণ। সেই

রাগের বশে সমালোচনা।

রাগের বশীভূত হইয়া তিনি সাবিত্রী তত্ত্বের সমালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। কাজেই সমালোচকের কার্য্যে যতদূর ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রয়োজন, ক্ষীরোদ বাবু তাহা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচনা পড়িয়া একজন বিচারকের কথা মনে পড়িল। তিনি সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিলেন এবং আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আসামীর উকীল বলিলেন,—

"আসামী দোষী তাহার প্রমাণ কই? সাক্ষীরা ত সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিল?"

বিচারক। সাক্ষীরা তাহাকে দোষী নাই বা বলিল, তাহাতে কি? তাহাদের জবানবন্দীতে যে টুকু অভাব আছে, তাহা আমি নিজেই পূরণ করিয়া দিয়াছি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

আমার কৈফিয়ৎ।

ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা গা চাটাচাটির প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে সামান্য প্রবল নহে। বেঙ্গলী বলিলেন, "ইজাবৎ হোসেন খারাপ লোক," অমনি অমৃতবাজার বলিলেন "ইজাবৎ হোসেন দেবতা বিশেষ।" হিতবাদী বলিলেন, "শাস্ত্রী অধ্যক্ষ পদের অনুপযুক্ত," বঙ্গবাসী বলিলেন, "শাস্ত্রী সাতরাজার ধন এক মাণিক।" এত গেল শত্রুতা। ঘোষজা বক্তৃতা করিলেন "আমাদের দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা মানুষ হইতেছে," বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "ধন্য ধন্য!" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুলিয়া গেলেন যে, তাঁহাকে সময়ান্তরে বিচার করিতে হয়, অথবা বিচারকর্তা তিনি পোষাকের সঙ্গে খুলিয়া ফেলিতে পারেন। প্রকাণ্ড সভায় বসুজা বলিলেন, "বাঙ্গালেরা বাঙ্গালা ভাষাটা মাটী করিতেছে," (কালীপ্রসন্ন ঘোষ এখনও মরেন নাই) অমনি মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন, "ঠিক ঠিক, তাহাদের গায়ে বড় দাদ।" পাঠক, ইহার একটী কথা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না।

মৌলিক রচনার যেমন সময় হয় নাই, বোধ হয়, সত্য সমালোচনারও তেমনি সময় হয় নাই। এখন পুস্তকের সঙ্গে গ্রন্থকার সমালোচকের দ্বারে উপস্থিত হন। বই সম্পূর্ণ [illegible] করিয়া, কোথায় বা না ছাপাইয়া, সমালোচনা সংগ্রহ করা হয়। সমালোচক হয় শত্রু না হয় গা চাটা। সত্যের অনুরোধে সত্য কথা বলিতে পারে, শত্রু না হইয়া ভুল দেখাইতে পারে, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস নাই। দুঃখের বিষয় যতীন্দ্র বাবুর মত লোকেরও এইরূপ ধারণা। যতীন্দ্র বাবু বুঝিয়াছেন যে, শত্রুতা করিয়াই আমি চন্দ্রনাথ বাবুর নিন্দা করিয়াছি, ইচ্ছা

করিয়া ভুল বুঝিয়াছি, যতীন্দ্র বাবু বালক।

চন্দ্রনাথ বাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শ্রদ্ধা করি বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর দোষ দেখাইব না, এমন অন্ধ ভক্তি আমার নহে। তবে সমালোচনা যত তীব্র হইয়াছে, তত তীব্র না হইলে পারিত। আমার ধারণা, ইহা অপেক্ষাও তীব্র সমালোচনা চন্দ্রনাথ বাবুর পক্ষে যথেষ্ট নহে। যিনি বলিতে পারেন, কাম "এমনই দুর্দ্দমনীয় উগ্র প্রবৃত্তি যে, শারীরিক বিকাশে ইহার উন্মেষ হইলে উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া রাখিতে পারে, এমন স্ত্রী কি পুরুষ নাই বলিলেই হয়" তাঁহাকে কেবল উপহাস করাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। স্পষ্টই বুঝা যায়, সমস্ত হিন্দুবিধবা ও বিরহিণী, কুমার ও বিপত্নীক, ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী সকলকেই চন্দ্রনাথ বাবু কামাতুর বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দুর্দ্দম প্রবৃত্তির অত্যাচার নিবারণ করিতে তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। বিধবাকে স্বৈরিণী ও একজন স্ত্রীর বহুপতিত্ব ব্যবস্থা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন, কি স্বামীদিগকে আপিসে যাইবার সময় স্ত্রীকে লৌহ পেটিকায় বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দিবেন বুঝা যায় না। যাহারা বলে, রূপবান পুত্র দেখিলে মায়েরও কামের উদ্রেক হয়, চন্দ্রনাথ বাবু সেই শ্রেণীর লোক। তাঁহার সাবিত্রী তত্ত্বে এ কথা গুলি নাই। তবে সাবিত্রীতত্ত্বের এত তীব্র সমালোচনা কেন করিলাম, বলা কর্ত্তব্য। গা চাটাচাটি এত প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং বাঙ্গালার লোকের বাহবা-পাইবার সাধ যুবকদিগের মধ্যেও তাহার

তাহারও এত অধিক হইয়াছে যে, শত্রু তা কেন, তাঁহাদের হিতৈষী হইয়াই লোকে সত্য কথা তীব্রভাবে বলিতে পারে। রোগের উপযুক্ত ঔষধ না দিলে ফল হয় না। যতীন্দ্র বাবুকে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে ছাপের আড়ালে চন্দ্রনাথ বাবুকে দাঁড় করাইয়া যতীন্দ্র বাবু আমার গুলি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার মক্কেল প্রকৃত বীরের ন্যায় সেরূপ আবডাল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মক্কেল উকিলকে বিদায় দিয়া বুক ফুলাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন।

যতীন্দ্র বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু উভয়েই বলিয়াছেন যে, "আমরা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেছি, যাহা দেখিয়া ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়াছে" ইত্যাদি কথাগুলি হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারের অভিপ্রায়েই লেখা হইয়াছে। সম্প্রতি কুচবিহারের গরিবপত্রিকার মোকদ্দমায় "নব্য-বাঙ্গালীর" অর্থ লইয়া একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু ব্রাহ্ম ও সাহেবিয়ানা প্রিয় লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া, তিনি যাহাদিগকে ধর্ম্মশাসন, সমাজিক শাসন ও পারিবারিক শাসন উপেক্ষা করিবার, উড়াইয়া দিবার লোক মনে করেন, যাহারা বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীর পরিবর্ত্তে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিতেছেন যে, এত অধোগত হইয়াও আমরা যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া ইউরোপ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ অর্থই বুঝিয়াছিলাম। তিনি স্বজাতীয়দিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, এ-কথা

একবারও মনে হয় নাই। কোন প্রকার চিহ্ন বা লক্ষণে(তিনি না বলিয়া দিলে)এখনও আমি বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি যখন এই অর্থ লইতে বলিতেছেন, তখন তাহা লইতে আমি বাধ্য। কিন্তু তাহাতে কি? ইয়ুরোপীয়েরা পাশব সংসর্গে যণ্ডা-মার্ক উৎপাদন করিতেছে এবং প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে কেবল মহাপুরুষের জন্ম হইত, প্রত্যেক হলহস্ত কৃষক এক একটী সিনসিনেটস, অপরাধী পাষণ্ড ছিল না, অপরাধ নিবারণের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই, ইত্যাদি কথাগুলি চন্দ্রনাথ বাবু প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না।

যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করে, তাহাকে জেটা বলে। যে দর্পিত স্বল্পজ্ঞান বিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে জেটামি বলে। স্বদেশানু-রাগ, স্বজাতিপ্রিয়তা স্বধর্ম্মে একাগ্রতা অতি আদরের জিনিস, কিন্তু যে স্বদেশানুরাগ দেশীয় শর্ষপকে বিদেশীয় পর্ব্বত অপেক্ষা বৃহত্তর মনে করে, যে স্বজাতিপ্রিয়তা স্বজা-তির কুসংস্কারকে অমূল্যায়মান করে, অজ্ঞতাকে প্রজ্ঞা দৃষ্টি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে আর্য্যামি বলে। আর্য্যামি একটী রোগ। এই আর্য্যামির দোষে যতীন্দ্র বাবু অন্য জাতির মধ্যে সাত্ত্বিকতা দেখিতে পান না,চন্দ্রনাথ বাবু ইউরোপে কেবল যণ্ডামার্ক দেখিতে পান,আরো দেখেন যে, ইউরোপীয় মহিলার পতিপ্রেম নাই। এবং সিদ্ধান্ত করেন, যেখানে বাল্য বিবাহ নাই, সেখানে কেবল ব্যভিচার দেখিতে পান। পঁচিশ বৎসরের পুরুষের সহিত আট বৎসরের বালি-কার বিবাহ দিলেই ব্যভিচার দেশ হইতে নির্ম্মূল হয়। হিন্দু সমাজে ব্যভিচার নাই।

হয় ত চন্দ্রনাথ বাবু প্রাচীন আর্য্য-সমাজের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। সুতরাং অপ্রিয় হইলেও, নিজের কুৎসা নিজে করা নিন্দনীয় হইলেও, আমাকে বাধ্য হইয়া দু চারিটী কথা বলিতে হইতেছে। বৈদিক যুগ হইতে বরাবর আমরা নগরে বারবনি-তার দর্শন পাই। ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল? অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্রীকে যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিতে হইত, তাহা কোন্ সুরুচিসঙ্গত? নিয়োগ প্রথা বা স্বামী অক্ষম হইলে অন্য পুরুষ ধরিয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিয়া লওয়া কোন্ সুনীতি অনুমোদিত?

অনেকে অল্প বয়সে দেশীয় বালিকার পূর্ণতা প্রাপ্তির কারণ কেবল দেশের উত্তা-পাধিক্য অনুমান করেন। বস্তুতঃ অল্প বয়সে হিন্দু বালিকার মনোভাবের বিকৃতি একটী প্রধান কারণ। বালিকার চক্ষু হইতে যুবক যুবতীর লীলা চাতুরি প্রচ্ছন্ন না থাকাতে অকালপক্বতার এত বৃদ্ধি হইয়াছে। যে ইউরোপীয় সমাজ চন্দ্রনাথ বাবুর এত ঘৃণিত, সেই সমাজের নিকট এই সকল বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে।

ইউরোপীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। আমাদের সমাজে যাহা দূষণীয়, তাহা অন্য সমাজের আদর্শে সংশোধন করিতে হইবে, আমাদের সমাজে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা অন্য সমাজের দৃষ্টান্তে পরিত্যাগ করিতে হইবে না। নতুবা সন্তানের বিষ্ঠা বলিয়া বিষ্ঠাকে পোষণ করা স্নেহশীলতার তাদৃশ পরিচয় দেয় না, অহম্মুখতার যত পরিচয় দেয়। আর্য্যামি এই জন্য নিন্দনীয়।

চন্দ্রনাথ বাবু আমার অপেক্ষা শতগুণে

পণ্ডিত ও বিচক্ষণ। এ সকল জানা কথা তাঁহাকে বলিবার কোন আবশ্যক নাই। আমার বিশ্বাস তিনি এ সকল জানেন ও বুঝেন, কেবল বাজারের লোকের হাততালি পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না বলিয়া, যশপ্রিয়তার নিকট আত্মমর্য্যাদার বলিদান করেন। সেই রোগ সারাইবার জন্য তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিবার আবশ্যক হয়।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, তিনি ইয়ুরোপ না দেখিয়া থাকিলেও ইউরোপীয় নাটক নবেলে ইউরোপীয় সমাজের চিত্র দেখিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুও বলেন, দেশের সাহিত্য হইতে দেশীয় সমাজের তথ্য সম্যক নিরূপণ করা যাইতে পারে, দেশ পরিভ্রমণের বা দেশীয়দিগের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক নাই। এ মতটী এত অসার যে, ইহার অসারতা প্রতিপাদন অনাবশ্যক। "তুই কাণা—তুই কাণা" এই রকমের একটা উত্তর দেওয়া যাউক। "হরিদাসের গুপ্ত কথা" বা "ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর" প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া যদি কোন ইংরাজ সিদ্ধান্ত করেন যে, হিন্দুগৃহে সতীত্ব নাই—সধবা বিধবা সকলেই ব্যভিচারিণী, আপ্তরঙ্গ বাছ বিচার নাই—চন্দ্রনাথ বাবু ও যতীন্দ্র বাবু এইরূপ সিদ্ধান্ত কেমন সম্মান করিবেন? বস্তুতঃ জাতি বিশেষের মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া যাহা জানা যায় না, কেবল সাহিত্য গ্রন্থ হইতে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। কল্পনাপ্রধান আখ্যায়িকার চরিত্র চিত্রাঙ্কন উদ্দেশ্যানুসারে সত্য হইতে বিভিন্ন। আদর্শপ্রধান আখ্যায়িকা অতিরঞ্জিত, লাঞ্ছনার অভিপ্রায়ে শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল সংযোজিত হয় বা চুণোঁচ রঙ্গ চড়াইয়া দিতে হয়। আখ্যায়িকা হইতে একটা আবছাওয়া মাত্র পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত নিরূপণ করা যেমন কঠিন, আখ্যায়িকা হইতে সমাজের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা তেমনি কঠিন। বিশেষ ভাবে যাহাদিগকে জানিনা, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে হইলে সংযমের সহিত বলা নিতান্ত আবশ্যক।

আর একটী কথার বিচার করিতে হইবে। মানসিক শক্তিতে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায় কি না? দেহের শক্তিতে যা না হয় (যেমন বন্ধ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন) মনের শক্তিতে তাহা হয়, (এখানে মনের শক্তি বলিতে কেবল একাগ্রতা বুঝিতে হইবে) চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একাগ্রতায় কার্য্যের পূর্ণতা সাধন করে। যে কোন শক্তি শতাগ্র না হইয়া একাগ্র হইলে তাহার শক্তিমত্তা অধিক হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমার মানসিক শক্তিতে আমার দৈহিক শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে, যে বোঝা এমনি তুলিতে পারিনা, রাগ হইলে তাহা তুলিতে পারি। হিপনটিজম্ সত্য হইলে, একজনের মানসিক শক্তি অন্য এক জনের কোন কোন মানসিক ও কোন কোন দৈহিক শক্তিকেও প্রভাবিত করিতে পারে। কিন্তু "বিশ্বাস গভীর হইলে অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে" বা দেহের শক্তিতে যাহা হয় না, মনের শক্তিতে তাহা হয়" একথা সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ সত্য নহে। দেবতার দৃঢ় বিশ্বাস বালিকাকে যুবতী করিয়া লইতে পারে, বন্ধ্যার সন্তান উৎপাদন করিতে পারে

তেঁতুলগাছে আম ফলাইতে পারে, মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে, এ সকল কথা এত অসত্য যে, আমি কোন দরিদ্র-শালায় পাঁচশত মুদ্রা উপহার দিতে প্রস্তুত আছি, যদি চন্দ্রনাথ বাবু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন। বস্তুতঃ কার্ত্তিক ও বারইয়ারী পূজার এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে এবং পাহাড়ের ভিত্তির পরিবর্ত্তে বালুর বাঁধের উপর হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রীক পৌত্তলিকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া গ্রীক পৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার শীঘ্রতর সম্পাদিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর ধারণা যে,'বাজারে লোকের ধারণার মত কুৎসিৎ, চন্দ্রনাথ বাবু স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু'সকল দেশের নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে কুৎসিত, এ পত্রে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজ, কি খ্রীষ্টসমাজ কি অন্য কোন বিশেষ সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই! কিন্তু যে কোন সমাজে অধিক বয়সে বিবাহনিয়ম প্রচার আছে, সেই সকল সমাজের রমণীমাত্র যে ব্যভিচারিণী, তাহাও বলিয়াছেন—তাঁহার সাবিত্রী, সীতা ও শকুন্তলা, দ্রৌপদী ও দময়ন্তী সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং তাহারাও যে অসতী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি মা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তিনি যাহাদিগের সহিত কখন ওঠাবসা করেন নাই, চাপরাশী বা খানসামার কাছে যাহাদের ঘরের পরিচয় লন, তাঁহার ধারণা তাহাদের সম্বন্ধে কত সত্য বা উচ্চ হইতে পারে, সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ যখন সাবিত্রী-তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে, চন্দ্রনাথ বাবুর অধোগতি এত অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তিনি অন্য নাম রূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে, তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই, তাহাদিগকে নাস্তিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলেই ইষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে।

এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার, স্বার্থ ও পক্ষপাতপরিপূর্ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন, তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জল জন্তুর জলে বাস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বর দত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন, তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার বা অনাধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশ গুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেন না তাহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে! আর একটী কথা স্থির ভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মা বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফলভোগ করিতে তোমারই অধিকার, অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে, তাহার ঈশ্বরে সত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে, তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন, তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবানের তাহা উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মারস্বরূপ জানিয়া তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম বা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাঁহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে, তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।*

হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে ও বেদ পাঠে সকলের অধিকার নাই। যে জীবের সম্বন্ধে সামাজিক সংস্কার অনুসারে স্ত্রী বা শূদ্র নাম কল্পিত হইয়াছে, ওঁকার উচ্চারণ ও বেদ পাঠ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট,এইরূপ বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশান্তি ভোগ ঘটিতেছে। অতএব বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, এই স্বতঃ-প্রকাশ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। ইহাঁরই দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নানা নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী নাম বা মন্ত্র ওঁকার। যেমন তোমাদের মধ্যে কাহারও নাম হরি, যদু বা রাম, তেমনি জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের নাম ওঁকার। যাঁহার নাম ওঁকার, তাঁহা হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই তাহার লয় ও পুনরুদয় ঘটিতেছে, অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে। সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ। স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্র আপনার বা বিরাট পুরুষ মাতা পিতার নাম যে ওঁকার, তাহা উচ্চারণ করে বা না করে, তাহাতে স্বরূপতঃ জীবের কি আসে যায়? যেমন, হরি যদু বা রামের সহিত যে প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সেই সেই নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়, তেমনই ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সিদ্ধির জন্য ওঁকার নাম ধরিয়া পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতাকে ডাকিতে হয়। যখন তিনি দয়া করিয়া জ্ঞান দিবেন, তখন তুমি দেখিবে যে,তোমা-রই নাম ওঁকার। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ অ, উ, ম, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বা অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ। এক ওঁকার হইতে এই তিন এবং এই তিনই এক ওঁকার। এই এক ওঁকার বিরাট পুরুষ দৃশ্যমান সাত অঙ্গ ধাতু বা তত্ত্ব লইয়া এক। এই ভাবে তাঁহার নাম সপ্ত ব্যাহৃতি বলিয়া শাস্ত্রে কল্পিত। যথাঃ—ওঁ ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবী, ওঁ ভুবঃ অর্থাৎ জল, ওঁ স্বঃ অর্থাৎ অগ্নি,ওঁ মহঃ অর্থাৎ বায়ু, ওঁ জনঃ অর্থাৎ আকাশ,ওঁ তপঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা,ওঁ সত্যং অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণ। এই সপ্ত ব্যাহৃতিকেই শাস্ত্রে দেবতা বলে। এতদ্ভিন্ন দেবতা হন নাই, হইবেন না, হই-বার সম্ভাবনাও নাই।

শাস্ত্রে বলে, তোমার দেহেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা তত্ত্ব কল্পিত হইয়া-ছেন। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মল নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের পৃথিবী তত্ত্ব বা দেবতা। মূত্র নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের জল তত্ত্ব বা দেবতা। অন্ন পরিপাক ইন্দ্রিয়ের অগ্নিতত্ত্ব বা দেবতা। শ্বাসবাহী ইন্দ্রিয়ের বায়ু তত্ত্ব বা দেবতা। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের আকাশ তত্ত্ব বা দেবতা। মনের চন্দ্রমা তত্ত্ব বা দেবতা। জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহির্দৃষ্টির অথবা জ্ঞান নেত্রের তত্ত্ব বা দেবতা সূর্য্য নারায়ণ। এই সকল তত্ত্ব বা দেবতা সূক্ষ্মতার পরিমাণ অনুসারে দেহের নিম্ন স্থান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে রহিয়াছেন—ইহারই নাম ষটচক্র, যাহাকে জ্ঞানের দ্বারা ভেদ করিলে অর্থাৎ যথার্থ রূপে চিনিলে অখণ্ড জ্যোতিরূপে সহস্রসার পদ্মে জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে চিনিয়া কারণে স্থিত হন। যাহা ভিতরে তাহাই বাহিরে। ভিতর বাহিরকে লইয়া একই ওঁকার সাকার নিরাকার

পরমাত্মা বিরাট পুরুষ অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া পবিত্র অপবিত্র, উত্তমাধম কোন জীবই ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না এবং কোন জীবকে ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিয়া ইনি নাই। অতএব ইহাঁর কল্পিত নাম যে ওঁকার শব্দ, তাহা উচ্চারণ করিতে কিরূপে কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে? যথার্থতঃ জীবেরই নাম ওঁকার। আপনার নাম আপনি উচ্চারণ করিতে বিধি নিষেধ অসম্ভব। গড্ আল্লা খোদা ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ গণেশ, সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা ইহাঁরই নাম। অথচ ইনি সকল নামের অতীত যাহা তাহাই। অতএব ইহাঁর যে নাম ব্রহ্ম গায়ত্রী তাহার জপ বা ওঁকার ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার যে মন্ত্র, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ওঁকার বা ব্রহ্মগায়ত্রী নামে ডাকিবে অর্থাৎ ঐ মন্ত্র জপিবে। এবং "ওঁ বরদে দেবী জ্যোতিঃ পরম ব্রহ্মণে স্বাহা" "ওঁ পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা," "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা" এই তিন বা ইহার মধ্যে কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মার নামে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ইহাতে কোন ভয় বা সংশয় নাই। বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলই আছে।

আরও তোমরা মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ, যাহাকে বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকার প্রভৃতি অথবা যাহাকে অধিকারী অনধিকারী বলে, তাহা কি বস্তু—সত্য না মিথ্যা? অধিকারী ও অনধিকারীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কি বস্তুর প্রভেদ, না, গুণ ক্রিয়া রূপের প্রভেদ? সেই যে প্রভেদ তাহা কি সাকার না নিরাকার—সত্য, না মিথ্যা? শাস্ত্রে ও লোকে সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই, অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা উপাস্য উপাসক, অধিকারী অনধিকারী প্রভৃতি কোন পদার্থই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি তোমরা মনে কর যে, বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকার অথবা অধিকারী অনধিকারী তোমরা মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া মিথ্যারই রূপ মাত্র রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, যখন জগৎ ও জগ-তের অন্তঃপাতী তোমরা মিথ্যা, তখন তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান-বিশ্বাস ও তোমা-দের ইষ্টদেবতা গায়ত্রী ওঁকার ঈশ্বর গড্ আল্লা খোদা প্রভৃতি সকলেই মিথ্যা। কেন না মিথ্যা হইতে কখনও সত্যের উপলব্ধি হয় না। এরূপ বলিলে বা ভাবিলে আরও বুঝিয়া দেখ যে, কে কাহার অধিকারী বা অনধিকারী হইবেন এবং বেদমাতা গায়ত্রী বা ওঁকারই বা কি পদার্থ হইবেন। যদি বল বা ভাব যে সত্য, তাহা হইলে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ যে, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য। এক সত্যের মধ্যে দ্বিতীয় সত্য অধিকারী অনধি-কারী, বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী, ওঁকার, ঈশ্বর গড্, আল্লা খোদা পরমেশ্বর প্রভৃতির দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিবেন?

রূপান্তর ভেদে একই সত্য নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। এই পূর্ণ রূপের মধ্যে সাকার নিরাকার এই দুইটী ভাব বা শব্দ কল্পিত হইয়াছে। নিরাকার· নির্গুণ শব্দাতীত জ্ঞানাতীত তাঁহার মধ্যে অধিকারী অনধিকারী বেদমাতা ওঁকার পূজ্য পূজক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা পদার্থ হইতেই পারে না। কেন না সেই নিরাকার এক নির্গুণ, গুণাতীত। তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ বা বিকার নাই। যেমন, জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কোন প্রকার জ্ঞান বিকার বা ভেদ থাকে না। পুনরায় জাগ্রত অবস্থা বা প্রকাশ হইলে জ্ঞান হয় যে, "আমি সুখে শুইয়াছিলাম; আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আছেন।" সেইরূপ একই সত্য সাকার দৃশ্যমান জ্ঞানময় বিরাট জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ বিরাজমান। সাকার ব্রহ্মেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, উপাধি, অধিকারী অনধিকারী, বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী, ওঁকার প্রভৃতি সম্ভবে। এই সাকার প্রকাশমান ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী শক্তি বা দেবতা দেবী "সহস্রশীর্ষা" ও „চন্দ্রমা মনসো জায়তে" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। সকলেই জানেন যে, এই সকল মন্ত্র সন্ধ্যাহ্নিকের অন্তর্গত। ইহার নিকৃষ্ট অর্থ এই যে, বিরাট বিষ্ণু ভগবানের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী পৃথিবী চরণ। এই বিরাট বিশ্বনাথ বা বিষ্ণু ভগবান ব্যতীত সাকার বেদমাতা সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা ওঁকার বা অধিকারী অনধিকারী দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গ্রহ দেবতা দেবী বলে, এবং অহঙ্কার লইয়া সেই পদার্থকেই শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বলে, যাহাকে উল্লেখ করিয়া "ক্ষিতিমূর্ত্তায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হয়। অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট বিভূতি, ও অষ্ট সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইঁহাকেই সাত বস্তু, সাত ধাতু, ব্যাকরণের সাত বিভক্তি ও ব্রহ্মগায়ত্রীর সাত ব্যাহৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ভগবানের কোন্ অঙ্গ বেদমাতা সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা ওঁকার ও অধিকারী অনধিকারী হন, আর কোন্ অঙ্গ না হন, অথবা ইহারা কি সমষ্টিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম? যদি এক অঙ্গকে অধিকারী ও অপর অঙ্গকে অনধিকারী বল, তাহা হইলে দেখাইয়া দাও, কোন্ অঙ্গ অধিকারী ও কোন্ অঙ্গ অনধিকারী, আর যিনি অধিকারী, তিনি কোন অঙ্গের অধিকারী বা সমষ্টির অধিকারী। যদি বল, এক অঙ্গ অধিকারী হইয়া অপর অঙ্গকে অধিকার করিতেছে, তাহা হইলে তুমি অধিকারী হইয়া তাঁহার কোন্ অঙ্গকে অধিকার করিতে চাহ, আর কোন্ অঙ্গকে অনধিকারী বলিয়া ত্যাগ করিতে চাহ? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, একই মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপী শক্তি বা দেব দেবী হইতে সমস্ত চরাচর জগৎ, স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি গঠিত হইতেছে। ওঁকার পুরুষের চরণ পৃথিবী গ্রহ, শক্তি

বা দেবতা হইতে স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস গঠিত। নাড়ী জলরূপী গ্রহ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব সমূহের রক্ত রস নাড়ী গঠিত। মুখ অগ্নিরূপী গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীব মাত্রেরই ক্ষুধা, পিপাসা, পরিপাক, ও বাক্য উচ্চারণ, রন্ধন, অন্ধকার নিবারণ প্রভৃতি ভিতরে বাহিরে নানা প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বায়ু প্রাণরূপী গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীবের নাসিকা-দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। মস্তক আকাশ গ্রহ-শক্তি বা দেবতা হইতে জীব মাত্রেই কর্ণ দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিতেছে। চন্দ্রমা গ্রহ-শক্তি বা দেবতা দ্বারা জীবের "ইহা আমার, উহা তাহার" ইত্যাকার জ্ঞান ও দিবা রাত্র সংকল্প বিকল্প ঘটিতেছে। বিরাট ব্রহ্মের বুদ্ধি বা জ্ঞান নেত্র সূর্য্যনারায়ণ গ্রহ, শক্তি বা দেবতা মস্তকে সহস্র দলে বিন্দুরূপে স্থিত হইয়া জীবমাত্রকে চেতন করিয়া নেত্র দ্বারে রূপব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন ও করাইতেছেন এবং তাঁহার দ্বারা জীব সত্যাসত্যের বিচার করিতে সক্ষম হইতেছেন। যখন সূর্য্যনারায়ণ তেজোরূপ জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিত করিয়া জ্ঞানাতীত কারণ ভাবে স্থিত হন, তখন জীবের জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে ও জ্ঞানের সমস্ত কার্য্যের সমাপ্তি হয়। যখন পুনশ্চ তেজোরূপে নেত্রে, মস্তকে প্রকাশমান হন, তখন তিনি জীব বা চেতন ভাবে রূপ দর্শন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করেন। এইত মঙ্গলকারী ওঁকার পুরুষ বিরাট ব্রহ্ম সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইঁহার কোন্ অঙ্গ অধিকারী ও কোন্ অঙ্গ অনধিকারী হন বুঝিয়া প্রকাশ করুন।

যদি বল হাড় মাংসের পুত্তলি স্থূলশরীর অধিকারী ও ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মশরীর অনধিকারী, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, ওঁকার পুরুষের চরণরূপী যে পৃথবী, তাহারই অংশ জীবমাত্রেরই হাড় মাংসের পুত্তলি স্থূল শরীর। তবে সকলেরই হাড় মাংস সমান ভাবে অধিকারী হইবে। যদি বল ইন্দ্রিয়াদি অধিকারী ও হাড মাংস অনধিকারী, তাহা হইলে দেখ যে, ওঁকার বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জীব মাত্রেরই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা প্রত্যেক জীবেই সমান ভাবে বর্ত্তাইতেছে। যথা, চক্ষুর দ্বারা দেখা, নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। যখন একইরূপে জীব মাত্রেই সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তবে জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়গণ অধিকারী। যদি বল, জীব যে চেতন তিনি অধিকারী, তবে দেখ, এক চেতনা ব্যতীত দ্বিতীয় চেতনা নাই। সমগ্র জীব একই ওঁকার চৈতন্যময় বিরাট পুরুষের অংশ, তবে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই সমান ভাবে বেদ গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অধিকারী। এই রূপ বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিবে যে, স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারী। অধিকারী অনধিকারী সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিবে যে, যাঁহার যে অভাব বোধ হইতেছে, তিনি সেই অভাব মোচনের অধিকারী। যিনি অন্ধকারে আছেন, তিনি অন্ধকার নিবারণের জন্য আলোকের অধিকারী। যিনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন, তাঁহার জ্ঞানের বা ভগবানের প্রয়োজন ও তিনি জ্ঞান বা ভগবানের অধিকারী। যাঁহার পিপাসা পাইয়াছে বা পাইবার সম্ভা-

বনা আছে, সেই ব্যক্তি পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত জলের অধিকারী। যিনি ক্ষুধাতুর, তিনি অন্নের অধিকারী। যাঁহার অভাব আছে, তিনিই দান প্রাপ্তির প্রকৃত অধিকারী। যিনি রোগী, তিনি ঔষধের অধিকারী। নিরোগীর ঔষধের প্রয়োজন নাই, তিনি অনধিকারী। যাঁহার জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞানের প্রয়োজন নাই তিনি অনধিকারী। এইরূপ সকল বিষয়ে অধিকারী অনধিকারীর যথার্থ ভাব গ্রহণ করিবে।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়া দেখ। যদি এক মাতা পিতার দশটী পুত্র কন্যা হয় এবং সকলেই ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকে ও উত্তম রূপে বুঝিয়া মাতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করে, তাহা হইলে মাতা পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্র কন্যার অমঙ্গল চেষ্টা করেন, এমন নহে। বরং প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল চেষ্টা করেন। সমদৃষ্টি সম্পন্ন সুপাত্র পুত্র কন্যা ইহাতে আনন্দিত হন যে, "আমরা দশজন ভাই ভগ্নী মিলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক আপন মাতা পিতাকে ডাকিতেছি ও মাতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছি।" পুত্র কন্যা মাত্রেই মাতা পিতা নামের ও মাতা পিতা বস্তুর অধিকারী। কুপাত্র পুত্র কন্যার স্বভাব ইহার বিপরীত। তাহারা নিজে ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক মাতা পিতার নাম উচ্চারণ বা প্রিয়কার্য্য সাধন করে না ও অপরকে করিতে বাধা দেয়। এবং তাহার ফলে সর্ব্বদা অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া অশান্তি অনুভব করে।

হিন্দু মুসলমান ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি তোমরা সকলেই পুত্র কন্যারূপী। মাতা পিতারূপী মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের একমাত্র গুরু মাতা পিতা আত্মা। ইহাঁরই নাম ওঁকার। এই ওঁকার পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ওঁকার হইতে সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়া ওঁকার স্বরূপই রহিয়াছেন। ওঁকার জীব মাত্রেরই আত্মা মাতা পিতা গুরু। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই বেদ, সাবিত্রী গায়ত্রী মাতা বা ওঁকার পুরুষের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারী। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ওঁকার পুরুষ ঈশ্বর একজনকে সত্যের অধিকারী অপরকে অনধিকারী করেন নাই ও করিবেন না। সুপাত্র পুত্র কন্যা নিজে উত্তম কার্য্য করিবেন ও অপরের দ্বারা করাইবেন। তিনি জানেন যে, ওঁকার পুরুষ বা ব্রহ্মকে কেহ খরিদ বা ঠিকা গ্রহণ করেন নাই। কেবল সামাজিক স্বার্থবশতঃ লোকে অধিকারী অনধিকারী কল্পনা করিয়াছেন।

সমস্ত রাজা জমিদারগণ অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়া মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে ধারণ ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য কি, বুঝিয়া সম্পন্ন কর। অবস্থা ও শক্তি অনুসারে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের যথার্থ অধিকারী। যাহারা না বুঝিয়া অধিকারী অনধিকারী কল্পনা দ্বারা অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করে ও আপনার অধঃপাত ঘটায়, তাহাদিগকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এরূপে দণ্ড দিবেন যে, তদ্দারা শিক্ষা পাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নশীল

হয় ও সৎপথে চলিতে পারে। এরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলবিধান করিবেন।

যদি মনুষ্যের মধ্যে একজনও অধিকারী হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে জীবের এরূপ কষ্ট হইত না, সমস্ত অমঙ্গল দূর হইত। এখন কেবল মুখেই অধিকারী অনধিকারী বলা সার হইয়াছে!

আর একটী কথা বুঝিতে হইবে। পরমাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য হইবার নিয়ম স্থাপনা করিয়াছেন; কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহার পরিবর্ত্তন করে। সে নিয়ম কি, বলিলেও যে কার্য্য হইবে, না বলিলেও সেই কার্য্য হইবে। সে কথা মুখে বলা আর না বলা দুই সমান। বল আর না বল, চক্ষের দ্বারা দেখিতে হইবে, কর্ণের দ্বারা হইবে না ইত্যাদি। পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়াছে, তাহার সেইরূপ গুণ বর্ত্তাইবে ও ক্রিয়া ঘটিবে। অধিকারীকে অনধিকারী বা অনধিকারীকে অধিকারী করিতে মনুষ্যের সামর্থ্য নাই। হস্তীকে মনুষ্য বা মনুষ্যকে হস্তী করা অসম্ভব। জীবের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ক্রিয়া শক্তি বা গুণ, অধিকার অনধিকার পরমাত্মা দিয়াছেন, কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না। স্বভাবতঃ তদনুসারে কার্য্য হইবে। মুখে বলিয়া বা অন্যবিধ চেষ্টা করিয়া কাহাকেও অধিকারী অনধিকারী করিতে হয় না। করিবার চেষ্টায় সত্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার পরের কষ্টভোগ মাত্র ঘটে ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইতে বিমুখ হইতে হয়। অধিকার অনধিকার যাহা কিছু পরমাত্মা করিয়াছেন ও করিবেন, ও তিনিই জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন। যেখানে তোমার অধিকার নাই, সেখানে তুমি আগে নিজে অধিকারী হও, তবে অপরকে অধিকারী বা অনধিকারী করিবে। ইহা নিশ্চিৎ জানিও যে, কেবল পরমাত্মাই অধিকারী বা অনধিকারী করিতে পারেন, ইহাতে মনুষ্যের কোন হাত নাই। তিনি যখন অন্ধকার করেন বা সুষুপ্তি ঘটান, তখন জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকলেরই সুষুপ্তি ঘটে বা অন্ধকার বোধ হয়। এমন নহে যে, জ্ঞানী পণ্ডিত আলোকের সাহায্য বিনা শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং মূর্খই কেবল আলোকের সাহায্যে কার্য্য করে।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী অনধিকারী এরূপ সংস্কার অভিমান ও মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জগতের হিতসাধনে যত্নশীল হও ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপন কর। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

পূর্ণ বাবুর নূতন চিন্তা।*

... ...তাহারই পরিশিষ্ট। প্রথমে দ্বিতীয়েরই অনুরণন শুনিতেছি। দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। সেক্‌স্পিয়ারের ট্রাজিডি এবং, বোধ হয়, বঙ্কিমের উপন্যাস

* কাব্য-চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা; জন্‌প্রেস্‌। মূল্য ১৲টাকা।

পড়িয়া পড়িয়া আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে—"সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে" —"আত্মঘাতী ও পরঘাতী খুনীদলের সৃষ্টি হইতেছে।" ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। অবিলম্বে রামায়ণ, মহাভারত, এবং আঠার পুরাণ দিয়া সমাজদেহে এ বিষবীসর্পের রোধ করিতে হইবে। কাব্যসুন্দরীর পর তাই কাব্যচিন্তারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রয়োজন তো হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণবাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—আমরা কথাটা বুঝিতে পারি নাই। "বিলাতী শেক্স-পিয়ারের ভাল ভাল ট্রাজিডি দ্বারা সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে"—"বটে"দ্বারা বুঝিতেছি, পূর্ণবাবুর আর একছিটা সংশয়ও নাই। কিন্তু তিনি তো সংশয়ের পারে পৌঁছিলেন, আমাদিগকে বড় খট্‌কায় রাখিয়া গেলেন। প্রতিজ্ঞাটী কি স্বতঃসিদ্ধ? যদি নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তবে পূর্ণ বাবুর কাছে তার একটু প্রমাণ চাহিতে ইচ্ছা হয়। সমাজশরীরে সাহিত্যের প্রভাব নাই, এমত বলিতেছি না। সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বোম্বাই কামানে চক্‌মকি লাগাইয়া একটা ডিক্‌শনারি ফরাসি বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সাহিত্য দুয়েরই রসায়ন হইতে পারে। কেন সমাজে পাপ বিদ্যমান, দেশভেদে কালভেদে কিসে তার পরিপুষ্টি হয়, সমাজতত্ত্বে এতদপেক্ষা গুরুতর সমস্যা আর নাই। পূর্ণবাবুর প্রতিজ্ঞা সেই কার্য্যকারণসম্বন্ধগর্ভা। সে সম্বন্ধ অনুমানগম্য। অনুমানে অব্যভিচারী হেতু আবশ্যক। ইংলণ্ডের সকল পুলিশ কোর্ট, সকল Assizeএর মোকদ্দমা মন্থন করিয়া, পূর্ণবাবুই হউন আর যিনিই হউন, যদি কেহ সেইরূপ হেতু উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবে এ প্রতিজ্ঞা বাহাল থাকিত। প্রতিজ্ঞাটা আগে ইংলণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হউক,তারপর এ দেশে হইতে পারিবে। এ দেশের সহিত শেকস্পিয়ারের আজও তেমন মাখামাখি প্রণয় হয় নাই। প্রতিজ্ঞা-প্রমাণের ভার পূর্ণ বাবুর উপর। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমরা তাঁহার প্রভূত লোকহিতৈষণায় মোহিত আছি, কিন্তু প্রভূত তথ্যবাদিতার প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ বাবুর দেখাইতে হইবে যে,শেকস্পি-য়ারের ট্রাজিডিরাজি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সমাজে অসুর ছিল না বা কম ছিল এবং তাহার পর, তাহারই ফলে, সমাজে অসুর-বংশের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারই ফলে—বিশেষণটা যেন পূর্ণ বাবুর স্মরণ থাকে। আর এক কথা। যতদূর বুঝিয়াছি, পূর্ণ বাবুর প্রতিজ্ঞা সঙ্কুচিতা নহে—প্রসারিণী। তিনি এমত বিবেচনা করেন না যে, ট্রাজিডিগুলি রামে রহীম্ বুঝাইয়া বা এমনই একটা কিছু দিয়া দৈবাৎ এখানে সেখানে দুই চারিটা নরপশুর এক আধটুকু ঘাসজল যোগাইতে পারে মাত্র। তাঁহার ধারণা, সেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিগুলির রজস্তমোবৃংহিনী একটা নিত্যশক্তিই আছে; তাহারা স্বভাবতঃই চিত্তের ক্রূর ভাবগুলিকে জাগাইয়া তুলে; তাহাদের হাওয়ায় চড়িয়া খালি ডাইন ফিরে, আর হাতের কাছে যাহাকে পায়, তাহারই গলা ভাঙ্গিয়া রক্ত খায়; এক কথায়, "তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট"। অতএব যদি কদাচিৎ ঐ সকল ট্রাজিডিদ্বারা দুই চারিটা কাণা রাক্ষসের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেও পূর্ণ বাবুর ইষ্টলাভ নাই; কেন না কাণা-

চিৎক সাধনে ঐরূপ ব্যাপক প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয় না। অধিকন্তু, সেরূপে ইষ্টলাভ করিতে গেলে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে। সুপ্তপাঞ্চাল-হত্যার মনন করিয়া অশ্বত্থামা মাতুল কৃপাচার্য্যকে তাহা জানাইলেন। শুনিয়া কৃপাচার্য্য কত সান্ত্বনা, কত ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সঙ্কল্প পাকা করিয়াছিলেন, ফিরিলেন না; আপনার অনুকূলে পাণ্ডবগণের বিবিধ কপটযুদ্ধের নজীর দেখাইলেন।* ধর্ম্মপক্ষও অধর্ম্মের উৎসাহ দিল; লোমহর্ষণ সৌপ্তিকপর্ব্ব কর্ম্মে অভিনীত হইল। খণ্ড প্রমাণে শেকস্পিয়ারকে গুনাহ্‌গার করিলে এখানে বলিতে হয়, পাণ্ডবচরিত্রের অধ্যয়নফল আরও জঘন্য; কেন না সে চরিত্র ধর্ম্মচরিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াও অসুর স্থষ্টির মশলা যোগাইয়াছে বা যোগাইতে পারে। তাহাতে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে।

যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করে নাই, তাহাকে তার স্রষ্টা বলিতে পারি না। যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে নাই, তাহাকেও তাহার পোষক বলিতে পারি না। এইজন্য আমি শেকস্পিয়ারকে অসুরের স্রষ্টা বা পোষ্টা বলিতে রাজি হই নাই। তবে অসুরে শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডির মধ্যেও আপনার খোরাক্ খুঁজিয়া লইতে পারে, আমি সে কথা অস্বীকার করি নাই। জিঘাংসাজ্বলিত দ্রৌণায়ন পাণ্ডবের যুদ্ধনীতিতে সেইরূপ খোরাক্‌ই পাইয়াছিল, দেখাইয়াছি। ফলে যার যেমন ভাবনা-তার তেমনই সিদ্ধি হইয়া থাকে। কাব্যার্থের পরিশীলনেও তাই। ভেলকির দৈববাণীর মত প্রৌঢ়কাব্যবাণীও দ্বিজিহ্বা। যে যেমন বাসনার চিত্ত মাজিয়া আসি, সে তেমনই উত্তর চিত্তনিকষে কষিয়া লইয়া যাই। সেইটাই সোনালী রেখায় ফুটিয়া উঠে, আর কিছুর দাগ পড়িতে দেখি না। এক আওয়াজই তার শুনিতে পাই, আর একটা আওয়াজ আর বড় শুনি না—শুনিলেও বুঝি না—বুঝিলেও বা বুঝিতে চাই না। "জ্ঞাতির বিষয়—তা, সংসারে থাকিতে হইলে সে টু-কু করিতে হয়। তাতে দোষ কি?" "দোষ বেশী কিছু না—দুর্য্যোধনের যাহা হইয়াছিল।" "কি, মরণ? মানুষ আবার অমর হয় নাই কি? দুর্য্যোধন রাজ্যলাভ করিল, ঐশ্বর্য্যভোগ করিল—আর চাই কি? সব করিল, তার পর তবে মরিল—ক্ষত্রিয় যেমন মরে, তেমনই মরিল। সে মরণেও মুমূর্ষু বীরের শিরে অমরপুষ্পবৃষ্টিপাত হইয়াছিল। আর যুদ্ধের নামে জুয়াচুরি ধরিলে সেও মারিত বই মরিত না।" "মরণের কথা নাই বা বলিলাম, কিন্তু অধর্ম্ম?" "অধর্ম্ম কি? নাবালগ্ পাণ্ডুপুত্রগণকে তো কৌরবেরা রাজ্য প্রত্যর্পণই করিয়াছিল। তার পর পাণ্ডব আপন খোশীতে রাজ্য পণ করিয়াছে। সে তো Contract *—চুক্তি। চুক্তির শর্ত্তে পাণ্ডব রাজ্য হারিয়াছে, দুর্য্যোধনের অপরাধ কি? জিত রাজ্য ছাড়িয়া দিলে দুর্য্যোধনের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু না ছাড়িবায় অধর্ম্ম হয় নাই।" "তাই কি?" "তাই না তো কি? এত যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মর, কই, তোমার ধর্ম্মরাজেরও তো বনরাজ্যটী ছাড়া আর কোনও রাজ্য বড় একটা জুটিতে দেখিলাম না—জুটিল তো বেশী দিন কপালে লাগিল না! অনুষ্ঠানের পরেই যে দেখি মহাপ্রস্থানের

* মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব্ব, ৫ অঃ।

* ব্যবহারবিদেরা বলিবেন, wagering contract!

ডাক পড়িয়াছে!" সর্বাঙ্গবারে বেদব্যাস বোকা বনিয়া যান; আমরা ঠিক্ হইয়া জ্ঞাতির সঙ্গে পাশা খেলিতে বসি যে যেমন ভাবিয়া আসি, সে তেমনই বুঝিয়া যাই। কাব্যবাণী হাসিয়া বলে—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

একবার যদি সাফাই হইয়া গেল, তার পর আর তখ্‌তে বসাইতে দেরি লাগে না দুর্য্যোধন যদি মঞ্জুর হইল, তবে সুতরাং পাশাখেলা, বস্ত্রহরণ, বনবাস, অভিমন্যুবধ—কিছু আর নামঞ্জুর থাকে না। মহাভারত কণ্ঠস্থ করিয়াও জ্ঞাতির সর্ব্বনাশ করিবার বাধা হয় না। বঙ্গসমাজে বাল্মীকি-ব্যাসের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে পূর্ণ বাবু যে মনোমোহন চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্রে নিসর্গের আলোটুকু ফুটিয়াছে, অন্ধকারটুকু ফুটে নাই। বুঝি বা পূর্ণ বাবু ইচ্ছা করিয়াই অন্ধকারটুকুকে আর ফুটিতে দেন নাই। লোকশিক্ষাকল্পে এইরূপ কেবলজ্যোতির্ম্ময় চিত্রই উপযোগী বটে, কিন্তু তত্ত্ববিচারস্থলে ইহাকে সত্যের অপলাপী না বলিলেও সত্যের দেশমাত্রদর্শী বলিতে হয়। চিত্রে অন্ধকার উঠে নাই, কিন্তু আদর্শে তো অন্ধকারও আছে। এক দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত কত পুণ্যবান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কত পাপীকে পুণ্যপথে লইয়া আসিয়াছে, আর এক দিকে তেমনই কত যে পাপিষ্ঠ তাহা হইতেই পাপের বীজ খালি খুঁটিয়া খাইয়াছে—তার কি সংখ্যা আছে? কিরূপে খুঁটিয়া খায়, উপরে আমি তাহারই একটা নক্‌শা দিয়াছি। ফলে যে দুর্ব্বাসনার শিকড় আমার স্তরে স্তরে বিঁধিয়া গিয়া কায়েমী হইয়া ধরিয়াছে, শাস্ত্র বল, ইতিহাস বল, কাব্য বল, তার উচ্ছেদ কেহ করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই সে আপনার অনুলোম ধাতুটী শুষিয়া আত্মসাৎ করে, প্রতিলোমটী যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া যায়। যেখানে আইন নাই বা থাকিয়াও অস্পষ্ট, সেইখানেই নজীরের প্রয়োজন হয়। দুষ্কর্ম্মের আইন নাই। তাই বুঝি তারও নজীর খুঁজিতে হয়। নজীরের যেটুকু নোক্‌শানী থাকে, সেটুকু রিফু করিয়া লই; আমাদের যেটুকু খুঁত ছিল, নজীর পাইবার পর সেটুকুও পরিষ্কার হইয়া যায়। নজীর না পাইলে লোকে পাপ করিত না, এরূপ বলি না। কিন্তু নজীরে পাপের বড় উপকার করে। অনেক সময়েই তো দেখিতে পাই, যে পাপ বাসনা ক্ষণস্থা হইত, নজীর পাইলে সে চিরজীবিনী হয়; যে লোলা ছিল, সে বিলোলা হয়; যে বিলোলা ছিল, সে কর্ম্মোন্মুখী হয়। পক্ষান্তরে, পাপের অনুষ্ঠান করিয়া যে একটু কেমন কেমন ভাবিতেছে, নজীর পাইলে সে খাতিরজমা হয়। রামায়ণ মহাভারতে এরূপ নজীরের অভাব নাই। যে চায়, সেই পায়। কত পাষণ্ড পাইয়াছে, তার ঠিকানা কি? পাপের তেমন বাছা বাছা বিচিত্র নজীর শেকস্পিয়ারেও নাই। এক মহাভারতে পাপের যত ইতিহাস, যত উপাখ্যানে, যত সংবাদ, যত গাথা আছে, শেকস্পিয়ারের সপ্তত্রিংশন্নাটকীয় সঙ্কলিত পাপরাশি তার কলার কলামাত্র। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিদ্বারা যদি অসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে রামায়ণমহাভারতদ্বারাও যে অসুরের সৃষ্টি হয় নাই, কে বলিবে? অথচ বাল্মীকি ব্যাস ধর্ম্ম ছাড়া অধর্ম্মের উপদেশ দেন নাই। তবে আর শেকস্পি-

রাবেরই বা অপরাধ কি? তিনিও তো মানুষকে অসুর হইতে বলেন নাই।

সকল প্রশ্নেরই উত্তর থাকে, এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর আছে। উত্তর কাব্যচিন্তায় নাই, সাহিত্যচিন্তায় আছে। উত্তরটার দুই বুনিয়াদ্। একটা অলঙ্কারশাস্ত্রের কাছাকাছি, আর একটা ধর্ম্মশাস্ত্রে। প্রথমতঃ, মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডিগুলিতে খালি ছুরী, খালি খুন! যেন এক একটা "কশাইখানা!" কেবল ভয়ানকরস, কেবল বীভৎসরস; শান্তরসের একটু গন্ধও নাই। এরূপ খাঁটি রস পান করিতে করিতে চিত্ত তার রজোগুণে তমোগুণে নিষিক্ত হয়; তার পর তাহাতে দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে থাকে। অতএব সেগুলির অধ্যয়নফল অতিগর্হিত। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় সকল কাব্যেই থাকা উচিত। রামায়ণ মহাভারতে তাহাই আছে। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিতেও তাহা নাই, এমন নহে। কিন্তু রামায়ণমহাভারতে ধর্ম্মই জাজ্বল্যমান, অধর্ম্ম নিষ্প্রভ; শেকস্পিয়ারে যেন অধর্ম্মই ভাস্বর, ধর্ম্ম নিষ্প্রভ। এজন্যও ট্রাজিডিগুলি অপকৃষ্ট। এই উত্তরই পূর্ণ বাবুর রক্ষাকবচ। কবচটা একটু হাতে লইয়া দেখি।

পূর্ণ বাবুর প্রথম আক্ষেপটা মিথ্যা নহে। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিতে এত রস আছে, কিন্তু শান্তরস নাই। শান্তরসের লক্ষণটা পূর্ণ বাবুর একবার স্মরণ করিতে হইবে। শান্তরস রসই কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না। কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় যে,অলঙ্কার যাহাকে শান্তরস বলিয়াছেন, তাহা সেই "রসো বৈ সঃ" আত্মা যে আত্মপ্রীতি কিছু দুষ্পচ; তার পিপাসা কাব্যে পরিতৃপ্ত হইবার আমি কোনও সম্ভাবনা দেখি না। আর শান্তরস না" থাকিলেই কাব্য অস্পৃশ্য হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নাই বলিয়াই যেমন কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়না, শান্তরস নাই বলিয়াই তেমনই তদ্বিহিত কাব্যও নিষ্ফল হয় না। রামায়ণ শান্তরসাত্মক নহে। এমন যে মহাভারত, শান্তরসের দুই চারিটা মীড় গিটকারী তাহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তরস তারও জান্ নহে। কুরুক্ষেত্র যার উপায়,হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার যার ঐপ্সিক, তার জান্ শান্তরস হইতে পারে না। যাহাকে পূর্ণ বাবু মহাভারতের "প্রধান আখ্যায়িকা" বা "প্রধান কাব্য-কল্পনা" * বলিয়াছেন, তাহাতে শান্তরস নাই, অথচ তাহাতেই নিখিল মহাভারত চরিতার্থ হইতেছে। বস্তুতঃ যে উপদেশ-যোগকে মম্মটভট্ট কাব্যের অন্যতম ফল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য রসেরই অবতারণায় সিদ্ধ হয়। তবে তারা শান্তেরই দিকে ফিরিয়া চায়, তার আর সংশয় কি? সৎকাব্যের পরিশীলনে তাই আমরা অধর্ম্মের আস্ফালনে ভীত, ক্রুদ্ধ হইতে শিখি; অধর্ম্মের উচ্ছেদে উৎসাহিত হই। যাহা সুন্দর তাহাকে ভালবাসিয়া, যাহা কুৎসিত তাহাতে ঘৃণা করিতে শিখি। মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডির অধ্যয়নফলও তাই। মাকবেথের আসুর সংরম্ভে আমাদের ভয় হয়, ক্রোধ হয়; অজস্র নর-শোণিতপাতে আমাদের ঘৃণা হয়। মাকবেথের সর্ব্বনাশে আমরা উৎসাহিত হই। ভয় বা ঘৃণা রাজস বা তামস হইতে পারে, কিন্তু এ রজস্তমঃ সত্ত্বেরই অনুগামী। তবে

---

* কাব্যচিন্তা; ৫৪, ৫৫ পৃঃ।

এ ভয়ানকে, এ বীভৎসে পূর্ণবাবু এত বিভীষিকা দেখিলেন কেন? রামায়ণ মহাভারতেও ভয়ানকবীভৎসের অভাব নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে যে বীভৎসের সৃষ্টি আছে, রমণীর শিরশ্ছেদ তার চেয়ে বেশী নয়। তেমন অবশ্য বীভৎসে ফরাসি নবেলও কলুষিত হইয়াছে কি না, আমার সংশয় হয়। তার পর, যাহা বলিতেছিলাম। মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডির ভয়ানক বা বীভৎসে কেন যে চিত্ত দূষিত হইবে, বুঝিতে পারি না। যে Addison এর উক্তি পূর্ণবাবু এত আহ্লাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তো শেকস্পিয়ারের নিন্দা করেন নাই। তবে ভয় খাইতে খাইতে ভয় যায়, ঘৃণা করিতে করিতে ঘৃণা দূর হয় বটে। কিন্তু পাপে ভয় বা পাপে ঘৃণার পুনঃপুনরনুশীলনেও সে ভয়, সে ঘৃণা ঘুচিয়া যায়—এমন খবর পূর্ণবাবু রাখেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি রাখি না। তা যার ঘুচিয়াছে, তার ঔষধ শেকস্পিয়ারে নাই বটে। সেজন্য শেকস্পিয়ারকে ফাঁসি দিলে আমিও দুঃখিত হইব না।

তার পর, সেই কথা—বাল্মীকিব্যাসে ধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল, শেকস্পিয়ারে অধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল। কিন্তু আপত্তিটার জোর সাহিত্যচিন্তায় যেমন ছিল, কাব্যচিন্তায় আর তেমন দেখিতে পাই না। কাব্যচিন্তায় পূর্ণবাবু স্বীকার করিয়াছেন, রাবণ বা দুর্য্যোধনও নিষ্প্রভ নহে। না হইবারই তো কথা। পূর্ণিমা না হইলে গ্রহণ লাগিবে কেন? তাই "দশানন মহাকালের সহায়তা লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিজয়ী রূপে সদর্পে সংসারধামে বিচরণ করিতেছে"। "দুর্য্যোধনও শত ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মহাবলদর্পে কুরুক্ষেত্রের রণে আসিয়াছে।"* তাই সে রাজঘাতী বন্ধুঘাতী শিশুঘাতী মাকবেথকে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়াছি। দেবপীড়নে ব্রহ্মপীড়নে যার আরম্ভ, সীতাহরণে তার পূর্ণিমা; নহিলে পাষাণ জলে ভাসিবে কেন? ইন্দ্রক বারণাবত, লাগায়েৎ উত্তরগোগৃহ—সব চাই; সব সাঙ্গ না হইলে কি লক্ষ্মীপতি রথের সারথি হয়? অতিথিরক্ত, বন্ধুরক্ত, শিশুরক্ত—এত রক্ত না মিশিলে অরণ্যানী সঞ্চারিণী হয়? চারি অঙ্কে মাকবেথের পূর্ণিমা; তবে পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ঐ আসে! ঐ আসে!—পঞ্চমে আর অন্য শব্দ নাই। পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ডন্‌কানের অযুত রক্তবীজ ইংরেজবাহিনী সাজিয়া ছিদ্ধি ছিদ্ধি রবে মাকবেথকে ঘিরিতেছে। ডাক্তার! এ জঞ্জাল দূর হয়, এমন জোল্লাব্ তোমার শাস্ত্রে নাই? মাকবেথের শক্তিব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। যে দৃপ্ত সামন্তমণ্ডল মাকবেথের করচুম্বন করিয়া অনন্ত সাহায্য শপথ করিয়াছিল, আজ তারা মাকবেথকে ছাড়িয়া যাইতেছে। "ডাক্তার, সামন্তেরা আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে!" শুধু কি তাই? রক্তপানে যে তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল, কই—মাকবেথ। রক্তদানে আজ সে তোমার সহধর্ম্মিণী হইল কই? গলফাঁস করিয়া আসিতেছে। সহস্রাব্দীর পার হইতে নরঘাতীর শুষ্ক নিঃশ্বাস শুনিতেছি—

They have tied me to a stake;
I cannot fly.

শুনিতেছি, আজও তাই শেকস্পিয়ারকে বিদায় দিই নাই। মাকবেথে ধর্ম্মপক্ষ নাম দিয়া একটা পক্ষ খাড়া

* কাব্যচিন্তা; ৭৩—৭৫, ৭৬ পৃঃ।

করা হয় নাই বটে; নারায়ণও অবতীর্ণ হইয়া তার সাহায্য করেন নাই। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রামায়ণেও "ধর্ম্মের দৈবসহায় নারায়ণ বিলুপ্ত ভাবে আছেন," পূর্ণবাবুই দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে মাকবেথে ধর্ম্ম নিষ্প্রভ বল কেন? যে দেবতা পার্থসারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রে কুরুবংশধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিই আজ মাকডফের খড়্গে থাকিয়া ডন্‌সিনেনে মাকবেথের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেছেন। যে ডাকিনীরা মাকবেথকে ভুলাইল, তারাই আর এক দিন দুর্য্যোধনকেও ভুলাইয়াছিল। মাকবেথে আর মহাভারতে, আমি তো কোনও প্রভেদ দেখি না।

আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। আমি কাব্যচিন্তার প্রয়োজনেরই সমালোচনা করিয়াছি, তদ্‌গ্রথিত বস্তুর সমালোচনা করি নাই। প্রয়োজন সমালোচনা করিয়া আমি ইহাই পাইয়াছি যে, নিতান্ত বিষে বিষক্ষয় না মানিলে পূর্ণবাবুর দ্রব্যগুণে একটু সংশয় থাকিয়া যায়। কেন না, শেকস্পিয়ারের দল উৎখাত করিয়া বাল্মীকিব্যাসকে তার স্থানে বসাইলেই যে বঙ্গসমাজে কাব্যদ্বারা অসুরসৃষ্টির সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে, এমত কোনও গারাণ্টী পূর্ণবাবুর কাছে পাই নাই। কাব্যচিন্তার বস্তুপরীক্ষা আমার উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। *

বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় আবার এক বৎসর অতীত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নব বর্ষের প্রারম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘোৎসব ব্রাহ্মের অতি শুভদিন; পরাধীন ভারতবর্ষেরও সৌভাগ্যের দিন। যে দিন ভারতবর্ষে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মকে নববেশে পুনরায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই দিন নরনারী সকলের প্রিয় দিন হওয়া উচিত। এই শুভদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে মৌখিক বক্তৃতা করিবার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। এবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কয়েকটী লিখিত রচনা পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের ভার আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে আপনাদের জ্ঞান-পিপাসা ও ধর্ম্ম-পিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলে আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিতাম। কিন্তু অন্ধের চিত্রপট দর্শন বাসনা মনে উদয় হইয়া মনেই বিলীন হইয়া যায়, আমারও এই প্রথম উদ্যমে সিদ্ধলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তবে কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এইরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

আমার নিজের এমন কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই যে,আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি; অন্য জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পুস্তক হইতে যৎকিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ করিয়া আপনাদের চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। অপরের কথা লইয়া যদি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করি, তাহা হইলে আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া আপনাদের ঔদার্য্য গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান অদ্যকার আলোচ্য

* এই প্রবন্ধটী ২ মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত হইয়াছিল।

বিষয়। বিষয়টী যে অতিশয় গুরুতর, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য, অসভ্য সকল সমাজেরই চিন্তার বিষয় হইয়া আসিতেছে। বিষয়টী পুরাতন হইলেও ইহা এখনও শৈশব অবস্থায় আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহার গতি অনন্ত উন্নতির দিকে। ইহা আমাদের জীবনের ও মরণের সহিত এইরূপ জড়িত যে, বার বার ইহার আলোচনা করিলেও ইহার আদর আমাদের নিকট হইতে কখন হ্রাস হইবে না। আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া অদ্যকার বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ধর্ম্ম কি, বিজ্ঞান কাহাকে বলে, ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহারই অনুসন্ধানে এখন প্রবৃত্ত হই।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহার উত্তর দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। "নানা মুনির নানা মত"। এই বাক্যটী যদি কোন বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার এই ধর্ম্ম অর্থ লইয়াই এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ লইয়া মনুষ্য মধ্যে পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই নানা মুনির নানা মত, এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্ম শব্দ ও ইংরাজি Religion শব্দের যৌগিক অর্থ প্রায় একই রূপ। Re and ligare অর্থাৎ বন্ধন। সিসিরো বলেন, উহা Re and legere হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ পুনরাহরণ বা সংগ্রহ। ধর্ম্মশব্দ ধৃ+মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ধ্রিয়তে লোকো অনেন ধরতি লোকং বা) Martineau তাঁহার Study of Religion এ ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ধর্ম্ম বলিতে আমরা এই বুঝি যে, এক জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ও তাঁহার পূজা করা। তিনি পরমাত্মা ও ইচ্ছাময়, তিনি জগত শাসন করিতেছেন, এবং তিনি মনুষ্যের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন"—

Understanding by religion. Belief and worship in an Everliving God that is a divine mind and will, ruling the universe and holding moral relation with mankind.

উপনিষদ বলিতেছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

যশ্চায়মস্মিন আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতিনান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অর্থ—এই যে তেজময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাকে জানিয়া এবং ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই।

Martineau বলিতেছেন, জীবন্ত ঈশ্বর, উপনিষদ বলিতেছেন অমৃতময় পুরুষ। Martineau বলিতেছেন, তিনি আমাদের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; উপনিষদ বলিতেছেন—তিনি আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। Martineau বলিতেছেন, ইঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ইঁহার উপাসনাই ধর্ম্ম। উপনিষদ বলিতেছেন, যে ইঁহাকে জানিয়া ও ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই, ইহা ভিন্ন ধর্ম্মের অন্য পথ নাই।

যদিও আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয়

অন্য অন্য ঋষিদের মত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি, তথাচ Martineau ও উপনিষদের মতই আমরা প্রধানত অবলম্বন করিব।

Kant এর মতে ধর্ম্ম, নীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া আমরা পালন করি,তখনই উহা ধর্ম্মে পরিণত হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিতে ধর্ম্মপুস্তক, যথা বেদ, কোরাণ,বাইবেল প্রভৃতিতে লিখিত কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশ বলিয়া তিনি.স্বীকার করেন না। কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যে কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করি,তাহা ঈশ্বরের আদেশ।

Fichte (ফিক্তে) বলেন, "Religion is knowledge" "জ্ঞানই ধর্ম্ম।" এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে; গুরুতর মহৎ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে, আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এবং আমাদের মনকে পবিত্র করে।

It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions and thus imparts to us a complete harmony with ourselves and a thorough sanctification of our mind.

সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত, কেবল শব্দ প্রয়োগ ভিন্ন প্রকার।

Schelmacher বলেন, "কোন একটী বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরই ধর্ম্ম। সেই বস্তু আমাদিগকে চালাইতেছে, আমাদের তাহার উপরে কোন হাত নাই।

Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which though determines us we cannot determine in our turn.

মহাত্মা থিওডোরপার্কার বলিয়াছেন, ধর্ম্মের মূলে নির্ভরের ভাব (Sense of dependence), আমি ক্ষুদ্র ও পরিমিত, আমি আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি না, তবে কাহার উপর নির্ভর করি। এই নির্ভরের ভাব হইতেই ঈশ্বরের ভাব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

Hegel বলিয়াছেন, ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত। কারণ পরমাত্মা ক্ষুদ্র মানবাত্মায় স্বয়ং স্বপ্রকাশ ও জ্ঞাত হন।

Religion is or ought to be perfect freedom, for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit.

Maxmuller বলেন,ধর্ম্ম সেই মানসিক বৃত্তি যাহার দ্বারা আমাদের অনন্তপুরুষের জ্ঞান হয়।

Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite.

Taylor বলেন, যেখানে আত্মার(Spiritual Being) স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই ধর্ম্ম। Spiritual Being অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে, লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত। দেব দেবী ও ঈশ্বর তদন্তর্গত।

John stuart Mill বলেন, একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বস্তুর প্রতি আমাদের ভাব ও ইচ্ছা সকলকে প্রবল বেগে ব্যাকুলতার সহিত পরিচালন করাই ধর্ম্ম। এই বস্তু আমাদের বাসনা ও স্বার্থ সিদ্ধির পদার্থ হইতে উচ্চ।

The sense of Religion is the strong and earnest direction of the Emotion and desires towards an ideal object recognized as the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desires.

সিলিং বলেন, ধর্ম্ম স্থায়ী ভক্তি। Habitual and premanent admiration.

তিনি ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—ঈশ্বরের প্রতি আমাদের হৃদয়ের ভাব

সকল উত্থিত হইলে আমরা তাঁহার উপাসনা করি। প্রেম ভক্তি ও প্রীতি উপাসনার অঙ্গ। এই সকল ভাব মনুষ্যের প্রতি, এমন কি অচেতন পদার্থের প্রতি উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু যখনই এসকল ভাব ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হয়, তখনই ইহা ধর্ম্ম নামে আখ্যাত হয়। যখন ভক্তি স্থায়ী ও প্রবল হয়, তখনই উহা কার্য্যে ফুটিয়া পড়ে। সেই জন্যই যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সিলিং আরও বলিয়াছেন, Substance of Religion is culture.

ধর্ম্মের মূলে অনুশীলন। পার্শ্ববর্ত্তী জড় প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই অনুশীলনের উপায় ও সীমা। অতএব বহির্জ্জগতের ও অন্তর্জ্জগতের প্রকৃতি আমাদের জানা চাই। বৈজ্ঞানিক সত্য ইহার অন্তর্গত। মিলের Ideal object of the highest excellence ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহার কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity বা মনুষ্য প্রেম। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অবস্থা Habitual and permanent admiration বা ভক্তিই উপাসনা। ইহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় উপাদান।

আমাদের বৃত্তি গুলির সম্যক অনুশীলন ও চরিতার্থতার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে, সেই সকল ঐ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া লই; সেই নিয়ম নীতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র। ইহা ধর্ম্মের তৃতীয় উপাদান।

এক্ষণে দেখা যাক, ধর্ম্মের সার কথা কি? ঈশ্বরকে জানিতে হইবে, তিনি আমাদের জীবনদাতা, আমাদের সঙ্গে নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রেম ও ভক্তির উপহারে তাঁহার উপাসনা করাই ধর্ম্ম। উপনিষদে উক্ত আছে, তাঁহার প্রতি প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসকের সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে কি সম্বন্ধ,তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিজ্ঞান এ বিষয়ে আমাদিগকে কত দূর সহায়তা করিতে পারে, তাহারই আলোচনায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হইব। বিস্ময়,ভীতি, প্রীতি, ও ভক্তি এবং অনন্তের ভাব, বিজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে কতদূর উৎপন্ন করিতে পারে, একবার দেখা যাক।

বিজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ঘটনাপুঞ্জ বা কার্য্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে বস্তু হইতে পৃথক করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা ও তাহাদের অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করাই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম ঘটনা ও বিষয় সকল নিরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ করা ও সংগ্রহ করা, তৎপরে পরীক্ষা দ্বারা উহাদের অর্থ ও সম্বন্ধ স্থির করা; অবশেষে উহা হইতে অনুমিতি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন সাধারণ সত্য বা নিয়মে উপনীত হওয়াই বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান কার্য্য সকলের কারণ নির্দ্ধারণ করে। সাধারণ নিয়ম সকল আবিষ্কার করে। কোন্ নিয়মে কোন্ ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে,তাহা স্থির করে। ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে বা কয়েকটী নিয়ম সংযোগে নূতন কি কার্য্য হইতে পারে,

তাহাও প্রকাশ করে। এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করা বিজ্ঞানের বিশেষ শক্তি। ততদিন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, যতদিন উহার কারণ সকলের জ্ঞাত নিয়ম হইতে ভবিষ্যৎ ফল স্থির করিতে না পারে। জগতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। বাহ্য ঘটনার প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা বিজ্ঞানের কার্য্য। যে বস্তু হইতে বাহ্য ঘটনা সকল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা Metaphysics এর কার্য্য। বিজ্ঞান ও Metaphysics এর ফল দর্শন (Philosophy) গ্রহণ করিয়া উহা বুঝাইতে চেষ্টা করে, পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জন করে এবং সকল জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একাধারে সমগ্র জগতের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে চেষ্টা করে। সুতরাং বাহ্য দৃশ্যের জ্ঞান এবং বস্তুর জ্ঞান অবশেষে দর্শনে পরিণত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন ধর্ম্মেরই কার্য্য করে। ঈশ্বরের জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাই? বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতই সেই জ্ঞানের মূল। তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, বিস্ময় প্রভৃতি সকলই সেই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সহিত চিরবিচ্ছেদ আছে, এই সংস্কার অনেকেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নহে, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও ধর্ম্ম অনুশীলন-কারীরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যথার্থ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে সদ্ভাব থাকাই যুক্তি-সঙ্গত। উভয়ই এক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। সত্যের সেবাই উভয়ের লক্ষ্য। ধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। দর্শন যেরূপ, বিজ্ঞানও সেইরূপ ধর্ম্মের পোষক ও সহকারী ভৃত্য। সকল বিজ্ঞানই দিন দিন ধর্ম্মের কার্য্যে অধিক হইতে অধিকতর আবশ্যক হইতেছে। বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য যোগ চিরকালই রহিয়াছে। শরী-রের সহিত মনের যোগ নাই বলাও যাহা, আর ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের যোগ নাই বলাও তাহা। বিজ্ঞান শাস্ত্র যাঁহারা অধ্য-য়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সমস্ত বিশ্ব কার্য্যের মধ্যে কোথাও একটু মিথ্যা নাই। এই অগণ্য বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে একই উত্তর দেয়।

এই চরাচরের মধ্যে কোথাও অনিয়ম নাই, খেয়াল নাই, অসত্য নাই। পদার্থ সমূহের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, কালও যেমন আজও তেমন, চিরকালই সেইরূপ। এই সত্য বিজ্ঞানতত্ত্বান্বেষীর মনে এমনই দৃঢ় হয় যে, তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে তৎক্ষণাৎ নূতন কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

ইউরেনস্ উপগ্রহের গতিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যতিক্রম দেখিয়া, গণিতের অঙ্ক-পাতের সহিত মিল না দেখিয়া জ্যোতিঃ-বেত্তারা অন্য একটী উপগ্রহ ইউরেনসের সন্নি-কটে থাকা সম্ভব মনে করিলেন। ইহার ফলে এডামস্ ও লভিয়ার দ্বারা নেপচুনের আবিষ্কার হইল।

এরূপ স্থলে যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ধর্ম্ম-বোধ আছে, সে অসীম বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেক পরমাণু হইতে নিশিদিন সমস্বরে যে এক মহান সত্য প্রচার হইতেছে, তাহা অন্তরে ও আচরণে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বিজ্ঞান আর একটী কথা প্রচার করিতেছেঃ—শক্তির চিরস্থায়িত্ব।

কেবল মাত্র যে পরমাণুর বিনাশ নাই, তাহা নহে। প্রত্যেক পরমাণু অনন্ত জগতের সহিত এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ যে, তাহাদের কোন একটীর মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা অনন্ত দেশে অনন্তকালে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

অন্তরের নিগূঢ় নিভৃত প্রদেশে এমন কোন চিন্তা, এমন কোন বেদনার উদয় হইতে পারে না, ব্যথিত, পীড়িত হৃদয় হইতে এমন একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হইতে পারে না, মনে এমন কোন তুচ্ছ বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে না, এমন কোন ক্ষুদ্র কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, জগতের আদ্যন্ত মধ্যে যাহার ইতিহাস চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ না হইয়া যায়। এ তত্ত্ব স্মরণ করিলে গর্হিত আচরণে কি আর প্রবৃত্তি হয়?

জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এবং সাধনের উপায় পরম্পরা এমনই সুশৃঙ্খলা সহকারে নিবিষ্ট যে, সেই আশ্চর্য্য কৌশল বহু প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মানবের বিস্ময় ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞান বিশ্বকার্য্যে সেই সুশৃঙ্খলা, সেই কৌশল প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। বিজ্ঞান এক নক্ষত্রের সহিত অন্য নক্ষত্রের, এই পৃথিবীর সহিত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, মানবের সহিত অতীত বর্ত্তমানের সমুদয় জীব পরম্পরায় এক অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধন দেখাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই মহান ঐক্য আবিষ্কার করিতেছে। এই ঐক্য, কি পরম একের দিকেই ধ্রুব অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে না? এই জগতে, অণুতে, পরমাণুতে, জড়ে, জীবনে সম্মিলিত এক বিরাট ঐক্য, এক অসীম বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের আলোকে, তত্ত্বান্বেষীর চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন কি অভিভূত, বিহ্বলচিত্ত, ভক্তিভরে পরম পুরুষের নিকট একান্ত নত হয়ে পড়ে না?

অনন্তকাল সমুদ্রের মধ্যে সময় দ্বীপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীত কালের তরঙ্গ ভঙ্গের শব্দ শুনিতে শুনিতে, ভবিষ্যৎ কালের উর্ম্মিরাশি দেখিতে দেখিতে মনুষ্য মনে তিনটী অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হয়।

কোথা হইতে এ জগত আসিল, কেনই বা আমরা ইহার উপরে আছি, আমাদের গম্য স্থানই বা কোথায়? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হই।

এই জগত কি? কেই বা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে? অনন্ত আকাশের বক্ষে ইহা কেমন করিয়াই বা ভাসিতেছে? কে ইহাকে দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদন করিয়াছে? কেই বা ইহার বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, বন উপবন, প্রান্তর ও ভূধর, মরু ও জলধি প্রভৃতি সৃজন করিয়াছে?

কোথা হইতে কোটী কোটী জীব এখানে আসিল? কোথা হইতেই বা সমুদ্রে অসংখ্য মৎস্য উৎপন্ন হইল? সরীসৃপ, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী সকল, কীট পতঙ্গ বিহঙ্গকুল কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল? মনুষ্যই বা এখানে কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যের চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা ও ভয়, প্রেম ও ভক্তি কে তাহাকে প্রদান করিল? এই সকল প্রশ্ন মনুষ্য আদিম কাল হইতে করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের প্রারম্ভে তাহার প্রথম পৃষ্ঠাতেই

এই পুরাতন প্রশ্ন দেখা যায়। মনুষ্য যতই চিন্তাশীল হয়, ততই এ প্রশ্ন প্রবলবেগে তাহার মনে উত্থিত হয় এবং তাহার জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। কেবল হস্ত সঞ্চালন করিয়া, অথবা জানি না, এই কথা বলিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ করিতে পারা যায় না। এই বিশ্ব জগতের আদি এবং মনুষ্যের নিজের আদি কারণ জানিবার যে বলবতী স্পৃহা, তাহা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করা যায় না। এই বিষয়ে মনুষ্যকে কি চিরদিনই সন্দেহজালে জড়িত হইয়া থাকিতে হইবে? না—তাহা কখনই হইতে পারে না। এ বিশ্বতেই ইহার আদি কারণের চিহ্ন দেখা যায়; তাহা অনুসরণ করিলেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আইস আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই। কেবল নিস্তব্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অজ্ঞেয়তাবাদী বা বিশ্বাসশূন্য হইয়া নিস্তব্ধ না থাকিয়া, যাহাতে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা যাউক। আইস আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ইহার দিকে প্রয়োগ করি। কোথা হইতে এই বিশ্ব আসিল?

ইহার দুইটী সম্ভবপর উত্তর হইতে পারে।

প্রথমতঃ—হয় ইহা দৈবঘটনা বশতঃ অকস্মাৎ স্বতঃউৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ইহা কোন বুদ্ধি ও ইচ্ছা-প্রসূত।

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর কোন মত দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক, কোন্ মত দ্বারা জগতের ক্রিয়াকলাপ সুন্দররূপে বুঝা যায়।

এই বিশ্ব যে আকস্মিক ঘটনা, তাহার অর্থ এই, সকল বস্তু যেমন সেইরূপই আছে। অতি পুরাকালে একটী কিম্বা অনেকগুলি পরমাণু অবস্থিতি করিতেছিল, ইহারা কোন গতিকে ক্রমে একত্রিত হইয়া জগতের আকার প্রকার ধারণ করিল। ইহার গতি চালাইবার জন্য অন্য কোন কর্ত্তা নাই কিম্বা এমন কোন আত্মা নাই যে, ইহার পদার্থ সকলকে প্রণালীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে। পরমাণু সকলই, তাহাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারাই এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। কিয়ৎকাল চিন্তা করিলে এবং অনুসন্ধান করিলে এই মতের অসারতা ও ভ্রান্তি উপলব্ধি করা যায়। যদি আমি কোন ছাপাখানা হইতে এক থলি সিশার অক্ষর আনয়ন করি এবং কোন পুস্তকাগার হইতে কালিদাসের গ্রন্থাবলী আনয়ন করি এবং আপনাদিগকে বলি যে, ঐ থলিটী পুনঃ পুনঃ নাড়িয়া এবং ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া আমি কালিদাসের শকুন্তলা বা অন্য কোন গ্রন্থ উৎপন্ন করিয়াছি, তাহা হইলে আপনারা কি বলেন? আপনারা কি বলেন না যে, "ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে? আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" তথাচ ইহাও একদিন সম্ভব হইতে পারে, কেন না এখানে আপনারা একজনকে কার্য্য করিতে দেখিতেছেন। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এইরূপ কোন আকস্মিক ঘটনাদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কোন সুবিখ্যাত গণিত শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, আজ অবধি পৃথিবীতে যত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, ভবিষ্যতে যত কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা যদি অঙ্কের সংখ্যার দ্বারা পূর্ণ করা যায়, সেই সংখ্যা অপেক্ষা, জগত যে

আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহার প্রমাণ অধিক।

কোন বিষয় সম্বন্ধে যদি কেবল একটী মাত্র মত (Hypothesis) থাকে, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও উহাকে একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু যেখানে দুইটী মত বিদ্যমান আছে, তথায় অল্প সম্ভবপর মতটী পরিত্যজ্য। সুতরাং চিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেই বিশ্বউৎপত্তির আকস্মিক ঘটনা সম্বন্ধীয় মত পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি প্রসূত মতটীই গ্রহণ করিয়াছেন।

বহ্মাণ্ড জ্ঞানও বুদ্ধি প্রসূত, এই মতাবলম্বীরা বলেন যে, জগতের প্রত্যেক পদার্থই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একটী মহান মনের ইহা ভাব এবং সেই মনই ইহাকে সৃজন করিয়াছে, ইহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছে এবং ইহার গতি সকল পরিচালন করিতেছে।

এই মতই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। কেমন করিয়া অসংখ্য স্তূপাকার অসংলগ্ন পরমাণু সকল এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ জগত উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। ইহা আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যিনি বা যাহা মনুষ্য মধ্যে মনের সংযোগ করিল, তাহা মন-বিবর্জ্জিত, তাহাতে কোন জ্ঞান নাই, ভাব নাই, ইচ্ছা নাই। কোন কার্য্যই কারণ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না এবং সাধারণত প্রত্যেক কার্য্যের কারণের সহিত সাদৃশ্য থাকে। সুতরাং জগতে প্রেমের ও চিন্তার অস্তিত্ব হইতে তাহাই অনুমিত হয় যে, ইহার স্রষ্টা প্রেমময় ও জ্ঞানময়।

জগত জ্ঞান-প্রসূত মতটী কেবল সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না, ইহা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। এই সত্য নির্ণয় করিতে অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞান এ বিষয়ে কি বলে দেখা যাউক।

প্রথমত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, জগত সৃষ্ট পদার্থ ইহা অনাদি অনন্ত নহে। এমন এক সময় ছিল, যখন ইহা এভাবে অবস্থিতি করিত না। বিজ্ঞানবিৎ সকলে একমত হইয়া বলেন যে, জগত একটী কার্য্য।

দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান ইহা একরূপ দেখাইয়াছে যে, জগত ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র বা আংশিক ভাবে একেবারে সৃষ্ট হয় নাই। এই বিশ্বজগত পুষ্পের ন্যায় ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা ঘড়ির ন্যায় নির্ম্মিত হয় নাই, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ন্যায় বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম এক্ষণে একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং ইহা সমস্ত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, বিশ্বজগৎ গতির অবস্থান্তর। সকল বস্তুই তিন প্রকার অবস্থার কোন না কোন অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তু সকল কঠিন, তরল অথবা বাষ্পাকার এই সকল অবস্থা নানা প্রকার গতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বস্তু যেমন গতির প্রকাশক, তেমনি প্রত্যেক বস্তুকে গতিতে পরিণত করা যায়। এক খণ্ড কয়লাকে অবস্থা বিশেষে উত্তাপে পরিণত হয়। উত্তাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে এক প্রকার গতি বলিলেই হয়।

চতুর্থত বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিভিন্ন প্রকার হইলেও ইহা একই। বৈজ্ঞানিককে বিশ্বের আদি কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার আদি কারণ গতি বা শক্তি। অনন্ত শক্তি হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে।

দার্শনিক সত্য অন্বেষণে ব্যস্ত। ধার্ম্মিক ঈশ্বর অন্বেষণে ব্যস্ত। উভয়ই বিজ্ঞানাবিস্কৃত ঘটনাবলী ও সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উহার গূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করেন। যদি জগত কার্য্য হইল, ইহার কারণ অবশ্য থাকিবে। যদি কার্য্যের মধ্যে ঐক্য থাকে, তাহা হইলে কারণের মধ্যেও ঐক্য থাকিবে সুতরাং ইহার স্রষ্টা একই। যদি এই বিশ্বগতির ফল হয়, তবে নিশ্চয়ই একজন গতি উৎপন্ন করিতেছে; কেন না, গতি আপনা আপনি স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ বিজ্ঞানের সত্য হইতে ধর্ম্মের মূল যে ঈশ্বর, তাহাতে উপনীত হয়। বিজ্ঞানীরা যাহাকে আদি কারণ বলে এবং যাহাকে শেষ কারণ বলে, সেই গতিরূপ সেতুর উপর দিয়াই ধার্ম্মিকেরা গমন করেন।

ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী পুরুষেরা এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—মনুষ্যের ভূয়োদর্শন আজ অবধি যতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এই দেখিতে পাই যে, আমাদের ঐচ্ছিক কার্য্যসকল ইচ্ছা-শক্তি-প্রসূত। যদি আমি আমার হস্ত উত্তোলন করি, তাহা আমি আমার ইচ্ছা শক্তিতেই করি। এই রূপ আমাদের ভিতরে ও বাহিরে আমরা যে সকল গতি উৎপন্ন করি, সে সকলই আমাদের ইচ্ছা দ্বারাই করি। যদি মনুষ্যের কার্য্য সমূহে এই নিয়ম দেখিতে পাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতিবিধিতে কেন না এই নিয়ম থাকিবে? অনন্ত ইচ্ছা ভিন্ন জগতের গতিবিধি কিসে উৎপন্ন হয়? যে অসীম অনন্ত শক্তির দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মূলে এই ইচ্ছা। কিন্তু কেবল ইচ্ছাই এ জগতের কারণ নহে। আমরা এই ইচ্ছার সহিত জ্ঞান, চিন্তা, ভাব ও প্রেম একাধারে দেখিতে পাই। সুতরাং এ বিশ্বে চিন্তাশীলতা, ভাবুকতা ও প্রেমের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হইবে না, আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাই যে, আমাদের চিন্তা আছে—ভাব আছে,—প্রেম আছে, কিন্তু এ সকল কোথা হইতে আসিল? সেই অসীম অনন্ত প্রেম ও চিন্তার উৎস ভিন্ন আর কোথা হইতে এই ভাব ও চিন্তা আমরা পাইতে পারি? একবার আমরা বহির্জ্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও জ্ঞান, চিন্তা ও প্রেমের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শীত প্রধান দেশের রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া দেখুন, পৃথিবী তুষারাবৃত, পুষ্করিণী সকল বরফে কঠিন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির এই অবস্থান্তর মধ্যে যে বিধি রহিয়াছে, তাই সেই বিধাতার জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় দিতেছে। জল যে উত্তাপে জমিয়া বরফ হয়, তাহার অপেক্ষা শীতলতায় জল সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়। সকল বস্তুই শীতলতায় ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল সম্বন্ধে ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বা বিশেষ বিধি। ফারেণহিট তাপমান যন্ত্রের ৪০ ডিগ্রি

উত্তাপ পর্য্যন্ত জল সাধারণ নিয়মের অধীন। কোন জলাশয়ের উপরিভাগ শীতল হইলে উপরিস্থিত শীতল জল সঙ্কুচিত হওয়ায় গুরু ভার বশতঃ জলাশয়ের নিম্নে অধঃস্থ হয়। নিম্নস্থিত লঘু জল উপরিভাগে উত্থিত হয়। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত জল ৪০ ডিগ্রি উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, সমস্ত জলে ঐ রূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। ৪০ ডিগ্রির নিম্নে শীতল জল অপেক্ষাকৃত লঘু হয়, সুতরাং উহা উপরিভাগেই থাকে, তথায় ৩২ ডিগ্রি ফারণহিটে উহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়।

আবার দেখুন, অধিকাংশ পদার্থ তরল অপেক্ষা কঠিন অবস্থায় গুরুতর। কিন্তু বরফ জল অপেক্ষা লঘু। সুতরাং ইহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। বরফের উত্তাপ সঞ্চারণ শক্তি অল্প, সুতরাং যদিও শীতকালে চতুর্দ্দিকের উত্তাপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ থাকে, তথাপি জলাশয়ের কয়েক হস্ত নিম্নে জলের উত্তাপ ৪০ডিগ্রি হইতে অল্প হয় না। সুতরাং জলাশয়কে বরফ একরূপ আবরণ করিয়া রাখে। জল সম্বন্ধে শৈত্যউষ্ণের এইরূপ স্বতন্ত্র নিয়ম না থাকিলে এ জগতে কিনা বিপর্য্যয় ঘটিত? জল সাধারণ নিয়মের অধীন হইলে সমস্ত জলাশয়ের জল জমিয়া বরফ হইত। বরফ প্রথমে তলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া উপরিভাগে আসিত। এই বিস্তৃত তুষাররাশি গ্রীষ্মকালের কোন উত্তাপই ২।৪ হস্ত ভিন্ন দ্রব করিতে সক্ষম হইত না। হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে কেবল স্তূপাকার বরফ দেখিতাম। এরূপ অবস্থায় জলজীবি-প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব সমূলে লোপ পাইত। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক স্থানেই জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হইত। কেন না, জগতের কোন অংশই স্বতন্ত্র নহে। পরস্পর পরস্পরের সহিত বাঁধা আছে। কোটী কোটী যোজন দূরে যে সূর্য্য আছে, তাহার সহিত ঐ যে পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহার সহিত কেমন সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি হইতেই উহার জীবন, উহার বর্ণ, উহার শোভা। ভূমি ন্যূনাধিক পরিমাণে জল দ্বারা পূর্ণ। বর্ত্তমান অবস্থায় অধিক দূর সে জল জমাট বাঁধে না। কিন্তু জল সাধারণ নিয়মের অধীন হইলে, ভূগর্ভে যে মূল ও বীজ সকল নিহিত রহিয়াছে এবং যে সকল কীটাণু ও ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ প্রভৃতি উহার মধ্যে বাস করিতেছে, তাহাদের কাহারও জীবন সম্ভব হইত না। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা-শীলতা ও অভিপ্রায় এই জগতের এইরূপ নিয়মে কি প্রকাশ পায় না?

ইহা কি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও প্রেমের পরিচায়ক নহে? বিশ্বগ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে তাঁহার জ্ঞান ও জীবের প্রতি প্রেমের দৃষ্টান্ত রাশি রাশি রহিয়াছে।

Darwin তাঁহার "Fertilisation of orchids" নামক গ্রন্থে orchid উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্যে পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে, পুষ্পের গঠনের এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না। মধুর নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হয়।

ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভরেণুর সহিত মিশ্রিত হয়। মধুপানে যে

বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া Darwin বলিয়াছেন :—

"If this is accidental it is a fortunate accident for the plant If this be not accidental and I cannot believe it to be accidental, what a singular case of adaptation !"

অর্থ—এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল, তবে এমন আকস্মিক ঘটনা যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাইতেছে।

মনুষ্যও এই পতঙ্গের অনুকরণ করিয়া অন্তত একটী লাভকর ব্যবসা চালাইতেছে, আমি তাহা জানি। সম্প্রতি (বিগত সেপ্টেম্বর মাসে) আমি যখন সিসেল দ্বীপে যাই, তথায় শুনিলাম, Vanillaর চাষ হয়। Vanilla একটী সুগন্ধ দ্রব্য। ইউরোপীয়েরা প্রচুর পরিমাণে ইহা ব্যবহার করেন। সাবান ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহার ব্যতীত পুডিং প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যেতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর সিসেল দ্বীপ হইতে প্রায় ৫।৭ কোটী টাকার Vanilla রপ্তানি হয়। আমরা যে জাহাজে আসিয়াছিলাম, তাহাতে প্রায় ৭০ হাজার টাকার Vanilla আনিয়াছিলাম। পতঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলে এত টাকার Vanilla উৎপন্ন হইত না। মনুষ্যই Vanillaর পরাগরেণুর সহিত গর্ভরেণু মিশাইয়া দেয়।

যে John Stuart Mill কে কেহ কেহ নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন ;—"আমার বোধ হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া ইহা খুব সম্ভব বোধ হয় যে, জ্ঞান দ্বারাই ইহা সৃষ্ট হইয়াছে।"

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge the adaptations in nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence"

একবার নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, বিশ্ব সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি। উন্নত আকাশে ভ্রমণ করি, কোটী কোটী তারকামণ্ডলীর বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করি। বসন্তকালের প্রদোষ হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত গ্রামের বাহিরে বন, উপবন, প্রান্তর, মাঠ, জলাশয় প্রভৃতি স্থানে একবার ভ্রমণ করিয়া আসি। প্রাতঃকালের নবোদিত সূর্য্যালোকে যখন দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, সাগরবক্ষ বা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে যখন তরুণ অরুণ প্রকাশ পায়, তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করি। চতুর্দ্দিকের প্রেম, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, চমৎকারিত্ব একবার হৃদয়ে অনুভব করি। দেখি, কত অসংখ্য অসংখ্য পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জলচর, খেচর, ভূচর, প্রাণী সকল জলে, স্থলে, ব্যোমে প্রফুল্ল অন্তরে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের স্বরলহরীতে প্রাণমন মুগ্ধ করিতেছে। উদ্ভিজ্জ রাজ্যের দিকে একবার মনকে নিযুক্ত করি। তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিকাশ অনুধাবন করি। এই সকলের মধ্যে সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় কি পাই না? এই যে উপরে যে কয়েকটী বাক্য লিখিলাম, তাহার মধ্যে যদি দু চারটী বাক্য কোন মরুভূমিতে অথবা পর্ব্বত কন্দরে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে কোন প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত দেখিতে পান, তাহা হইলে কি আপনারা বলেন না যে, ইহা কোন বুদ্ধিমান জীবের কার্য্য। বিশ্বসংসারে কি এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় নাই?

জগৎ যে কোন জ্ঞানবান বুদ্ধিশালী আত্মার সৃষ্ট, তাহা এইরূপ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করি। সেই স্রষ্টাকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি। মনুষ্য যে অকস্মাৎ উৎপন্ন জীব নহে, এবং বৃথা দুরাশার দাস নহে, এই শুভ সংবাদ বিজ্ঞানী ও ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী পুরুষেরা সুসভ্য ও অসভ্য সকলের নিকটই প্রচার করিতেছেন।

জগৎ ও মনুষ্য সকলই যে ঈশ্বর-

হইতে আসিয়াছে, তাহা বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে বলিতেছে।

যাঁহার জ্ঞান আছে, যিনি শৃঙ্খলাময় এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তিনি পুরুষ কি না, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুরুষ অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। শরীর, বা শারীরিক যন্ত্র থাকিলে পুরুষ হয় না, পুরুষ কোন বস্তু নহে। কোন কীটকে আমরা পুরুষ বলি না—কুকুরকে আমরা পুরুষ বলি না উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি বা বুদ্ধিহীন মনুষ্যকে আমরা পুরুষ বলিনা। পুরুষের নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান আছে,—বুদ্ধি আছে—ভাব আছে,—স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সকল সুস্থ আত্মারই এই ধর্ম্ম। ঈশ্বর যদি মন বা আত্মা হয়েন, এই সকল শক্তি তাঁহার আছে, সুতরাং তিনি পুরুষ। কিন্তু পুরুষ বলিলে, ঈশ্বর দেখিতে যে মনুষ্যের মতন হইবেন বা মনুষ্যকল্পিত অন্য কোন বস্তু হইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন আমাদের বা অন্য কোন ব্যক্তির মন যে কিরূপ, তাহা ধারণা করিতে পারিনা, তখন যিনি আমার মনের মন—যিনি অনন্ত অসীম আত্মা—তাঁহাকে কেমন করিয়া বা ধারণা করিব, স্বপ্নেও তাঁহাকে কল্পনা করিতে পারিনা। যদি ঈশ্বর পুরুষ না হয়েন, তাহা হইলে তিনি অন্ধশক্তি, উদাসীন দেবতা। কিন্তু তিনি যে অন্ধ শক্তি নহেন—উদাসীনও নহেন, জীবের ও জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত,তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখিতে পাই।

যখন দেখিতেছি, এই জগত এক অসীম মনের সৃষ্টি, তখনই বলিতে হইবে, ইহার কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে। কেননা, আমরা দেখিতেছি যে,উচ্চ শ্রেণীর মন সকলের কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সুতরাং তুমি আমি সকলে জানিতে চাই, এই বিশ্ব কেনই বা সৃষ্ট হইয়াছে,আমরা কেনই বা এখানে আসিয়াছি? আমাদের কোন চরমগতি বা গম্য স্থান আছে কি? না—আমরা কেবল একটী বৃত্তের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? এ বিশ্বের স্রষ্টা কি ইহাকে সৃজন করিয়া পরিত্যাগ করতঃ কোন দেশ দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, না—তিনি ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহার কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন? এই জগৎ কি একটী বৃহৎ ঘড়ি, যাহাকে দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—টিক টিক করিয়া চলিতেছে, শেষে এক দিন বন্ধ হইয়া যাইবে? না—ইহা কোন বুদ্ধিশালী জ্ঞানসম্পন্ন মনের কৌশলপূর্ণ সৃষ্টি, তাহার মধ্যে স্রষ্টা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া জীবন স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন এবং তাহার চিন্তা ও প্রেম প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের শরীরের যন্ত্র সকলের সহিত আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর যে সম্বন্ধ, তাহার সঙ্গে কি এই বিশ্বের সেই সম্বন্ধ নহে? আমরা একবার দেখি, বিজ্ঞান কি বলে। বিজ্ঞান যে বিবর্ত্তনবাদের মত স্বীকৃত করিয়াছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, অতি দূরে একটী ঐশ্বরিক কার্য্য রহিয়াছে, তাহার দিকে সমগ্র জগতের গতি চলিতেছে। বস্তুসকল অর্থশূন্য বৃত্তের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না, কিন্তু নদীর ঘূর্ণজলের ন্যায় স্রোতের সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। কেহ কেহ ভয় করিতেছেন, এই বিবর্ত্তনবাদ বুঝি ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। ভ্রান্তমতি, বৃথা ভয়। পূর্ব্বকালে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারকে লোকে মনে করিয়াছিল যে, উহা জগৎ হইতে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, বিবর্ত্তনবাদ কোন বস্তুরই কারণ নহে, উহা আদি কারণের হস্তের যন্ত্র, উহা কেবল মাত্র একটী উপায়—যাহার দ্বারা তিনি কার্য্য করিতেছেন। যিনি এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাকে ইহা কেমন করিয়া অপসারিত করিবে।

বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? ভূতত্ত্ব (Geology) আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, এই বহির্জ্জগত, জীব উৎপত্তি ও তাহার

পুষ্টির জন্ত অনেক দিন হইতে চেষ্টা ও শ্রম করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে। উদ্ভিদ তত্ব ও প্রাণীতত্ব (Biology) দেখাইয়াছে যে,বহু দিবস একগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে, বুদ্ধিজীবী মনুষ্য হইতে ক্রমে ধর্ম্ম ও নীতি সম্পন্ন মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে। বিজ্ঞান এইরূপে দেখাইতেছে যে, সৃষ্টির সকলের গতি যেন ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে। অসম্পূর্ণ মনুষ্যকে যেন সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহাই বিবর্ত্তনবাদের শিক্ষা। ইহার নিয়ম কি আমরা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিতে পারি? এই বিবর্ত্তনবাদের ফল বিষময় না অমৃতময়? ইহা আমাদের ঈশ্বরের চরণকে আরো সুন্দর করিতেছে। ইহা উচ্চৈঃস্বরে এক মহা অমর জীবনপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেছে। বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাস এই বলিয়া দিতেছে যে, সকল বস্তু একত্রে অসংখ্য অসংখ্য বৎসর ধরিয়া কষ্ট ও শ্রমের মধ্য দিয়া এক মহা সুন্দর উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। জীবরাজ্য এক সম্পূর্ণ উচ্চ দৈহিক ও মানসিক মনুষ্য জীবন লাভের উপযুক্ত করিতেছে।

মনুষ্যকে সম্পূর্ণ উন্নতির দিকে ক্রমশঃ লইয়া যাওয়াই যেন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে, ক্রমোন্নতিই আমাদের গম্য স্থান।

আমরা দেখিলাম, মনুষ্য উৎপন্ন করা জগৎ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য এবং আমাদের গম্য স্থান অনন্ত উন্নতির দিকে। এখন আমরা বুঝিতে পারি, মনুষ্যের মূল্য কত এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ কি এবং ক্ষুদ্র মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব।

তোমার জন্ত, আমার জন্ত এই বিশ্বের সৃষ্টি। জগদীশ্বর ইহার নিয়ম সকলকে এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার শক্তি সকলকে এরূপ চালিত করিতেছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্য আত্মার জন্য বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং পূর্ণতা লাভ হয়। ইহা যখন আমরা ভাবি, তখন কি আমরা তাঁহার দয়ার ভারে অবনত হই না? তখন কি একথা বলিতে হয় না, "তোমার করুণা ভার বহিতে পারি না আর।" মনুষ্য তুমি কে,যে তোমার জন্য এত আয়োজন, তুমি কে, যে সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত অসীম সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণব্রহ্ম তোমার প্রার্থনা শুনেন। তোমাকে এই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ব ও শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি সৌভাগ্য ক্রমে তাহার চিন্তার বস্তু হইয়াছ। তোমার সঙ্গে তিনি নিজকে যেমন করিয়া বাঁধিয়াছেন, সেরূপ সম্বন্ধ তিনি আর কাহার সহিত রাখেন নাই। তোমাকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, ভাব, স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, এরূপ আর কাহাকেও দেন নাই। তুমি তাহার চরণতলে বসিবার উপযুক্ত। তোমাকে তিনি তাঁহার স্বরূপের কিছু কিছু দিয়া সৃজন করিয়াছেন। এবং তোমাকে শক্তি দিয়াছেন—যাহা তুমি ক্রমশঃ বিকাশ করিতে পার এবং তাঁহার অনুরূপ হইতে পার। আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, সুতরাং তিনি যে তোমার ও আমার কল্যাণের জন্ত—উন্নতির জন্ত চিন্তিত, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।

এইবার জড়জগৎ ছাড়িয়া একবার অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া দেখি, সেখানে জগদীশ্বরের লীলা কিরূপ, তাহার কার্য্যকলাপ সেখানে কিরূপ হইতেছে, একবার দেখা যাউক।

আমাদের মধ্যে কি কি ভাব আধিপত্য করিতেছে? জড়জগতের তত্ব অন্বেষণ করিয়া বিজ্ঞান আমাদের মনে যে ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, তাহা অতি মহৎ ও উচ্চ। এক অনন্ত সর্ব্বব্যাপী চিৎ শক্তি আমাদের ক্ষুদ্রত্ব বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। আমরা যে সম্পূর্ণ এই শক্তির অধীন, তাহা আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। এ শক্তির উপর আর আপীল নাই। আমরা কত কিরিতে ইচ্ছা

করি, কিন্তু কত অল্প করিতে পারি, আমরা যেন পঞ্চ ভূতের খেলার পুতুল মাত্র, কেহ যেন সদর্পে আমাদের ইচ্ছাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। ঝড়,বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রাঘাত, মহামারী বা প্লেগ, ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু বা ব্যাকটিরিয়া পর্য্যন্ত সকলেই যেন পদে পদে আমাদিগকে অপদস্থ করিতেছে।

আলেকজাণ্ডারই হউন, আর নেপোলিয়ন্ হউন; যাজ্ঞবল্ক্যই হউন আর মনুই হউন; শেক্সপিয়রই হউন আর কালিদাসই হউন; রামই হউন আর রাবণই হউক, ক্ষুদ্র কীটাণু হউক আর হস্তীই হউক; সকলকেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। আমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারি না, তাঁহার উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই।

এই নির্ভরের ভাবকেই থিওডোরপার্কার ধর্ম্মভাবের মূল বলিয়াছেন। কোন প্রবল পাপ প্রলোভনে পতিত হইবার পরক্ষণে, আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আমরা সকলেই একদিন না একদিন অনুভব করিয়াছি। ইহা কি সুখের অবস্থা, লাভের অবস্থা বা সন্তোষের অবস্থা? না, তাহার কিছুই নহে।

পূর্ব্বক্ষণে যে সুখ বা লাভের জন্য অন্যায় কার্য্য করিলাম, তাহা পরক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। এমন কি, এই পাপের স্মৃতি মনুষ্যের মনে যখনই উদয় হয়, তখনই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আমাদের অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া দেয়। কে দেয়? আমরা স্বয়ং আপনা হইতে চিন্তা করিয়া বা জ্ঞান, বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কি ভাল হইতে চাই? না, ইহার মধ্যে সেই অজ্ঞাত পুরুষের হস্ত রহিয়াছে? আবার যখন আমরা প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হই, যিশুর মতন যখন বলিতে পারি,"দূর হও সয়তান, আমাকে প্রলোভন দেখাইও না।" তখন আমরা যে আনন্দ পাই, যে পবিত্রতার স্পর্শলাভ করি, নিজের উপযুক্তা ও বল অনুভব করি, তাহার মধ্যেও সেই দেব দেব পরমদেব রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে কথা কহিতেছেন, অন্য লোকে ইহাকে বিবেকের বাণী বলে, থিওডোর পার্কারের জননী, ইহাকে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন।

St. Paul রোমানদের পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"Not that what I would that I do practise but what I hate that I do." The good which I would I do not but the evil which I would not, that I practise."

আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করি না, কিন্তু যে কার্য্য করিতে আমি ঘৃণা করি, তাহা আমি করি। যে সৎ আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না, কিন্তু যে অসৎ আমি ইচ্ছা করি না, তাহাই করি, ইহাই পরিতাপের বিষয়। আমাদের জীবনের সম্মুখে শেষ চারিটী বিষয় উপস্থিত হইতে দেখিতে পাই।

প্রথম—পাপের প্রলোভন,দ্বিতীয়—সৎকার্য্যের সুযোগ,তৃতীয়—অন্যায় কার্য্য করা, চতুর্থ—সৎকার্য্য করা। এই সকলের মধ্যে একটী স্বর সর্ব্বদাই উত্থিত হইতেছে। সৎকার্য্যে উৎসাহ দান, অসৎ কার্য্যে সতর্ক করা ও তিরস্কার করা। কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা দেখি, অনেকের মধ্যে এই বিবেকের বাণী অতি অল্পই শুনা যায়। ইহার কারণও আছে। আমরা দেখি, যে বৃত্তি আমরা চালনা না করি,তাহা অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আমাদের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনাভাবে এইরূপ দশা প্রাপ্ত হয়।

আমরা সকল কার্য্যের উপর ন্যায় কি অন্যায়, এই মত সর্ব্বদা প্রকাশ করি, সুতরাং ন্যায় যাহা, তাহা করিতে বাধ্য, নতুবা ন্যায়ান্যায় শব্দের কোন অর্থ থাকে না। এখন দেখা যাউক, কাহার কাছে আমরা বাধ্য? নিজের কাছে নহে, সমাজের কাছেও নহে, রাজার কাছেও নহে—কেননা, এমন অনেক অন্যায় কার্য্য আমি করিতে পারি, যাহা ইহারা জানিতে পারে না। এবং তজ্জন্য আমাকে কোন শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং অন্য একজনের নিকট আমরা দায়ী।

তিনি আমাদিগের অন্তর দেখেন, এবং তিনি যে আমাদের পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারস্বরূপ শাসন রাখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমাদিগের জন্য চিন্তিত আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

অনেকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন, বিবেক যদি ঈশ্বরের বাণী হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যের বিবেক একরূপ কার্য্যে সকলকে নীত করেনা কেন? ন্যায়ান্যায় কার্য্য সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? অসভ্যেরা যাহাকে ন্যায় বলে, সুসভ্যেরা তাহাকে অন্যায় বলে। ইতিহাসে দেখা যায়, এক জাতিতেই বংশ পরম্পরা ভেদে নীতির আদর্শ ভিন্ন হইয়াছে। স্পার্টানেরা চুরি করাকে সাহসের কার্য্য বলিত। কিন্তু চুরি করিতে যাইয়া ধৃত হওয়া লজ্জাস্কর বলিত। অদ্যকার অনেক রাজনৈতিক পুরুষেরা ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যা বা প্রতারণা করাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্য জাতির সহিত ব্যবহারে ছলে বলে, কলে কৌশলে, যে প্রকারে হউক, ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। উহাতে যে কোন দোষ আছে, তাহাও মনে করেন না। ইহার কারণ কি? কোন্ কার্য্য ন্যায় আর কোন্ কার্য্য অন্যায়, তাহা বিবেক বলিয়া দেয় না। বিবেক বলে, যে কার্য্য তুমি তোমার সমাজের অবস্থা ও তোমার মানসিক বিকাশানুসারে ন্যায় বল, তাহা তোমার করা উচিত এবং যাহা অন্যায় বল, তাহা করা অনুচিত। দয়া, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ সুসভ্য জগতে সৎ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা লোকের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে আদিম কাল হইতে অনেক বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যখনই আমরা কোন কার্য্যকে সৎ ও কোন কার্য্যকে অসৎ বলিয়া বুঝিতে পারি, তখনই বিবেক আসিয়া আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে বলে। ভগবান এইরূপ বহির্জ্জগতে ও আমাদের অন্তর্জ্জগতে থাকিয়া তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছেন। আমাদের আত্মা কি তাহার সম্বন্ধে কোন সাক্ষী দিতে পারে না? যদি না পারে, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া আমরা কি করিব? মহিয়সী মৈত্রেয়ীর সহিত একবাক্যে বলি—"যেনাহং না মৃতাস্যাম্ কি মহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমি বলি, যদি সেই অমৃতময় পুরুষকে আমার হৃদয় না দেখিল, তাহা হইলে আমি ধর্ম্ম লইয়া কি করিব? আবার বলি, "রবি শশি তারা শোভে না আমার কাছে। যদি হারাই তাঁহারে। কিসের সে জীবন যৌবন, তিনি বিহনে কি হবে সে জ্ঞানে—যাতে তাঁহারে না পাই।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, শোকে আকুল হইয়া, দুঃখে অবনত হইয়া সেই পরমদেবের স্মরণাপন্ন হইলে হৃদয়ে শান্তি পান নাই। জগাই মাধাই হইতে হীন হইয়া কি আমরা অনেক পরিমাণে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই নাই? এমন ঈশ্বরোপাসক কে আছেন, যিনি একথা অস্বীকার করিতে পারেন?

একবার স্মরণ করুন, এক প্রবল ভয়ানক প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত, কোন একটী রিপু কাম, ক্রোধ বা লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছে। ঐ রিপু আমাদিগকে এমন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার হস্ত হইতে কোন মতেই অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। এই সময়ে যদি একবার পরমেশ্বরকে স্মরণ করি, তাঁহার দিকে মুখ তুলে চাই, করযোড়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহার নিকট বল ভিক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা কি ফল পাই না? রিপু সকল সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া কি অপসারিত হয় না? যদি না হয়, আমার ঈশ্বরোপাসনা সকলই কল্পনা ও বৃথা। আমরা দেখিয়াছি, এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করে এবং আমরা ঐ জীবন মরণ সংগ্রামে জয়লাভ করি। এরূপ স্থলে

আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন—আমাদের ক্রন্দন ধ্বনি তিনি শুনিয়া আমাদের সহায় হইয়াছেন। বিজ্ঞান বা দর্শন কখনই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। মনুষ্য জগত ও তাহার নিয়ম সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জড় জগতে যেমন নিয়ম আছে, আধ্যাত্মিক জগতেরও সেইরূপ নিয়ম আছে। জড় জগতে দেখি, একটী চুম্বকের যত নিকটে একটী সূচকে লইয়া যাই, ততই প্রবল বেগে উহা আকর্ষণ করে। সেই রূপ আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম এই যে, যতই ব্যাকুলভাব সহিত প্রার্থনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ হই, ততই, তাঁহার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। প্রার্থনার দ্বারা সূচকে চুম্বকের নিকট আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা এবং চুম্বক দ্বারা আত্মাতে ঈশ্বরের বল লাভ করিবার চেষ্টা উভয়ই দুরাশা! দারুণ শোকের সময় হৃদয়ে শান্তি প্রদান করে। অনুতাপে যখন হৃদয়কে দগ্ধ করে,তখন ঈশ্বরের ক্ষমা আমরা অনুভব করিতে পারি। প্রলোভনের সময় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ে বল লাভ করি, পাপকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হই। এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জগতের কোন নিয়মই ভঙ্গ হয় না, বরং ইহা নিয়ম সকলের সুন্দর দৃষ্টান্ত। বৃষ্টিধারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়, চন্দ্রের গতিতে যেমন জোয়ার ভাটা হয়, ইহাও সেইরূপ নিয়মের অন্তর্গত। শস্য উৎপন্ন ও অধিক ধনলাভ করা যেমন কেবল প্রার্থনার দ্বারা সম্ভব নহে, তাহার অন্য উপায় আছে; সেইরূপ সাধু চরিত্র এবং হৃদয়ে শান্তি লাভ করা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন সম্ভব নহে।

ঈশ্বরের নিকট যে কেবল অনবরত দরখাস্তের পর দরখাস্ত পেশ করিব আর বলিব, এই দাও, ঐ দাও, কেবল দাও দাও করিব, তাহা নহে। তিনি আমাদের বন্ধু, তাহার সহিত দুদণ্ড আলাপ করিব, কথাবার্ত্তা করিব, তাহাই আমাদের সুখ। উপনিষদ সেই অমৃতময়পুরুষকে জানিতে বলিয়াছেন, মার্টিনো তাঁহার উপাসনা করিতে বলিতেছেন। আমরা দেখাইয়াছি, ঈশ্বর মঙ্গলময়, পূর্ণময়, শান্তিস্বরূপ, তাঁহাকে জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? জগতের বন্ধুর সহিত কথোপকথনে লাভ কি, এ প্রশ্ন কি আমরা কখন করি? তবে সেই পরম বন্ধুর সহিত কথোপকথনে ফল কি, এ প্রশ্ন কেন হয়? বন্ধুর সহিত আলাপেই সুখ,আর বন্ধু যদি আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানী, সৎ ও শ্রেষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে কি আমরা মনে করি না, তাহার সহবাসেই আমাদের মঙ্গল। উপাসনার প্রকৃত ভাবই আত্মা পরমাত্মার সন্নিকটস্থ হইবে, তাহারাই সন্নিধানে বসিবে, Enoch Arden যখন প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতেছেন,তখন Tennyson প্রার্থনা যে কি, তাহা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন

"Yet Enoch as a brave Godfearing man
Bowed himself down, and in that mystery
Where God-in-man is one with man-in-God
Prayed for a blessing in his wife and babes
Whatever came to him."

একধারে দেব ও মানব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শোক-গাথা।

ভারতসম্রাজ্ঞী অালেকজ্যান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া মাতার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

(জন্ম—১৮১৯, ২৪শে মে, মৃত্যু—১৯০১, ২২শে জানুয়ারি, মঙ্গলবার ৬॥ ঘটিকা।)

১

অভাগী ভারত! আজি শুনিলি কি করি—
শূন্য রাজ-সিংহাসন
কোটি কোটি প্রাণ মন,
স্বরগে চলিলা তোর রাজ-রাজেশ্বরী!
ছুটিছে শোকাগ্নি শিখা,
হিমাচল কুমারিকা,
ছুটিছে সিন্ধুর বক্ষে আগ্নেয় লহরী!
এত জ্বালা অভাগিনি! সহিছ কি করি!

২

এ জ্বালা বিষম জ্বালা, নহে সহিবার—
যে দেবীরে পেয়ে "রাণী"
ভুলেছিলে অভাগিনি!
পোড়া কপালের ব্যথা পরাধীনতার!
যাঁর-প্রজা-বৎসলতা
স্মরায় অতীত কথা
হিন্দুর রাজত্বে—সেই গৌরব তোমার,
তোর সেই মহারাণী আজ নাই আর।

৩

সত্য কি গো! অস্তগামী তপনের বেশে,
সমাপি কর্ত্তব্য যত,
সাধি-জীবনের ব্রত,
গেলে মা ভারতেশ্বরি! দেবতার দেশে?
উষা যে আবার হবে,
তুমি মা! আসিবে কবে,
রবি যে আসিবে কালি নিশা-অবশেষে,
তুমি কি গো আসিবেনা দয়াময়ী-বেশে?

৪

পুণ্যময়ী স্নেহময়ী করুণার খনি
তোমার তুলনা দিতে,
কি আছে মা! পৃথিবীতে,
মানুষে গড়িল বিধি তোমারে আপনি!
দেবের বাঞ্ছিত মেয়ে,
কুসুমে কোলে পেয়ে,
শিহরি উঠিল মরি আনন্দে অবনী!
বাসন্তী কুসুম-রূপ
অপরূপ অপরূপ!
পবিত্র হইল ছুঁয়ে জনক জননী!
তোমারি মিলনে সতি!
কৃতার্থ হইল পতি,
মণি কাঞ্চনের যোগ হেরিল ধরণী!
দয়া, মায়া, সুদক্ষতা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, পবিত্রতা,
সকলি লভিলে তুমি নারীকুল-মণি!
শত পুণ্যে ছেলে মেয়ে,
মাতৃরূপে তোমা পেয়ে,
জীবনের সার্থকতা লভিল জননি!
পরিজন, দাস দাসী,
জ্ঞাতি বন্ধু, প্রতিবাসী
সবে জানে দেবী তুমি সংসার-পালনী,
ধন্য ধন্য মহারাণি নারী কুলমণি!

৫

তব রাজ্যে দিনকর অস্ত নাহি যায়,
শত্রু মিত্র সমভাবে তব যশ গায়;
তোমারি মহত্ত্বে সতি!
সসাগরা বসুমতী
তোমার চরণ-ছায়ে ঘুমাইতে চায়—
কোটি কোটি প্রজাগণে,
সন্তান জানিয়া মনে,
পালিয়াছ ন্যায় সহ স্নেহ-করুণায়!
ও হৃদি অমৃত-সিন্ধু,
মানে নি খ্রীষ্টান হিন্দু,
চাঁদের আলোক কোথা ছোট বড় চায়!
এমনি উদার প্রীতি
বিপক্ষের যশোগীতি,
গাহিয়াছ প্রাণ খুলি ভুলি আপনায়!
অনাথ, অধম দুখে,
কত ব্যথা লাগে বুকে,
স্বরগ বাতাস যথা সবারে যুড়ায়!
কি আছে আমার শক্তি,
ক্ষুদ্র বুকে কই ভক্তি

বর্ণিতে তোমার গুণ ক্ষমতা কোথায় !
মরতে "আদর্শ" বিধি গড়িলা তোমায় !

৬

আজি মা ! ভারত তব কার মুখ চায় ?
হারা সে সম্রাজ্ঞী-রত্ন
কে করে সান্ত্বনা যত্ন,
তুমি যে করুণাময়ী নাহি এ ধরায় !
ভীষণ কামান-শব্দ,
জগৎ হতেছে স্তব্ধ,
শত বজ্র পড়িতেছে ভারত-হিয়ায়।
বিশ্ব যেন কালি-মাখা,
সকলি আঁধারে ঢাকা,
শোকভরা ধরাখানি, কি দেখিনু হায় !
লেখনী খসিয়া পড়ে,
নয়ন আপনি ঝরে,
আগুন লেগেছে যেন হৃদি-কলিজায়,
আজি মা ! ভারত তব কার মুখ চায় !

৭

তবে,
পুণ্যময় জীবনের লীলা পরিহরি,
যাও মা ! স্বরগ-ধামে ভারত-ঈশ্বরি !
যাও দেবতার দেশে
রাজ-রাজেন্দ্রাণী-বেশে,
পাতিয়াছে রত্নাসন অমর অমরী ;
গাঁথিয়া মন্দার-মালা,
ডাকে তোমা দেব-বালা,
গাহিছে ও গুণ-গাথা কিন্নর কিন্নরী !
তুচ্ছ মণি কোহিনুরে
ফেলিয়া মরতপুরে,
পরশে ত্রিদিব রত্ন মহানন্দ করি !
তোমারি লাগিয়া সতি !
তব প্রিয়তম পতি,
পুত্র পৌত্র সনে আছে প্রতীক্ষায় মরি !
সাঙ্গ জীবনের কার্য্য,
যাও যথা দেব-রাজ্য,
যাও ভবিষ্যৎ-ভূপে আশীর্ব্বাদ করি।
আমরা মরম-স্তরে
পূজিব মা ! চির তরে
দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী !
জীবন হইল ধন্য
হইনু কৃতার্থমন্য,
তোমারে পাইয়া রাণী তব গুণ স্মরি !
কোটি কণ্ঠ মিশাইয়া,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া,
ডাকরে ভারতবাসি ! ডাক হরি হরি !!
স্বর্গে চলে যায় মাতা রাজ-রাজেশ্বরী !

শ্রীমা——— সাগরদাঁড়ী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। মালতী-মালা।—গীতি কাব্য। শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ভিক্টোরিয়া প্রেস. বঙ্গ নারীর তুলনা দিতে ভয় হয়, অসভ্য আদিম নরনারীর মত নিকৃষ্ট কবিদিগের সরস্বতীও বড় অলঙ্কারপ্রিয়া। যে স্বতঃসুন্দর, অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য্য বড় বেশী বাড়ায় না ; কিন্তু যে সুন্দর নহে, অলঙ্কার তাহাকে সুন্দর করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমাদের হৃৎকম্পের সঞ্চার করে মাত্র। এইরূপ কতকগুলি বিকট শব্দালঙ্কার হরিশ্চন্দ্রের সরস্বতীর গলা চাপিয়া শ্বাসরোধ করিতেছে। তাই তার কণ্ঠ দুই চারিবার বই শুনিতে পাই না। যেখানে শুনিয়াছি, সে খানে বড় মধুর—

কত আশা ছিল মনে পোহাইবে প্রেম-নিশি
চুম্বনে মিলনে কত মরমে মরমে মিশি।

বড় স্নিগ্ধ—

শেতরূপে আলো করি এলান কুন্তল-ভার,
যার অঙ্গে পদ্মগন্ধ ঝরিতেছে অনিবার।

পদটী পড়িতে পড়িতে বিহারী লালের সারদামঙ্গল মনে পড়ে। কিন্তু মালতী মালায় এরূপ রচনা বেশী নাই।

৩৭। গঙ্গা স্তোত্রাদি সংগ্রহঃ— শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিকেন সঙ্কলিতোঽনুবাদিতঃ প্রকাশিতশ্চ। কলিকাতা যন্ত্র। এই পুস্তকে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গঙ্গাস্তোত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত স্তোত্রগুলি আবার সেই সেই স্তোত্রের ছন্দেই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে তাহা মূলের পদ্যের যে মাধুর্য্য রক্ষিত

BENGAL LIBRARY
11. APR. 19

IIK 548 1~
2nd/1508

বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য। *

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এমন অনেক মত ও ভাব আছে, লোকে যে সকলকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সেই সকল মত ও ভাবের মধ্যে এক দিকে যেমন বিরোধ দেখা যায়, সেইরূপ আবার সামঞ্জস্যও দেখা যায়।

আমরা অনেক সময়ে, কোন একটী বিষয়ের কেবল এক দিক্ দেখি বলিয়া সে সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। সত্য কেমন? অনেক বিষয় সম্বন্ধেই মনে হয়, সত্য যেন একটী গোলাকার বস্তুর ন্যায়। একটী বল বা কমলালেবুর ন্যায়। এক সময়ে এক দৃষ্টিতে গোল বস্তুর সকল দিক্ দেখা যায় না। উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে হয়। নতুবা সকল দিক্ দেখা যায় না। সত্য সেইরূপ। এক দিক্ দেখিলে প্রকৃত ভাবে সত্যের জ্ঞান লাভ হয় না। সকল দিক্ দেখা চাই। তাহা হইলেই উহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়।

একদেশদর্শিতার জন্য আমরা অনেক সময়, অনেক বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই না। বালকদের পুস্তকে যে বহুরূপীর গল্প আছে, তাহা আপনারা জানেন। কয়েকজন যুবা একটী উদ্যানে গিয়া বহুরূপী নামক একটী জন্তু দেখিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের মধ্যে এই কথা উঠিল যে, বহুরূপীর বর্ণ কিরূপ? কেহ বলিলেন, বহুরূপীর বর্ণ সাদা, কেহ বলিলেন, কাল, কেহ বলিলেন, সবুজ, এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হইল। বিরুদ্ধ মতের জন্য তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন সেই বাগানের মালী আসিয়া এই বিরুদ্ধমতের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিল। মালী বলিল, বহুরূপী যখন যে পদার্থের উপর বসে, তখন সেই পদার্থের অনুরূপ বর্ণ সে ধারণ করে। যখন কৃষ্ণবর্ণ কোন পদার্থের উপর বসে, তখন তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। যখন সে কোন হরিদ্বর্ণ পদার্থের উপর বসে, তখন তাহাকে হরিদ্বর্ণ দেখায়। এই বিভিন্ন অবস্থায় তাহাকে বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। মালী এইরূপে বুঝাইয়া দিলে, যুবকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন।

এই প্রকার আর একটী প্রাচীন গল্প আছে। কোন স্থানে চারি পাঁচজন জন্মান্ধ বসিয়াছিল। তাহারা হঠাৎ শুনিল যে, নিকটে এক হস্তী আসিয়াছে। তাহাদের হস্তী দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাহারা হস্তী দর্শনের জন্য হস্তীর নিকট গমন করিল। চক্ষু নাই, হস্তী কেমন করিয়া দেখিবে? তাহারা হাত বুলাইয়া হস্তী দেখিতে লাগিল। ঐ রূপে হস্তীদর্শন করিয়া, স্ব স্ব স্থানে আসিয়া তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিল, হস্তী কেমন দেখিলে ভাই? কেহ বলিল, হস্তী থামের মত। আর এক জন বলিল, কখনই না; হাতী ঠিক্ চামরের মত। আর একজন বলিল, কখন না; হাতী একটা ঢাকাই জালার মত। তখন আর এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তোমরা

* এই বক্তৃতাটি ১০ই মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪ ৩ ৫ ৭
২৯/১২/৯৮

যাহা দেখিয়াছ, সকলই ভুল। বাস্তবিক আমি বলিব, হাতী কিরূপ? হাতী ঠিক কুলার মত। এইরূপে সেই জন্মান্ধদিগের মধ্যে ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। তখন একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সেখানে আসিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমারা যে যাহা বলিতেছ, সকলই মিথ্যা অথচ সত্য। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী থামের মত, তিনি হাতীর পা দেখিয়াছেন। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী চামরের মত, তিনি হাতীর পুচ্ছ দেখিয়াছেন। যিনি বলিতেছেন যে, হাতী ঢাকাই জালার মত, তিনি হাতীর উদর দেখিয়াছেন। আবার যিনি বলিতেছেন যে, হাতী কুলার মত, তিনি হাতীর কর্ণ দেখিয়াছেন। সকলেরই ভ্রান্তি হইয়াছে। ভ্রান্তি আংশিক দর্শনের ফল। ভ্রান্তি হইয়াছে, অথচ ভ্রান্তির মধ্যেই সত্য রহিয়াছে। এইরূপে, সেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিলেন।

সত্যের সঙ্গে সত্যের সামঞ্জস্য আছেই আছে। যদি না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা মিথ্যা, ও অপরটী সত্য। আলোকে ও অন্ধকারে কি মিলন সম্ভব? কখনই না। সত্যের সঙ্গে সত্যের মিলন, সত্যের সঙ্গে সত্যের সামঞ্জস্য সম্ভব। কেন না, সকল সত্য একই মূল হইতে আসিতেছে। সেই এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে সকল সত্য আসিতেছে।

অদ্য যে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিব, তন্মধ্যে, প্রথম সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ। এ দুয়েতেই সত্য আছে। সুতরাং দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। নিরাকার উপাসক! ভয় পাইবেন না। আমি সাকার উপাসনা সমর্থন করিতে যাইতেছি না। আমি চিরদিনই সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে গুলি গোলা বর্ষণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি।

সাকার বিষয়ে যাহাই কেন বলিনা, মূর্ত্তিপূজা মানি না। অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব। গণিত শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব। সোণার পাথর বাটী, তেঁতুলের আমসত্ব যেমন, অনন্তের মূর্ত্তিও সেইরূপ। মূর্ত্তি হইলেই পরিমিত হইবে, সুতরাং অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব কথা।

এই বহির্জ্জগৎ কি? পরব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ। না হইতে হাঁ হয় না। কিছুই ছিল না, তাহা হইতে কিছু হইল, ইহা অসম্ভব। সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন, 'নাসদসজ্জায়তে।' মহিষের শৃঙ্গ হয়, মানুষের হয় না কেন? মহিষের দেহে এমন কিছু শক্তি আছে, যাহা শৃঙ্গরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহে তাহা নাই, সেইজন্য মানুষের শৃঙ্গ হয় না।

ঐ বৃক্ষটীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। উহার উৎপত্তি কিরূপে হইল? ছিল, ব্রহ্মশক্তি, হইল বৃক্ষ। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, মায়ার বিকার। অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ।

লোকে বলে, নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করিয়া ভাবিব? আমি বলি, প্রথমাবস্থায় সাকার পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই নিরাকার ব্রহ্মকে চিন্তা কর। একদিন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনিও সেই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীনকালের ঋষিদের ঐ প্রকার হইয়াছিল। তাঁহারা

প্রথমে বহির্জ্জগতে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভ করিলেন। ঐ বৃক্ষকে ভাব। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, দয়া, প্রেম সকলই প্রকাশিত। কেবল তাঁহার গুণ সকল নহে, তিনি স্বয়ং ঐ বৃক্ষে প্রকাশিত। ঐ বৃক্ষকে প্রকৃত ভাবে দেখিলে ব্রহ্মকে দেখা হয়। ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা, সমস্ত বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাহাই। এ জগৎ সাকার ও নিরাকারে জড়িত।

দ্বিতীয় কথা, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ কি? অদ্বৈতবাদই বা কি? আমরা বলি 'সত্যং'। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেমন আমার চিন্তা সকলের উৎপত্তি ও স্থিতি আমার মধ্যেই, আমাকে ছাড়িয়া সে সকলের স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব, সেইরূপ এক পরব্রহ্মে সকল জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া এ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা-সম্ভব নহে। এ সকল তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন তরঙ্গসকলের উৎপত্তি ও স্থিতি, নদী ও সমুদ্রে, সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি পরব্রহ্মরূপ অকূল সমুদ্রে। যেমন নদী ও সমুদ্রকে ছাড়িয়া তরঙ্গ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে, সেইরূপ পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া এই বহির্জ্জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব। এ জগতে তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই মঙ্গলভাব প্রকাশিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলভাবকে ছাড়িয়া তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে, সুতরাং বলিতে হইবে, এ সকল তাঁহারই প্রকাশ। এ সকল সেই অনন্তের পরিমিত প্রকাশ। সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকালে অবতীর্ণ। অদ্বৈতবাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা তাহাই।

আবার দেখুন, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়; জগৎ অসত্য, জগৎ অসার, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম সার; জগৎ অনিত্য, ব্রহ্ম নিত্য; জগতের সকল পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, ব্রহ্ম ধ্রুব পদার্থ। জগৎ পরিমিত, ক্ষুদ্র; ব্রহ্ম অনন্ত, পূর্ণ। সুতরাং জগৎ কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত এ স্থলেও গ্রহণ করুন। যেমন আমার চিন্তা ও ভাব সকল আমি নহি, সেইরূপ এই জগৎ ও ইহার অন্তর্গত পদার্থ সকল ব্রহ্ম নহে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সকল সমুদ্র নহে, সেইরূপ এই জগৎ সকল, ব্রহ্ম নহে। জগৎ পরিমিত, অসার, অনিত্য ও অধ্রুব পদার্থ। ব্রহ্ম অনন্ত, সার, নিত্য ও ধ্রুব পদার্থ। সুতরাং জগৎ কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? দ্বৈতবাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা ইহাই।

পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ এই তত্ত্বটী কেমন পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন! মহর্ষি উপনিষদে বলিতেছেন যে, সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকল পদার্থের সহিত এক। আবার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম এ সকলের কিছুই নহেন। আবার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম যেমন জগতের অন্তরে, সেইরূপ, তিনি জগতের বাহিরে। উপনিষদের মধ্যে এই তিন প্রকারের শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক) সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম। মাণ্ডূক্য ২

এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম।

(খ) ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্। মুণ্ডক ২।২।১১

এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই জগৎ।

(গ) হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথি র্দুরোণসৎ। নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ। কঠ, ৫।২

তিনি আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদীবাসী অগ্নি, ও কলসবাসী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে উৎপন্ন হয়েন, পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন, যজ্ঞে উৎপন্ন হয়েন, এবং পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন। তিনি সত্য ও মহান্।

আবার সেই উপনিষদে মহর্ষি বলিতেছেন, এ সকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন।

(ক) যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
কেন, ৪

যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহা কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে, (পরিমিত) বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

(খ) অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
কেন, ৩

তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তাবৎ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন।

তিনি জগতের অন্তর্ভূত হইয়া আছেন, অথচ তিনি জগতের অতীত, এরূপ ভাবের শ্লোকও উপনিষদে রহিয়াছে।

(ক) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
কঠ, ৫।৯

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপ ভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, এবং (সমুদয় পদার্থের) বাহিরেও আছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৭

সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশক, সমুদয় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের মহৎ শরণকে ব্রহ্মবাদিগণ কীর্ত্তন করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই সকল জগৎ ব্রহ্মের শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এ সকল তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহাকে ছাড়িয়া এ সকলের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। সুতরাং এ স্থলে অদ্বৈতবাদের সত্য দেখিতেছি। অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিতেছি।

আবার দেখিতেছি যে, এ সকল ব্রহ্মশক্তির সাময়িক, ও পরিমিত প্রকাশ মাত্র। এ সকল সসীম, জন্মমরণধর্ম্মশীল। সুতরাং ইহার কিছুই ব্রহ্ম হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে দ্বৈতবাদের তত্ত্ব দেখিতেছি। অদ্বৈততত্ত্ব ও দ্বৈততত্ত্ব এক সঙ্গেই দেখিতেছি। উভয়েরই সামঞ্জস্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিতেছি।

কিন্তু এ সকল কথা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে বলা হইল। অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য কিরূপ? এ বিষয়টী বুঝিতে হইলে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি বুঝা আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান যে পরিমিত, তাহা বলা অনাবশ্যক। আমাদের জ্ঞান এতই সংকীর্ণ যে, ঐ প্রাচীরের ওদিকে কি আছে, বলিতে পারি না। পর মুহূর্ত্তে কি হইবে বলিতে পারি না। এইত ক্ষুদ্র আমাদের জ্ঞান। স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের জ্ঞান সসীম, এবং সেই জন্য আমরা সর্ব্বদাই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই।

আবার দেখুন, জ্ঞানের আর একটা দিক্ আছে। সে দিকে জ্ঞান অসীম। আমাদের দেশ কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্বরূপ,

যখন আলোচনা করি, তখন সসীমের মধ্যে অসীম দেখিতে পাই। আমাদের সসীমের জ্ঞান আছে। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, সহজ সত্য। কিন্তু সসীমের জ্ঞানের মধ্যেই অসীমের জ্ঞান বর্ত্তমান। আমাদের সীমার জ্ঞান আছে, ইহা নিশ্চয়। সীমার জ্ঞান যখন আছে, তখন সীমার অতীত যাহা, তাহারও জ্ঞান নিশ্চয় আছে। দেশ ও কাল সম্বন্ধে, সীমা এবং সীমাতীত, এই এই উভয়েরই জ্ঞান আমাদের রহিয়াছে।

পরিমিত দেশখণ্ড ভাবুন। উহার সীমার ওপারে দেশ নাই, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। তোমার মনকে বামে, দক্ষিণে, অধঃ ঊর্দ্ধে, যে দিকে কেন প্রেরণ কর না, কোন দিকেই আকাশের সীমা পাইবে না। অনন্তদেশে আমাদের জ্ঞান ছড়াইয়া পড়িবে। ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতেছি, উহা পরিমিত দেশখণ্ডে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কি ঐ পরিমিত দেশখণ্ডকে অনন্তদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি? ঐ পরিমিত দেশখণ্ডকে অনন্তদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি? কখনই না।

আমরা দেশকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবিতে পারি। কিন্তু যখনই সীমা ভাবি, তখনই বাস্তবিক আমি সীমার অতীত হইয়া যাই। সীমার জ্ঞান যাহার আছে, সীমাতীতের জ্ঞানও তাহার নিশ্চয়ই আছে। সসীমের জ্ঞান যাহার আছে, অসীমের জ্ঞান তাহার নিশ্চয়ই আছে। সসীমের জ্ঞান ভিন্ন অসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে, আবার অসীমের জ্ঞান ভিন্ন সসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে। সীমাকে যখন জানিতেছি, তখন সীমার অতীতকেও জানিতেছি।

ইহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না সসীম ও অসীম, এ দুই আপেক্ষিক জ্ঞান। সসীমের জ্ঞানের মধ্যে অসীম, আবার অসীমের জ্ঞানের মধ্যে সসীম। যেমন, দীর্ঘ বলিলেই হ্রস্ব বুঝায়, এবং হ্রস্ব বলিলেই দীর্ঘ বুঝায়, সেইরূপ সসীম বলিলেই অসীম বুঝায়, এবং অসীম বলিলেই সসীম বুঝায়।

দেশ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কাল সম্বন্ধেও তাহাই। কাল আছে, ঘটনা নাই; ঘটনা আছে, কাল নাই, এ দুই অসম্ভব। কাল আছে, কিন্তু কিছু ঘটিতেছে না; ঘটনা ঘটিতেছে, অথচ কালে নয়, ইহা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বর্ত্তমান কাল বলিলে, বর্ত্তমান ঘটনা বুঝিতে হয়। আবার দেখুন, বর্ত্তমান ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে; সুতরাং মনে করিতে হয় যে, ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বে অবশ্য কাল আছে; কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্ব্বেও কাল আছে। সুতরাং ঘটনা আছে। এইরূপে কালের শেষ এবং ঘটনার শেষ পাইবেন না। অনাদি কাল ও অনাদি ঘটনাশ্রেণীর মধ্যে আমাদের জ্ঞান বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

ভূতকাল সম্বন্ধে যেরূপ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। বর্ত্তমান ঘটনার পরে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পরেও অবশ্য কাল আছে। সুতরাং ঘটনাও আছে। এইরূপে কালের শেষ এবং সর্ব্ব শেষ ঘটনার নাগাল পাওয়া যায় না। অনন্ত কাল ও অনন্ত ঘটনার মধ্যে আমাদের জ্ঞান ছড়াইয়া পড়ে।

অনন্ত বা অসীম কাহাকে বলে? যাহা সীমাকে অতিক্রম করে, তাহাই অনন্ত বা

অসীম। অথবা এরূপ বলিলেও হয় যে, যাহা সসীম অপেক্ষা বড়, তাহাই অসীম বা অনন্ত। আমাদের জ্ঞান, দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে, ছাড়াইয়া যায়, সীমাতীত দেশ ও কালে বিস্তারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমাদের জ্ঞান, দেশ ও কাল সম্বন্ধে, এক ভাবে, অনন্ত ও অসীম।

কেবল তাহাই নহে। জ্ঞান, অনাদি, অনন্ত দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে। একটী দেশখণ্ড মনে কর। তাহার অবশ্য অংশ আছে। সেই দেশখণ্ডকে যতই ক্ষুদ্র অংশে কেন বিভক্ত কর না, তাহার অবশ্য অংশ থাকিবে। ঐ ক্ষুদ্র অংশকে খণ্ড খণ্ড কর, তথাচ অংশ থাকিবে। খণ্ড করার শেষ হইবে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক দেশখণ্ড অনন্ত অংশের সংযোগ।

আবার যত বড় দেশখণ্ডকে মনে করনা কেন, তাহার সহিত আরও দেশখণ্ডের যোগ রহিয়াছে। আকাশের পর আকাশ, তাহার পর আকাশ—সীমা নাই। দেশ কেবল অনন্তের যোগ।

দেশের ন্যায় কালও কেবল অনন্ত সংযোগ। কাল কেবল পূর্ব্ব ও পরের সম্বন্ধ বা যোগ। কালের পর কাল, ঘটনার পর ঘটনা। কাল, কেবল এইরূপ অনাদি ও অনন্ত সংযোগ।

দেশ ও কাল কেবল অনন্ত সংযোগ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কে সংযোগকারী? কাহার দ্বারা সংযোগ হইতেছে? সংযোগকারী জ্ঞান।, সংযোগ ভিন্ন দেশ ও কাল সম্ভব নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান,দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে। জ্ঞান, কেবল আপনার মধ্যে অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এমন নহে; জ্ঞান অনাদি অনন্ত দেশ ও কালকে সম্ভব করিতেছে।

এখন দেখুন, আমরা সৃষ্ট জীব। যাহা সৃষ্ট, তাহা অবশ্য সসীম। তাহা সসীম, তাহা সসীমকেই জানিতে পারে। সসীম হইয়া অসীমকে জানা অসম্ভব। যাহাতে যাহা নাই, সে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? সসীম যে, সে অসীমকে জানিতে পারে না। সসীম, সসীমকেই জানিতে পারে। কিন্তু সসীম, সসীমকে সসীমরূপে জানিতে পারে না। কেননা সসীমকে, সসীমরূপে জানিলেই অসীকে জানা হইল। কেননা, সসীম ও অসীম আপেক্ষিক জ্ঞান। একই জ্ঞানের দুই দিক্। একটীকে জানিলেই আর একটীকে জানা হয়।

আমরা যখন সসীম, তখন অসীমকে কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু আমরা অসীমকে জানিতেছি। সসীমকে জানিলেই অসীমকে জানা হয়। আমরা অসীমকে জানিতেছি। এই অসীমের জ্ঞান আমাদের মধ্যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ইহা বলিতেই হইবে যে, যিনি অসীম, অনন্ত, তাঁহারই জ্ঞান আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এখন দেখুন, যে জ্ঞান অনাদি, অনন্ত দেশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যে জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত দেশ কালকে সম্ভব করিতেছে, তাহা আমাদের অন্তরে। যিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে আপনার আভাষ প্রকাশ করিতেছেন।

আবার দেখুন, জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন, প্রেম সম্বন্ধেও সেইরূপ। একটী পুরাতন

ব্রহ্ম সঙ্গীতে কেমন একটী সুন্দর কথা রহিয়াছে !

> এক ভানু অযুত কিরণে,
> উজলে যেমতি, সকল ভুবন,
> তোমার প্রেম হইয়া শতধা
> বিরচয়ে সতীর প্রেম,
> জননীহৃদয়ে করে বসতি।"

কি সুন্দর কথা ! ইহা কেবল কবিত্ব নয়, সত্য। কবিত্বের আকারে সত্য প্রকাশ হইয়াছে।

মানবের প্রেম কি তাহার নিজের ? প্রেমময়ের প্রেম মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু, মাতৃ হৃদয়ে পতিত হইয়াছে, সেই জন্য মাতৃস্নেহ এমন অপূর্ব্ব, এমন নিষ্কাম, এমন পবিত্র পদার্থ। তাঁহারই প্রেম মাতৃহৃদয়ে মাতৃ স্নেহ ; তাঁহারই প্রেম, দয়ালুর হৃদয়ে দয়া ; তাঁহারই প্রেম, বন্ধুর হৃদয়ে, বন্ধুতা। তাঁহারই প্রেম, সাধ্বী সতীর অন্তরে, পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের আকার ধারণ করিয়াছে। যিনি প্রেমময়, তিনি আর তাঁহার প্রেম, কি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে ? যেখানে তাঁহার প্রেম, সেখানেই তিনি। তিনি মাতৃহৃদয়ে পরমমাতা, পিতৃহৃদয়ে পরমপিতা, বন্ধুর হৃদয়ে পরমবন্ধু, দয়ালুর হৃদয়ে পরম দয়াল রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এখন দেখুন, যেমন জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া,মানব অন্তরে সেই অনন্ত জ্ঞানের আভাষ দেখিলাম, সেইরূপ সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর প্রেমরূপেও সেখানে অবতীর্ণ।

> "কারে বল্‌বো কে করবে রে প্রত্যয়।
> এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

এ স্থলে আর একটী প্রয়োজনীয় কথা বলি। ব্রাহ্মসমাজ বহু কাল হইতে বিশ্বাস করিতেছেন ও প্রচার করিতেছেন যে, বিবেক পরমেশ্বরের বাণী। এ কথা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে রহিয়াছে। বিবেক পরমেশ্বরের বাণী, বহু দিন হইতে ইহা ব্রাহ্মসমাজের মত।

এস্থলে দেখুন, বিবেক যেমন এক দিকে পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ, আবার উহা আমাদের মনের বা জ্ঞানের একটা অবস্থা। এক দিকে যেমন উহা পরমেশ্বরের বাণী, সেইরূপ আবার উহা আমাদের মনোবৃত্তি বা মনের ভাব। এক দিকে উহা পরমেশ্বরের বাণী, আর একদিকে উহা আমাদের নৈতিক বৃত্তি। সুতরাং দেখুন, আমাদের অন্তরে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ ! যাহা পরমেশ্বরের বাণী, তাহাই আবার আমাদের মনের ভাব !

দ্বৈতবাদ কি ? জগৎ ও ব্রহ্মের ভিন্নতা। অদ্বৈতবাদ কি ? জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব। স্থূল ভাবে ও সংক্ষেপে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এইরূপ লক্ষণা করা যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য কি ? যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এ দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

যাঁহারা বলেন যে, জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের কথা কি অমূলক ? বাস্তবিক কি জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে ? জগৎ অসার,ব্রহ্ম সার ; জগৎ অসত্য, ব্রহ্ম সত্য ; জগৎ অনিত্য, ব্রহ্ম নিত্য ; ইহাই যখন হইল, তখন জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয় তো কি ? দ্বৈতবাদী যাহা বলেন, সে কথা অমূলক বলিয়া কেমন করিয়া অস্বীকার করিব ?

তবে কি দ্বৈতবাদই সত্য, অদ্বৈতবাদ

অসত্য? না, তাহা কি করিয়া বলিব? অদ্বৈতবাদের মধ্যে অমূল্য সত্য দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু গুণকে ছাড়িয়া পদার্থ, শক্তিকে ছাড়িয়া শক্তিমান কি কখন থাকিতে পারে? কখনই না। সুতরাং বলিতেই হইবে, ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এ জগতে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার দয়া, তাঁহার প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন। ভারতের প্রাচীন মহর্ষি বলিতেছেন;—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ঐ বৃক্ষটীকে প্রকৃত ভাবে দেখিলে ব্রহ্মকে দেখা হয়। কেননা উহা তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও প্রেমের প্রকাশ। ইহাই অদ্বৈতবাদের সত্য।

আবার দ্বৈতবাদের সত্য উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ এক সময় ছিল না, এক সময় থাকিবে না, উহা ব্রহ্মশক্তির সাময়িক ও পরিমিত প্রকাশ মাত্র, উহা অনিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ব্রহ্ম নহে। জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এ কথা সত্য। সর্ব্বত্রই দ্বৈত ও অদ্বৈতের সত্য বর্ত্তমান।

বাহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা, অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই। এই পরিমিত জীবের মধ্যে, আমাদের পরিমিত জ্ঞানের মধ্যে, সেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা এক দিকে যেমন অল্পবুদ্ধি, ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্ট জীব, আবার আমাদেরই মধ্যে, আমাদেরই জ্ঞানরূপে সেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছেন! সেই জন্য মানুষের ভিতরে, দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই বর্ত্তমান।

আবার নৈতিক প্রকৃতি, ধর্ম্ম প্রকৃতির মধ্যে দেখিতেছি যে, যাহা আমার বিবেক, বা ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহাই পরমেশ্বরের বাণী। এক দিকে আমি দুর্ব্বল, পাপী, অপরাধী জীব, অন্যদিকে আমারই অন্তরে, আমারই ধর্ম্মবুদ্ধিরূপে, সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর অবতীর্ণ। এখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ। ইহাই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য। বহির্জ্জগতে দ্বৈত ও অদ্বৈতের সামঞ্জস্য, অন্তর্জ্জগতেও দ্বৈত ও অদ্বৈতের সামঞ্জস্য।

তাহার পর তৃতীয় কথা, অবতার মানিনা ও অবতার মানি। অবতার মানি না, তাহা কিরূপে? দেশকালে বদ্ধ অবতার মানি না। ব্রহ্ম স্বয়ং আসিয়া পৃথিবীতে দেহ ধারণ করেন, ইহা মানি না। এমত ব্রহ্ম স্বরূপের বিরুদ্ধ। অযোধ্যা, বা মথুরা বা বেথেলহেমে মনুষ্যরূপে পূর্ণব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা মানি না।

তবে কি মানি? ইহাই মানি যে, তিনি সকল ভুবনে অবতীর্ণ। তিনি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ। শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে, পবিত্রতারূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ। তিনি অন্তরে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। এই মহা বিশ্বজনীন অবতার স্বীকার করি ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করি।

লোকে বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রহিয়াছেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় কি বিশ্বাস করি? করি না, অথচ করি। আকা-

শের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইত্যাদি বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিশ্বাস করি যে, এক দেবতা আকাশে, পৃথিবীতে, জলে, বায়ুমণ্ডলে, পর্ব্বতে, নদীতে, সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী হইয়া রহিয়াছেন।

দুই কথাই সত্য। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত সত্য,অথচ অসত্য। ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নাই। এক পূর্ণব্রহ্ম, জগতের প্রত্যেক বিভাগে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া রহিয়াছেন।

পৌত্তলিকতা অখণ্ড পরমেশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, শিব সংহারকর্ত্তা, গণেশ সিদ্ধিদাতা, ষষ্ঠি শিশুদিগের কল্যাণকারিণী, এই রূপ বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কার্য্য। তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তা। তাঁহাদের Jurisdiction ভিন্ন ভিন্ন। ইহা মহাভ্রম। ব্রহ্মের বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া,মানুষ ঐ প্রকার কল্পনা করিয়াছে। অজ্ঞানপ্রসূত কল্পনা, ব্রহ্মের বিবিধ গুণ ও শক্তিকে, ব্যক্তিত্ব দিয়া, বিভিন্ন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। অখণ্ডকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়াছে। ইহাই দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের মহাভ্রম।

ইহা যেমন ভ্রম, সেইরূপ আবার প্রচলিত উপধর্ম্মের মূলে ঐ টুকু সত্য বীজরূপে স্থিতি করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার First Principles নামক গম্ভীর গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন ;— "There is a soul of truth in things erroneous." ভ্রমসঙ্কুল বিষয়ের মধ্যেও সত্যের আত্মা স্থিতি করিতেছে।

ঐ শীতকিকে, খণ্ড খণ্ডরূপে দেখাই ভ্রান্তি। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা, তিনিই সিদ্ধিদাতা, তিনিই শিশুগণের কল্যাণকারী, তিনি যুবা, বৃদ্ধ, নর নারী সকলের কল্যাণকারী। বহু নয়, এক।

এখন সেই মূল কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। এক পূর্ণব্রহ্ম, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ। এইরূপ অবতার মানি। আমি বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতার হন, এ মত মানিনা। দেশ কালে বদ্ধ অবতার মানি না। কিন্তু এ মতের মূলেও সত্য আছে।

ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিরূপে লিখিত আছে, "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ঐ বাক্যের অর্থ এ প্রকার নহে যে,পরমেশ্বর মনুষ্যরূপে, যুগে যুগে, পৃথিবীতে অবতার হন। উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিশেষ বিশেষ মানবে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম প্রেরণ করেন। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। বুদ্ধদেব, সক্রেটিস, যীশু, সেণ্টপল, মার্টিন লুথর, বাবা নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। মানুষের কি শক্তি আছে? এই সকল মহাপুরুষ এ জগতে যে মহা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে ঐশীশক্তি। এই সকল মহা পুরুষকে এক ভাবে অবতার বলা হয়। কেননা, তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি,জ্ঞান ও প্রেম অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এ বাক্যের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। ভাগবতে আছে, "অবতারাহ্যসংখ্যা।" ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজনগণকে এক ভাবে

অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

চতুর্থ কথা, সাধারণ বিধান ও বিশেষ *বিধান। অনেকে বলেন, পরমেশ্বর সাধারণ* নিয়মে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিশেষ কিছু নাই। সকলই সাধারণ। সকল জগতের পক্ষে, সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে বিশেষ কিছু নাই। বিশ্বজনীন প্রণালীতে, সাধারণ নিয়মে সর্ব্বত্র কার্য্য হইতেছে। যাঁহারা এই সাধারণ বিধানবাদী, তাঁহারা বিজ্ঞানের সাক্ষ্যদ্বারা আপনাদের মত সমর্থন করেন। যাহা প্রকৃতির নিয়ম, তাহা সকলের পক্ষে সমান। তোমার, আমার জন্য বা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের *জন্য ভগবানের কোন বিশেষ নিয়ম নাই।* সাধারণ বিধানবাদীগণ, কোন বিশেষ নিয়ম বা বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন না। সাধারণ নিয়মে ভূমি হইতে বৃক্ষ লতা, ফল শস্য উৎপন্ন হইতেছে, সাধারণ নিয়মে নদী সকল সাগরসঙ্গমে ধাবমান হইতেছে, সাধারণ নিয়মে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সাধারণ নিয়মে অগ্নি দগ্ধ করিতেছে, সাধারণ নিয়মে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্ত হইতেছে। সকলই সাধারণ নিয়ম। সময়ে সময়ে যে সকল প্রাকৃতিক উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহাও সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। ঝঞ্ঝা ঝটিকা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সকলই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। বিশেষ কিছু নাই।

যাঁহারা বিশেষ বিধানবাদী, তাঁহারা যে সাধারণ নিয়ম অস্বীকার করেন, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত জীবনে বা জাতীয় জীবনে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান স্বীকার করেন।

এই সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধানের মতকে অনেকে পরস্পরবিরুদ্ধ মত বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক কি এ দুই বিরুদ্ধ মত? *বিরুদ্ধ বটে, অথচ নয়। যদি বল* যে, পরমেশ্বর সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ বিধান ও সাধারণ বিধান অবশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে বিশেষ বিধান, অবশ্য, সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম, বিশ্বজনীন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পরমেশ্বর কোন কার্য্য করেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। উহা একান্ত অযুক্ত কথা বলিয়া মনে করি। অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া, (Miracle) আমরা মানিনা। যাঁহারা বলেন যে, বিশ্বজনীন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরমেশ্বর বিশেষ বিধান করেন, তাঁহাদের মত মানি না। সেরূপ বিশেষ বিধান মানি না।

কিন্তু বিশেষ বিধানের মত কি সকল স্থলেই যুক্তিবিরুদ্ধ? কখনই না। যদি এমন বল যে, সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভগবান্ বিশেষ বিধান করেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই অযুক্ত কথা। কিন্তু বিশেষ বিধান হইলেই কি উহা সকল স্থলেই সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ হইবে? কখনই না। এ উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

সে সামঞ্জস্য কিরূপ? সাধারণ নিয়মের যখন কোন বিশেষ প্রয়োগ হয়, সাধারণ নিয়মদ্বারা যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, তখনই বিশেষ বিধান। এরূপ বিশেষ বিধানের সহিত, সাধারণ বিধানের কোন বিরোধ নাই। এরূপ স্থলে, বিশেষ বিধান, সাধারণ বিধানেরই অন্তর্গত।

কোন ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসক বলিলেন, রোগীকে যে ঔষধ দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য পাতি লেবুর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে সময়ে, ও সে প্রদেশে পাতি লেবু দুর্লভ। অথচ পাতি লেবুর দ্বারা যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহা না হইলে, সেই পীড়িত ব্যক্তির জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। এমন সময়ে, দূরদেশ হইতে কতকগুলি পাতি লেবু আসিয়া উপস্থিত। পীড়িত ব্যক্তির কোন আত্মীয় উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পীড়ার বিষয় এবং উক্ত পীড়ায় যে পাতি লেবু একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি জানিতেন না। লেবু পাইবা মাত্র পীড়িত ব্যক্তি বলিলেন, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন।

পীড়িত ব্যক্তির ঐ কথাটী কি অযুক্ত কথা? কৃপাময় বিধাতার উপর যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি ঐ প্রকার অবস্থায়, ঐ রূপ কথাতো বলিবেনই। এই যে দূর স্থান হইতে লেবু আসাতে ঐ ব্যক্তির আরোগ্য লাভের উপায় হইল, ইহাই ভগবানের বিশেষ কৃপা বা বিশেষ বিধান। ইহাতে কি কোন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ হইল? কিছুই না। সাধারণ নিয়মদ্বারাই ব্যক্তিগত জীবনে এই বিশেষ বিধান সম্ভব হইল। সাধারণ নিয়ম দ্বারা বৃক্ষে লেবু ফল উৎপন্ন হইয়াছে, সাধারণ নিয়ম দ্বারা উহা প্রেরিত হইল, এবং সাধারণ নিয়ম দ্বারাই উহা রোগ আরোগ্যের উপায় হইল।

কোন ব্যক্তি মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কোন কারণে পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রের আইলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। যেমন একটা আইল হইতে অপর একটা আইলে পা দিবেন, অমনি তাঁহার দুই পায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ যমোপম এক ভীষণ কেউটিয়া সর্প ফণা তুলিয়া উঠিল। সেই ব্যক্তি উহা দেখিবামাত্র ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া গিয়া সর্পের মস্তকের উপর পড়িল। সর্প চাপা পড়িল। তখন সেই ব্যক্তি বিবস্ত্র অবস্থায় ধাবমান হইয়া, দূরে গিয়া, আত্ম রক্ষা করিল।

এই ঘটনাটী আমার কল্পিত নহে। আমি শুনিয়াছি, ইহা একটী বাস্তব ঘটনা। সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইয়া সেই ব্যক্তির মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, আমি জানি না। কিন্তু সে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত লোক হইলে, তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন;—"জগদীশ্বর রক্ষা করিলেন!"

ইহাই বিশেষ বিধান। ভগবানের বিশেষ কৃপা। কোন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কি এই ঘটনা হইল? কিছুই না।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক বা জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন বিশেষ কৃপা বা বিধান, সামাজিক বা জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। অতীতসাক্ষী ইতিহাস, দেশে দেশে, যুগে যুগে, বিধাতার বিশেষ বিধানের স্বপক্ষে, কোটি কণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

সকল দেশের ইতিহাস হইতে এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি একটীর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব না। একাধিক সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল, যখন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে

একান্ত শোচনায় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান হইল। তিনি পবিত্র ব্রহ্ম নামের জয় ডঙ্কা বাজাইলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের নির্ম্মল আলোক প্রবেশ করিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক উন্নতি প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। সহস্র প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পৌত্তলিকতার দুর্গের মধ্যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মনামের, জয়পতাকা উড্ডীন হইল। এ দেশের চিরকল্যাণের উৎসস্বরূপ, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ভাগীরথী তীরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সকল ঘটনার মধ্যে আমি কি দেখি? করুণাময় বিধাতার হস্ত। এ জাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। এ দেশের দুর্দ্দশা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ বিধান। যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় ভাবি, তখন তাঁহার সুমহৎ জীবনের মধ্য দিয়া মঙ্গলময়, করুণাময় বিধাতাকেই দেখি। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা, এ দেশের কল্যাণের জন্য বিধাতার বিশেষ বিধান। কিন্তু এই বিশেষ বিধান, কি সাধারণ বিধানকে ভঙ্গ করিয়া হইয়াছে? কখনই না। কোন অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া (Miracle) সংঘটিত হয় নাই। সাধারণ নিয়মানুসারেই ভারতের, জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের এই বিশেষ বিধান।

পঞ্চম কথা, সম্প্রদায় ও অসম্প্রদায়। ইয়োরোপে ও আমাদের দেশে, এমন অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে হৃদয় সংকীর্ণ হইয়া যায়, স্বাধীন চিন্তা নষ্ট হইয়া যায়! আপনার দলের মধ্যেই লোকের প্রেম বদ্ধ হইয়া পড়ে, লোকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে প্রেমালিঙ্গন দিতে পারে না। তাঁহারা এই প্রকার মনে করেন। বিলাতে এই প্রকার লোক অনেক আছেন।

কিন্তু এই সকল লোকের কথা কি যুক্তিযুক্ত? তাঁহাদের কথা যে একেবারেই অসার, এমন মনে করি না। সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া অনেক লোক নিতান্তই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। তাহাদের হৃদয় ও চিন্তাশক্তি সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে ঐ প্রকার হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, সকলকেই যে ঐরূপ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নহে। এমন অনেক লোক দেখা যায়, তাঁহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের হৃদয় উদার ও অসাম্প্রদায়িক।

সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কোন কোন দোষের কথা অনেকে বলেন বটে, কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা নাই? সম্প্রদায় একান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষে মানুষে মতের ও ভাবের একতা হইলে তাহারা একত্র হইবে, ইহার তুল্য স্বাভাবিক আর কি আছে? মত ও ভাবের একতা হইতে সহানুভূতির উৎপন্ন হয়, এবং সেই সহানুভূতি মানুষকে মিলিত করে। মত ও ভাবের সহানুভূতি, বহু মনুষ্যকে এক করে। এই রূপে স্বাভাবিক প্রণালীতে সম্প্রদায় সমূহের উৎপত্তি হয়।

সম্প্রদায়সংগঠন স্বাভাবিক ও উপকারী। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে একটী সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রে সিদ্ধি হয় না। এ বাক্যের তাৎপর্য্য, বোধ হয়, এই যে, সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং সিদ্ধি সহজ হয়। একাকী মানুষ কি করিতে পারে? তাহার শক্তি, তাহার জ্ঞান, তাহার ধর্ম্মভাব কতটুকু? সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিলে, পরস্পরের উপদেশ, পরামর্শ, ধর্ম্মভাব ও চরিত্রের দৃষ্টান্তে, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে থাকাতে শুকাইয়া মরিয়াছে। একটা বড় নদীর সহিত যোগ না থাকিলে, খালের জল শুকাইয়া যায়, নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে যে সকল দোষ ঘটিবার কথা অনেকে বলেন, তাহা একবারেই অমূলক নহে। অনেকে দলো হইয়া যায়। উহা ভাল নহে। মিছরি হওয়াই আবশ্যক। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেন, "দেখিস্, যেন দলে জড়াইয়া মরিস্ না।"

সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে দোষ ঘটে বলিয়া সম্প্রদায় ত্যাগ করা বিধেয় নহে। ত্যাগ করিলে অধিকতর দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। সংসারে অনেক ভাল জিনিস আছে, যাহা মানুষের দোষে মন্দ হয়। মন্দ হয় বলিয়া কি ভাল জিনিস পরিত্যাগ করিব? অগ্নিদ্বারা কত গ্রাম-নগর বিনষ্ট হয়। তাহা বলিয়া কি অগ্নির ব্যবহার ত্যাগ করিব? অগ্নি ব্যতীত আমাদের দৈনিক আহার যুটে না। অগ্নি না হইলে জগতের শত শত হিতকর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। প্রেমের অপব্যবহারে মানুষের কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা বলিয়া কি নির্ম্মল প্রেম পরিত্যাজ্য?

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য এই যে, অসাম্প্রদায়িক ভাবে, সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে হইবে। সম্প্রদায়ের যাহা উপকার, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ যে সকল দোষের সম্ভাবনা, তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে হইবে। সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিব, অথচ আমার হৃদয় সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিবে, ইহাই আমার সকল সাধন ভজনের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। মতভেদ হইলেই হৃদয়ভেদ হয়। ধর্ম্মজগতে ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পরিতাপের কথা কি বলিব, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও মতভেদের জন্য হৃদয়ভেদ বিরল নহে। এমন উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রেমের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও যদি আমাদের মধ্যে কেবল মতভেদের জন্য হৃদয়ভেদ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি আছে? ইহাতে কেবল আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতাই প্রকাশ পায়। মতভেদে হৃদয়ভেদ, ইহাই নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করে যে, আমরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া জগতের নিকট প্রকাশ করিতেছি, বাস্তবিক, আমরা সে পরম ধর্ম্মের যোগ্য নহি।

ষষ্ঠ কথা এই যে, জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতা। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জাতীয়ত্বার অতিরিক্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা মনে করেন যে,

বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে যাহাই হউক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে বিদেশীয়দিগের নিকট আমাদের কিছুই শিক্ষা করিবার নাই। যাহার ঘরে প্রচুর অন্ন আছে, সে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে কেন যাইবে? আমাদের সমাজের তুল্য কি আর সমাজ আছে? আমাদের ধর্ম্মের তুল্য কি ধর্ম্ম আছে? আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলের তুল্য কি আর শাস্ত্র আছে? আমরা এ সকল বিষয়ে ভিখারীর ন্যায় কেন পরের দ্বারে যাইব? সমাজ কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, বিদেশীয়দের নিকট হইতে আমাদের কিছুই গ্রহণ করিবার নাই। বিদেশীয়েরা এখন আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন, আমাদের শাস্ত্রের সমাদর করিতেছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি ও আমেরিকায় আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতেছে। আমাদের কিসের অভাব আছে? পরের শাস্ত্র ও পরের ধর্ম্ম হইতে আমাদের কি লইবার আছে? কিছুই না।

এই সকল কথা কি যুক্তিযুক্ত? কখনই না। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু, উপকারী, যাহা কিছু সত্য, তাহা জাতীয় বা বিজাতীয় কি? তাহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যাহা কিছু আমাদের পক্ষে ভাল, তাহা স্বজাতীয় হউক বা বিজাতীয় হউক, অবশ্য গ্রহণ করিব। কেন না, উহা ভাল। যাহা কিছু আমাদের পক্ষে উপকারী, তাহা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা বিদেশীয় বা বিজাতীয় হইল, তাহাতে কি? বিদেশীয় বা বিজাতীয় বলিয়া যাহা ভাল ও উপকারী, তাহাও গ্রহণ করিব না, ইহার তুল্য অযুক্ত ও অবিবেচনাসিদ্ধ কথা আর কি আছে? আমাদের দেশের অনেক লোকের এইরূপ একটা ভাব দেখিতে পাই যে, দেশের যাহা মন্দ, তাহাও রক্ষা করিতে হইবে, অথচ বিদেশের যাহা ভাল, তাহা লওয়া হইবে না। এ প্রকার অন্ধ রক্ষণশীলতা, দেশের উন্নতিপক্ষে মহা অন্তরায়।

জাতীয় সত্য ও বিজাতীয় সত্য, সত্যের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কখন সম্ভব নহে। সত্যের মধ্যে এরূপ জাতিভেদ নাই। যাহা সত্য, তাহা সকল দেশের জন্য, সকল জাতির জন্য। সত্য, হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টিয়ানের নয়, তোমার নয়, আমারও নয়, অথচ সকলেরই। যাহা সত্য, তাহা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে আসিয়াছে। সকল সত্যই পরমেশ্বরের সত্য। সমগ্র মানবজাতি তাঁহারই সন্তান। সুতরাং সকল সত্য, মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সকল সত্য, মানবজাতির পিতৃসম্পত্তি। যেমন, এক সূর্য্য সকল জাতিকে আলোক ও উত্তাপ দিতেছে, সেইরূপ সেই এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, তাঁহার সকল সন্তানকে সত্যরত্ন বিতরণ করিতেছেন। সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে। ইয়োরোপীয় সত্য, মার্কিন সত্য, ভারতবর্ষীয় সত্য, সত্যের এ প্রকার বিভেদ নাই। সত্য, সকল দেশের, সকল জাতির জন্য। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, কোরাণ, জেন্দ আবেস্তা, বাইবেল, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কোন শাস্ত্রে, যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির জন্য।

রাজা রামমোহন রায় বহু জাতির ভাষা ও বহু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই মহা সত্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ

জাতির মধ্যে, বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্য বদ্ধ নহে। সেই জন্য, তিনি যেমন হিন্দুশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অমৃত তাঁহার স্বদেশবাসীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, আবার যীশুর অমূল্য উপদেশ নিচয় সংগ্রহ করিয়া "Precepts of Jesus, guide to peace and happiness" নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে এক, বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পারসি ভাষায় রচিত, ও আরবি ভাষায় লিখিত এক ভূমিকা সম্বলিত, 'তোহফতুল মোহদীন' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন তাঁহার শিষ্যগণকে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন, তখন ভাবাবেশে, তাঁহার গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

বিশ্বজনীন সত্য, বিশ্বজনীন ধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজে চিরদিনই রহিয়াছে। যে দেশে, যে শাস্ত্রে, কেন সত্য থাকুক না, তাহাই যে গ্রহণ করা আবশ্যক, সকল সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাদের চরণতলে বসিয়া যে আমাদিগকে সত্য শিক্ষা করিতে হইবে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার বহু পূর্ব্বে, ভক্তিভাজন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্রনির্ব্বিশেষে যে সত্য সংগ্রহ করিতে হইবে, অক্ষয় বাবু কেমন সুস্পষ্ট ও সুন্দর-রূপে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অক্ষয় বাবুর লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি।

"অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস, যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কমৃট্, যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য, পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।"

বিশ্বজনীনতা সমর্থন করিয়া অনেক কথা বলিলাম। তবে কি জাতীয়তার প্রয়োজন নাই? তবে কি জাতীয়ভাব কিছুই নয়? এ কথা কে বলে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জাতীয় ভাবের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তবে, ইহাও বলি যে, যে জাতীয় ভাব, বিশ্বজনীন সত্য ও ভাবের বিরোধী, এমন জাতীয়ভাব চাই না। কিন্তু যে জাতীয় ভাব বিশ্বজনীন ভাবকে বর্দ্ধন ও পোষণ করে, সেরূপ জাতীয় ভাব চাই। বাস্তবিক, প্রকৃত জাতীয় ভাবের সহিত বিশ্বজনীন ভাবের কোন বিরোধ নাই।

বিকাশের (evolution) নিয়মানুসারে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতেছে। মানবজাতির সকল বিভাগেই বিকাশের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। ধর্ম্ম, বিকাশের নিয়মের বহির্ভূত নহে। সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ বিকাশ; (evolution)

সমগ্র মানবজাতির বিকাশ বা ক্রমোন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির বিকাশ, ঠিক্ যে এক প্রকার, এমন নহে। বিকাশ যে সর্ব্বত্র

একই রূপ আকার ধারণ করিতেছে, এমন নহে। প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব আছে।

ইয়োরোপে দেখুন। জর্ম্মানদিগের চিন্তাশীলতা ও দর্শনশাস্ত্রপ্রিয়তা, আয়ারলণ্ডবাসীদিগের রসিকতা, ফরাসিদিগের ভদ্রতা ও ভব্যতা, স্কটলণ্ডবাসীদিগের দৃঢ়তা, ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যপ্রিয়তা, উদ্যমশীলতা ও রাজভক্তি, ইটালিয়ানদিগের সঙ্গীতপ্রিয়তা ও শিল্পকুশলতা, এই সকল ইয়োরোপীয় বিশেষ বিশেষ জাতির বিশেষত্ব। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে, "হুযুরে চীন, হুজুগে বাঙ্গালী" জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের জন্যই এই প্রকার প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে।

নানা কারণে এক এক বংশের ও এক এক জাতির বিশেষত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম বিষয়েও সেই রূপ। এক এক ধর্ম্মের, এক এক বিশেষ ভাব। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? নৈতিক বুদ্ধির প্রাধান্য ও পাপবোধ। মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? কঠোর একেশ্বরবাদ ও সকল প্রকার পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? নির্ব্বাণ ও মৈত্রী। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? ধ্যান ধারণা ও ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাব, বিশেষ বিকাশ রহিয়াছে। এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে লইয়া সমগ্র মানবজাতি, বিশ্বজনীন, অসীম, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। জাতিগত বিশেষত্ব, সাধারণ ও বিশ্বজনীন উন্নতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সকল বিশেষত্ব সাধারণ ও বিশ্বজনীন বিকাশকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে।

মানবজাতির সৃষ্টি হইতে এইরূপ বিকাশ ও ক্রমোন্নতি চলিয়াছে। কিন্তু মানবজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন বংশে ও জাতিতে, সকল বিষয়ের বিকাশ সমভাবে হয় নাই। প্রত্যেক জাতি, বিশেষ বিশেষ ভাবে, সেই বিশ্বজনীন উন্নতির সাহায্য করিতেছে।

প্রত্যেক সভ্যজাতি তাহাদের বিশেষ ভাবে, জগতের কার্য্য করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের কি কিছু বিশেষ কার্য্য নাই? উন্নতি পথে, মানব জাতির এই মহাযাত্রার সাহায্য করিবার জন্য আমাদের কি বিশেষ কিছু করিবার নাই? অতি প্রাচীনকাল হইতে, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ, আমাদের ভক্তিভাজন পিতৃপুরুষগণ, আমাদের দেহে, বৈজিক নিয়ম (Law of heridity) অনুসারে যাহা কিছু মঙ্গলকর পদার্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সমাজে ও শাস্ত্রে যাহা কিছু সার ও সত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অবলম্বন করিব, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিব, তাহাই আমাদের বিশেষত্ব। পিতৃপুরুষদের জ্ঞান ও ধর্ম্ম আমরা শিক্ষা করিব। তাঁহারা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই মূলধন করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিব। উহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। উহাই আমরা জগৎকে দিব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়াই এদেশে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

"The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that, the idolatry of the Brahmins was

contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities, which they profess to revere and obey." *Autobiographical Sketch*

তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন।

তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র বিশ্বজনীন ভাবের প্রধান প্রচারক। তথাচ, জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট ও সুন্দর রূপে, বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি।

"But the future Church of India must be thoroughly national; it must be essentially an Indian Church. The future religion of the world I have described, will be the common religion of all nations, but in each nation it will have an indigenous growth, and assume a distinctive and peculiar character * * * No country will borrow or mechanically imitate the religion of another country; but from the depths of the life of each nation its future church will naturally grow up * * * Neither will Germany adopt the religious life of China, nor will India accept blindly that of England or of any other European country. India has, religious traditions and associations, tastes and customs, peculiarly sacred and dear to her, just as every other country has, and it is idle to expect that, she will forego these; nay she cannot do so, as they are interwoven with her very life. In common with all other nations and communities we shall embrace the Theistic worship, creed and gospel of the Future Church,—we shall acknowledge and adore the Holy One, and accept the love and service of God and man as our creed, and put our firm faith in God's almighty grace as the only means of redemption. But we shall do all this in a strictly national and Indian style. We shall see that, the Future Church is not thrust upon us, but that we independently and naturally grow into it; that it does not come to us as foreign plant but that it strikes its roots deep in the national heart of India, draws its sap from our national resources, and develops itself with all the freshness and vigour of indigenous growth." Lecture on *The Future Church.*

এখন সেবকের নিবেদন নামক পুস্তকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি আপনারা শ্রবণ করুন।

"আমরা আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আর্য্য রক্ত যতদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে, ততদিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব না। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া আমরা স্বজাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, অধর্ম্ম, দুর্নীতি পোষণ করিব।" * *

"আমরা ঈশা, মুষা, মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চিরদিন হিন্দু থাকিব। * * * ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বিরোধী; জাতিচ্যুত, বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে—সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু।"

এখন দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের তিন জন মহাপুরুষই বিশ্বজনীন সত্য ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাঁহারা জাতীয়তার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত জাতীয়তা ও প্রকৃত বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে যে বিরোধ আছে, ইহা তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই।

পিতৃপুরুষদিগের পথে অগ্রসর হইতে গেলে, বৈজিক তত্ত্ব (Law of heridity) অনুসারে উহা আমাদের সহজ হয়। পিতৃপুরুষদিগের পথ ছাড়িয়া দিলে "ইতঃভ্রষ্ট-স্ততনষ্ট।" যে সকল বিষয়ে আমাদের জাতীয় অভাব আছে, তাহা অন্য সুসভ্য জাতির নিকটে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে, অন্য সুসভ্য জাতির সাহায্যে সেই সকল অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পিতৃপুরুষদিগের সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টা, যত্ন ও সাধনের ফল আমরা যেন না হারাই। পিতৃপুরুষদিগের ধনে যেন বঞ্চিত না হই।

পিতৃপুরুষদিগের ধ্যান ও ধারণা, ব্রহ্মের সন্নিকর্ষের অনুভূতি, ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব, ধর্ম্মের এই সকল গভীর ভাব আমরা যেন না হারাই। ভারতের প্রাচীন মহর্ষি, আপনার অন্তরে এতই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়াছিলেন যে বলিলেন যে, ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ। ইহা কি সহজ কথা! উপনিষদে মহর্ষি বলিতেছেন ;—

"তমাত্মস্থং যেনুপরিপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং-শাশ্বতী নেত রেষাং।"

যে ধীর সকল তাঁহাকে আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপরের হয় না।

পরমাত্মাকে আত্মাতে দর্শন করা, ভারতবর্ষীয় আর্য্য শাস্ত্র সকলের একটী বিশেষ ভাব। উপনিষদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র এই প্রকার গভীর ভাবের শ্লোকে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরে, সে দেশবাসীগণের অনেক বিষয়ে অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নিকট ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানে অন্যান্য বিষয়ে ধর্ম্মভাব যথেষ্ট থাকিলেও, ধ্যান ও আরাধনার ভাব বড়ই অল্প।

আমরা যতই কেন বিলাতি ভাবাপন্ন হইনা, তথাচ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভাব আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী দেখুন, ইহার মধ্যে আমাদের হিন্দুত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া যে আরাধনা ও তৎপরে ধ্যান, উহা আমাদের হিন্দু ভাবই প্রকাশ করে। ধ্যান ও আরাধনা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। প্রার্থনা, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব। কিন্তু এ কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, হিন্দু ধর্ম্মে বা হিন্দুশাস্ত্রে প্রার্থনা নাই, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে আরাধনা নাই। আমাদের উপাসনাপ্রণালীতে যে সাধারণ প্রার্থনা রহিয়াছে, উহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত। এ স্থলে কেবল বিশেষ ভাবের কথা বলা হইতেছে।

তাহার পর আরও দেখুন। এই বেদী কেন? উহা কি আমাদের হিন্দু ভাব প্রকাশ করিতেছে না? সমাজমন্দিরে, আমরা কেন গির্জা ঘরের অনুকরণে পুলপিট্ খাড়া করিলাম না? তাহার পর, আরও দেখুন, দেশীয় রাগ রাগিণীতে, দেশীয় সুরে সঙ্গীত কেন? দেশীয় খোল করতাল সহকারে কীর্ত্তন কেন? বিলাতী সুরে কেন এখানে গান হয় না? এ সকলে প্রমাণ হইতেছে, দেশীয় ভাব আমাদের মজ্জাগত হইয়া আছে। আমরা উহা একেবারে ছাড়িতে পারি না।

পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক আমাদের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কোন গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। পিতার পরলোক হইলে, তিনি পিতার স্মরণচিহ্নস্বরূপ, তাঁহার পাদুকা একান্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন নিকটবর্ত্তী নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া বন্যা আসিল। তিনি ভয়ে, সপরিবারে গৃহের বাহির হইলেন। প্রবল বেগবান বন্যায় তাঁহার গৃহের সামগ্রী সকল কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তখন তাঁহার হঠাৎ

মনে পড়িল যে, তাঁহার বড় যত্নের পিতৃ-পাদুকা ঐ গৃহের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি তখন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আমার শাল, দোশালা, অন্যান্য সকল মূল্যবান সামগ্রী, এই মহা বন্যায় ভাসিয়া যায়, যাউক,কিন্তু আমার বড যত্নের সামগ্রী, পিতৃদেবের ব্যবহৃত পাদুকা আমি কোন ক্রমেই নষ্ট হইতে, ভাসিয়া যাইতে দিবনা। এই বলিয়া তিনি অতি কষ্টে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃপাদুকা বাহির করিয়া আনিলেন।

ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব হওয়াতে এ দেশে ঘোরতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে। এই মহাবন্যায় আমাদের কি থাকিবে আর কি যাইবে, জানিনা। এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? একটী বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, ঐ পিতৃভক্ত পুত্র যেমন বন্যার সময় অতি যত্নপূর্ব্বক পিতৃ-পাদুকা রক্ষা করিল. সেইরূপ যেন আমরাও, এই মহা সামাজিক বন্যার সময়ে, আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করি। পিতৃ-পুরুষগণ শাস্ত্রে ও সমাজে যাহা কিছু কল্যাণ-কর বিষয় আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই।

উপনিষদাদি আর্য্যশাস্ত্ররূপ মহা ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, তাহাতে আমাদের জন্য কি অমূল্য পারমার্থিক জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্ররূপ পবিত্র মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব, মধুর, অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব তথায় বর্ত্তমান। ভ্রাতৃগণ! ভক্তিভাজন পিতৃ-পুরুষগণের এই সব মহামূল্য ধনে বঞ্চিত হইও না।

সমুদ্রমধ্যস্থ অনেক দ্বীপে অনেক বর্ব্বর পশুতুল্য জাতি আছে। ইয়োরোপীয় খৃষ্টিয়ান সভ্যজাতীয় লোক সকল তথায় গিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন। নূতন করিয়া তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম গঠিত হইতেছে। ভালই হইতেছে। তাহাদের কিছুই ছিলনা, সুতরাং তাহাদের সকলই নূতন করিয়া সংগঠন করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা খাটিবে না। আমরা জুলু নহি। আমরা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার অধীকারী। আমাদের সমাজে, শাস্ত্রে, অনেক ভাল জিনিস আছে। আমরা পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত অনেক ভাল জিনিসের উত্তরাধিকারী। আমাদের শাস্ত্রে ও সমাজে কি অসত্য ও মন্দ কিছু নাই? আছে বই কি? যাহা মন্দ, তাহা এই মহাবন্যায় ভাসিয়া যাক্! কিন্তু যাহা ভাল, যাহা পিতৃপুরুষ-প্রদত্ত মূল্যবান সামগ্রী, তাহা একান্ত যত্ন-পূর্ব্বক রাখিয়া দেও।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য কথায় কি বুঝাইব? ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন দেখ। তাঁহার মহৎ জীবনে জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার সামঞ্জস্য দেখ। এক দিকে দেখ, তাঁহার জীবনে কেমন উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বজনীন ভাব! সমগ্র মানবজাতি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত কেমন সহানুভূতি! সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য, ইংরেজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া মূল ভাষায় অর্থাৎ হিব্রু-

ভাষায় বাইবেলের পূর্ব্বভাগ এবং গ্রীক ভাষায় উহার উত্তর ভাগ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। বাইবেল শাস্ত্র ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও প্রশস্ততা দেখিয়া ইংলণ্ডের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যীশুখৃষ্টকে একান্তচিত্তে ভক্তি করিতেন। যীশুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া Precepts of Jesus, guide to peace and happiness, নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জগতের সকল শাস্ত্র, সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি। তাঁহার হৃদয় এমনই প্রশস্ত ছিল যে, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক স্থান পাইত। তাঁহার উদার হৃদয়, সকল সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

এই তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব। আবার দেখুন, তাঁহার জাতীয় ভাব কেমন প্রবল। তিনি হিন্দুশাস্ত্রে একজন মহাপণ্ডিত। তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য কতই যত্ন, কতই পরিশ্রম করিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিলেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বজনীন সত্য প্রচারের জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাকে জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার সমাজে তিনি পুলপিট আনিলেন না, বেদী করিলেন। তথায় উপনিষদাদি জাতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। দেশীয় রাগরাগিণীতে, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে তথায় মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বজনীন সত্যকে জাতীয় আকারে প্রচার করিলেন। বিশ্বজনীন সত্যকে ভিত্তি করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাকেও জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য তিনি যাহা কিছু করিলেন, সকলই জাতীয় ভাব ও জাতীয় রুচির সহিত মিলাইয়া করিলেন। তিনি বলিতেন "আমার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি। হিন্দুশাস্ত্রের যাহা প্রকৃত তাৎপর্য্য, আমি তাহাই আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।" বিশ্বজনীন সত্য ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিদেশীয় ধর্ম্ম ও বিদেশীয় শাস্ত্র সকলের সারগ্রাহী হইয়াও, তিনি চিরদিন হিন্দুশাস্ত্রকে সম্মান করিয়াছেন, চিরদিন আপনার হিন্দুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তার কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়!

এই একটী প্রশ্ন লোকের মনে উত্থিত হইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি বিশ্বজনীন হইল, তবে আবার উহা জাতীয় কেমন করিয়া হইবে? বিশ্বজনীন অথচ জাতীয় ধর্ম্ম, এই কথাটা কি অসঙ্গতি দোষপূর্ণ হইল না? কখনই না।

দুইটী বিষয় বুঝিলেই ইহা বুঝা যায় যে, জাতীয় ধর্ম্ম ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম যে পরস্পর বিরোধী হইবেই হইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। প্রথম, মানবজাতির উৎপত্তি হইতে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইতেছে। সেই ক্রমবিকাশ, সমগ্র মানব-

জাতির সম্বন্ধে যেমন সাধারণ, সেইরূপ আবার বিশেষ বিশেষ জাতির পক্ষে বিশেষ বিকাশ। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে যে সকল বিশেষ বিকাশ, তাহাও আবার সমগ্র মানবজাতির জন্য। যাহা বিশেষ, তাহাও সকলের জন্য। জাতিগত বিশেষ উন্নতির স্রোত, সমগ্র মানবজাতির সাধারণ উন্নতিরূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। যাহার যাহা, তাহা সকলের। ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মান, ইটালিয়ান, আমেরিকান, হিন্দু,যাহার যাহা বিশেষ বিকাশ, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, কি সামাজিক কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, যাহার যাহা বিশেষ বিকাশ, তাহা সমগ্র মানবজাতির উন্নতি স্রোতকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য। সকলেই সকলের জন্য। সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এবং এইরূপে এক অসীম উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিতীয়, বিশ্বজনীন; সত্যের সাধন ও প্রচার জাতীয় আকারে হওয়া আবশ্যক। তাহা স্বাভাবিক। তাহা ভিন্ন হয় না। সত্য, বিশ্বজনীন, কিন্তু জাতিগত জীবনে উহার সাধন যেরূপ হয়, তাহা বিশেষ। ভাব, বিশ্বজনীন; কিন্তু জাতিগত জীবনে উহা যে আকার ধারণ করে, তাহা বিশেষ। এই বিশেষ ও বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। ইহাই বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য।

আমাদের বাঙ্গালীর দেহ। আমরা কাবুলি মেওয়া খাইতেছি, বিলাতি বিস্কুট খাইতেছি। কিন্তু ঐ সকল খাদ্য আমাদের বাঙ্গালী দেহই পুষ্ট করিতেছে। দেহ সম্বন্ধে আমরা কাবুলির ন্যায় অথবা ইংরেজের ন্যায় হইতেছি না। সেইরূপ বিদেশ হইতে যে সত্য, যে ভাব আমরা লাভ করিব, উহা জাতীয় আকারই ধারণ করিবে। এইরূপেই স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের সামঞ্জস্য হয়।

বিধাতার বিধানে আমরা পাশ্চাত্য জগতের সহিত সংস্রবে আসিয়াছি। ইহাতে আমাদের বিশেষ কল্যাণ হইতেছে ও হইবে। আমাদের দেশেও যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাও ইয়োরোপ ও আমেরিকা স্বীকার করিতে ও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিধাতার বিধানে, এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্মিলনে, আমাদের জাতিগত উন্নতিস্রোত, সার্ব্বভৌমিক উন্নতিরূপ মহা সমুদ্রের দিকে চলিতে থাকিবে। করুণাময় বিধাতার ইহাই ইচ্ছা।

হে জ্ঞানময়, মঙ্গলময় বিধাতা! তুমি আমাদের নিকটে তোমার সত্য প্রকাশ কর। হে প্রভো! প্রকৃত ভাবে সত্যকে দেখিতে শিক্ষা দেও। আমরা যেন একদেশদর্শী হইয়া না যাই। পূর্ণভাবে আমাদের নিকট তুমি সত্য প্রকাশ কর। এই সাকার জগতে তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই, আবার অন্তরে চৈতন্য রূপে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জন্ম সার্থক করি। হে অদ্বৈত ব্রহ্ম! এক দিকে নেতি নেতি করিয়া আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, তুমি এ সকলের কিছুই নও, এ সকলের অতীত, আবার যেন তোমাকে শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, দয়ারূপে, প্রেমরূপে, আনন্দরূপে, "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপে নিখিল বিশ্বে সর্ব্বভূতে দেখিতে পাই। তুমি বাহিরে, তুমি অন্তরে। তুমি অন্তরে জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, গুরুরূপে বর্ত্তমান। অন্তরে তোমার বাণী শ্রবণ করিয়া যেন জীবন

পথে চলিতে পারি। জীবনে ও জগতের সকল ঘটনায়, হে বিধাতঃ তোমার হস্ত দেখিতে শিক্ষা দেও। তুমি জগতের সাধারণ পিতা, সাধারণ মাতা, সাধারণ গুরু হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছ, সকলকে শিক্ষা দিতেছ, আবার বিশেষ ভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি, ও প্রত্যেক জাতিকে তোমার অনন্ত উন্নতিপথে লইয়া যাইতেছ। আমাদের এই প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ তোমারই বিশেষ কৃপা, বিশেষ বিধান। তুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের গুরু। হে গুরু কল্পতরু! তুমি আমাদিগকে সংকীর্ণতা ও অনুদারতা হইতে রক্ষা কর। আমরা একদিকে যেমন স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসিব, সেইরূপ তোমার কৃপায় যেন উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রশস্ত হৃদয়ে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিতে পারি। তোমার কৃপায় আমাদের জ্ঞানের নিকট সত্য ও ধর্ম্মের সমন্বয় হউক; তোমার কৃপায়, আমাদের হৃদয় সকল সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করুক, এবং আমাদের জীবন তোমার সহিত মিলিত হইয়া সকল মানবজাতির সহিত একীভূত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।

(অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর)

নরেন্দ্রভবনাথাদিভক্ত সম্মিলন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মাষ্টারের প্রথম দর্শন কথা বিবৃত আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিলেন, ও যাহা যাহা আদেশ করিলেন, ঐ সংখ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই সকল কথা আছে। এইবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম সমাধি দর্শন ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ও ভবনাথের সহিত প্রথম দেখা।

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারি চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন। আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্রিদিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্য বদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। একটী ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক-

ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র,* কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃ পরিপূর্ণ, চক্ষু দুটী সাতিশয় উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র তুই কি বলিস্? সংসারী লোকেরা কত কি বলে? কিন্তু দেখ্—হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র। আমি মনে করবো কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নারে অতো দূর নয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন। তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। বাঘনারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করবে।

"একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটী সাধু থাকেন, তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূ.. এইটী জেনে সকলকে নমস্কার.,' .. দিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাট আন্‌তে বনের মধ্যে গিয়েছিলো। এমন সময় একটা রব উঠলো কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।" সব্বাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালালো না, সে জানে হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব। এই বলে দাঁড়িয়ে রহিল; আর নমস্কার করে স্তব স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটী তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষত বিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চলে গেলে না? সে বল্লে, গুরুদেব যে আমায় বলে দিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীব,জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লেন যে, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে তা সত্য, কিন্তু বাবা! মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন! যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও মানতে হয়।

"শাস্ত্রে আছে আপোনারায়ণঃ—জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুরসেবার চলে আবার কোন জল আঁচান, বাসন মাজা,

* নরেন্দ্র—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

চলে। কিন্তু খাওয়া ... চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন, কিন্তু অসাধু, অভক্ত দুষ্টলোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না, মাখামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে; আবার কাহারও সঙ্গে তাহাও চলে-না। এরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, যদি দুষ্টলোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে তা হলে কি চুপ করে থাকা উচিত।

[গৃহস্থ ও তমোগুণের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমো-গুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করতে আসছে বলে উল্‌টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"একমাঠে রাখালরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। একদিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্লেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেলনা। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র পড়লেন, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ওরে তুই কেন পরের হিংসা করে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব; এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে। আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্লেন, এই মন্ত্র জপ কোরো, আর কাহারও হিংসা কোরোনা। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লেন, আমি আবার আসবো।

"এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না। যেন কেঁচোর মত হয়ে গেছে। এক দিন এক জন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে, সাপটাকে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হয়ে পড়লো— নড়েনা চড়েনা। রাখালরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চরতে আসতো, রাখালদের ভয়ে দিনের বেলায় আসত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর জীবহিংসা করে না; মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

"প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই সাপের সন্ধান

করলেন। রাখালরা বল্লে সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হলোনা। তিনি জানেন,যে মন্ত্র সে নিয়েছে, তাহা সাধন না হলে দেহ ত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে গিয়ে, তাঁর দেওয়া নাম ধরে, ডাকতে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে, গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো; ও খুব ভক্তিভাবে, প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কেমন আছিস?' সে বল্লে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন।' সাপ বল্লে 'ঠাকুর! আপনি আদেশ করেছেন,'কাহারও হিংসা করোনা'। তাই পাতাটা, ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিয়েছি।' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কিনা; তাই কাহারও উপর ক্রোধ নাই। সে একেবারেই ভুলেই গিছলো,যে রাখালরা তাকে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না। অবশ্য আরও কোন কারণ আছে, তুই ভেবে দেখ। সাপটার তখন মনে পড়লো যে রাখালরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্লে 'ঠাকুর এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তা তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না, আমার মনের কি অবস্থা,আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, তা তারা কেমন করে জানবে।' ব্রহ্মচারী বল্লেন, "ছি! তুই এত বোকা? তুই আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতে বারণ করেছি; তোকে তো ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?"

"তাই বলছি, দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, তাদের উল্‌টে অনিষ্ট করতে নাই।

"ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব-জন্তু, গাছ, পালা, ধাতু এই সব আছে। জানয়ারের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে। বাঘের মতন হিংস্র জানয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয়, এমন গাছও আছে; আবার বিষ ফল হয়, এমন গাছও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে, সাধুও আছে, অসাধুও আছে, সংসারী জীবও আছে, আবার ভক্তও আছে।

(DOCTRINE OF EQUALITY.)

"জীব চারি প্রকার—বদ্ধ জীব,মুমুক্ষুজীব, মুক্ত জীব ও নিত্য জীব। নিত্যজীব যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে আসেন জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদের শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধ জীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষু জীব; যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না। মুক্ত জীব; যাঁরা সংসারের কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ ন'ন—যেমন সাধু মহাত্মারা,যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই। আর যাঁরা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না। এরা নিত্য জীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা

করে, এরাই মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সকলে পালাতে পারে না। দু চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়। তখন জেলেরা বলে, ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশ মাছ পালাতেও পারে না, আর পালাবার চেষ্টাও করে না, বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে। মনে করে বুঝি আর কোন ভয় নাই, আর আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না জেলে হড়্ হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, আবার মনে করে যে, ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। কিন্তু জানে না যে, ঐতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধ জীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, তুমি ত চল্লে, আমার কি করে গেলে। আবার এমনি মায়া যে প্রদীপে বেশী সল্‌তে জ্বললে বলে, 'তেল পড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও'। এ দিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবোল তাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা কল্লে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না; তাই বেড়া বাঁধছি। হয়ত সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ করলে।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ।]

একজন ভক্ত। মহাশয়! এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ করতে হয়। আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

(বিশ্বাসের ফল)

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হোলো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের যে কত জোর তাতো শুনেছ।

"পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হোলো। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ্ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়লো। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

"বিভীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিয়েছিল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বল্লে, তোমার ভয় নাই তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হলো যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে, একবার দেখি। খুলে দ্যাখে যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, 'একি! শুদ্ধ রাম নাম একটী লেখা রয়েছে!' যাই অবিশ্বাস হলো অমনি ডুবে গেল।

"যার বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে, গো ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এসব হত্যা করে, তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে সে

সব ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হয়। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ কখনও করব না; তার কিছুতেই ভয় হয় না।"

(নামের মাহাত্ম্য)

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আখেরে, এ দীনে না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি, বিনাশি নারী;
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি।"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন—

"এই ছেলেটীকে দেখছো, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়; আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে, জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না।

"বেদে আছে, হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিম নীচে পড়তে থাকে। কিন্তু এত উচ্চ যে, অনেক দিন ধরে ডিম পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোক ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোক ফুটে দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সেই পাখী একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। আর উঁচুতে উঠে যায়।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভা মধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখ নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া শুনায় সব তাতেই ভাল। সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। তার কথা গুলো কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দিতে লাগল।

(মাষ্টারের প্রতি) "ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে?

মাষ্টার। হাঁ ইংরাজীতে (Logic) ন্যায় শাস্ত্র আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন,—

এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত,

যেমন; সব মানুষ মরে যাবে।
পণ্ডিতেরা মানুষ।
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।

আর এক রকম আছে বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পোঁছান। যেমন, কাকটাও কাল, (আবার) যত কাক দেখছি সবই কাল; অতএব সব কাকই কাল। কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেন না, হয় ত খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত— যেখানে বৃষ্টি দেখছি, সেই খানেই মেঘ ছিল

বা আছে। অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে, মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয়। আর এক দৃষ্টান্ত,—এই মানুষটীর ৩২টী দাঁত আছে। ও মানুষটীরও ৩২টী দাঁত আছে। আবার যে কোন মানুষ দেখছি তারই ৩২টী দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরি ৩২টী দাঁত আছে। এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রে আছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথা গুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে।]

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এ দিক ওদিক পাদচারণ করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরেই মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। দু চার জন ভক্তও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গান ছাড়া এমন মধুর গান কখনও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না! নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে।

ভক্তদের মধ্যে কাহাকে জিজ্ঞাসা করায়ে তিনি বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শোনেন নাই। অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়।

গানটী এই—

চিন্ময় মন মানুষ হরি চিদঘন নিরঞ্জন;
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত হৃদয় রঞ্জন।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশীবিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে,
পুলকে শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটী গাইবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি "কোটীশশীবিনিন্দিত" কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছিলেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কত খানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল—

হৃদি কমলাসনে দেখ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন;

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ ও স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এই বারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

প্রেমানন্দ রসে হওরে চির মগন
(চিদানন্দ রসে) (হরি প্রেমানন্দ রসে)

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি

হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয় মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকরী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল—

প্রেমানন্দ রসে, হওরে চির মগন——
(হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ]

তাহার পর দিনেও ছুটী ছিল। বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেতে মাদুর পাতা, সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ আর দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টী ছোকরা ১৯।২০ বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্য বদন, ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়াছেন। ছোক্‌রাদের সঙ্গে আনন্দের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই, ঠাকুর উচ্চ হাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐরে। আবার এসেছে!' বলিয়াই হাস্য।

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—

"দেখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারিটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিলো। তার পর দিন ঠিক চারিটার সময় এসে সেই ময়ূরটা উপস্থিত। আফিমের নেশা লেগেছিল, মৌতাত ধরেছিল, তাই আবার ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে" (হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিতো ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি এঁর দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন্ দেখিব, কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে।'

এরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফস্‌টি নাষ্টি করিতে লাগিলেন। যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এঁরই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম! সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। ইনিই কি আমার প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করিয়াছিলেন? ইনি কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী!' বলেছিলেন! ইনিই কি সাকার, নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন। ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য! ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছেন!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক এক বার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন, তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, এর একটু উমের বেশী কি না, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত

হাসি খুসি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন ২৬।২৭ হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ হনুমানের কি ভাব! ধন মান, দেহ সুখ, কিছুই চায় না। কেবল ভগবানকে চায়। যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভোলবার ছেলে নয়, সে বল্লে—

গান।

আমার কি ফলের অভাব,
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরামচন্দ্র কল্পতরু মূলে রই,
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনীগো) ও ফল গ্রাহক নাই,
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।

গান গাইতে গাইতেই আবার সেই সমাধি অবস্থা—আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিতলোচন, দেহস্থির বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা—যাহারা এই মাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিল—সকলেই একদৃষ্টি হইয়া সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সমাধি অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল, মুখ সহাস্য হইল, ইন্দ্রিয়গণ যেন আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে ফিরিতে লাগিল। ঠাকুর চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকেমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচবছরের বালক! ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন—"তোমরা দুজনে ইংরাজিতে কথা কও ও তর্ক বিচার করো আমি শুনবো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের তর্ক বিচার আর সম্ভব নয়—তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব তিনি আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জীদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজিতে তর্ক আর হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

(অন্তরঙ্গ সঙ্গে)

পাঁচটা বাজিয়াছে, ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁস পুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুর বাড়ীর এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁস পুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া 'মুখ ধুইয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'দেখ্ এখন একটু বেশী বেশী আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে—যেমন নূতন—পতি। কেমন আসবি ত? নরেন্দ্র বলিলেন, হাঁ চেষ্টা করবো। আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন,দেখ চাষারা হাটে গরু কিনিতে যায়। তারা ভাল গরু মন্দ গরু বেশ চেনে। লেজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু লেজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। এই যে নরেন্দ্রকে দেখছ, এ সেই গরুর জাত্। ভিতরে খুব তেজ আছে। এই বলিয়া ঠাকুর হাঁসিতে লাগিলেন।

"আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার। আঁট নেই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, তুমি নরেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করতে যাও; আমায় বলবে,কি রকম ছেলে। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে যখন আরুতি হইয়া গেল, চাঁদনির কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তারপর পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। কালেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না, তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বড় সাধ যে, তাঁর মুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাট মন্দিরে একটী আলো জ্বলিতেছিল। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেই রূপ দেখাইতেছিল। মাষ্টার সঙ্কুচিত ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আর কি গান হবে? ঠাকুর বলিলেন, না আজ আর গান হবে না। এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন,তবে এক কর্ম্ম করো আমি বলরামের বাড়ী কাল কলিকাতায় যাব। তুমি যেও,সেখানে গান হবে। মাষ্টার বলিলেন, যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার সঙ্গে নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?'

মাষ্টার। "আনা" এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা ভক্তি, বৈরাগ্য বা বিশ্বাস কখনও কোথায়ও দেখি নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর প্রণাম করিয়া মাষ্টার বিদায়গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাট মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) আবার যে ফিরে এলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে বড় মানুষের বাড়ী যেতে দেবে কিনা, তাই সেখানে যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো—তা কেন ? তুমি আমার নাম করবে। বলবে, তাঁর কাছে যাব, তাহলেই—কেউ আমার কাছে তোমায় নিয়ে আসবে।

মাষ্টার "যে আজ্ঞা" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভারত মাতার আক্ষেপ।

কে তোরা ডাকিলি ওরে আজিকে আমায় ?
কেন হায়! এই আবাহন ?
নিদ্রাকোলে আছি সুখে,
দহিবারে মনোদুখে
কেন সবে বৃথা মোরে কর সচেতন ?

জাগিলে তো শুধু জ্বালা শুধু হা হুতাশ!
তার চেয়ে এই নিদ্রা ভাল ;
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়
কোন ফল নাহি তায় ;
কেন এ ব্যথিত বুকে শোকানল জ্বাল' ?

আমি কি ঘুমাই সুখে ধূলি-শয্যা' পরে!
ঘুম নহে এ যে বিস্মরণ!
কি ছিনু কি হইয়াছি,
কি জীবন ধ'রে বাঁচি!
স্মরিলে সে কথা. বুকে জ্বলে হুতাশন!

'অসভ্য সুসভ্য আজি, পতিত উন্নত ;
নগ্ন আজি মণ্ডিত ভূষণে ;
আমি চির রাজরাণী,
আজি বিশ্বে ভিখারিণী!
হেন ভাগ্য বিপর্য্যয়. সহে কি জীবনে ?

তোমরা কাঁদিছ আজি ; বৃথা সে রোদন!
রোদনে কি সাধিবে উদ্ধার।
আমার মলিন বেশ,
আমার এ রুক্ষ কেশ,
রোদনে কি দূর হবে পুঞ্জ শোকভার ?

হা অবোধ! উন্নতি কি মুখের বচন ?
বৃথা কেঁদে তারে পাওয়া যায় ?
সে যে ধন সাধনার,
নহে সভা বক্তৃতার,
মৌখিক চীৎকারে কেবা পেয়েছে তাহায় ?

উন্নতি সাধিবে যদি ভোল স্বার্থজ্ঞান,
ভোল নিজ সুবিধা বিচার ;
পরার্থে বরণ করি
লও তুলে শিরোপরি
অকাতরে বলি দাও সুখ আপনার।

প্রেমমন্ত্রে আপনারে কররে দীক্ষিত,
ভুলে যাও অপ্রেম বিদ্বেষ ;
ভাই ব'লে সর্ব্বজনে
বাধ প্রীতি আলিঙ্গনে,
পুষিও না হৃদয়েতে অভিমান লেশ।

যবনে ব্রাহ্মণে মিলে কর কোলাকুলি,
এক লক্ষ্যে বাঁধ সব প্রাণ ;
ভুলি শত ভিন্ন মতে,
মাতৃ-সেবা পুণ্য ব্রতে,
আনন্দে মিলিত হও সকল সন্তান।

সত্যেরে ঢেকোনা বৃথা মিথ্যা আবরণে,
বাড়াইওনা তর্কের জঞ্জাল ;
নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞানে
চাহিয়ে হৃদয় পানে,
আপন কর্ত্তব্য ধরি চল চিরকাল।

স্বার্থ লাগি ধর্ম্মবুদ্ধি করোনা কুটিল,
রচিওনা ব্যাখ্যা অলৌকিক ;
বিবেক-নির্দ্দেশ যাহা—
প্রাণপণে সাধ তাহা,
নৈতিক সাহসে নাশি ভ্রূকুটী অলীক।

বাক্য নহে,—রক্ত চাই আত্ম-বলিদান ;
চাই—মৃত্যু, কঠোর সাধন ;
সভা নহে, প্রেম চাই ;
পারিবে কি দিতে তাই ?
পারিবে কি হেসে প্রাণ সঁপিতে আপন ?

উন্নতি কি শুধু কথা-আত্ম গুণগান ?
সভাগৃহে শূন্য করতালি ?
কত কৃচ্ছ্র তপস্যায়
সে রতনে পাওয়া যায় ;
সাধনায় দিতে হয় প্রিয় প্রাণ ডালি।

পারিবে কি এই ব্রতে সঁপিতে জীবন ?
ভেবে দেখ আপনার মনে ;
নতুবা এ আবাহন
সব বৃথা অকারণ ;
জীবন না দিলে কোথা পাইবে জীবনে ;

ওই শুন কাঁপাইয়ে আকাশ অবনী
"প্রাণ চাই" উঠে এই স্বর ;
পারিবে কি দিতে প্রাণ ?
দিতে স্বার্থে বলিদান ?
স্থির চিত্তে দেখ খুঁজে আপন অন্তর।

তা যদি না পার তবে মিছে আবাহন ;
কালনিদ্রা—এই নিদ্রা ভাল ;
জাগায়ে কাঁদায়ে মায়
কোন ফল নাহি হায় !
কেন এ ব্যথিত বুকে শোকানল জ্বাল ?

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

দেব-দূত।

পালি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের সাধারণ নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে সকল উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, উহা লইয়া সূত্র-পিটক বিরচিত হইয়াছে। সূত্রপিটকে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে অঙ্গুত্তর-নিকায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার রিচার্ড মরিস্ (Dr. Richard Morris M. A, LL. D, D. C. L) উক্ত গ্রন্থ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া লণ্ডন পালিটেক্সট্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি এই অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থের দেবদূত নামক পরিচ্ছেদের ভাবার্থ নিয়ে প্রকাশিত করিলাম। দেবশব্দের অর্থ মৃত্যুরাজ বা যম। জরা, ব্যাধি ও মরণ এই তিনটী যমের দূত।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে কোন পর্ণাবৃত শিংশপা বনে বিহার করিতেছিলেন। অনন্তর হস্তক নামক একজন জঙ্ঘাবিহারী ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন ! আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই ত ?" ভগবান্ উত্তর করিলেন, "হে বৎস ! আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, সংসারে যে সকল লোক সুখে নিদ্রালাভ করে, আমি তাহাদিগের অন্যতম।' তখন হস্তক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভদন্ত ! এখন শীতকাল, রাত্রিতে হিমপাত হইয়াছে ও অবিরত শীতল বাতাস প্রবাহিত

হইতেছে; আপনি যে ভূমিতে শায়িত ছিলেন, উহা বন্ধুর ও গোখুর দ্বারা আহত; বিরল-নিবিষ্ট পত্রসমূহ দ্বারা আপনার শয্যা বিরচিত হইয়াছে; আপনার পরিধেয় বস্ত্র কাষায়রাগরঞ্জিত, অথচ আপনি বলিতেছেন, আপনার সুখে নিদ্রা লাভ হইয়াছে ও যে সকল লোক সুখে নিদ্রালাভ করে, আপনি তাহাদিগের অন্যতম, ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

তখন ভগবান বলিলেন,"হে বৎস। মনে কর, কোন গৃহপতির গৃহ চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত; উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহার অভ্যন্তরে সুন্দর পর্য্যঙ্ক সংস্থাপিত আছে। পর্য্যঙ্কের উপরে মসৃণ উত্তরচ্ছদ এবং পর্য্যঙ্কের উভয় দিকে লোহিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত উপধান রহিয়াছে এবং গৃহের অভ্যন্তরে তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছে। হে বৎস। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি উক্ত গৃহপতি সেই গৃহে শয়িত হন, তাহা হইলে তিনি সুখে নিদ্রালাভ করিবেন কিনা?" হস্তক উত্তর করিল, "হে ভদন্ত। উক্ত গৃহপতি অবশ্য সুখে নিদ্রা যাইবেন।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে বৎস। মনে কর, উক্ত গৃহপতির কায়িক, বাচিক বা মানসিক কোন উৎকট পরিদাহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কাম বা ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে তিনি সুখে নিদ্রা যাইবেন কিনা?" হস্তক উত্তর করিল, "ভগবন্! সেই গৃহপতি কামক্রোধাদি দ্বারা দহ্যমান হইয়া কখনই সুখে নিদ্রালাভ করিতে পারিবেন না।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে বৎস! যে কামক্রোধাদি দ্বারা দগ্ধ হইয়া লোক সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, আমার সেই কামক্রোধাদি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ ও মোহ সম্পূর্ণভাবে উন্মূলিত হওয়ায় আমার অসুখের কিছু মাত্র কারণ নাই। হে বৎস! এই জন্যই বলিয়াছি, শীত রাত্রিতে, বন্ধুর ভূমিতে, পর্ণাবৃত শয্যায়, অনাবৃত দেহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।"

তদনন্তর ভগবান্ অন্যান্য ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! লোক কায়িক, বাচিক ও মানসিক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহজন্মে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না এবং পরকালে নিরয়গামী হয়।" এক সময়ে নিরয়পালগণ কোন পাপীলোককে মৃত্যুরাজের নিকট লইয়া বলিল "হে দেব। এই লোক জীবনে পিতা, মাতা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কাহারও কোন উপকার করে নাই; কুলাঙ্গারকে আপনি সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

মৃত্যুরাজ যম উক্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পুরুষ! তুমি জীবনে বহু পাপ করিয়াছ, তোমাকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তোমার নিকট যে প্রথম দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও নাই? পুরুষ উত্তর করিল "হে ধর্ম্মরাজ। আমি সেই দূত দেখিতে পাই নাই, আমার নিকট কোন দূত যায় নাই।"

যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! তুমি কি সংসারে জরা দেখিতে পাও নাই? সংসারে জীর্ণদেহ, দণ্ডপরায়ণ, খণ্ডদন্ত ও পলিতকেশ কোন স্ত্রী বা পুরুষ কি কখন ও তোমার নয়নপথে উপস্থিত হয় নাই?"

পুরুষ উত্তর করিল "হে মাননীয় যমরাজ! আমি এবংবিধ অনেক লোক দেখিয়াছি।" তখন যমরাজ বলিলেন,

"তুমি এবংবিধ জরাগ্রস্ত লোক দেখিয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসিক কল্যাণ কর্ম্মে রত হও নাই?" পুরুষ উত্তর করিল "হে ধর্ম্মরাজ! আমি কল্যাণকর্ম্ম করি নাই, আমার ভ্রম হইয়াছিল।" যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! ভ্রমবশতঃ পুণ্যকর্ম্ম কর নাই, অথচ অনেক পাপ করিয়াছ। তোমার পাপের ফল তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, মিত্র, অমিত্র, জ্ঞাতি ইত্যাদি কেহই ভোগ করিবে না; তোমার পাপের পরিণাম তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে।"

অনন্তর যমরাজ বলিলেন, "হে পুরুষ! তুমি ব্যাধি নামক দ্বিতীয় দূত এবং মরণ নামক তৃতীয় দূতকেও কি দেখিতে পাও নাই?" পুরুষ বলিল, "হে ধর্ম্মরাজ! আমি ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু উহাদের দেখিয়া কখনও মনে ভাবি নাই, আমারও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিবে। আমি অহংকার-মত্ত হইয়া সৎকার্য্য করি নাই, আমার ভ্রম হইয়াছিল।"

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। নিরয়পালগণ উক্ত ব্যক্তির দুই হস্ত, দুই পাদ, ও উরঃ-স্থল লৌহশৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ করিল। সে তথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়ায় তাহার জীবন বহির্গত হইল না। তখন নিরয়পালগণ তাহাকে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির করিয়া তাহাকে কুঠার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরে তাহারা উহাকে প্রজ্বলিত অঙ্গার পর্ব্বতের উপর সংস্থাপন করিল। অনন্তর তাহারা উহাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করিল। মহানিরয় অতি ভয়ানক:—

চতুক্কন্নো চতুদ্বারো বিভত্তো ভাগসো মিতো
অয়োপাকার পরিয়ন্তো অয়সা পটিকুজ্জিতো।
তসস অয়োময়া ভূমি জলিতা তেজসা যুতা
সমন্তা যোজনসতং ফরিত্বা তিট্ঠতি সব্বদা।

মহানিরয় চতুঃকর্ণ ও চতুর্দ্বার। উহা বহু ভাগে বিভক্ত ও অয়ঃপ্রাকার দ্বারা পরিরক্ষিত। উহা আয়োময় ভূমি শত যোজন পরিমাণ ও উহাতে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে।

যমরাজ বলিলেন, বহুলোক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই প্রকার উৎকট যন্ত্রণা অনুভব করে ও উহারা নিরয়ে অবস্থান কালে বলিয়া থাকে, "অহো আমাদের পুন-রায় মানবজন্ম-লাভ হউক, ভগবান্ বুদ্ধ সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমরা তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পাপের ক্ষয় করি; ভগবানের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আমরা জন্ম, জরা, মরণ, ব্যাধি ইত্যাদির প্রশমন করি।"

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

শিক্ষিত শ্রেণীর বর্ত্তমান অভাব।

শিক্ষা পূর্ব্বে উচ্চ জাতিতে নিবদ্ধ ছিল। এখনও উচ্চ জাতীয়েরা শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ও প্রয়াসবান্ সত্য, কিন্তু সকল জাতীয় লোকই এখন শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। ইহা ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃতি। শিক্ষিত শ্রেণী বলিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না। উচ্চ জাতীয় লোক ও নিম্ন জাতীয় ধনশালী শিক্ষিত লোক লইয়া একটী শ্রেণী। এই

শ্রেণীর আখ্যা ভদ্র। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য এই ভদ্র শ্রেণী। জমীদারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইলেও তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহেন। মধ্যম শ্রেণীর কথা বলাই উদ্দেশ্য। এই মধ্যম শ্রেণী সমাজের প্রধান অবলম্বন। ইহাদের সংখ্যা উচ্চ শ্রেণীর সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে। ইঁহাদের হাতেই সমাজের গঠন হয়। ইংরাজি শিক্ষার গুণে এই শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। ঐ শিক্ষার প্রভাবে এই শ্রেণীর চিন্তা স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনায় বুদ্ধিও শাণিত হইয়াছে। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার ও তাহার মীমাংসা বুঝিয়া লইবার শক্তি জন্মিয়াছে।

পূর্ব্বে জীবনের উদ্দেশ্য কিরূপ বর্ণিত হইত, তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপেত বলিতে পারা যায় যে, ইহ-লোক মায়াময় ও পরলোক মাত্র সত্য, এই উপদেশ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীকেই ব্যাপিয়া ফেলিয়াছিল। হয় আত্মপরিবার প্রতিপালন, না হয় পরলোকে সদ্গতি লাভ, এই দুয়ের একটী চেষ্টা লইয়া সকল শ্রেণীর লোক ব্যাপৃত থাকিত। এই দুইটীর কোনটী যে কিছুমাত্র দোষাবহ, তাহা কখনই বলি না। পরিবার প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এবং পরলোকে সদ্গতি লাভের চেষ্টাও সর্ব্ব প্রকারে প্রশংসিত। কিন্তু আমার বলিবার কথা এই যে, এই দুইটী মাত্র পর্য্যাপ্ত নহে। এই দুয়ের অন্তর লক্ষ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে। একটী ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত, এবং তাহার নিরসন লেখকের প্রার্থনা।

ঈশ্বরে ভক্তি ও জীবে দয়া, এই দুইটী উপাসকের লক্ষণ। সামাজিক লোক মাত্রেরই এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবে দয়া, এই কথাটীর অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। অতিথিকে এক মুষ্টি চাউল কি একটী পয়সা দিলে জীবে দয়া প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। এই দয়া সমাজ বন্ধনের রজ্জু, জাতি গঠনের মশলা। যে প্রকার জীবে দয়া গুণে জাতি (Nation) হয়, তাহারই উন্মেষ হইয়াছে; ইংরাজি শিক্ষার সহায়ে এই গুণের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। এক্ষণে তাহা ক্রমশ বর্দ্ধমান হওয়া আকাঙ্ক্ষিত।

যাহারা পারিবারিক কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারা সংসারী। আর যাহারা পরলোকে সদ্গতি লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত ও যাঁহারা তদ্বিষয়ে উপদেষ্টা, তাঁহারা উদাসীন। আমাদের দেশে এই দুই শ্রেণী মাত্র বর্ত্তমান। সংসারীর চেষ্টিতের সীমা আত্ম পরিবার, সুতরাং জাতি বা (Nation) এর কথা তাহার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইত না। উদাসীন সংসার প্রত্যাখ্যান করিতেন। আমরা সংসারকে আরও কিছু বিস্তৃতভাবে বুঝিতে চাই। যেমন আত্মপরিবার, আপনার জাতি (Caste), আপনার ধর্ম্ম (Religious Sect) প্রভৃতি থাক আছে, সেইরূপ নেশন (Nation) রূপ একটী থাক আছে, তাহার উন্নতি অবনতি আছে, তাহার লক্ষ্য চেষ্টা আছে, তাহার জন্ম উৎসর্গ আছে, তাহার পূজা আছে, পূজার সুফল আছে, তাহাতে সৎকর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি হইয়া থাকে। পরলোকরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট না

হইয়া নেশন (Nation) রূপ সংসারের উপকার করা যাইতে পারে। এই জাতি (Nation) কি উপাদানে গড়ে, কি প্রকারে তাহার উন্নতি হয়, তাহার উন্নতিতে কি সুখ, তাহার উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কিরূপ ও পূজায় কি ফল, এ সকল কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা নাই। সম্প্রতি জাতীয় জীবনের যেটী প্রয়োজন, তাহারই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা বহু বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত শ্রেণীর লোক কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এই সমস্যা কঠিন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সাহেবগণ বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় শিক্ষিত লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অবধি চাকুরীর অন্বেষণে ফিরে। এক হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস, ও অপর হস্তে চাকুরীর দরখাস্ত লইয়া এ দেশীয় লোক রাজদ্বারে উপনীত হয়। ইহা তাঁহাদের মতে অন্যায়। আমরাও বুঝি যে ইহা অন্যায়। কিন্তু রাজপুরুষ ও আমাদের মতের যে টুকু পার্থক্য, তাহাই এস্থলে বক্তব্য। লর্ড কার্জ্জন পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া মহীসুর রাজ্যে উপনীত হইলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ঐ কথার আলোচনা পড়িয়াছি। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন যে, আপনার রাজ্যে রাজকর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশা দেশীয় লোকের পক্ষে অসঙ্গত নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ কথা যদি মহীসুরে বলিলে অর্থযুক্ত হয়, তবে বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ইহা অর্থশূন্য হইবে কেন? যাহা হউক, রাজপুরুষগণ, অধিক কি, রাজপ্রতিনিধি যখন বলিতেছেন যে, রাজ সরকারে কর্ম্ম পাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য জীবনোপায় দেখিতে হইবে, তখন আর যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতে যাওয়া নিষ্ফল। অন্য অন্য প্রকারে শিক্ষিত শ্রেণীর লোককে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপায় দেখিতেই হইবে।

কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণী শিক্ষারই বেগধারণে অসমর্থ; অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া, ঐ ভাষায় লিখিত জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিতে এ দেশীয়ের শক্তিতে কুলাইতেছে না। এ দেশীয়ের মধ্যে বাঙ্গালীর কথাই জানি। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রথম বিঘ্ন এই যে, তাঁহার স্বাস্থ্য হানি হইতেছে। উচ্চশিক্ষার ধকল এই হীনশক্তি বাঙ্গালী দেহ সহ্য করিতে পারিতেছে না। দ্বারকানাথ মিত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় দেশের ও তাঁহার নিজ পরিবারের অনিষ্ট ঘটিয়াছে। রমেশচন্দ্র মিত্র কিঞ্চিৎ অধিক দিন বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষভাগে শরীরের অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক দিন বাঁচিয়া থাকায়, পারিবারিক অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের বড় কিছু উপকার করিবার অবসর তিনি পান নাই। অথচ ধরিতে গেলে উভয়েই আত্মজীবনে নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্য্য (office business) ব্যতীত অধিক কিছুই করিতে পারেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা কেবল নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন,

উঁহারাও দেশের দুরদৃষ্ট বশত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, ইঁহারা যে অদ্ধপথে বিচ্ছিন্ন হইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই অবস্থায় দেশের কি অনিষ্টপাত হইতেছে, ভাবিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। রাজকার্য্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামশঙ্কর সেন, কালীচরণ ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। কালীচরণ ঘোষ চাকুরী হইতে অবসর লইবার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। রামশঙ্কর ঘোষ পীড়িত হওয়ায় শেষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন। কে জানিত যে, রাজস্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষীয় কর্ম্মচারী রজনীনাথ রায় রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের আশালতার মূল ছিন্ন করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী হইতে অবসর লইয়া দুই বৎসরের মধ্যে নীরব হইলেন! আইন-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রোগগ্রস্ত বলিয়া শুনিয়াছি। মনোমোহন ঘোষ অল্প বয়সে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। যাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিলাম। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, প্রভৃতি আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। এক্ষণে যাঁহারা কোনও রকমে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান কর্ম্মক্ষম পুরুষ ছিলেন। বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও চেষ্টা তাঁহার চিন্তাশক্তির পরিচায়ক প্রমাণ। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি যে চেষ্টার বাহ্যিক কোনও নিদর্শন রাখিয়া যান নাই। বোধ হয়, স্বাস্থ্য ভঙ্গ ইহার কারণ মধ্যে গণিত হওয়া উচিত। প্যারীচরণ সরকার ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি শেষ বয়সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঁহাদিগের বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক মানসিক তেজস্বিতা রক্ষা হইয়াছে। কি প্রণালীতে ইঁহারা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যহানির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বর্ত্তমান সময়ের একটী অভাব নিবারণের পন্থা হয়।

সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে, অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের ঘটনা না লইয়া মোটের উপর বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইলে এইরূপ বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিয়া, নিরামিষোপম খাদ্য আহার করিয়া, ব্যায়ামের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনটী কারণের এক একটী স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

শিক্ষিত শ্রেণীকে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে হয় কিনা, আমরা অপর দেশের সহিত তুলনা করিবার সুবিধা পাই না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, একটী বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহার পর আমাদিগকে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে হয়। এই বিদেশীয় ভাষা শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া পুস্তক পাঠ দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। মুখে মুখে শিক্ষা করিবার কোনই সুবিধা নাই। এই ভাষার ব্যাকরণ অতি অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে ভাষা কহিবার ও লিখিবার ভুল হইলে ব্যঙ্গোক্তি করিবার লোক অনেক। এই জন্য ছাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য থাকে

ভাষা শিক্ষা। তৎপরেও সেই চর্চা চলিতে থাকে। ইহাতে জীবনের সর্ব্বোত্তম ভাগ বৃথা কাটিয়া যায়। ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও তজ্জন্য যে পরিমাণ প্রয়াস পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতিগণের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের বড় অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, সে বিষয়েও সন্দেহ মাত্র নাই। আবার ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা আমরা কম পুষ্টিকর ও অল্প পরিমিত আহার করি, তাহাও নিশ্চিত। ইহার উপর শিক্ষা করিবার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার বিষয় অনেকগুলি করিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটী বা দুইটী বাছিয়া লইবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে একবারেই ছিল না, তাহাতে প্রথমাবস্থায় বাঙ্গালী জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। একটী বা দুইটী বিষয় বাছিয়া লইবার অবকাশ যত অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, ততই মঙ্গল। ইংরাজি ভাষা ত একটী থাকিবেই, তাহার উপর আর একটী মাত্র বিষয় বাছিয়া লইবার অবকাশ না দেওয়াই প্রয়োজন। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অধিক বিষয় বাছিয়া লইতে চাহে, তাহাতে উৎসাহ দিবার প্রয়োজন তাদৃশ নাই। কেবল বিষয় বাছিয়া লওয়া ঠিক হইতেছে কিনা, সেইটুক মাত্র জানিবার জন্য একটু অবসর দিলেই যথেষ্ট।

পাসের পীড়ায় বড় ভয়ঙ্কর শ্রম। কয়েক মাস ধরিয়া ছাত্রগণ আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া পড়িবায় ব্যাপৃত হয়। পাস না পাইলে লজ্জা অপমান আছে, আবার পূর্ণ এক বৎসর পড়িতে হয়; যে বিষয়ে ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ হইয়াছে ও পাস পাওয়া গিয়াছে, বিষয়ান্তরে পাস না পাওয়াতে তাহাতেও পাস না পাওয়া গণিত হয়। এই শেষোক্ত নিয়ম বড় কঠোর। আমরা জানি, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র এ নিয়ম মানিয়া চলেন না। রাজ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কোনও কোনও শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে অনেক বিষয়ে পাস পাইতে হয়। এমন নিয়ম আছে যে পাস না পাইলে বেতন বৃদ্ধি হইবে না, কোনও কোনও স্থলে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পাসের একটী নিয়ম এই যে, কেহ একবার যে বিষয়ে পাস পাইলেন, আর সে বিষয়ে তাঁহাকে পাস পাইতে হইবে না। শুদ্ধ ইহাই নহে, কর্ম্মচারীর ইচ্ছানুসারে একটী বিষয় মাত্র এক এক বারে বাছিয়া লইয়া তাহাতে পাস পাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ করিবার প্রার্থনা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুনয়নে না দেখিতে পারেন। কিন্তু বোধ করি, নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচলনে বিশেষ বাধা বা অনিষ্ট না হইতে পারে। অর্থাৎ যে ছাত্র একবার পরীক্ষায় একটীমাত্র বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে আর একবার সেই বিষয়টীতে মাত্র পরীক্ষা দিয়া পাস পাইতে হইবে, অন্য বিষয়ে নহে; এরূপ নিয়ম করার প্রভূত উপকার দর্শিতে পারে। বোধ হয়, ইংলণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এই দুরূহ ব্যাপার স্মরণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,

ইহা আমরা মনে করি না। যদি এই নিয়মের অপব্যবহারও হয়, তথাপি তাহা, ইহা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে বাধা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

এ ত গেল কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কাজ, সুতরাং পরায়ত্ত। যাহা ছাত্রগণের নিজায়ত্ত, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি। কেন যে ছাত্রগণ পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন বা ছয় মাসের জন্য এক বা দুই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ফেলিয়া রাখে, ও পরীক্ষার সম সম কালে দিশাহারা হইয়া অনিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা স্বাস্থ্য-হানি ডাকিয়া আনে, তাহা বুঝিতে পারি না। স্কুল কলেজে অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নন। ছাত্রেরা নিজেও এ বিষয়ে মনোযোগী নহে। যাহা নিজায়ত্ত কার্য্য, তাহা যদি এ ছাত্র জীবনে শিক্ষাকালে শিক্ষা না করিলে, তবে আর তাহা কবে শিখিবে? যখন স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, এবং হায় কেন পূর্ব্বে ভাবি নাই, বুঝি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে উচ্চশিক্ষার প্রতি নিজের, পিতামাতার ও জাতিসাধারণের অননুরাগ উদ্ভব করিবার জীবন্ত ফুটন্ত দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিবে, তখন আর কিসে আত্মাদর ও সমাজ-সম্মান রক্ষা হইবে, আপনার ও দেশের উপকার হইবে?

দ্বিতীয় কারণ নিরামিষোপম আহার। বাঙ্গালীর আহার বড় পুষ্টিকর নহে। বাঙ্গালীর কার্য্যও শক্তিমান পুরুষের কার্য্যের অনুরূপ নহে। আহার ও কর্ম্ম, এই দুইটী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। বাঙ্গালীর আহারের নিমিত্ত Ministerial অর্থাৎ সেবা কার্য্যই তাহাকে সাজে; Excutive অর্থাৎ নেতৃত্ব ও বল সাপেক্ষ কার্য্যে বাঙ্গালীকে অপটু বলিয়া রাজপুরুষেরা অবজ্ঞা করেন। ছাত্র জীবনের পক্ষেও এই আহার পর্য্যাপ্ত নহে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা আলোচনার সময় ছাত্রগণের যেরূপ আহার নিয়মিত ছিল, এক্ষণে তাহারও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং পূর্ব্বের সে বুদ্ধিমত্তা এক্ষণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বুদ্ধিমত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু এই আহার শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারিতেছে না, ইহা অস্বীকার করিবেন কেমন করিয়া? মাংসবহুল আহার আমাদের দেশে চলিবে না; অর্থের অভাব, ইচ্ছার বিরোধ, এবং বোধ হয়, অনভ্যাসের নিমিত্ত উপযোগীও নহে। অধিক মাংস ভোজন করার দুর্ঘটনা হইয়াছে, এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাংসবহুল আহার কর্ত্তব্য না হইলেও, মাংসবর্জ্জিত আহারও স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচুর নহে; কিন্তু বাঙ্গালীর খাদ্য প্রায়ই মাংসবর্জ্জিত। কেহ কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া মাংস মাত্র আহার করিয়া কাটাইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও জানি। যাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় মাংস ভোজনের বিরোধী বলিয়া জানিতে পারি, তাঁহারা যে প্রয়োজনমত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপও অনুমান হয় না; কথায় তর্ক করিবার নিমিত্ত বলেন মাত্র, এইরূপ অনেক স্থলে বোধ জন্মাইয়াছে। যাহা হউক, প্রয়োজনানুরূপ মাংস ও দুগ্ধ ব্যবহার করিতে না পাওয়াতে হীন স্বাস্থ্য আরও হীন হইয়া যাইতেছে। দুগ্ধ প্রয়োজনীয়, মাংসও প্রয়োজনীয়। দুগ্ধের অভাব মাংস দ্বারা পূর্ণ করা যায় না, মাংসের অভাব

দুগ্ধের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। বিশেষত যে বহুমূত্র রোগের বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ডাক্তারেরা মাংসই পথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রোগ হইবার পূর্ব্ব হইতে মাংস ভোজনের ব্যবস্থা থাকিলে রোগবাহুল্য না হওয়ারই সম্ভাবনা। সুতরাং মাংস ভোজন বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। মাংস ভোজন পরিমিত চাই, অর্থাৎ যেমন বাঙ্গালী দুই বেলা দুগ্ধপানে অভ্যস্ত, মাংস ভোজনে ঝটিতি সেরূপ অভ্যস্ত হইতে পারে না।

তাহার পর আর একটী কথা হইতেছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহা সুজীর্ণ হইতে পায় না; কাজেই তাহাতে সম্যক উপকার হয় না। একেত পুষ্টিকর আহার সমস্ত দিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া উঠে না; তাহার উপর আবার ভুক্ত ভোজ্য সম্পূর্ণ কার্য্যকারিতা পায় না; এজন্য আহার হইতে শরীর পোষণের ব্যাঘাত জন্মে ও রোগোৎপত্তি হয়। কি প্রকারে ভুক্ত ভোজ্য জীর্ণ হইতে না পাইয়া রোগ উৎপাদন করে, তাহার বিবরণ স্বর্গীয় ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম। ডাক্তার এইরূপ বলিয়াছিলেন :—নিম্নতর বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীরা (মুনসেফ ও সবজজগণ) প্রায় বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কেহই সরকারী বাসস্থান বিনা ভাড়ায় বা ভাড়া দিয়াও পান না; এজন্য তাঁহাদের বাসস্থান, অনেক জায়গায়, স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী হয় না। কোন্ দিন বদলি হইবেন, একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিবার কথা নহে, ইত্যাদি কারণে কেহ আপন ব্যয়ে ভাল বাস-গৃহ করিতেও পারেন না। কিন্তু বাসগৃহের কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট ও ক্ষতি হয়, সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত সমস্ত দিনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার অবসর থাকে না। আদালতে বসিয়া অনবরত সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে হয়। মোকদ্দমার রায় লিখিতে হয় বাটীতে আসিয়া। সুতরাং সকাল সন্ধ্যা কোনও সময়ে অবসর থাকে না। যে কথা উপস্থিত প্রবন্ধে বিশেষ প্রাসঙ্গিক, তাহা এখনও বলা হয় নাই। স্বর্গীয় ডাক্তার বলিয়াছিলেন, আহার করিয়াই এই সকল কর্ম্মচারী (Brain work) মানসিক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক উভয়কে এক সময়েই কার্য্য করিতে হয়। পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র (organ)। একটী এইরূপ, কেহ ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, যন্ত্রের কার্য্য আপনি হইতে থাকিবে। অপরটী সেরূপ নহে, অর্থাৎ ইচ্ছা না করিলেও মনঃসংযোগ না থাকিলে তাহার কার্য্য চলে না। (Voluntary ও involuntary organ) আহারান্তে মানসিক পরিশ্রম করিতে থাকিলে মস্তিষ্কের কার্য্যের জন্য মনঃসংযোগ হেতু শক্তি (energy) সেই কার্য্যেই নিয়োজিত থাকে; পাকাশয় হইতে শক্তি অপকর্ষিত হইয়া আইসে, এজন্য পাকাশয়ের কার্য্য ভালরূপে হয় না, অর্থাৎ ভুক্ত খাদ্য ভালরূপে জীর্ণ হয় না। প্রথম প্রথম মাথা ধরিতে আরম্ভ হয়; ইহাই রোগ আরম্ভের প্রথম স্ফুট লক্ষণ। যিনি ইহা দেখিয়া সাবধান হইতে পারিলেন, তাঁহারই মঙ্গল। আর যিনি এই লক্ষণ উপেক্ষা করিলেন, রোগ তাহাকে ক্রমশ জিনিয়া বসিতে লাগিল। জীর্ণশক্তি উত্তরোত্তর হীয়মান হইয়া আসিয়া অবশেষে,

আহার দ্রব্যের শর্করাংশ জীর্ণ করিবার সামর্থ্য হারায়; তখন ঐ শর্করাংশ শরীর পোষণের সহায়তা করিতে না পারিয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া আইসে। এইরূপে তাঁহাদের বহুমূত্র রোগ জন্মে। ডাক্তারের কথায় বুঝা যায় যে, আহারান্তে পাকাশয়ের কার্য্য চলিবার নিমিত্ত মানসিক শ্রম হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমরা ইংরাজি প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আহারের পরই কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হই। শিশুকালে স্কুলে পড়িতে যাওয়া অবধি যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে আফিষাদি কর্ম্মস্থলে কেরাণিগিরি প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া পেনশন লওয়া পর্য্যন্ত, আজীবন এই নিয়মে আমরা কার্য্য করিতেছি। ডাক্তার কে ডি ঘোষের কথা সঙ্গত হইলে, এই প্রথার দোষে আমাদের শিক্ষিত সমস্ত লোককেই আজীবন আয়ুক্ষয়কর কার্য্য করিতে হয়। ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত আমরা কি করিতে পারি? যত টুকু করিতে পারি, তাহাও অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যাপক প্রথা রহিত করিবার অধিকার আমাদের হস্তে নাই। যে যে স্থলে প্রথা রহিত করা সম্ভব, তথায়ও ইহা রহিত হইবে না; অর্থাৎ দেশীয় লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন স্কুল কলেজ আফিস প্রভৃতি স্থানে এই প্রথার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে, শীতের সময় ৬টা হইতে ১২ টা ও গ্রীষ্মকালে ৫ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার সময় নির্দ্ধারণ হওয়া অসম্ভব না হইলেও, অসুবিধা, অস্বচ্ছলতা, লোকসান ইত্যাদি নানা ব্যপদেশে কেহই তাহার পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, প্রচলিত ১০ টা ৫টা কাজ করিবার প্রথা থাকাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে আমাদের জাতি সাধারণের স্বাস্থ্য হানি হইয়া যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা এই উদাসীন কর্ত্তৃপক্ষীয়ের, লাভ বা স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত তুলনা করিলে তাঁহারা কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য হইবেন না। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রথামতে আমরা প্রাতঃসন্ধ্যা এই দুই প্রসন্নকাল নিজের আয়ত্তে পাইতেছি। এই দুই সময়ের অপব্যবহার না করিয়া ১০টা ৫টা সময়ে স্কুলে পড়া ও আফিসে লেখার হেতু যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণের চেষ্টা না করিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাও কোনও অংশেই ক্ষমাযোগ্য নহে।

তৃতীয় কারণ ব্যায়ামের অভাব। ব্যায়াম বলিলে পালোয়ানের ও (gymnast) জিম্‌নাষ্টের কুস্তী বুঝায়; কিন্তু তাহা বলিতেছি না। যাহার পক্ষে যেরূপ ব্যায়াম স্বাস্থ্যকর হইবে, অনিষ্টকারী হইবে না, তাহাই প্রশস্ত ব্যায়াম; অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক, এজন্য ত্যজ্য। ভ্রমণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতিও ব্যায়াম মধ্যে গণিত। রুদ্ধদ্বার গৃহে কুস্তী বা প্রায় তাদৃশ স্থানে জিম্‌নাষ্টিক করা স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে, বোধ হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রয়োজনীয়, রুগ্নেরও শরীর ইহাতে সুস্থ থাকে। ব্যায়ামে যে শরীর ভাল থাকিয়া সবল হয়, তাহার একটী কারণ নির্ম্মল বায়ু সেবন ও অপর কারণ পেশী সঞ্চালন। যাহারা দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় রুদ্ধদ্বার গৃহে অবস্থান করিতে বাধ্য, তাহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। ছাত্রেরা ও আপিষের কেরাণীরা স্কুলে ও আফিসে বহু লোকপূর্ণ বদ্ধ গৃহে থাকিয়া মানসিক শ্রম করিতে বাধ্য। ছাত্রেরা বাটীতে আসিয়াও গৃহ মধ্যে বসিয়া

মানসিক শ্রম করিয়া থাকে। ইহাদের সকলের পক্ষেই বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রয়োজনীয়। ইহা না করিলে তাহাদের শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ক্ষুধা কমিতে থাকে, শেষে রুগ্ন হয়। প্রাতে দুই ঘণ্টা ও পরাহ্নে দুই কিম্বা এক ঘণ্টা সময় বিস্তীর্ণ বাগানে বা মাঠে বেড়াইলে, কি খেলা করিলে, কোনও রকমে শরীরটাকে বজায় রাখিতে পারা সম্ভব। প্রাতে অক্ষুধায় আহার করিয়া ভুক্তভোজ্য জীর্ণ হইবার অবসর না দিয়া, শারীরিক মানসিক শ্রমে ব্যাপৃত হইতে হইতেছে, এরূপ অবস্থায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় নির্ম্মল বায়ু সেবন শরীর রক্ষার পক্ষে যে খাদ্যের ন্যায় প্রয়োজনীয়, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে বর্ত্তমান সময়ের স্বাস্থ্যহানি রূপ দুর্দ্দশা হইতে শিক্ষিত সমাজের আত্মরক্ষা করা দুষ্কর হইবে। এই কার্য্য আমাদের আয়ত্ত, আর ইহাতে পয়সা খরচ নাই, এজন্য ইহা সহজ সাধ্য। কেবল প্রবৃত্তির অভাবেই ইহা কেহ করেন না। আর যিনি ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই হৃদগত করিতে চান না ও পারেন না।

শিক্ষিত শ্রেণীর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা ও জীবনোপায় নির্দ্ধারণ করা, এই দুইটি যুগপৎ প্রয়োজন হইয়াছে আজীবন মানসিক পরিশ্রম, বোধ করি কোনও জাতীয় লোকেই সহ্য করিতে পারে না, বাঙ্গালী কেমন করিয়া পারিবে? চাকুরীর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য বোধ হয় স্বাস্থ্যের উপযোগী। আর নিজের আয়ত্ত কার্য্য মাত্রেই ইচ্ছামত শ্রম ও বিশ্রাম সম্ভব হইতে পারে। সকল প্রকার চাষের কার্য্য এই গুণে সর্ব্বপ্রধান; আর প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা কার্য্যে এই গুণ অল্পাধিক বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কার্য্যে একদিকে যেমন শরীর রক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, অপর দিকে আর একটী উপকার সিদ্ধ হইবে। শিক্ষালাভ করিয়া কেবল চাকুরীর প্রার্থী হওয়া নিতান্ত অন্যায়। আর চাকুরীই বা কত মিলিবে? বি এ পাস করিয়া এপ্রেণ্টিস থাকিতে হইতেছে, তাহার পর ২৫ টাকা বেতনে কর্ম্ম পাইয়া ছয় বৎসর কাল একই অঙ্কে আবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। এই বেতন (Subsistance allowance) পেটভাতা বই আর কি? সুতরাং স্বাস্থ্য হানির আর কারণ খুঁজিতে হইবে কেন? কিন্তু এস্থলে মানসিক শ্রমই যে স্বাস্থ্যহানির এক মাত্র কারণ, তাহা নহে।

নানা কারণে ঐশ্বর্য্যের সহিত উচ্চ শিক্ষার সদা বর্ত্তমান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমাদের দেশে নাই। শাস্ত্রের উক্তি ও হিন্দুর ধারণা এই যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সপত্নী ও চিরবিরোধিনী। শাস্ত্রশাসিত দেশে ইহাই আজিকার সামাজিক অবস্থা। বাঙ্গালায় আজি শিক্ষা ও ঐশ্বর্য্যের অপ্রণয় দেদীপ্যমান। জাতি (Nation)ধর্ম্মানুসারিণী প্রতিভা যে দিন বাঙ্গালায় ঐশ্বর্য্যের সহিত মিলিত হইবে, সেই দিন বাঙ্গালীর সুপ্রভাত হইবে। সেই সুদিন দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। বাঙ্গালায় প্রতিভাশালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন; আর ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার শ্রেণীও বর্ত্তমান আছেন। এই দুই সম্প্রদায় ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায় হইলে মণিকাঞ্চন যোগ সিদ্ধ হয়। কিন্তু

কি কারণে বলিতে পারি না, এই মহান্ যোগের সাধনায় বাধা অনেক ও ইহার উৎপাতকারী অসুর দুর্দ্ধর্ষ। এজন্য এই যোগসাধনা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মথনাথ বসু।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২০)

মায়াবাদ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ মত এবং আমরা মায়াবাদ যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছি, তাহা আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেকে শঙ্করকে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও অন্যান্য লেখা হইতে, তাঁহার মায়াবাদটী কিরূপ, তাহা ক্রমে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। এ সংখ্যায় নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরো গুটীকতক কথা বলিতে হইতেছে; নতুবা আমরা পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় যে কথা বলিয়াছি, তাহা বিশদ হইবে না।

জ্ঞেয় (object) ভিন্ন জ্ঞানের স্থিতি সম্ভবে না। জ্ঞেয়, জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে; উহা জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেবল কার্য্যকালে উহার পৃথকৃত্ব সূচিত হয় মাত্র। জ্ঞেয়, অভিন্নভাবে জ্ঞানেতেই লুক্কায়িত থাকে;—জ্ঞানের স্বরূপই এইরূপ। বেদান্তে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞানস্বরূপই হইলেন, তবে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই জ্ঞানে, জ্ঞেয়-পদার্থরাশি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেন না, জ্ঞেয় ছাড়া, জ্ঞানের স্থিতি কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, যদি জ্ঞেয়-পদার্থরাশি, জ্ঞানেরই আত্মভূত হয় এবং জ্ঞানেতেই উদ্ভূত হওয়া নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যে সৃষ্টির প্রাক্কালে "সর্ব্বজ্ঞ" রূপে বর্ণিত হইবেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? সেই লুক্কায়িত জ্ঞেয় বহিঃপ্রকাশিত হইলে, জ্ঞানের নিজের স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। তাহাতে জ্ঞান সাকার হইয়া যায় না। এ কথা শঙ্করাচার্য্য উত্তম যুক্তি সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ:—

"আত্মনঃ স্বরূপংজ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতে, অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাস্তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে; তস্মাৎ * * তে আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে। যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানং তৎ সবিতৃপ্রকাশবদব্যাপ্তিবচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। সর্ব্বভাবানাঞ্চ তেনাবিভক্তদেশকালাকাশাদিকারণত্বাচ্চ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ ন তস্মাদন্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবিষ্যচ্চবাস্তি, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞংতদ্ব্রহ্ম।'

এই সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ; জ্ঞান আত্মা হইতে পৃথক্ নহে; উহা নিত্য। বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হইয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বৈষয়িক ঘট পটাদির জ্ঞান উৎপাদন করে, সে জ্ঞান আত্ম-জ্ঞানেরই ক্রিয়া বা বিকাশ হইলেও, মূর্খ লোকে সেই জ্ঞানকে বিকারী বা পরিণামী জ্ঞান মনে করে। কিন্তু তাহা ভুল। ব্রহ্মের জ্ঞান, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত;—ব্রহ্মস্বরূপ ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। জ্ঞেয় মাত্রেই, সেই জ্ঞানে অবিভক্তরূপে থাকায় এবং উহা অত্যন্ত সূক্ষ্মবিধায়, কোন জ্ঞেয়-বস্তুই, সেই জ্ঞান হইতে

দূরে থাকিতে পারে না;—সমস্ত জ্ঞেয়ই সেই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া, অন্য এক স্থলে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। ডাক্তার থিব এই অনুবাদ করিয়াছেন :—

"To maintain that he who possesses eternal knowledge (নিত্যজ্ঞান) capable to throw light on all objects is not all-knowing (সর্ব্বজ্ঞ) is contradictory. If his knowledge were considered non-permanent (অনিত্য), he would know sometimes and sometimes he would not know, from which it would follow indeed that he is not all-knowing. This fault is avoided is we admit Brahma's knowledge to be permanent But it may be obejected on this latter alternative, the knower cannot be designated as independent with reference to the act of knowing—Why not? we reply The sun also, although his heat and light are permanent, is nevertheless designated as independent, when we say 'he burns,' 'he gives light.' But it will again be objected that we say the sun burns or gives light with reference to some *object* to be heated or illuminated; Brahma stands before the creation, in no relation to any object of knowledge. This objection too, we reply, is not valid, for as a matter of fact we speak of the sun as an *agent*, saying,—'the sun shines,' even without reference to any object. Hence Brahma may be spoken of as an agent even without reference to any *object* of knowledge. If however an object is supposed to be required, the texts ascribing *thought* to Brahma will fit all the better. What then is that object to which the knowledge of the Lord can refer previously of the origin of the world? Name and Form (নামরূপ), we reply,—unevolved but about to be evolved."

বিষয়টী অতীব গুরুতর এবং শঙ্করের মত প্রকাশক বলিয়া, আমরা কিছু দীর্ঘ অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক ক্ষমা করিবেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষ্য এবং এই ভাষ্যানুবাদ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জ্ঞেয়—জ্ঞানেরই স্বরূপভূত; জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞেয়ের স্থিতি সিদ্ধ হইতে পারে না। সূক্ষ্ম ও অবিভক্তরূপে সমুদয় জ্ঞেয়, জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বর বলা যাইতে পারে। তাহাতে ব্রহ্মের (জ্ঞানের) স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মে সৃষ্টিস্থিতির জ্ঞান নিত্য নিয়ত বিদ্যমান আছে। এই ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়; কেননা সে জ্ঞানে সমুদয় জ্ঞেয় যুগপৎ অবিভক্ত রূপে সর্ব্বদা উপস্থিত আছে। এইরূপে, বেদান্তে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সগুণ সর্ব্বজ্ঞ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই সগুণ ব্রহ্মই গীতাতে "পরম পুরুষ" শব্দে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। কাজেই, ব্রহ্ম জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট অথচ সর্ব্বাতীত রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি সগুণরূপে জগতে প্রবিষ্ট না থাকিলে, জগতে আত্মার (Life) উদ্ভব হইতে পারিত না। অতএব কেবল কারণ রূপে দেখিতে গেলে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় (Absolute) হইলেও, যখন তাঁহাকে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধরূপে (Related) দেখা যায়, যখন তাঁহাকে কার্য্যরাশির কারণ রূপে দেখা যায়, তখনই ব্রহ্মকে "ঈশ্বর" বলা যায়। তাঁহাতে কার্য্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও, তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি বা বিচ্যুতি ঘটে না। কেননা তিনি সর্ব্বাতীত ও কেবল চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহাকে কার্য্যের "কারণ" রূপে স্বীকার করিলেই, কারণে কার্য্যের ও স্থিতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণে, কার্য্য—সূক্ষ্মরূপে, অবিভক্তরূপে,—বর্ত্তমান থাকে। অতএব কারণ রূপে তাঁহাকে স্বীকার করিলেই, সেই কারণের ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি-

সত্ত্বাদি এবং সেই কারণে কার্য্যেরও নিত্য-বিদ্যমানতা—অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নতুবা তাঁহাকে কারণই বলা যাইতে পারে না। অতএব কার্য্যের কারণ রূপে বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাতারূপে, তিনি আদি পুরুষ বা সগুণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে সগুণ না বলিয়াও পারা যায় না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ ও জীবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একথা এখন বুঝা গেল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যখন কার্য্যরাশি সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে অবিভক্তরূপে — শক্তিরূপে — বর্ত্তমান থাকে, তখনই তাহা মায়া বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম, অবিভক্ত প্রকৃতিকে ঈশ্বর ক্রমে প্রকাশিত করেন। ক্রমে ইহাই স্থূলরূপে দেখা দেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তার অনুশীলন।

সকল কথা, সকল সত্য, সকল শাস্ত্রের মূল আমি। আমিত্বের বিকাশ হইতে কথা, সত্য ও শাস্ত্র। আমিত্বের প্রসার, বিকাশ ও বিস্তৃতি ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আমি না থাকিলে আমার নিকট কিছুই নাই—সব শূন্য। আমি আছি বলিয়াই আমার নিকট সব অস্তিত্ববান।

আমি কি, আমি কে? আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইব? কত দর্শন কত ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে,—কিন্তু অকূলের কূল নির্ণয় করিতে পারে নাই। আমিত্বের উদয় এবং তিরোধান কেহ জানে না, বুঝে না—কেহ দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করে নাই, কেহ অনুভব করে নাই। সকল ইন্দ্রিয় এখানে পরাস্ত। পড়িবামাত্র মানব-শিশুর যে শ্বাস চলিতে আরম্ভ হইল—মৃত্যুর সময় সেই শ্বাস বন্ধ হইল—কে আসিল, কে যাইল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোথা হইতে আসিল, কোথায় গেল—চিরকাল মহা সমস্যাময়। কোন ব্যাখ্যা সমীচীন? কোন্ টীকা প্রত্যক্ষ সত্যমূলক? অকূলের কূল নির্ণীত হয় নাই—হইবে না,—হইবার নয়। আমিত্বের মহাবীজে অনন্তেরই মহা আভাস। তুমি বল সান্ত, সান্ত, সবই সান্ত; কিন্তু আমি অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া এই চৈতন্যময় মানব বীজের মূলে সর্ব্বত্রই কেবল অনন্তেরই আভাস পাই। আমি বলি—সবই অনন্ত,—সান্ত বা পরিমিত কিছুই নাই।

জড় বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে জড় অবিনশ্বর;—মনোবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে, চৈতন্যও অবিনশ্বর। মানুষ জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণ; সুতরাং মানুষও অবিনশ্বর। পঞ্চভৌতিক দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন, কিন্তু চৈতন্য কোথায় লুকাইল? পাখী কোন্ অদৃশ্য জগত হইতে আসিয়াছিল, কোথায় গেল, কেহই জানে না। অবিনশ্বর চৈতন্য কোন্ রাজ্যে প্রস্থান করিল, কল্পনার কথা বাদে দিলে, কেহই ঠিক বলিতে পারে না। মহাসমস্যা, মহা প্রহেলিকা। যদি বলিতে পারিত, তবে আমিত্বের সোপান অবলম্বন করিয়া অনন্তের আভাস পাওয়া যাইত না। সান্ত মানুষে, অনন্তের মহাসিন্ধু।

সান্ত মানুষে যেমন অনন্তের মহামিলন; এই সান্ত মানুষেই, তেমনি, দ্বৈতাদ্বৈতের মহা ব্যাখ্যা। আমি মাটীর পুতুল, আমি সোণার পরী। আমি যখন পাপের পথে ঘুরি, পাপ চিন্তা, পাপ আহার, পাপ পান করি, তখন আমি মাটী তুল্য —অথবা মাটী অপেক্ষাও হীন এবং নীচ। মানুষের অকার্য্য কি আছে? পাপের সংসারে মানুষকে অন্বেষণ কর, দেখিবে, পশুর পশুত্বেও তুলনায় ভাল বলিয়া বোধ হইবে। আমি সে সকল পাপের কাহিনী আর বিবৃত করিব না। পাপের সংসার —মোহের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন, সৎ, চিৎ আনন্দ সূর্য্যের প্রকাশ সেখানে নাই। সেখানে কেবল অসুর, পিশাচ, নররূপী সয়তান বাস করে। সে দ্বৈতপুরী। আমি যখন নররূপী সয়তান, তখন শ্রেয় বা বিবেক আমার নিকট প্রকাশিত হয় কি? ডুবিতে ডুবিতে এমন অন্ধকারময় প্রদেশে আসিয়াছি, যখন আর দেবধামের কোন কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তখন আমি পৃথক, তখন আমি নরক, তখন আমি দ্বিত্বে বিভোর করিতেছি। স্বর্গের বাণী কচিৎ শুনিলেও তাহা গ্রাহ্য করি না, আমি তখন অহংময়। আমি বলি, আমি চলি, আমি করি—তখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার প্রতি কথায় গরল, প্রতি পদনিক্ষেপে নরক, প্রতি কার্য্যে পাপ। এ হেন অবস্থায় আমি দ্বিত্বের রাজ্যে স্বামিত্বের বিজয় নিশান উড়াইতেছি। কিন্তু দৈব কোন ঘটনায়, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন লীলায় এই আমিত্বের কখন কখন আবার রূপান্তর হয়। যে নরহত্যায় লিপ্ত ছিল, সে কখনও আবার নরসেবায় প্রবৃত্ত; যে ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ডুবিতেছিল, সে কখনও আবার সংযমের পথে ফিরিতেছে,—যে নরকের পথে মরিতেছিল, সে কখনও আবার স্বর্গের অন্বেষণ করিতেছে। মৃত্যু সদা এই সংসারে বিচরণ করিয়া মোহের জাল ছিন্ন করিতেছে— মানুষকে যেন সদা সতর্ক করিতেছে। মানুষ একদিন, দশ দিন, এক বৎসর, বা দশ বিশ বৎসর ভুলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল ভুলিয়া থাকিতে পারে না। ভুলিতে চায় সে, কিন্তু তবুও পারে না। কে যেন সদা তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। পতনের পর উত্থান হইবেই হইবে,—কেহ চিরপতিত থাকিতে পারে না। দ্বৈতের ভিতরে অদ্বৈতের মহাপ্রকাশ।

দ্বিজত্ব পায় নাই, পুনর্জন্ম হয় নাই, এই সংসারে এমন মানুষের কল্পনা করা যায় না। জগাই মাধাই নবদ্বীপের জঙ্গলে দস্যুগিরি করিয়া ফিরিত হঠাৎ অদ্বৈতের প্রকাশে রূপান্তরিত; বাল্মীকি নরহত্যা করিয়া অরণ্যে জীবন কাটাইতেন, অদ্বৈতের আবির্ভাবে তিনি হঠাৎ মহা কবি। এক সময়ের সল, পল হইলেন; এক সময়ের আগষ্টাইন, সেণ্ট হইলেন। এক সময়ের গর্ব্বিত নিমাই পণ্ডিত, সময়ান্তরে প্রেম ভক্তিতে নমিত শ্রীচৈতন্য; এক সময়ে যিনি সূত্রধরের পুত্র যিশু, অন্য সময়ে তিনি মানবের উদ্ধারকর্ত্তা খ্রীষ্ট। মহম্মদ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, স্বর্গের আলোক হঠাৎ তাঁহার মস্তকে অবতীর্ণ হইল। শ্রীচৈতন্য কখনও কখনও বলিতেন, 'মুই সেই;' খ্রীষ্ট বলিতেন, "I and my father are one,—" এ কোন্ অবস্থায়? দ্বৈতের রাজ্যে চৈতন্য এবং খ্রীষ্ট শচী ও মেরীনন্দন; কিন্তু অদ্বৈতের রাজ্যে উভয়েই আত্মহারা আত্ম

একটা কিছু। আমি, আমি, আমি—মাটীর পুতুল, পাপের কীট; সময়ান্তরে এই আমি, স্বর্গের পরী, সোণার চাঁদ। আমি কখন শুধু আমিই, আবার কখনও যেন আর এক রাজ্যের জীব। আমি দ্বৈত, পাপের পথে; আমি অদ্বৈত—পুণ্য বা স্বর্গের পথে। আমি কে? আমার ভিতরে যখন পাপ কিল-বিল করিতেছে,—ইন্দ্রিয় বা রিপুর তাড়নায় যখন আমি অস্থির, তখন আমি স্বর্গভ্রষ্ট, দেবত্বভ্রষ্ট, অসুর; আমি তখন পৃথক। এই আমার ভিতরে যখন পুণ্যের আবির্ভাব, সংযমের কশাঘাতে যখন মোহাসক্তির বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন, আমি যখন ধীর এবং স্থির—যখন দয়া, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান ও সেবায় নিষ্কাম মহাযোগী, তখন আমি কে? তখন আমি চিতের অংশ; অংশ নই, আমিত্ব তখন চিন্ময়ত্বে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—তখন অদ্বৈত শক্তি-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিতেছে; পৃথিবীর দ্বৈত অসুরের বিনাশ সাধন হইয়াছে।

কাল অনবরত মানুষের মস্তকে কিছু চাপাইয়া যাইতেছে। সময় কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না; কিন্তু ইহা সকলেই জানে, সময় কিছু না কিছু মানুষকে দিয়া যাইতেছে। সময় দিয়া যাইতেছে বলিয়াই মানুষ অতীত বংশের সঞ্চিত সত্য জ্ঞান পুণ্য রাশির উত্তরাধিকারী। বংশ পরম্পরায়, কত জ্ঞান, কত ভাব, কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা মানুষের মস্তকে চাপিতেছে। কালের সংগ্রাম বড় ভীষণ সংগ্রাম। মানুষ মায়া মোহের অধীন হইয়া মজিয়া থাকিতে চাহিলেও, সময় তাহা দিতেছে না। সময়—বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বার্দ্ধক্য আনিতেছে। মানুষ ইচ্ছা বা চেষ্টা না করিলেও, সময় তাহার মস্তকে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা চাপাইয়া দিতেছে। সময়ের পীড়নে মানুষের জ্ঞান, পুণ্য ভাব, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও রিপু নিস্তেজ হইতেছে, মস্তিষ্ক শিথিল হইতেছে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইতেছে, সে ক্রমে ক্রমে বলবীর্য্য, ক্রমে ক্রমে শক্তি সৌন্দর্য্য, ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি সংসারাসক্তি হারাইতেছে—সে যেন দিন দিন কেমন হইতেছে। মানুষের সাধ ও ইচ্ছা ছিল অনেক—কিন্তু হায়, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতে, সে সাধ মিটিতে না মিটিতেই চিত্ত নিস্তেজ, ইন্দ্রিয় শ্লথ, অঙ্গ পরি-ম্লান হইয়া আসিতেছে। ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, তাহার বাসনা, তাহার কামনা, তাহার আসক্তি, তাহার পাপানুরাগ,—কি জানি কেন, কমিয়া আসিতেছে। অপূর্ণ পিপাসা, কি জানি কেন, অপনা আপনি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে আগে কত বাক্‌যুদ্ধ করিত, এখন সহস্রবার উত্তেজনা করিলেও একটী কথাও বলিতে চায় না; পরনিন্দায় তাহার কত উল্লাস ছিল, এখন তাহার উত্তেজনা করিলেও কাহারও নিন্দা করিতে সে চায় না; সে আগে কোন মানুষের ভাল দেখিতে পারিত না, হিংসা বিদ্বেষে জর্জ্জ-রিত ছিল, এখন সে সকলের উন্নতি দেখিলে কত উল্লসিত হয়;—সে আগে কাম ক্রোধ লোভের জন্য না করিত, এমন কাজ নাই; এখন সব ঝটিকা যেন থামিয়া আসিতেছে,—দিন দিন সে আসক্তিহীন, কামনাহীন, বাসনা-রহিত—কি জানি কেমন এক প্রকার কোন্ রাজ্যের লোক হইয়াছে। তুমি তাহার সহস্র নিন্দা কর, সে ফিরিয়াও চাহে না, তুমি তাহার কত অনিষ্ট করিতেছ,

সে একবারও তাকায় না;—সে দিন দিন যেন কেমন হইতেছে। দেবদূত সময়, মানুষকে, ঘটনা, অবস্থা, শোক দুঃখের ভিতর ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিয়া এমন একটা অবস্থায় শেষে উপস্থিত করে, পূর্ব্বের মানুষ যেন আর নাই। পূর্ব্বের মানুষকে অন্বেষণ কর, আর এ সংসারে খুঁজিয়া পাইবে না। বাল্যে যে ছিল, যৌবনে সে নাই; যৌবনে যে ছিল, বার্দ্ধক্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক অবস্থায় মৃত্যু, অন্য অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম, সংসারের নিত্য ঘটনা। নবজীবন লাভ করিতে করিতে, শেষে, বার্দ্ধক্যে আমিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইতেছে,—ইচ্ছায় ইচ্ছার মিলন হইতেছে—এক মহতী ইচ্ছা তাঁহাকে যেন পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। স্বতন্ত্র মানুষ মরিয়া গিয়াছে, চিৎরাজ্যে অদ্বৈতের উদয় হইয়াছে। বন্ধু, তুমি কি বল?

বয়স করে কি?—বয়স শোক দুঃখের শীতল বারি সিঞ্চনে আসক্তির প্রজ্বলিত আগুন নির্ব্বাণ করে। এই সংসার যেন শিক্ষালয়। কর্ম্মবন্ধনে ফেলিয়া, খাটাইয়া, কোন্ মহামায়া যেন মানুষকে নির্ব্বাণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে কেবল কাজ, কেবল কর্ম্ম। মানুষ অবিরত খাটিতেছে, ছুটিতেছে, একটুও বিরাম নাই। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কত খাটুনী, ঘর বাড়ী পরিবারের জন্য কত খাটুনী, সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কত খাটুনী। খাটিতে খাটিতে মানুষ পরিশ্রান্ত; তবুও খাটুনির বিরাম নাই। দ্বৈত অবস্থায় কর্ম্ম বন্ধন মহা বন্ধন,—এই বন্ধন-মুক্তি না হইলে আসক্তির রজ্জু ছিন্ন হয় না। অমুক অবস্থায়, এইরূপে—একটু ভালবাসিলাম, তৃপ্তি নাই; আরো বাসিলাম, তবুও তৃপ্তি নাই। একটু জ্ঞান চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি নাই। আর একটু চর্চ্চা করিলাম, তৃপ্তি কিছুতেই মিলিল না। ক্রমাগত হাটিতে, ছুটিতে খাটিতে লাগিলাম। অনন্তের পথে অনন্ত খাটুনি। যাইতে যাইতে, খাটিতে খাটিতে—শেষে, অবশেষে, হায় একি তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিলাম? পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধুর ভালবাসার পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, এক অনন্ত প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত। জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে করিতে, শেষে, এক অকূল জ্ঞান-সাগরে আসিয়া উপনীত। মনুষ্যত্বের পথে হাটিতে হাটিতে, শেষে, মানুষ দেবত্বে উপনীত। বয়সের পরিপক্কতার সহিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের পরিপক্কতা উপস্থিত। অসম্পূর্ণতা—পাপ, মোহ, আবিলতা ঘুচিতে ঘুচিতে, শেষে পূর্ণত্বের দিকে অভিযান। তবুও যদি তুমি এহেন মানুষকে দ্বৈত পদবীতে বসাইতে চাও, আমি নাচার। বৃদ্ধের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়াছে,—চিন্ময়ত্বে তাহার সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল রিপু, সকল ইন্দ্রিয় নির্ব্বাপিত;—সে এখন অদ্বৈতের ভিতরে সুষুপ্ত। ইহাকে মানুষেরা না বুঝিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত করে! হায়, না বুঝিয়া কত ক্রন্দন, কত হাহাকার করে!! আমি বলি, দ্বৈত মানুষ এখন অদ্বৈত সিন্ধুতে নিমগ্ন। মহা যোগ, মহা সমাধি, মহামিলন। পিতা পৃথক, পুত্রও পৃথক,—পিতার রাজ্য, সৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কত বিপথে ঘুরিল, এখন আবার পুত্র পিতার চরণতলে উপস্থিত,—এখন পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে; এক ইচ্ছা, এক জ্ঞান, এক তত্ত্ব, এক সত্তা, এক ধর্ম্মে একাকার। এখন, এহেন অবস্থায়ও, যে পার্থক্য দেখে, সে গভীর সৃষ্টি-রহস্য মোটেই বুঝে নাই।

বিশ্ব-বোধ, ভোজের বাজি, লীলার বুদ্বুদ, চক্ষের ভেল্কি, উহা কিছুই নয়, উহা কিছুই নয়। পাপ-বোধের পরও আমি পাপের পথে চিরকাল ঘুরিব, মরিব, পচিব, এ অধিকার আমার মোটেই নাই। দশ বৎসর, নয় বিশ ত্রিশ বৎসর। একজন আমার পশ্চাতে লাগিয়া আছেন, যিনি অনবরত লাগাম টানিয়া ধরিতেছেন। সাধ্য কি আমার যে আমি ক্রমাগত মরণের পথে চলিব? আমার শোণিত অবিরত শিরায় শিরায় চলিতেছে, আমার সাধ্য নাই, রোধ; করি আমার চক্ষের পলক নিমেষে নিমেষে পড়িতেছে,আমার সাধ্য নাই থামাই; পাকস্থলীতে ভুক্ত আহারের হজম হইতেছে, সাধ্য নাই, কর্তৃত্ব করি; আমার স্নায়ু সকল অবিরত বিদ্যুতের ন্যায় নানা বার্ত্তা মস্তিষ্কে বহন করিতেছে, সাধ্য নাই, আমি রোধ করি। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে আমার কান্না পায়, বিপদ দেখিলে ভয় আসে, সাধ্য নাই আমি রোধ করি। আমি কি পারি, আমি কি বা করি? দেখিতে চাই একটা, দেখি আর একটা; করিতে চাই একটা, করিয়া বসি আর একটা। আমার বুকের ভিতরে কে যেন অনবরত কেমন একটা স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমি ত কিছুতেই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সংসার আমাকে কিনিতে চাহিল, আমি বিক্রীত হইলাম না। পাপ চিরদাসত্বে আমাকে উৎসর্গ করিতে চাহিল, আমি অনুৎসর্গই রহিলাম;—ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, আমাকে এটা সেটা ধরাইয়া মজাইয়া রাখিতে চাহিল, আমি মজিতে পারিলাম কই? কে যেন আমাকে সদা 'কেমন একরূপ করিতে চাহিতেছে। তোমরা, সমস্ত সংসার, চাও একরূপ করিতে, তিনি চান আর একরূপ করিতে! আমি কি করিব বল, আমার ক্ষমতা কোথায় যে ফিরি? আমার অসার আমিত্ব, অক্ষম স্বামিত্ব। যিনি আমাকে ধরিয়াছেন, তিনি তোমাকে বা তাঁহাকে কি ভুলিয়া রহিয়াছেন? না—তাহা অসম্ভব। তিনি তোমাকে তুমিত্বে, আমাকে আমিত্বে, তাহাকে তিনিত্বেই লইয়া যাইতেছেন। মানুষ কত কোটী বৎসর চেষ্টা করিল, দশ জনকেও মিলাইতে পারিল কি?—একরূপ করিতে পারিল কি? বিধান্ নহে তাহা নয়। প্রতি বৃক্ষের সহস্র পাতা সহস্র প্রকার, মানব পরিবারের কোটী সন্তান, কোটী প্রকার। প্রতি বস্তু বা জীবই বিশেষত্বে পূর্ণ; কাহাকে কে উপেক্ষা করিবে? এইরূপ যদি না হইত, অনন্তের আভাস কেহ পাইত না। অনন্তের আভাস দিবার জন্য কে যেন এইরূপ বিধান করিতেছেন। আমি অনন্তের ছেলে, অনন্তের বিন্দু ধরিয়াই, অনন্তের আদেশে অনন্তের পথে চলিলাম; কাহারও সাধ্য হইল না, আমাকে বাঁধিয়া রাখে? তুমি বল, এটা কর, সেটা কর;—আমি তোমার প্রচারিত পথে যাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না;—কেননা, আমার শক্তি নাই, আমি শক্তিহারা জড়ভরত। বৃথা আমাকে তিরস্কার কেন কর ভাই? কত চিকিৎসক এ জগতে আছে, কিন্তু প্রতিদিন কোটী কোটী লোকের শরীরান্ত হইতেছে, কে রাখিতে পারে? ঈশার ঘাতকের হাতের মৃত্যু, শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রে পতন—অপরিহার্য্য ঘটনা। রাজা মরিতেছেন, প্রজা মরিতেছেন, মহাজ্ঞানী মরিতেছেন, নিতান্ত মরিয়া যে, সেও

মরিতেছে। বিধান স্বতন্ত্র কি ? এক সূর্য্য এক চন্দ্র সকলকে আলোক প্রদান করে, এক বায়ু সকলকে রক্ষা করে, এক জল সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে ;—বিধান স্বতন্ত্র কি ? কেহ স্বর্ণপাত্রে, কেহ বা গণ্ডূষে জল পান করে, তৃষ্ণা নিবারণ দুয়েরই হয়। বিধান, এক ভিন্ন দুই নয়, প্রতি এক ভিন্ন বহু নয়,—পাত্রানুসারে আলোক, বায়ু ও জলকে পৃথকরূপ দেখাইলেও, তাহা একই আলো, বায়ু ও জল। ভেল্কি বা ভোজের বাজি দেখিয়া যে ভোলে, বৃথা যে অহঙ্কারে ফোলে, প্রকৃতি-তত্ত্ব সে মোটেই বুঝে নাই।

মূল কথা, আমি, তুমি, তিনি—সকলেই এক স্থানে পৃথক পৃথক, আবার আর এক স্থানে একাকার। জীবনে রূপান্তর, মরণে একাকার ; অথবা সীমায় রূপান্তর, অসীমে একাকার। কত নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া কত নামে পরিচিত হইল, কিন্তু যখন বঙ্গ উপসাগরে মিলিল, তখন সব একাকার। ভেদ কোথায়, বন্ধু বলত ? আমার জীবন-ইতিহাসেও আমার কতরূপ, কত বিভিন্ন প্রকৃতি,—কখন আমি অসুর, কখনও সুর, কখন দস্যু, কখনও দেবতা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে—যখন মরণের পথে পাপ সকল নির্ব্বাণ, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় বা রিপু সকল নিস্তেজ, তখন ক্রমে ক্রমে স্বামিত্ব ও আমিত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমাকে পূর্ণ রূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। একটী, একটী, একটী করিয়া যখন পাপ বলিদান হইতে লাগিল, তখন শত দিক হইতে শত প্রকারে পুণ্যের অভ্যুদয় হইতে লাগিল; শেষে একদিন জগত বিস্ময়ে দেখিল, "আমিত্ব" বলিয়া যে একটা দিগ্বিজয়ী অসুর ছিল, সেটা কোন্ নির্ব্বাণ পুরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেখানে এক পুণ্যময় দেবতার লীলা প্রকটিত হইয়াছে; দেখিল, দেবাসুর সংগ্রামে এক মহাশক্তির জয় হইয়াছে। তখন বহু লোকে কেবল সেই শক্তিরই জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। হায়, আত্মপ্রশংসা ভুলিয়া কবে সব মানুষ সেই মহা শক্তির—সেই অদ্বৈত শক্তির জয় ঘোষণা করিতে রত হইবে ! শক্তি কি আর আছে ? এক শক্তি—পূর্ণ শক্তি—সকল, সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তাই ভক্তির সহিত, আকাশ কাঁপাইয়া বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" দ্বৈতজ্ঞান কেবল ভোজের বাজি—অদ্বৈতের প্রকট লীলা মাত্র, তাই বল, এক শক্তি, এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান ;—বল—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

কর্ম্মফল ও করুণাবাদ।

আজকাল যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া উদার ভাবে আলোচনা করিতে লোকের যেন একটু প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না ; সে সময়ে একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও ধর্ম্ম চর্চ্চা বড় একটা দেখা যাইত না। তখন কার ব্রাহ্মসমাজও কতকগুলি সংকীর্ণ মত বিশ্বাস লইয়া নাড়া চাড়া করিতেন ; সুতরাং দেশের বা বিদেশের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাবার্ত্তা, মত বিশ্বাসে দৃক্‌পাত করিতেন না।

বাল্যকালে দেখিয়াছি, পিতা ঠাকুরকে হাতের লেখা একখানি ভগবদ্গীতা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। এখন সেই গীতা-গ্রন্থ হাটে মাঠে ছড়াছড়ি

দেখিতে পাওয়া যায়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সমস্ত ভাষায় ব্যাখ্যাদি সহত বিস্তর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেই, তদ্ভিন্ন ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহেও বহুতর সংস্করণ প্রচারিত; শুধু প্রচারিত নয়, ঐ সকল দেশের লোক নিয়মিতরূপে গীতা অধ্যয়ন করতঃ উহার সম্যক মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছেন। হলণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগরে গীতানুশীলনের জন্য রীতিমত একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে,তাহার নাম"গীতা সমাজ''।

উক্ত প্রকারে ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করায় খ্রীষ্টান জগতের এতকালের পোষিত ধর্ম্মমত যেন টল্‌টলায়মান বলিয়া বোধ হয়। জন্মজন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদ ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিকড় গাড়িবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। * বাস্তবিক জন্মজন্মান্তর বাদ গীতার ভিত্তি; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে গীতার ভিতর প্রবেশ করিতে গেলে কর্ম্মফলের দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে দণ্ড-পুরস্কার ভোগ সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের দেশে একজন মাত্র ঐ মতটী বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নববিধান শাখার বিখ্যাত উপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্গৌরগোবিন্দ রায় মহোদয় যে সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র, তাহাতেই জন্মান্তর সম্বন্ধীয় মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ পণ্ডিত, তাঁহার যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান ও গবেষণা, তাহাতে তাঁহার কথার উপর কথা কহা আমাদের মত মূর্খের কিছুতেই সাজে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না যে, শঙ্কর, শ্রীধরাদি মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্ম-বীরগণের মধ্যে কেহই উক্ত মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই; বরং সর্ব্বতো-ভাবে উহার পোষকতা করিয়াই গিয়াছেন।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে ছোট বড় যে কত প্রকারের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, ঐ সমস্ত দলের লোকসমূহ প্রায়ই শিক্ষিত ভদ্র লোক। কতকগুলি পুরাতন মুমূর্ষু সম্প্রদায়, যাহা এ যাবৎ নিম্নশ্রেণীর লোকে পূর্ণ ছিল, তাহাও, কতক ভদ্র লোকদিগের দ্বারা পুনর্জীবিত হইয়া নূতন উদ্যমের

* জন্মজন্মান্তরবাদ যে পাশ্চাত্য ভূমে এই প্রথম উপস্থিত, একথা বলা যায় না, বহুপূর্ব্বে পিথাগোরাস্ কর্তৃক উহা প্রচারিত হয়। তদনন্তর প্রাথমিক খ্রীষ্টানগণও উহা স্বীকার করিতেন। বাইবেলের স্থানে স্থানে উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে, যথা যোব্ এক স্থলে বলিতেছেন,—'উলঙ্গ মাতৃগর্ভ হইতে আসিয়াছি, পুনরায় উলঙ্গ তথায় গমন করিব।' (Naked have I come out of my mother's womb, and naked shall I return thereto'—Job)যিশু নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি ইলাইয়াস নহি, ইলাইয়াস জন-দি ব্যাপটিস্ট্ রূপে এবার আসিয়াছেন।" জনৈক জন্মান্ধের বিষয়ে প্রশ্ন করাতেও তিনি এ প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, যাহাতে সহজে বুঝা যায় যে,পূর্ব্ব জন্মকৃত অপরাধ জন্য অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ অসম্ভব নয়। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, উচ্চ শ্রেণীর সাধুগণ ভগবানের আদেশে তাঁহার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিধান প্রচারার্থ বারম্বার পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কেবল সাধুগণই আসেন, অসাধুগণকে একেবারেই আসিতে হয় না, এ কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হয়।

সহিত জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহা বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সকল সম্প্রদায়ের জন্মজন্মান্তর সম্বন্ধে এক মত। ঐ পুরাতন পরিত্যক্ত বিশ্বাসটী স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন। যাঁহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত বিশ্বাস লইয়া মাথা ঘামাইতে আদবেই চাহেন না, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চোপাধিধারী ঘোর দুনিয়াদার ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারাও জন্মজন্মান্তর বাদ সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রচারিত কর্ম্মফল ও জন্মজন্মান্তর সম্বন্ধীয় মত বিশ্বাসটুকু যে নেহাত পোড়াইয়া ফেলিবার জিনিস, এ প্রকার বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। নব্যভারতে ইহার বিরুদ্ধে দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন আলোক পাওয়া যায় নাই। আমাদের মত লোকের বিদ্যাবুদ্ধি তত বেশী নয় যে, অত বড় একটা গুরুতর বিষয়ে ওরূপ দুই চারিটা ভাসা-ভাসা কথাতে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। দুর্ভাগ্যের বিষয় ও সম্বন্ধে আর কোন বিজ্ঞ ভ্রাতা স্বপক্ষতা বা বিপক্ষতা অবলম্বন করতঃ কোন রূপ আলোচনা করিলেন না। যাহা হউক, মতটী বিজ্ঞানের ছুরিকায় ব্যবচ্ছিন্ন হইলে কিরূপ দাঁড়ায়, সে বিষয়ে আলোচনা করিকরিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বপক্ষীয় পণ্ডিতবর্গ * যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন, তাহাতে ত আমাদের বিলক্ষণ ধাঁদা লাগিবারই কথা। এজন্য কোন প্রকার তর্কের কথা তুলিতে ভয় হয়। তবে উক্ত ধীমান ব্যক্তিগণের মধ্যে, যাঁহারা কর্ম্মফলকে চূড়ান্ত সাব্যস্ত করিয়া দয়াময়ের করুণাবাদকে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিবার ইচ্ছায় নিজের জিজ্ঞাস্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বাল্যকালে একদল পণ্ডিতের কথা শুনিতাম, যাঁহাদের মতে ঘড়ি নির্ম্মাতার ঘড়ির মত, বহুকাল হইল, ঈশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়া এখন নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্ম্মা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহার সহিত আর তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, এখন ইহা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মে চলিতেছে, কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না। উক্তরূপ পণ্ডিত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং ঐ মত সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের আর মীমাংসা হইল না। কিন্তু আধুনিক কর্ম্মফলবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, উপরোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসী দলের সঙ্গে তাঁহাদের ত কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা জগদীশ্বর সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন? কি কিছুদিন দাপটের সহিত শাসনকার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? কিম্বা

* পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন যে, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা বেশী প্রমাণ আর কি চাই? পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ত উহা স্পষ্ট প্রচার করিতেন।

বার্দ্ধক্য বশতঃ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে পদচ্যুত হইয়াছেন, না কর্ম্মক্ষম থাকা সত্বেও ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের নিয়ম জারি করতঃ তাঁহাকে পেন্‌সেন লইতে বাধ্য করা হইয়াছে? ইহাই এ অধীনের জিজ্ঞাস্য।

অনেক সাধু মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি, ঈশ্বর প্রত্যেক অণুর প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া না থাকিলে বিশ্ব এখনই লোপ পাইত। তিনি দয়াময়, তাঁহার করুণাতেই বিশ্ব সংসার চলিতেছে, তাঁহার দয়া ব্যতীত কোন জীব তিলেকের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। নানা দেশের নানা মহাপুরুষ এবং নানা শাস্ত্রে একমুখে তাঁহার দয়া, প্রেম প্রভৃতি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এখন কি বুঝিতে হইবে যে, সে সকল বাতুলের প্রলাপ মাত্র? আমাদিগকে এতকাল পরে কি এই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, নিরেট কাজ ভিন্ন ভগবানে ভক্তি শ্রদ্ধা বা তাঁহার উপাসনা প্রার্থনাতে কোন ফল হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন কালের ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে বিপন্ন, পাপাচ্ছন্ন, অনুতপ্ত জীবনের সান্ত্বনার জন্য যে সকল ভগবৎকৃপার দৃষ্টান্ত উদাহরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সে গুলি কি কেবল কল্পনা-প্রসূত স্তোক বাক্য মাত্র?

কর্ম্মফলবাদীদিগের পুরাণাদি হইতে দুটী আখ্যায়িকা এখানে দিতেছি, পাঠক দেখুন, এগুলি কেমন মিষ্ট ও আশাপ্রদ। এ সব কি নিতান্তই ছেলে ভুলান গল্প?—কোন ব্রাহ্মণ নিয়ত ভগবানের ধ্যানে রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু তাঁহার অন্ন কষ্ট অতীব তীব্র। দুই এক দিন উপবাসের পর এক দিন আহার জুটিয়া থাকে। একদা নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারা বিধাতাপুরুষের নিকট এজন্য আবেদন পাঠাইলেন। উত্তর এই আসিল যে, পূর্ব্বজন্মেও তিনি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলেন, দান খয়রাত বড় কিছু করেন নাই, কাজেই তাঁহার জমা পুঁজি বেশী নাই; সামান্য যাহা কিছু আছে, তাহাই হিসাব করিয়া কেবল মাত্র প্রাণধারণ জন্য দুই এক দিন অন্তর দেওয়া হইতেছে। যতদিন তাঁহার আয়ু, তাহাতে প্রত্যহ দিলে কুলাইতে পারা যাইবে না। উত্তর শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ভগবানকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ওরূপ কিস্তিবন্দির আর প্রয়োজন নাই, যাহা কিছু জমা পুঁজি বাকী আছে, একেবারে দেওয়া হউক; তার পর তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে। ভগবান তাহাতেই সম্মত হইয়া একেবারে সমস্ত পাঠাইয়া দিলেন। সেই প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যাদি পাইয়া সাত্বিক ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত নিরন্ন দীন দুঃখীদিগকে এক দিন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দ্বারা হঠাৎ এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায়, তদ্বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা সমস্ত শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, তাহার রাজ্যে এরূপ সাধু ব্রাহ্মণকে ঐ প্রকারে উপবাসী থাকিতে হয়; এবং সেই দিন হইতে রাজভাণ্ডার হইতে তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। এখন এখানে দেখিতে হইবে যে, কর্ম্মফলবাদীদের মতে এ জন্মের কর্ম্মফল এজন্মে পাওয়া যায় না, খাতায় জমা খরচ হইয়া জন্মান্তরে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভগবান দয়া করিয়া বিশেষ কারণে যে নিয়মের ব্যতিচার করিয়া নগদ নগদ

হিসাব মিটাইলেন। তাহা হইলে আর তিনি পেন্‌শন প্রাপ্ত বা বার্দ্ধক্য বশতঃ অন্ধ পঙ্গু হইয়া কাজের বাহির হইলেন কি প্রকারে? তাঁহার দয়া ত বিশেষ কাজ করিল। এটীত গেল জড় জগতের প্রয়োজনাভাব মোচন সম্বন্ধে; দ্বিতীয়টী দেখুন।—কোন বেশ্যা আজীবন নিজের অসদ্বৃত্তি দ্বারা দিন কাটাইয়া যমালয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে দেখা গেল যে, তাহার সমস্তই অসৎ কার্য্য; একটী মাত্র সৎকার্য্য এই যে, তাহার ফুলবাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি সে কাহাকেও তুলিতে দিত না, কেবল একটী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি দেবপূজার্থ সমস্ত ফুল লইয়া যাইবেন। সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বল উহার ছিল। বেশ্যা প্রথমেই সুকৃতির ফল ভোগের অভিলাষিণী হওয়ায় তাহাকে অতি মনোরম পুষ্প সমূহ শোভিত একটী প্রশস্ত উদ্যান তিন মাসের জন্য ভোগ করিতে দেওয়া হইল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই চতুর্দ্দিকের পবিত্র ভাবে বেশ্যার চিত্তে ভয়ানক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায় সে ভগবানের চরণে ক্রমাগত অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনবরত তিন মাস কাল এক ভাবে এবম্প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত করা হেতু তাহার সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া পূর্ব্বকৃত যাবতীয় অপরাধের মার্জ্জনা হইল।—ইহা কি করুণাবাদ নহে? বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ দয়া করিলে কি তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ত্রুটি ঘটিয়া তাঁহাতে পক্ষপাতিতার দোষ স্পর্শে? আমাদের ন্যায় কৃপাভিখারী জীবের মতে ত এরূপ স্থলে কোন প্রকার অন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দয়াময় নামের সার্থকতা ত এই শ্রেণীর ঘটনাতেই জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আর একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। এটী বিদেশীয়, কিন্তু বড়ই মধুর। খ্রীষ্টানেরা এইটী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মত সংস্থাপনে যত্ন পাইয়া থাকেন।—গ্রীস দেশীয় কোন নরপতি অতি সাধু চরিত্র ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে ব্যভিচার নিবারণার্থ এ প্রকার বিধান ঘোষিত করেন যে, যে কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি মন্দ অভিপ্রায়ে কটাক্ষপাত করিবে, তাহার দুই চক্ষু উৎপাটন করা হইবে। রাজার একমাত্র পুত্র অতি সজ্জন, সর্ব্বলোকপ্রিয়, কোমল প্রকৃতির যুবক দৈবাৎ উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইতে পারে না, নরপতি আদেশ করিলেন যে, কোন দিকে না তাকাইয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় রাজকুমারের প্রতি দণ্ড বিধান হইবে, ইহাতে কোন প্রকারে অন্যথা হইতে পারে না। দেশশুদ্ধ প্রজা যুবরাজের পক্ষে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, রাজা কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। অবশেষে অনেক উপরোধ অনুরোধ, কাকুতি মিনতির পর কৃপালু নরপতি এই মীমাংসা করিলেন যে, দুই চক্ষুই নষ্ট করা হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে যে, উহার এক চক্ষু ও উহার পরিবর্ত্তে আমার নিজের এক চক্ষু উৎপাটিত হউক। শেষে তাহাই হইল—আইনের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল, যথাসাধ্য কৃপা প্রদর্শনেও ত্রুটি করা গেল না। খ্রীষ্টানগণ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহেন যে, পরম পিতা দুর্ব্বল মানবপুত্রগণকে তাহা-

দের পাপের সম্যক দণ্ড ভোগ করিতে অশক্ত দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া নিজে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রগণের পাপ-ভার বহন করতঃ ক্রমে রক্তদান করিয়া গেলেন। কথটা যেমন হউক, বড় শক্ত কথা। দীন হীন ক্ষীণ অসহায় মানবগণের প্রতি দয়াল পিতার এত করুণাই বটে। ভাবিলে চক্ষে জল ধরে না। এ হেন কৃপা-নিধি সন্তানবৎসল জগৎপিতাকে সিংহা-সনচ্যুত করিতে কি প্রাণ ফাটিয়া যায় না! জানি না কোন্ প্রাণে উল্লিখিত শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতেরা একমাত্র কঠোর কর্ম্ম-বাদের আইনকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন? দয়াময়ের দয়া বিশ্ব-রাজ্য হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে কি তাঁহাদের প্রাণে একটুও ব্যথা লাগে না?

প্রেমময়ী মা জগদম্বা জগদ্ধাত্রীরূপে আমাদিগকে কোলে করিয়া স্তনপান করা-ইতেছেন; তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে বসিয়া আমরা কত না উৎপাত করিতেছি; তন্মধ্যে অনেকগুলি স্নেহ পরবশ হইয়া উপেক্ষা করি-তেছেন; বিশেষ দোষগুলি হইতে আমা-দিগকে টানিয়া আনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ তিরস্কার করিতেছেন, গুরুতর অপরাধগুলির জন্য বেত্রাঘাত সহ্য করি-তেছি; আবার ব্যাকুল ভাবে রোদন দ্বারা অনুতাপ করিলে বহুতর পাপ মার্জ্জিতও হই-তেছে। এই ত আমাদের বিশ্বাস। হস্তি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র পিপীলিকা লম্ফ ঝম্প করিলে মাতঙ্গ-রাজ কি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদদলিত করতঃ দণ্ড বিধান করিয়া থাকে? জগন্মাতা কি তাঁহার ভীষণ কঠোরতা প্রদর্শন জন্য এই বিশ্বসংসার পাতিয়া দুর্ব্বল মানবের উপর নানাবিধ কঠিন শাস্তি দিয়া সুখ বোধ করি-তেছেন? কেবল তাঁহার অলঙ্ঘনীয় বিধি ব্যবস্থাদির মর্য্যাদা রক্ষা করাই এই ভব-লীলার একমাত্র উদ্দেশ্য? এ কথা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে যে, অসংখ্য প্রকারের অগণ্য প্রলোভনের মধ্যে এই হীনবল জীবকে আইনের কলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতে-ছেন। মূঢ় অর্ব্বাচীন অসহায় মানব সমূহ তাঁহার আইনের খেলার সামগ্রী কখনই হইতে পারে না। দয়াময়ীর অনন্ত করুণার নিকট আমাদের পাপাদি কিছুই নয়; হাজার হইলেও পাপরাশির অবশ্য একটা সীমা আছে, মায়ের করুণার সীমা নাই। ভাই, ভয় নাই "জয় মা করুণাময়ীর জয়" বলিয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে চীৎ-কার করতঃ মায়ের অপার করুণার দোহাই দিতে দিতে অবাধে এই দুস্তর ভবসাগর পার হইয়া যাইব। বড় বড় জাহাজ সমূহ তুমুল তুফানে ডুবিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মাতৃচরণ-ভেলা অনায়াসে তোমাকে আমাকে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীপদের কৃপা-ভেলায় ভর করিয়া নির্ভয়ে বসিয়া থাক, চকিতের ন্যায় অপর পারে উপনীত হইবে। জয় বিশ্বমাতার জয়। জয় মায়ের স্নেহ দয়ার জয়!!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

নারী বিষয়ক কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অযথা নানা প্রকার পীড়ন হইতেছে। তাহার ফলে জগৎবাসীর মহাপীড়ন উপস্থিত, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন না। যাহাতে স্ত্রীপীড়ন নিবারণ হয়, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য জানিবে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা না বুঝিয়া লোকের বদ্ধমূল সংস্কার যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে, স্ত্রী ও পুরুষ কি বস্তু—সত্য বা মিথ্যা। এইরূপ বিচার করিয়া মিথ্যা ত্যাগ ও সত্য গ্রহণ করিলে মনের সমস্ত অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া শান্তি-বিধান হইবে। শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত। এক সত্য ও আর এক মিথ্যা। এখন বুঝিয়া দেখ যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোনটী বা উভয়েই সত্য বা মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা দৃশ্যে নাই, অদৃশ্যে নাই। মিথ্যা হইতে স্ত্রী পুরুষ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট প্রভৃতি কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যাতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম বা সংজ্ঞা হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। তবে যে একই সত্যের মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট, এই প্রকার যে দুইটী ভাব ভাসিতেছে, ইহা কি জ্ঞানের কার্য্য বা অজ্ঞানের কার্য্য? মিথ্যা হইতে নিকৃষ্ট যে স্ত্রী তিনি হইয়াছেন, এরূপ বলিলে বুঝিয়া দেখ, মিথ্যাত কোন পদার্থ নহে, যাহা নাই, তাহারই এক নাম মিথ্যা। যদি স্ত্রী সত্য হইতে হইয়া থাকেন ও সত্যেরই রূপ হন, তাহা হইলে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, তখন সেই একই সত্য হইতে একটী স্ত্রী নিকৃষ্ট ও অপর একটী পুরুষশ্রেষ্ঠ কোথা হইতে বাহির হইলেন? যদি কোন পুরুষ বলেন, আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এক সত্য হইতে হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাচ বস্তুতঃ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট; তাহা হইলে সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষের মুখে চূণ কালী দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরুষ যদি বোধ করেন যে, আমি এক অদ্বিতীয় সত্য হইতে হইয়াছি ও তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু হইতে স্ত্রী হইয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথায়, তাহার কি রূপ? আর যে সত্য হইতে পুরুষ হইয়াছেন, সেই সত্যের রূপ, পূর্ণত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? "শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং" কেবল মুখেই বলাই সার, কার্য্যে কিছুই নহে। যদি হাড় মাস বিষ্ঠার পুত্তলিকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ের স্থূল শরীর সেই একই পদার্থে গঠিত তখন উভয়ই সমভাবে নিকৃষ্ট ও হেয়। যদি দশ ইন্দ্রিয়কে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদি সেই একই পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত, তখন স্ত্রীগণের ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ কিম্বা উভয়েই স্ত্রীও নিকৃষ্ট। অতএব স্ত্রীকে হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কাটিয়া

কাটিয়া ফেলিয়া দিউন। যদি বল ইন্দ্রিয়াদির গুণ ও ধর্ম্মে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখ যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমান ভাবে বর্ত্তাইতেছে ও তদনুসারে দুঃখ সুখ অনুভব হইতেছে। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, দুঃখ সুখ, লজ্জা ভয়, মান অপমান, ক্ষুধা পিপাসা, জীবন মরণ প্রভৃতি উভয়ের একই রূপে ঘটিতেছে। তবে উভয়ই সমান ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইবেন। যদি চেতন জীবাত্মাকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল, তাহা হইলে যখন একই সত্য পরমাত্মার অংশ স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রেই জীবাত্মা ভাবে বর্ত্তমান, তখন উভয়ই সমানরূপে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইবেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইলে আপনাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটাইতে হইবে। যখন একই কারণ পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত বা উৎপন্ন হইয়াছে, তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে ইহাই উচিত। নতুবা পরমাত্মার এক অংশকে স্ত্রী বলিয়া ত্যাগ ও অপর অংশকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা মূর্খের কার্য্য—সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞা বিশেষণ, পরমাত্মা বিশেষ্য। তাঁহারই জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সৃষ্টিপালন লয়কারিণী শক্তির নাম প্রকৃতি বা স্ত্রী সংজ্ঞা জানিবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় সংজ্ঞা লইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ সর্ব্বকালে বিরাজমান। এই বোধ হওয়ার নাম যথার্থ ত্যাগ। পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, এই জ্ঞানই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ত্যাগ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রতি জ্ঞানীর প্রেম ও সম্মান সমান।

মূল কথা, একই সত্য স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান অর্থাৎ কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির নাম মায়া আদ্যাশক্তি কালী দুর্গা সরস্বতী সাবিত্রী গায়ত্রী বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। ইনি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন, পরব্রহ্ম স্বরূপই। এই মঙ্গলকারিণী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি ও লয় হইতেছে। এই মঙ্গলকারিণী জগৎজননী মহাশক্তি স্ত্রী হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়া মহা মহা অবতার, ঋষি মুনি, রাজা বাদসাহ, পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি পদ পাইয়া তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। পুরুষ মাত্রকেই ধিক যে, তাহারা স্ত্রী রূপিনী জগৎ জননীর ক্লেদ মূত্র বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তম গুণ গ্রহণ করিতেছে না, স্ত্রী সংজ্ঞকমাত্রকে সেবা ভক্তি মান্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাঁহাকে নীচ শূদ্র অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। ইহার অপেক্ষা অধিক বলবীর্য্য জ্ঞানহীন আর কি হইতে পারে? শুধু মস্তক মুণ্ডন করিয়া "শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং" বলিলে কি হইবে? শুনিয়াছেন, পার্ব্বতী পরমাসুন্দরী। অনবরত "শিবোহং" বলিবার ফলে পার্ব্বতীপতি শিব হইয়া কৈলাসবাসের বাসনা। ধিক্ তোমার জ্ঞানে, ধিক্ তোমার "শিবোহং" বলায়!

কাহার কাছে প্রকাশ কর যে, শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং? যাহার কাছে প্রকাশ কর সে কে? এ আকাশের মধ্যে কয়টা সত্য বা শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং আছেন বা হইবেন? শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। সম্মান পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রকে জান যে, আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। যে কার্য্যের যে উপযোগী, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য কর ও করাও। হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইহাঁর শরণ লও, যাহাতে ইনি সদয় হইয়া তোমার অন্তরে শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং রূপ যে অজ্ঞান ভাসিতেছে, তাহার নিবৃত্তি করেন। ইনি দয়াময়। তোমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ শিবোহং সচ্চিদানন্দোহং কাহাকে বলে, বুঝিয়া শান্তি পাইবে। তখন তুমি বুঝিবে যে, একই পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রীও প্রকাশ পাইতেছেন, পুরুষও প্রকাশ পাইতেছেন। উভয়েই পরব্রহ্মের রূপ মাত্র। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মাতা পিতা গুরু আত্মা পতি পরব্রহ্ম। দুয়ের মধ্যে কেহই উচ্চ নহেন—কেহ নীচ নহেন—উভয়েই সমান। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে স্ত্রী পুরুষ নাম বা সংজ্ঞা—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ। পুরুষ বিশেষ্য সংজ্ঞক, স্ত্রী বা শক্তি বা জ্ঞান বিশেষণ সংজ্ঞক। বিশেষ্য বিশেষণ একই বস্তু। যেমন, অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ উভয়ই একই অগ্নি। অগ্নি সংজ্ঞক পুরুষ ও প্রকাশ সংজ্ঞক স্ত্রী। পরব্রহ্ম বিশেষ্য, পরব্রহ্মের সৃষ্টিপালন সংহারকারিণী বিদ্যা বা জ্ঞানময়ী ইচ্ছা শক্তির নাম বিশেষণ। বিশেষ্য অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ ভাব। বিশেষণ প্রকাশমান জগৎস্বরূপ। পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় জগৎরূপে প্রকাশমান হইয়া অনন্তশক্তি দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অনন্ত প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। জীবের মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে—পরব্রহ্মের রূপই। যেরূপ জাগরিত অবস্থায় তুমি ও তোমার নানা শক্তি দ্বারা নানা কার্য্য হয়—আমি তুমি তিনি, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি। এবং সুষুপ্তির অবস্থায় সমস্তেরই কারণে লয় ঘটে। আমি তুমি তিনি, স্ত্রী পুরুষ প্রকৃতি পুরুষ কোন ভাব থাকেনা। অগ্নির প্রকাশে অগ্নির সমস্ত গুণের প্রকাশ থাকে। অগ্নির নির্ব্বাণে সমস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ, সর্ব্ব বিষয়ে শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপে অবস্থিতি কর।

অল্পাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় আচরণ হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার কোথাও দেখা যায় না। অবলা স্ত্রীগণ অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট পাইতেছেন। পুরুষগণ তাহার মোচন করা দূরে থাকুক, দেখিয়াও তাহা দেখিতেছেন না। পুরুষেরা আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়া সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সুখ বা স্বাধীনতা চাহেন না। এ বোধ নাই যে, যিনি

সকলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন, কেবল তিনিই নিজে স্বাধীন হইতে পারেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার দ্বারা ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যে কার্য্য সুখে সম্পন্ন হয়, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে পরমানন্দে অবস্থিত করেন। যে সকল ন্যায়বান বীরপুরুষগণ স্ত্রীজাতির সহায় হইয়া পরমাত্মার সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মার প্রিয়। যাহারা স্ত্রী পীড়নের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করে, তাহারা পরমাত্মা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেছেন ও হইবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

এদেশের স্ত্রীজাতির যে কষ্ট, তাহার সীমা নাই। কন্যা ভাবে, পত্নী ভাবে ও বৈধব্যে স্ত্রীগণ ঘরে ঘরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বৃথা মানের ভয়ে তাহা জানিয়াও সকলে সকল সময় স্বীকার করেন না। অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেরই সংস্কার যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় স্বভাবতঃ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী হীন। পুরুষের জন্যই যেন স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে; স্ত্রীর জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই। এ বোধ নাই যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়েরই কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। এমন নহে যে, পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন, আর স্ত্রীগণ পুরুষের ইচ্ছামত চলিবার জন্য জন্মিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু বা আর্য্য নামধারী, তাঁহারা শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে মুখে বলেন যে, স্ত্রী মাত্রেই দেবী মাতা মহাশক্তির অংশ, পুরুষ মাত্রেই শিব। উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ঠিক বিপরীত। আপনার বৃথা সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা অবিচারে কতরূপে সেই মহাশক্তিস্বরূপিণীকে সত্য হইতে বিমুখ ও সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহার সীমা নাই। ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে? এরূপ অসদাচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি যে হিন্দুদিগকে জ্ঞানহীন, শক্তিহীন করিয়া পীড়িত করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তথাপি চৈতন্য হইতেছে না। যতদিন হিন্দুগণ কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বেদমাতা সাবিত্রী, গায়ত্রী, প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ প্রভৃতি নাম দিয়া মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তত দিন তাঁহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রীভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহাঁ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি স্বরূপিণী স্ত্রীগণের প্রীতি ও সম্মান পূর্ব্বক সৎকারে বিরত হইয়াছেন। যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র সমদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। সমদর্শী ব্যক্তিই পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হন।

নারীরূপিণী মহাশক্তি হইতে ইহাঁরা যে কিরূপে বিমুখ হইয়াছেন, একটী ব্যবহারের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ রূপে দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে নিয়ম যে, 'পুরুষ দক্ষিণ ভাগের অধিকারী ও স্ত্রী বামভাগের অধিকারিণী। এই ব্যবহারে স্ত্রীগণের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা সূচিত হয়, তাহা সর্ব্ব ব্যবহারের মূল হইয়াছে। হিন্দু পুরুষগণ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া দক্ষিণভাগ গ্রহণ করিতেছেন বটে, কিন্তু অন্তরে বাহিরে নানা বিপদ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। বিচারশীল মহাত্মা

ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন যে, দক্ষিণ ভাগ যদি সম্মানের হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই জগৎজননী নারীকে সেই দক্ষিণ ভাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। লোকাচার ক্রমে বাম বা দক্ষিণ ভাগ দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানিও যে, স্ত্রী পুরুষের সম্মান সমভাবে রক্ষা করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী রাজা সর্ব্ববিষয়ে সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহা লৌকিক রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথাচরণে রাজ্যের নাশ হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

মূল কথা, দায়াধিকার প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের সমান ক্ষমতা পরমাত্মা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অন্যথা না করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, ব্রহ্মাণ্ডের নানা রূপ আমোদ প্রমোদ কেবল পুরুষেই দর্শন করিবে, স্ত্রীলোকে করিবে না। যথার্থ পক্ষে যাহা পুরুষের পক্ষে নির্দ্দোষ, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দ্দোষ। যাহা স্ত্রীর পক্ষে দোষ, তাহা পুরুষের পক্ষেও দোষ। ঈশ্বর এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, বিবাহ না করিলে নারীর অন্য গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা না করা ইচ্ছাধীন। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, ইচ্ছা না হয় করিবে না, তাহাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোষ বা গুণ হয় না। তিনি এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একাধিক বিবাহ করিয়া নির্দ্দোষী থাকিবেন ও স্ত্রী সেইরূপ আচরণে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন; এবং তিনি এরূপ আজ্ঞা দেন নাই যে, বিধবা বেশ ভূষা ও সুখাদ্য ত্যাগ করিবে ও বিপত্নীক ভোগ বিলাসে রত থাকিবে। তিনি পূর্ণ, কেহই তাঁহার পর নহেন। তাঁহাতে পক্ষপাত বা ইতর বিশেষ নাই। জীবমাত্রেই তাঁহার নিকট সমান।

বিধবা স্ত্রী অলঙ্কারাদি ধারণ করে বা না করে কিম্বা উত্তম দ্রব্য খায় বা না খায়, তাহাতে দোষই বা কি গুণই বা কি? দোষ গুণ আসক্তি অনাসক্তি মনে, অসন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা ভগবান যদি দয়া করিয়া জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন, তবেই ইন্দ্রিয়াদি শান্ত ও সৎপথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও সামর্থ্য নাই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের কোন গুণ বা ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটাইতে পারেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা যথা সময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে বর্ত্তাইবে, তাহাতে কাহারও কোন নিন্দা বা দোষের লেশ মাত্র নাই। তোমরা নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও অপরকেও কষ্ট দিও না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ। যাহাতে উভয়ে পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করে, ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ।

যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বাল্যাবস্থা হইতে জুতা ও পোষাক পরা, বিদ্যাভ্যাস, অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া হয়, তবেই মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট প্রিয়, নতুবা সর্ব্বপ্রকারে দোষী দণ্ডার্হ। নারীকে সৎ শিক্ষা না দিয়া কেবল পুরুষকে দেওয়া নিষ্ফল ও জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যদি কোন স্ত্রী

বন্ধ্যা হন তাহা হইলে অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মা বিমুখ লোকে তাঁহাকে নিন্দা ও ঘৃণা করে। ইহা পশুতুল্য ব্যবহার। স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার ত নিজের কোন শক্তি নাই যে, গর্ভধারণ করিবে বা করিবে না। যাহার সন্তান হয়; তাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে হয়। যাহার না হয়, তাহারও ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই হয় না। তিনি যে গাছে ফল হইবার নিয়ম করিয়াছেন, সেই গাছে ফল হয়। পাণ প্রভৃতি যে গাছে তিনি ফল হইবার নিয়ম করেন নাই, তাহাতে ফল হয় না। গাছের কি দোষ? পরমাত্মার ইচ্ছা। কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি কর, সকল দোষের শান্তি হইবে।

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবে। তাহা হইলে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানও সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বুঝিয়া দেখ, তোমরা তাঁহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী। তিনি ক্ষমা না করিলে তোমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। অথচ তোমরা মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী প্রভৃতির সামান্য দোষও ক্ষমা করিতে অপরাগ। তাহার জন্য সর্ব্বদা নিজে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ ও অপরকে করাইতেছ। ইহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞতা ও মূঢ়তা অধিক আর কি হইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে না, সে কিরূপে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা পাইবে? যে অপরকে ক্ষমা করে, ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন। ক্ষমা পরম তপস্যা। ক্ষমা বলীর ভূষণ। এজন্য দুর্ব্বলা স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট বিশেষ রূপে ক্ষমার পাত্রী। সধবা, বিধবা, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চরিত্রা, নারীমাত্রেরই যাহাতে কোন প্রকার অভাব বা কষ্ট না থাকে, তৎপ্রতি রাজা পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পরের হিতসাধন করিতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বদা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট 'প্রার্থনা কর। তিনি নিজ গুণে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ একটী প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ও ভবিষ্যতে সন্তান সন্ততির হিতের জন্য বিবাহ। যাহাতে মনুষ্যগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে, তাহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের উদ্দেশ্য। বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যে, তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে। বরঞ্চ সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে কার্য্য হয়। ইহা না বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রণালী ও পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল না হইয়া তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি প্রচলিত বিবাহের ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে বিবাহ সত্ত্বেও ব্যভিচার ও সন্তানের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটিতেছে কেন? বিবাহ নানা স্থানে মঙ্গলের আকর না হইয়া

অনিষ্টের হেতু কেন হইতেছে? যদি বিবাহের প্রথা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে গঠিত হইত, তাহা হইলে কেন এরূপ ভ্রমের প্রচার হইবে যে, বিবাহ মাত্রেই পরমার্থ সিদ্ধির বিরোধী। বিবাহ সম্বন্ধে পরমাত্মার কি নিয়ম বা উদ্দেশ্য, তাহা না জানায় ও পক্ষপাত এবং স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করায়, এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে। অজ্ঞতা বশতঃ লোকে বুঝিতেছে না যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ মিলন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ।

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংস্কারানুসারে তাঁহাতেই সাকার নিরাকার এই দুইটী ভাব ভাসিতেছে। নিরাকার নির্গুণ জ্ঞানাতীত। সেই নিরাকার ব্রহ্মে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ ব্যভিচার ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কিছুই নাই। সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই সাত অঙ্গ ধাতু বা শক্তি। এতদ্ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আকাশের মধ্যে দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন বিচার করিয়া দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম— নিরাকার ব্রহ্মের নাম বিবাহ, না, সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ; অথবা বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি কোন অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ? যদি ইহার মধ্যে কাহাকেও বিবাহ বল, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা মনুষ্যের কল্পনায় বহু হইলেও যথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমাজে প্রচলিত প্রথা উৎকৃষ্ট ও অপর সমাজের প্রথা নিকৃষ্ট, এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ জনিত দ্বেষ হিংসা অশান্তির মূল থাকে না। আর যদি বল যে, বিবাহ এতদ্ভিন্ন অপর কিছু, তাহা হইলে বিবাহ বলিয়া কোন পদার্থই নাই। যাহা নাই, তাহারই নাম বিবাহ।

যাহা নাই তাহারই অন্য নাম মিথ্যা। যাহা বা যিনি আছেন, তাঁহারই নাম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে বিবাহ এই শব্দ মাত্র আছে। শব্দের অনুরূপ কোন বস্তুই নাই। যদি বল সত্য, তাহা হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই সত্যের নাম যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলেও বিবাহের প্রথাভেদ লইয়া হিংসা দ্বেষ বশতঃ অশান্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই।

মূল কথা এই যে, অজ্ঞতা বশতঃ জগৎ, জীব, মায়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন ভাসিতেছেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাসা সত্ত্বেও একই। এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদে মিলনের নামই বিবাহ। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া জগতের হিতার্থে যে মিলিত হয়েন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ইহাতে শাস্ত্র, শ্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না। পরস্পরকে ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করিয়া অভিন্ন হৃদয়ে প্রীতি পূর্ব্বক জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ যে পরস্পরের প্রিয় কার্য্য সাধন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ। ব্যবহার কার্য্যের সুবিধার জন্য বিবাহের যে অনুষ্ঠান, তাহা বাহ্য বিবাহ মাত্র। যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই অন্তর্বিবাহ।

যেখানে অন্তর্বিবাহ হয় নাই, সেখানে

বাহ্য বিবাহ ঈশ্বরের নিকট ব্যভিচার ও দণ্ডার্হ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্য তোমাদের দুর্দ্দশা লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। তথাচ তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতেছ না যে, কেন আমাদের এত দুঃখ। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ দুরবস্থার বিষয়ে চিন্তা কর। ভাবিয়া দেখ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ বা কিছু কি নাই যে, তিনি তোমাদের দুঃখ মোচন করেন বা তদ্দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণার শান্তি হয়। যদি থাকেনত তিনি কোথায়? সরল অন্তঃকরণে এইরূপ অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবে যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ তোমাদিগকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে নিত্য স্বতঃ প্রকাশ বিরাজমান। শরণার্থী হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি মঙ্গলময় তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাব বা সংস্কার দেখা যায়। কেহ বলেন, বিবাহ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন ক্রমে মুক্তি হইবে না। সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট পদ, গার্হস্থ্য ঘৃণ্য হীন অবস্থা। আবার কেহ বলেন, সন্ন্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাহ করা মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। করিলে পরমাত্মা সন্তুষ্ট হন, না করিলে তাঁহার অপ্রসন্নতা। কেহ বলেন, অবিবাহিত ব্যক্তি পরমার্থের অনধিকারী, আর কেহ বলেন, তিনিই কেবল অধিকারী। এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ বশতঃ কেহই শান্তি বা দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

এস্থলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করা উচিত। বিচার না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান বিনা শান্তি নাই। অতএব তোমরা সকলে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, বিবাহ করিলেই বা কি ফল, আর না করিলেই বা কি ফল? পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিতে পারে, ইহাই পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের সৃষ্টি কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য। তেজ বা শক্তি বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যাহার শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই, সে ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। এজন্য সকলেরই পক্ষে মিথুন ভাবাক্রান্ত হইয়া অযথা তেজোক্ষয় করা অবিধেয়। কিন্তু মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তেজোরক্ষা হয়, পরমাত্মার এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচার পূর্ব্বক মিথুন আচরণেও তেজোরক্ষা হয় এবং অবিচারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানেও তেজোক্ষয় হয়। মূল কথা, জীবের বিবাহে বা ব্রহ্মচর্য্যে কোন হানি লাভ নাই। তেজোরক্ষার প্রয়োজন। বিবাহ করিলে যাহার তেজোরক্ষা হয়, তিনি বিবাহ করিবেন। ইহা ভগবান পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের আজ্ঞা। বিবাহ না করিলে যাঁহার তেজোরক্ষা হয়, তিনি বিবাহ করিবেন না। ইহাও ভগবান জ্যোতিস্বরূপের আজ্ঞা। যিনি বিবাহ না করেন ও যিনি বিবাহ করেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। উভয়েই পরমাত্মার আজ্ঞাযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য

সুনিষ্পন্ন করিলে তাঁহার কৃপায় মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অবস্থিতি করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। যিনি পরমাত্মা-বিমুখ ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নহীন, তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি তেজোহীনের নিকটেও আবির্ভূত হইতে পারেন, তেজস্বীর নিকটেও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেন।

কুমার কুমারী ও বিধবার মধ্যে যাঁহার ভোগ বাসনা নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সুখে শান্ত, সুখের সন্ধানে বিরত, যাঁহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অনুরাগ, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে একমাত্র পতি বা পত্নী জানিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাযুক্ত, এরূপ স্ত্রী বা পুরুষকে কদাচ বিবাহের জন্য জেদ করিবে না, তাঁহাকে পূর্ণ পরমাত্মারূপে নমস্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে না করিবেন; তাহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। তিনি বিবাহ করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষী ও প্রিয়, না করিলেও নির্দ্দোষী ও প্রিয়।

স্ত্রী বা পুরুষ যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাকে কোনরূপ ভয় বা ফলের লোভ দেখাইয়া বিবাহে বিরত করিবে না। বিবাহ অভিলাষী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে যে রাজ্যে বিবাহ করিবার সুবিধা নাই, সে রাজ্য শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি বিবাহ করিতে যাহাতে সক্ষম হন, তাহা রাজা [illegible] ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে আপন আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া বিবাহের দ্বারা যে মিলিত হন, ইহা পরম কল্যাণের হেতু। মনুষ্য একজনের সহিত অভেদে মিলিতে পারিলে সকলের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভেদে মিলিতে পারেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

আরও দেখ, যাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার কোটী কোটী [illegible] হইলেও তিনি স্বরূপে অনাদি শুদ্ধ কুমাররূপে বিরাজমান। কোন কালে অশুদ্ধ অপবিত্র হন না। যেমন সোণার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ সোণা থাকিয়া যায়, তেমনই জীব বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে একইরূপ শুদ্ধ। কেবল অজ্ঞতাবশতঃ বুঝিবার ভেদ।

অতএব যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা, তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করিয়া পরমাত্মার উপাসনাদি প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেন। যাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তিনি না করিবেন। পরমাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। পরমাত্মার প্রকাশ তেজোময় জ্যোতিকে ধারণ কর, সর্ব্বদা পূর্ণতেজে তেজস্বী থাকিবে। যাঁহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা, তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বা পাত্রী। এবিষয়ে লৌকিক সংস্কারবশতঃ কোনরূপ চিন্তিত বা ভীত হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া অন্নে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাক। জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল। আপনার মঙ্গলে জগৎ মঙ্গলময়। কেন না, সমগ্র জগৎ আপনার আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

হিন্দু নামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ হিন্দুদিগের ধারণা যে, আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ পুণ্যের কার্য্য। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সের কন্যাকে বিবাহিত করিয়া থাকেন। এবং সকলেরই ধারণা যে, অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতা প্রভৃতি গুরুজনের অধঃপাতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্রা হয়েন। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই শান্ত গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বিচার করিলে সহজেই বুঝিবেন যে, বিরাট পরব্রহ্মের সর্ব্বাঙ্গ হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। এবং স্ত্রী পুরুষ একই সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই সত্যেরই রূপ মাত্র। স্ত্রী ও পুরুষ একই পদার্থে নির্ম্মিত, বস্তুগত ভেদ শূন্য। অর্শাদি রোগে পুরুষের বিবাহের পূর্ব্বে রক্তস্রাব হইলে অধঃপতন ও অপবিত্রতা ঘটে না কেন? স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন নিয়ম কখনই জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ হয়, এজন্য কল্পিত শাস্ত্রে অধঃপাত ও অপবিত্রতার ভয় দেখান হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া কেবল মাত্র মিথুন ধর্ম্ম পালন করিবে। জীব মাত্রেই যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, যথার্থপক্ষে পরমাত্মার সৃষ্টির এই এক উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, কত স্ত্রী শৈশবে বিবাহিতা ও বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কেহ বা বন্ধ্যা, কেহ বা মৃতবৎসা, কেহ বা কম বয়সে প্রসব করিতেছেন। কেহ বা যাবজ্জীবন নানা প্রকার রোগে ভুগিতেছেন। পরমাত্মার যথার্থ যাহা নিয়ম, তাহার প্রতিপালনে কখন এরূপ কুফল উৎপন্ন হয় না। নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলেই এরূপ ঘটে।

জগতের সর্ব্বত্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থার কোন পদার্থই সুব্যবহার্য্য হয় না। আম্র ফল পরিপক্ক হইলে সুস্বাদু ও বলবর্দ্ধক হয়। তাহার বীজে বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই আম্রকে কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয় ও কাঁচা আম্রের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। হইলেও অচিরস্থায়ী, ফলবিহীন হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থাতেই সকল বস্তু কার্য্যের উপযোগী। যাঁহারা বাল্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে জানিলেন যে, মনুষ্যের সম্বন্ধে ঈশ্বর পরমাত্মার নিয়ম অন্যরূপ? স্বার্থপরতা ও মিথ্যা সংস্কার বশতঃ বাল্য বিবাহের বিধির প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিণা লাভ। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইলে যে সকল পুত্র কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত হয়, তাহাদের বিবাহ না হওয়ায় উপার্জ্জনের হ্রাস ঘটে। বিবাহের পর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের কোন হানি লাভ নাই। এবিষয়ে পরমাত্মার নিয়ম ভঙ্গরূপ অপরাধের জন্য বিধিকর্ত্তা ও বিধিপালকগণের জীবনে যন্ত্রণা নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

বাল্য বিবাহের প্রবর্ত্তকগণ বলেন যে, যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বা প্রারম্ভে বিবাহ হইলে [illegible] পবিত্র

থাকেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ও পরিচিত ব্যক্তিগণের জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবেন, একথা সত্য কি মিথ্যা। মিথ্যা হইলে তাঁহার এরূপ প্রবর্ত্তনার জন্য ঈশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ কিনা?

পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীল স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা বিবাহ করিবেন। তাহাতে কাহারও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করা অকর্ত্তব্য। করিলে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার নিকট দোষী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে। বার বৎসরের পূর্ব্বে পুত্র কন্যার কখনই বিবাহ দিবে না। তাহার পর বিশ বৎসর বা ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হইতে পারে। যৌবন বিয়োগের পূর্ব্বে যত পরিপক্কাবস্থায় বিবাহ হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। পুত্র হউক, কন্যা হউক, যাহার বিবাহে অনিচ্ছা, তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ দিবে না। পুত্র কন্যাকে শিশুকাল হইতে যথোপযুক্তরূপে সৎশিক্ষা দিবে। সরল শৈশবে পুত্র কন্যাকে সুন্দরী কন্যা ও সুন্দর বর পাইলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়, এইরূপ উপদেশ দিবে না।

রাজা প্রজাগণ, আপনারা কোন বিষয়ে চিন্তিত, ভীত বা নিস্তেজ হইবেন না। পরমাত্মার যে নিয়ম কথিত হইল, তদনুসারে কার্য্য করিবেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবেন। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

পাষাণী।

গীতি নাটিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রণীত।

জানিনা, আমি স্নেহে অন্ধ কি না? দ্বিজুকে ভালবাসি, তাই বা তাঁহার পাষাণী এত ভাল লাগিয়াছে। আজ দেব দর্শন ঘটিয়াছে। একদিন একটী মহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন, ক্ষীরোদ বাবু, আমার পরম সৌভাগ্য আজ ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছি। সে দিন সে মহিলার উৎসাহ ও আনন্দ বুঝি নাই, সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। আজ সেই কথা মনে পড়িল।

হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহত্ব, জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা, ঢেঁকির কচকচি অনেক শুনিয়াছি, কাণ জ্বালাতন হইয়াছে। মাথায় কোন কথা প্রবেশ করে নাই। আজি অন্ধকার গহ্বরে একখানি ছবি দেখিলাম, অপূর্ব্ব সুন্দর মহান্, ফিডিয়াসের ভাস্কর কর্ম্ম, র্যাফেলের চিত্র। অতি সুন্দর অতি সুন্দর। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব যাহা দর্শন বিজ্ঞান বক্তৃতায় বুঝি নাই, আজি চিত্রপটে তাহা বুঝাইল। সুকুমার তুলিকার আঘাতে চিত্রকর যাহা বুঝাইল, দার্শনিক ও শাস্ত্রকারের তাহা বুঝাইবার শক্তি নাই। হাঁসির ভিতর শক্তি থাকে "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে শক্তি এত অধিক, তখন বুঝি নাই। মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপিয়ারের নিন্দার বিষয় নহে।

এই অপূর্ব্ব চিত্র, এই অপূর্ব্ব কবিত্ব, বাণী রঙ্গের ও বাণী ছন্দের রচনা। পুরাণ জিনিসকে নূতন করিয়া সাজাইতে একটু

বেশী রকম ওস্তাদির প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্র লাল বাসীফুলে মনোহর মালা গাঁথিয়াছেন। এই মালার তারটী কণক তার।

সাধনাসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ শক্তির প্রভেদ অনেক। বিশ্বামিত্র সাধনায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। সহজেই মনে একটু অহমিকা জন্মিয়াছে। বন্ধু জনকের নিকট একটু ব্রাহ্মণত্বের পসার করিতে গিয়াছিলেন। জনক স্বয়ং রাজর্ষি, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও আপনাকে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,

"যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে।"

বিশ্বামিত্র প্রমাণ চাহিলেন। জনক তাঁহাকে বলিলেন,গৌতমের আশ্রমে যাইয়া চাক্ষুষ দেখিয়া আইস। অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা। ইসাই ও ইসলাম, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবিধ আখ্যায়িকা রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত গুণ পরীক্ষায় উজ্জলতর হয়। অহল্যা গৌতমের প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ বলিয়া কি প্রাণের ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিতে পারিয়াছেন?

ভাষা যেমন মিষ্ট, ছন্দ তেমনি মধুর, আর ভাব সেত অনুপম। অনেক ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট কবির ছায়া প্রতিমার পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম, সকলেই হাঁসি মুখে উঁকি মারিয়া ছবিখানি দেখিয়া যাইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস উদ্দীপনে অদ্বিতীয়। এমন একটা মহা ব্যাপারে হাসির উচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রথমটা বড় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বালকপণা করিয়া বুঝি চিরপ্রণম্য মহাপুরুষকে লাঞ্ছনার ভাগী করিবেন। শেষে দেখিলাম, ভাবের উচ্চতা ধারণে মস্তক অসমর্থ হৃদয় ত্রাসিত হইত, যদি সে ঘোর অন্ধকারের পার্শ্বে এ বিজলির খেলা না থাকিত।

সমালোচকের অভিসম্পাৎ আছে,একটা না একটা দোষ ধরিতেই হইবে। গৌতমের তপোবন মিথিলায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভারত ইতিহাসে অনেকগুলি গৌতম, ন্যায়কার, সাংখ্যকার গৌতম, শাক্যসিংহের পূর্ব্ব পুরুষ গৌতম, আবার অহল্যা পাষাণীর প্রাণেশ্বরও গৌতম। অহল্যা পাষাণীর প্রতিমূর্ত্তি সরযূতটে গোন্দা বা গৌতমাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একজন মহোপাধ্যায় ন্যায়কার গৌতমের আশ্রম এক দিন এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাড়ায় পড়িয়া টোলটী এখান হইতে উঠাইয়া মিথিলায় লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছেন। তিনি ন্যায়কার গৌতম ও অহল্যার স্বামী গৌতমকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং মিথিলায় তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এবং মিথিলায় অহল্যার স্বামীর আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রামায়ণের কাহিনীর একটু উলট পালট ঘটাইয়াছেন। এরূপ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

একটী চিত্র উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছিনা। প্রভাতে গৌতম কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, দূরে যোগিগণ গাইতেছেন।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে,
এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা।
মন্দির তোমায় কি গড়িব মা গো?

মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন
তরু, লতা ফল, ফুলমধুরিমা।
গৌতম। কি মহান দৃশ্য! দূর নিশ্চল নীরব
শুভ্র তুষারের স্তূপ, উপরে অসীম
নীলিমা প্রসার—নিম্নে নিশ্চল কঠিন
ধূম্র পর্ব্বতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত
দৃঢ় প্রস্তরের ঢেউ। দৃশ্য—কি মহান্
কি নিস্তব্ধ, কি উদার সুন্দর গম্ভীর।

পুনরায় গীত।

সতীর চরিত্র প্রণয় মধু—মা?
শিশুর হাসিটী জননীর চুমা
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা
যে দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

গৌতম। হেন শুদ্ধ রম্য স্নিগ্ধ গম্ভীর নিক্কণে,
মনুষ্যের সন্ধি হয় প্রকৃতির সনে,
লঘু হয় চিত্ত, সন্দ বিবাদ ভঞ্জন
হয়। জীবন সার্থক হয় দূর যায়
ক্ষোভ, পরিতাপ, ঘুচে যায় মৃত্যুর ভয়।

পুনরায—গীত।

তথাপি মাটীর এ প্রতিমা গড়ি।
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা,
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা
দেখিনা আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটী বাড়ায়ে
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।
গৌতম। আর দুঃখ নাই, আর চিন্তা নাই
লিপ্সা নাই—ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই, আমি
পিতার নয়ন তলে, জননীর ক্রোড়ে
লভিয়াছি অনন্ত বিরাম। বসি আজি
সমুচ্চ শৃঙ্গোপরি, দেখিতেছি চাহি
পদতলে, পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, কোলাহল,
ক্ষুদ্র লোভ ঘৃণা হিংসা—অনন্ত বিস্ময়ে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। (৪)

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দর্শন শাস্ত্র কাহাকে বলে, সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে। মানুষ দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক, প্রমাণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করে, সেই সকল তত্ত্ব ও তৎপ্রতিপাদক প্রমাণ যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অবস্থা বিশেষে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সে অবস্থায় বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির দৃষ্টিতে বাহ্য ও আন্তর তত্ত্ব সকল প্রতিভাত হইতে পারে। সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপ অতীন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রতিভার এই স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত, আরও এক প্রকার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইতে পারে। তাহা যোগলভ্য। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া সবিচার বা সবিতর্ক রূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগে অবস্থান করিতে পারিলেও এই সকল সত্য অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতে পারে। সে তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যে সকল মহাপুরুষের চিত্তে এইরূপে সত্য সকল স্বতঃ প্রতিভাত হয়, তিনি নিজে কাজেই সেই সকল সত্য বিশ্বাস

করেন—তাহাতে আস্থাবান হন। কিন্তু যে সকল লোকের এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ বা যোগ অথবা সাধনাজাত দৃষ্টি লাভ হয় নাই, তাহার পক্ষে এ সকল সত্য স্বীকার করিবার বা সেই সকল সত্য বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ থাকে না। তবে যত দিন তাহারা ঐ সকল সত্য দ্রষ্টা ঋষি বা মহাপুরুষদের উপর আস্থাবান থাকে, যত দিন তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি থাকে, তত দিন কোন গোলযোগ হয় না।

এইরূপ গোলযোগ হইবার প্রধান কারণ কি, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। লোকে যখন নানা মুনির নানা মত, ইহা দেখিতে পায়, যখন জানিতে পারে যে, "বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন" যখন বুঝিতে পারে না, কাহার মত অনুসরণ করিবে, তখন লোকের মনে সংশয় উদয় হয়। তখন জ্ঞানার্থীর মনে সত্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে—তখন জিজ্ঞাসার উদয় হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জিজ্ঞাসা বা সত্যানুসন্ধান জন্য আপ্ত প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সত্য স্থাপনার চেষ্টা হয়। কেহ বা শাস্ত্রের বিভিন্ন মত যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া একরূপ মত স্থাপনা করিয়া গোলযোগ মিটাইতে চেষ্টা করেন।* এইরূপ চেষ্টার ফল যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহাই দর্শন গ্রন্থ। মানুষে কর্ত্তা বা ভোক্তা ভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্থী হয়। সেই দ্রষ্টা অবস্থায় প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তত্ত্ব দর্শন করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য এই সকল গ্রন্থের নাম দর্শন গ্রন্থ।

* পণ্ডিত স্পেনসর বলিয়াছেন :—
"A man becomes a philosopher by reason of a certain perplexity from which he seaks to free himself,—and the perplexity arises from the contemplation of the world."

ইহার মধ্যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন বা আপাতবিরোধী মত সমন্বয় জন্য যে দর্শন শাস্ত্র, তাহাকে মীমাংসা বলে। আর যে তত্ত্বের স্পষ্ট আভাষ বেদে নাই, তাহা আপ্ত প্রভৃতি প্রমাণ অবলম্বনে যাহাতে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাও দর্শন শাস্ত্র। সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি 'মীমাংসা গ্রন্থ নহে। তাহাদের স্মৃতি বা প্রমাণ সিদ্ধ শাস্ত্র বলে। তাহাও দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত।

দুঃখ নিবৃত্তি জন্য, সন্দেহ নিরাসন জন্য ও জ্ঞানালোচনা বা বিজ্ঞানাবৃত্তির চরিতার্থতা জন্য আমাদের তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়। বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। প্রমাণ ও যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তাদি উক্ত তত্ত্ব স্থির করাই মনন। দর্শন শাস্ত্রে এই মনন ক্রিয়ার সাহায্য করে।

শ্রুতিতে আছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫)'। এই জন্য যে শাস্ত্রের দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়, যাহাতে মানুষ দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তাহাকে দর্শন শাস্ত্র কহে। আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অর্থ।

অতএব যাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শ্রুতি উক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, যাহাতে সাধারণ তত্ত্ব বিস্তার সাহায্য করে, যাহাতে সন্দেহ নিরাসন হয়, জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে, জ্ঞান-প্রবৃত্তির চরিতার্থ হয়, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞান হয়, আত্ম বা ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্র—ব্রহ্ম বা আত্মবিজ্ঞান শাস্ত্র।

দর্শনের ইংরাজী কথা ফিলজফি। এই কথার মূল অর্থ ধরিলে এই বুঝা যায় যে, মানুষ বিদ্যা বা জ্ঞান অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া

সেই জ্ঞান বা তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার গতি ও ফল যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই ফিলজফি। সুতরাং মূল অর্থে দর্শন ও ফিলজফি একই। তবে দর্শন বলিলে অন্তর দৃষ্টির যতটা প্রাধান্য বুঝায়, ফিলজফি বলিলে ততটা বুঝায় না * পাশ্চাত্য মেটাফিসিকস্ বলিলে, অনেকটা দর্শন শাস্ত্র বুঝায়।

প্রসঙ্গ ক্রমে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করিতে হয়। পূর্ব্বে এ পার্থক্যের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু প্রভৃতি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) দ্বারা যে সকল বাহ্য ও আন্তর বিষয় প্রত্যক্ষ করি—এবং পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার দ্বারা যে প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া ধারণা করি ও অনুমানাদি প্রমাণ ও যুক্তি বলে তাহা হইতে যে তত্ত্ব নিশ্চয় করি, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করি, তাহাই বিজ্ঞানের বিষয়। বিজ্ঞান কেবল এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের তত্ত্বালোচনা করে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—অর্থাৎ প্রাকৃত বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কেবল শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপে আর এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু আত্মা বা পরমাত্মা। এই তত্ত্ব দর্শন করিতে পারিলে আত্মবিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং বিজ্ঞান দুই রূপ—বাহ্য বিজ্ঞান ও আত্ম বিজ্ঞান বা ব্রহ্ম বিজ্ঞান। আমাদের জ্ঞানে দুইটী তত্ত্ব যুগপৎ প্রতিভাত হয়—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। আত্মা এই জ্ঞাতা আর আমাদের দেহ ও বাহ্য জগৎ জ্ঞেয়। এই বাহ্য জগৎ ও দেহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানই বাহ্যবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। ইহা বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

এই যে ব্রহ্ম বা আত্মবিজ্ঞান—ইহা অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু আর্য্য পণ্ডিতগণ এই আত্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্যবিজ্ঞান হেয় বোধে প্রায়ই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের অভিমত এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন :—

"সিদ্ধ বস্তু হইলেও ব্রহ্ম প্রমাণান্তরের বিষয় নহেন। ...ব্রহ্ম বিজ্ঞানে অনুমান প্রমাণের কারণ তা নাই। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয়ও বাহিরে। সেই জন্যই সর্ব্বান্তরতম ব্রহ্ম উহাদের অগ্রাহ্য বা অগোচর। ..দৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্ম সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয় কেবল কার্য্যভাগটা দেখে, তাহার কারণ কি, তাহা দেখে না বা দেখিতে পায় না।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানকে পূর্ব্ব প্রদর্শিত সম্পৎ জ্ঞান বা অধ্যস্তাদি জ্ঞান বলা যায় না এবং তৎকারণে তাহাকে পুরুষ ব্যাপারের অধীনও বলা যায় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু স্বরূপের অধীন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবস্তুর অধীন।"

অন্যত্র আছে :—"জ্ঞান প্রমাণ নিষ্পাদ্য, প্রমাণ আবার যথাভূত বস্তুস্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। অতএব তাহা বস্তুর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে। পুরুষের অধীনও নহে। অধিবৃত্তি প্রত্যক্ষীভূত

* জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট যাহাকে transcendental Philosophy বলিয়াছেন, তাহাই অনেকটা হিন্দুর প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র।

অগ্নি বস্তুতন্ত্র অধীন। অগ্নি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা হইবে।"

(বেদান্তদর্শন ১।১।৪ সূত্রের) ভাষ্য

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতি ব্রহ্ম আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানেরই বিষয়। আন্তর প্রত্যক্ষ হইতে জ্ঞানে যে সত্যের অনুভূতি বা দৃষ্টি হয়, তাহাই এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এ বিজ্ঞানের অর্থ তত্ত্ব দর্শন। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ দর্শনই (ইহাকে ইংরাজিতে perceptive knowledge বলে) বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হইতে প্রাকৃত বিজ্ঞান; আর আন্তর বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হইতে আত্ম বিজ্ঞান লাভ হয়।

দর্শন—এ বিশেষ জ্ঞানের বিষয় নহে—ইহা দ্বারা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হয় না। তবে দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণ ও যুক্তি বা চিন্তার দ্বারা যে সত্য অনুমিত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ সত্যই (ইহা ইংরাজীতে যাহাকে (abstract knowledge) বলে, তাহা হইতে জাত) প্রধানতঃ দর্শনের বিষয়। * কিন্তু অনেক স্থানে দর্শন শাস্ত্র বিজ্ঞানের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বিজ্ঞানও অনেক সময় দর্শনের অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও অনেক পার্থক্য আছে, তাহা এস্থলে ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য। দর্শনের প্রমাণ প্রণালী ও বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রণালী বিভিন্ন। দর্শনের আলোচিত বিষয় ও বিজ্ঞানের আলোচিত বিষয় বিভিন্ন। বিজ্ঞান বলিলে প্রধানতঃ বাহ্য বিজ্ঞানই মনে হয়। যাহা হউক, এখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞান জগৎতত্ত্ব কখনবা মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে, দর্শন আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসা করে, বিজ্ঞান সসীমের বিষয় আলোচনা করে, দর্শন অসীমের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান বহুত্বের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকে—দর্শন এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান কার্য্য আলোচনা করে—দর্শন তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞান প্রতিলোম যুক্তি (a posteriori) অবলম্বন করে, দর্শন অনুলোম যুক্তি (a priori) যুক্তি অবলম্বন

* জর্ম্মন পণ্ডিত স্বোএগ্‌লার (Schwegler) বলিয়াছেন —

"Philosophy is reflection, the thinking consideration of things... ..By what does philosophy distinguish itself from those sciences ?...not certainly by the difference of its matter......but by its form, by its method—so to speak by its mode of knowing". History of Philosophy, p. I.

পণ্ডিত কুঁজে বলেন—

"Philosphy is the complete development of thought .....(it) is the understanding ând explanation of all things

Cousin's History of Philosophy, vol. I. p. 23.

জর্ম্মান-পণ্ডিত ইউবারউইগ্‌ বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the science of principles." History of philosophy, vol. I. p. [illegible]

জর্ম্মান দার্শনিক হার্কট বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the elaboration of conceptions".

পণ্ডিত হরার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন,—

"Science is partially unified knowledge, Philosophy is completely unified knowledge".

একত্ব জ্ঞানে উপনীত হওয়া দর্শনের চরম উদ্দেশ্য। অতি অল্প দর্শনেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পণ্ডিত লপেনহর বলিয়াছেন,—

"Philosophy bgins where science ends. Sience cannot proceed from the known to unknown, as every thing is unknown to philosophy. Philosophy is most general rational knowledge, the first principles of which cannot be denied by other principles .

এই অর্থে বিলাতি ফিলজফি আমাদের দর্শন শাস্ত্রের অনুরূপ। সপেনহর অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"Philosophy is the sum total of general judgments—of that which is to be found in human consciousness...Its taste is to state in the abstract, the nature of the whole world and its parts"

করে। বিজ্ঞান ইহকালে মানুষের সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাসের জন্য চেষ্টা করে, দর্শন মানবকে সুখ দুঃখের পারে লইয়া তাহার সকল বন্ধন ঘুচাইয়া তাহাকে নিত্য আনন্দ দিতে চাহে। বিজ্ঞান ইহকালের কথা ভাবে—দর্শন পরকালের কথা ভাবে। বিজ্ঞান জড় ও শক্তি তত্ত্ব আলোচনা করে—দর্শন শক্তিমানকে অনুসন্ধান করে।

এইরূপে বিজ্ঞান আপনার পূর্ব্বাধিকার চ্যুত হইয়া এক্ষণে অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—দর্শনের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু বুঝি না। যাহা হউক, এ বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দর্শনের প্রথম আলোচ্য বিষয় জগৎ, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। যখন মানুষের জ্ঞান প্রথম প্রস্ফুটিত হয়, তখন জগৎই তাহার জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। যত দিন জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন মধ্যে নানা রূপ শক্তি অথবা শক্তিমানের ক্রিয়া দেখিয়া মন অভিভূত থাকে, যত দিন সেই সকল শক্তিকে অসীম—এই জগৎকে অনন্ত অসীম বলিয়া, আমাদের জ্ঞান তাহা ধারণা করিতে পারে না—যতদিন জগৎকে অসীম করিয়া আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইতে পারেনা, তত দিন দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ হয়না। অসীম ও সসীমের সীমা নির্দ্ধারণ করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাতীতের রাজ্য আরম্ভ হয়। জ্ঞান এই জ্ঞানাতীতের রাজ্যে প্রমাণ ও যুক্তি বলে কখন যাইতে পারেনা। সে রাজ্যে যাইবার উপায় দর্শন কখন স্থির করিয়া দিতে পারেনা। দর্শন কেবল জ্ঞান ও জ্ঞানাতীতের মধ্যে সীমা কি, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের ক্রম বিকাশের সহিত জ্ঞানের সীমা ক্রমেই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। জ্ঞানাতীতের রাজ্য—অজ্ঞেয় রাজ্য জয় করিয়া দর্শন ক্রমেই জ্ঞান-বিস্তার করে। জ্ঞানের সীমা যতই বিস্তীর্ণ হউক, তাহার পারে অনন্ত রাজ্য থাকিবে। জ্ঞান পরিধির পূর্ণ বিস্তার হইলেই দর্শন শাস্ত্র শেষ সীমায় উপনীত হয়—তাহার পর দর্শনের আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার পর ব্রহ্ম বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই বিজ্ঞান বা আন্তর প্রত্যক্ষ মূল সত্য উপলব্ধির শেষ উপায়—ইহাই দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত। আর এই জন্যই দর্শন নামের সার্থকতা। সে কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

মানুষ প্রথমে সমস্ত জগৎকে জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনে। তখন দর্শনের আরম্ভ হয়। তখন এই সসীম জগতের মধ্যে অসীমের বা জ্ঞানাতীতের রাজ্য কোথায় আরম্ভ, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। জগৎ জ্ঞানের সীমা কোথায়, তাহা স্থির করিবার জন্য দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। কারণানুসন্ধান বৃত্তি মানুষের অত্যন্ত প্রবল। ইহাই প্রকৃত জ্ঞানবীজ। এ বৃত্তি না থাকিলে মানুষে ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। এই বৃত্তি বশে, প্রথমে এই প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে যে নিয়ত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সে ক্রিয়ার আধার কি এবং তাহার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রথম প্রবৃত্তি হয়। এই অনুসন্ধান ফলে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কেন না কার্য্য কারণের অন্তর্গত—কার্য্য অপেক্ষা কারণের পরিসর অধিক। এইরূপে কারণের কারণ দেখিতে দেখিতে, জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে দর্শন অগ্রসর হয়। জগতের মধ্যে যে নিয়মের শৃঙ্খল জ্ঞানে ধারণা হয়—যে নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য বলিয়া জ্ঞান সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইতেই কারণের কারণ অনুসন্ধান সম্ভব হয়। যে স্থানে শেষকারণে উপনীত হয়—সেই স্থানই এইরূপ দর্শনালোচনার সীমা, বুদ্ধি আর তাহার পারে যাইতে পারে না। এই স্থানে সাধারণতঃ দর্শনের একরূপ শেষ হয়। তাহার পর জ্ঞানাতীতের রাজ্য। এই জ্ঞানের পরিধি সকলের সমান নহে—জ্ঞানরাজ্য বিস্তারের সামর্থ্য সকলের

সমান নহে। এই জন্য বিভিন্ন দার্শনিকের শেষ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন। এই জন্য দর্শনে মত ভেদ আছে। তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

যাহা হউক, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন এই নিয়ত গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে কোন অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা বা উপাদান আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা হয়। এই অনন্ত দেশকালে স্থাপিত জগত নিত্য কি সৃষ্ট— এই দেশ কালের স্বরূপ কি, ইহা জানিতে কৌতূহল হয়। যাঁহারা এইরূপে জগতের উপাদান অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন যে, জগতের সত্ত্বা আছে—পরিবর্ত্তন আবরণে আবৃত বলিয়া তাহার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কেহ বলেন, এই পরিবর্ত্তন ব্যতীত জগতের আর কোন নিত্য সত্ত্বা নাই। কেহ বলেন, এই সত্ত্বা জড়, কেহ বলেন, ইহা শক্তি। (১)

কেহ এই নানা রূপে প্রতীয়মান জগতের মধ্যে এক মাত্র সত্ত্বা আছে, ইহা ধারণা করেন। কেহ বলেন, এই জগত মূল পাঁচ ভূত হইতে গঠিত, কেহ বলেন, এই পাঁচ ভূতের মধ্যে একটী মূল ভূত— অপর চারিটী সৃষ্ট। কেহ আকাশকে, কেহ বায়ুকে, কেহ তেজকে, কেহ জলকে, কেহ বা অগ্নি বা পৃথিবীকে এই মূল ভূত বা মূল উপাদান বলিয়া ধারণা করেন। কেহ বলেন, পরমাণুই জগতের মূল সত্ত্বা— কেহ বলেন, মূল পরমাণু একরূপ—কেহ বলেন বহুরূপ। কেহ বলেন, এই পরমাণু বা ভূত—যাহাই জগতের আদি সত্ত্বা হউক, তাহা এক অনন্ত মহাশক্তির বিকাশ মাত্র। যাহা হউক, যাঁহারা জগতের মূল উপাদান অনুসন্ধান করেন,—তাঁহাদের মত সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কাহারও মতে জগতের মূল উপাদান জড়; কেহ বলেন, এই মূল উপাদান শক্তি।

জগতের মূল উপাদান যাহাই হউক, তাহাই জগতের মূল কারণ বা তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি—ইহা ধারণা হয়। এই জন্য কেহ জড়কে, কেহ বা শক্তিকে জগতের মূল কারণ বলেন এবং তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি, ইহা ধারণা করেন। সকল দার্শনিক এরূপ মূল কারণ থাকা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, কার্য্য উৎপাদন করিয়াই কারণের নাশ হয় এবং কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত, তাঁহারা জগতের কোন নিত্য উপাদান থাকা স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই জন্য বৌদ্ধদর্শনে শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ আসিয়াছে। যাঁহারা কার্য্যকে কারণের স্বরূপ বা রূপান্তর মনে করেন, যাঁহারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে একই সত্ত্বা থাকা স্থির করিতে পারেন, তাঁহারাই জগতের মূল কারণ কি, তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য কারণের স্বরূপ কি, তাহা এই সকল দার্শনিকদিগকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। এ বিষয় এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই।

অতএব জগতের মূল পদার্থ বা মূল উপাদান বা নিত্য সত্ত্বা কি? আর জগত কোন্ উপাদান হইতে উৎপন্ন? এই দুই প্রশ্নই এক। জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে কার্য্য হইতে কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়—কারণের অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হয়। কারণের কারণ কি, তাহাও যুক্তি দ্বারা বা প্রমাণের দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়। এইরূপে অবশেষে এক আদি কারণে গিয়া উপনীত হওয়া যায়। চিন্তা তখন আর এই আদি কারণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এই খানেই অসীমের রাজ্য আরম্ভ হয়। অতএব কারণ তত্ত্ব স্থির করা ও জগতের কারণ অনুসন্ধান

(১) স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

"Because something permanent is present along with what changes (i e the permanent changes in form and quality with action) the idea of permanence (i.e. the idea of matter) first appears." Through space and time matter is reached as the possibility of coexsistence and permanence" "Matter is more than causation. Its true being is in action cause and effect constitute the whole nature of matter."

করা—এই সময়ের দার্শনিকদিগের প্রথম কার্য্য। ইহাই দর্শনের প্রথম স্তর।

কারণ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দুই রূপ কারণ উপলব্ধি করেন। এক নিমিত্ত কারণ, আর এক উপাদান কারণ। জগতের উপাদান বা উপাদান কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পরে জগতের নিমিত্ত কারণ কি, তাহাই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তর। (১) যাঁহারা জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিয়া নিমিত্ত ও এই উপাদান কারণ এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন—তাঁহারা দর্শনের এই দ্বিতীয় স্তরে আসিতে পারেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যখন জগতের মূল বা নিমিত্ত কারণ নানাবিধ—জগত নানা শক্তির কার্য্য ও নানা শক্তিমানের আশ্রয়ীভূত, এইরূপ ধারণা থাকে, ততদিন এ বিষয়ে কোন দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। যখন এই জগতের এক নিমিত্ত কারণ উপলব্ধি হয়—তখনই এই তত্ত্ব আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের বিষয় হয়।

জগতের নিমিত্ত কারণ আলোচনা করিয়া কেহ বলেন, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এক—তাহারা স্বতন্ত্র নহে। কেহ উপাদানকেই নিমিত্ত কারণ বলেন, কেহ নিমিত্ত কারণকেই উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বলেন সসীম জগতাতিরিক্ত অসীম ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ, কেহ বলেন, জগতের জড় বা শক্তি উপাদানই স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বলে এই নিমিত্ত কারণ হইয়াছে। কেহ বলেন, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। যাঁহারা নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ এই নিমিত্ত কারণকে শক্তিময়, কেহ চৈতন্যময় ইহা সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণা হয়। জগৎকে সসীম সিদ্ধান্ত করিয়া কখন তাহার অসীম আধার ঈশ্বর—ইহা স্থির করা যায়। অন্য দিকে জগৎ যে কঠোর অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলে চালিত হইয়া ক্রমে পরিণত হইতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া এই জগতের জ্ঞানময় নিয়ন্তা, কল্পনা করা হয়। এইরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করাই দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তর। (২)

এইরূপ ঈশ্বর ও জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিবার পর দার্শনিক পণ্ডিত ক্রমে আত্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমার স্বরূপ কি, আমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, আর আমার সহিত জগতের সম্বন্ধই বা কি ইহা জানিবার জন্য দর্শন অগ্রসর হয়। ইহাই দর্শনের তৃতীয় স্তর। এই স্তরে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা হয়। এই আমি কি—আমি কি জানিতে পারি—আমি জগৎ কিরূপে জানিতে পারি—জগতের কতটুকু জানিতে পারি—তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হয়। আমি কি উপাদানে গঠিত—আমি নিত্য কি সৃষ্ট—মৃত্যুতে আমার ধ্বংস হয় কিনা—আমি জগৎ উপাদানে গঠিত—কি আমার সত্ত্বা স্বতন্ত্র—আমি জড়ের পরিণতি কি চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমার দুঃখের পরিণাম কি—আমার সুখ

(১) জগতে শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিয়াই নিমিত্ত কারণের অনুমান হয়। আমরা যেমন নিজে কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বা নিমিত্তে কোন কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হই—জলাধারের প্রয়োজন হইলে, জলাধারের ধারণা করিয়া, তাহা প্রস্তুত জন্য মৃত্তিকা উপাদান লইয়া তাহাকে ঘটরূপে পরিবর্ত্তন করি—সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়মিত জগৎও কেহ কোন অভিপ্রায় বিশেষ হইতে বা কোন নিমিত্তে—ইহাকে উপাদান হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন—এইরূপ ধারণা হইতে নিমিত্ত কারণের অনুমান। কেবল উপাদান স্বতঃপ্রবর্ত্তিতঃ হইয়া বিনা নিমিত্তে এরূপ কৌশলপূর্ণ জগতের উৎপত্তি করে—এরূপ ধারণা হয় না। এবং নিমিত্ত কারণ আপন উপাদানে সৃষ্টি করিতে পারে—আপনিই উপাদান কারণ হয়, এরূপ ধারণা হয়।

(২) এই দুই রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, সেই দুই যুক্তিকে ইংরাজিতে—Cosmological proof এবং Teleological অথবা Physico theological proof বলে। জগতের উপাদান কারণ হইতে মূল সত্ত্বার ধারণা ও তাহা হইতে ঈশ্বর ধারণা—Cosmological proof, আর নিমিত্ত কারণ হইতে নিয়ামক ঈশ্বরের ধারণাই Teleological proof.

চেষ্টার সীমা কোথায়—আমি স্বাধীন কি প্রকৃতির লীলা-পুত্তলি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। এই আত্মতত্ত্বজানিবার চেষ্টা হইতেই প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের অভিব্যক্তি হয়—ইহা হইতেই দর্শনের মূল ভিত্তি স্থাপিত।

এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। ইহা শঙ্করাচার্য্যের কথাতেই বলিতেছি :—

"প্রাকৃত লোকেরা অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চা বিহীন অজ্ঞ মানবেরা এবং চার্ব্বাকেরা নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছে যে, এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাস্পদ। আবার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরা বলে, ইন্দ্রিয় সমষ্টিই চেতন, সুতরাং ইন্দ্রিয় সমষ্টিই আত্মা। অন্য এক সম্প্রদায় নির্ণয় করে, মনই আত্মা—মন ভিন্ন আর কোন পৃথগাত্মা নাই। আবার বৌদ্ধেরা বলেন, ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান প্রবাহই আত্মা; পৃথগাত্মা নাই। উঁহাদের অন্য সম্প্রদায় বলেন, আত্মা কোন পদার্থ নহে, শূন্যতারই অন্য নাম আত্মা। তার্কিকেরা বলে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহাশ্রয়ী ও সংসরণশীল। সেই সংসরণশীল আত্মা কর্ম্মনিবহের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের ভোক্তা। অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আত্মা অকর্ত্তা, তিনি কিছু করেন না, প্রকৃতির কর্তৃত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। অন্যে বলেন, এই দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নামক আত্মা আছেন। এ সম্বন্ধে এ পক্ষের মত এই যে, সেই সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা সংসারী আত্মার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ।"

(বেদান্ত দর্শনের ১।১।১ শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ)

এই রূপ তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে দর্শনশাস্ত্র তিনরূপ স্তর দিয়া অগ্রসর হয়। এবং অবশেষে দর্শনের পূর্ণ পরিণতি হয়। আমাদের দেশের দর্শনের পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া এ তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কেন না, আমাদের দেশে যে সময় দর্শনের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যখন এখানে দর্শন ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সকল দার্শনিক মতেরই বিকাশ হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ, বলিয়া প্রসিদ্ধ হই লেও সে সময় সকলরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া, সকল তত্ত্বগুলিই একরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা বেদান্ত দর্শন হইতেই জানিতে পারা যায়, এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া এই তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ও ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই তত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। এইরূপ দর্শনের ক্রমোন্নতির কারণ মানব দৃষ্টির উন্নতি। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বাহ্যজগৎ আলোচনা করিতে আরম্ভ করে—যতই জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হয়, ততই অন্তর্দৃষ্টি স্পষ্টতর হইতে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি হইতেই আত্মতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয় 'অহং' ও 'ইদং' বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। প্রথমে এই 'ইদং' এর তত্ত্ব আমি ব্যতিরিক্ত অন্যতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। সে আলোচনা পরিণত হইলে তবে 'অহং' তত্ত্ব আলোচনার সময় হয়। তাহার পর যখন অহং ও 'ইদং' এই উভয় তত্ত্ব একীভূত করিয়া তাহার উপরের তত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, তখনই ব্রহ্ম আলোচনার সময় আইসে। জগৎ হইতে যে ঈশ্বর ধারণার কথা বলিয়াছি, সে শ্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণা। শঙ্কর ইহাকেই সংসারী আত্মা ছাড়া স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর ও ব্রহ্ম ভিন্ন। জগৎতত্ত্ব হইতে ঈশ্বর ধারণা হয়, কিন্তু ব্রহ্ম ধারণা হয় না। ব্রহ্মধারণাই দর্শনের শেষ পরিণতি—ইহাই দর্শনের চতুর্থ স্তর। আত্মতত্ত্ব আলোচনা হইতেই এই ব্রহ্মের ধারণা হয়। (১)

(১) আত্মতত্ত্ব আলোচনা হইতে যে ব্রহ্মের সিদ্ধান্ত হয়, ইহাকে ইংরাজিতে ontological proof বলে।

যখন দর্শন শাস্ত্র এইরূপে পূর্ণ পরিণত হয়, তখন দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব এবং এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্ব; অর্থাৎ জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, আত্মার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং জগত আত্মা ও ব্রহ্ম এই তিনের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ। একথা আরও বিশদ করিবার জন্য একটী ত্রিভুজের ধারণা করিব।

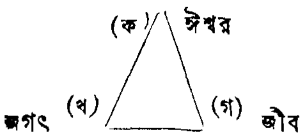

এই ত্রিভুজের উচ্চ কোণে ব্রহ্ম ও নিম্ন দুই কোণের মধ্যে এক কোণে জীব ও অপর কোণে জগৎ ধারণা করিব। আর এই ত্রিভুজের এক একটী রেখাকে ইহাদের মধ্য সম্বন্ধ ধারণা করিব। এবং জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ক, খ রেখায়, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ খ, গ রেখায় এবং ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ ক, গ রেখার অনুমান করিব। আর এই ব্রহ্ম জীব ও জগত ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ একত্রে এই ত্রিভুজে ধারণা করিব। এইরূপে সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আমরা বুঝিতে পারিব। কোন দার্শনিক কেবল জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করেন, কেহ জীবতত্ত্ব আলোচনা করেন; কেহ জগত ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্ব আলোচনা করেন। তাহার পর দার্শনিক পণ্ডিত যখন ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন, তখন ব্রহ্মই তাঁহার আলোচ্য বিষয় হয়। তাহার পর, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ তত্ত্ব অথবা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়। তাহার পর দর্শনের শেষ পরিণামে এ সকল তত্ত্বই (ক,খ,গ) দার্শনিক পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয় হয়। বলিয়াছি ত, এই সময়েই দর্শনের পূর্ণ পরিণতি হয়।

এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, দর্শনের এই কয় প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত আরও এক অবান্তর বিষয়ও দর্শনের আলোচ্য। এই বিষয়টী আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত। কেবল জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বিষয় বা তাহাদের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই দর্শন ক্ষান্ত হয় না। জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহাও আলোচনা করিতে হয়। জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহার প্রামাণ্য কি, কি উপায়ে আমাদের জগৎ, আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও দর্শনের আলোচনার বিষয়। কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত তত্ত্বের কতদূর জানা যায়—প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিতে কিরূপে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে বা কি উপায়ে লাভ করা যায়, তাহাও দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জ্ঞান নিজের স্বরূপ বুঝিয়া—নিজের কতদূর ক্ষমতা বুঝিয়া, তবে আপনার পরিসর বৃদ্ধি করিতে ও অজ্ঞেয়তার রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য জ্ঞান তত্ত্ব ও প্রমাণ তত্ত্ব আলোচনা করাও দর্শনের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এই প্রয়োজন হইতে প্রধানতঃ ন্যায় দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপে পূর্ব্বে ন্যায় শাস্ত্র দর্শনের অন্তর্গত ছিল না। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট অসাধারণ প্রতিভাবলে এই ন্যায়কেই তাঁহার দর্শনের মূল ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার দর্শনে প্রধানতঃ এই জ্ঞানতত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সম্পূর্ণ দর্শন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়েরই আলোচনা থাকে। যে সকল দর্শন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের প্রকৃত আলোচনা না থাকে, সে সকল দর্শন শাস্ত্রই অসম্পূর্ণ বা আংশিক। আমাদের দেশে একমাত্র বেদান্ত দর্শনে এই সকল তত্ত্বই পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, এই জন্যই বেদান্ত পূর্ণ দর্শন। বেদান্ত ব্যতীত আর কোন দর্শন এরূপ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নহে। বেদান্ত দর্শনে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে জগৎ তত্ত্বেরও আলোচনা আছে। ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ, জগত ও জীবের সম্বন্ধ, সকলই মীমাংসিত হইয়াছে। কি প্রমাণের দ্বারা এ সকল তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও বেদান্তে ইঙ্গিত করা

আছে। তাই বলিতেছিলাম, বেদান্ত তুল্য দর্শন শাস্ত্র আর নাই। (১) বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এস্থলে আরও এক কথা বলা উচিত যে, ইহাতে সকল বিরোধীবাদ তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়া অপূর্ব্ব যুক্তি বলে ইহার নিজ প্রতিপাদ্য মত স্থাপন করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য মূল বিষয় "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহাই সকল দর্শনের শেষ প্রতিপাদ্য। অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধান্তই দর্শনের পরিণাম।

> 'জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কং।
> স্থিতৈরেকাদশতন্ত্রৈস্তু তত্ত্বত্রয়ং নিরূপিতং॥
> পশ্চাৎ বেদান্ত সদ্যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানতঃ।
> অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতস্যাবসরঃ কুতঃ॥"
>
> অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি—উপসংহার।

অর্থাৎ (বেদান্ত ব্যতীত অপর) একাদশ প্রকার তন্ত্র (বা মত) অবলম্বন করিয়া জীবতত্ত্ব, জগৎ তত্ত্ব ও ঈশতত্ত্ব, এই তিন তত্ত্ব সেই মত যুক্তির দ্বারা নির্ণয় পূর্ব্বক বেদান্তোক্ত সদ্যুক্তি অনুসরণ করিয়া ও অদ্বৈত শ্রুতি প্রমাণ হইতে অদ্বয় ব্রহ্ম নিরূপণ করা হইলে আর দ্বৈত জ্ঞানের অবসর থাকে না।

অতএব জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহাদিগকে Ideals of reason বলিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শেষ।

বড় সাধ মনে ছিল—মরণের বেলা,
ধীরে ধীরে কাছে তুমি বসিবে আসিয়া;
ছিল সাধ—জীবনের সে সায়াহ্ন খেলা,
ঐ মুখে চেয়ে চেয়ে যাইবে ভাঙ্গিয়া!
বড় সাধ মনে ছিল, প্রাণের যাতনা
খুলিয়া দেখাব সব অন্তিম শয্যায়;
নীরবে নিভেছে কত পবিত্র কামনা,
কি মহত্ত্ব বলি দিছি নীচতার পায়।
কতই আনন্দ আশা কত হাহাকার,
লুকায়েছি হৃদি তলে শত সাবধানে,
একটী পেলেনা ঠাঁই চরণে তোমার
গেল না প্রাণের ক্ষত সুধা-পরশনে!
স্বরগে রহিলে তুমি, আমি ধরাতলে,
সব সাধ ডোবে আজি নয়নের জলে।

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

হোলি।

প্রাণ চায় আজি ফের গান গাহিবারে,
যমুনার শ্যামতটে, চারু বৃন্দাবনে!
বাঁশরী লইয়া এস ব্রজ বনমালি,
আমরা সকলে ঘিরে দিব করতালি।

(১) বেদান্ত দর্শন কয়টী মাত্র সামান্য সূত্রে গ্রথিত। ইহাতে কিছু কম ছয় শত মাত্র সূত্র আছে। এই অল্পায়তন গ্রন্থ যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ, ইহা অনেকের বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সূত্র যুগে অতি অল্প কথায় তত্ত্ব সকল আলোচিত হইত। তখন আচার্য্যের সাহায্যে এই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইত। তখন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইত না—কেবল সূত্র সাহায্যে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইত। সেই জন্য, ইহা অল্পায়তন ছিল। আজকাল দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ বিস্তারিত ভাবে তত্ত্বালোচনা হইয়া থাকে, সেরূপ ভাবে বেদান্ত শাস্ত্রে তত্ত্বালোচনা থাকিলে ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়িত। শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বেদান্ত দর্শন বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার সে গ্রন্থ বড় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। শাঙ্করভাষ্য বুঝা যে কত কঠিন, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় (২৩৮ পৃঃ) বলিয়াছেন, পূর্ব্বকার লোকগুলিকে তোমরা বুদ্ধিমান বল আর নির্ব্বোধই বল, কিন্তু তাঁহাদের এই একটী ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহারা অল্প কথায় এক একটা বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। * * তখনকার কালেরই এরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন একটী কথার মধ্যেই অনেকগুলি কথা পূরিত থাকিত।" এখন একটী তত্ত্ব বুঝিতে তাহার সম্বন্ধে অনেক অবান্তর বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করিতে হয়। সপেনহর একটী মাত্র বৈদান্তিক তত্ত্ব বুঝাইতে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য ব্যাখ্যা করিতে "World as will and idea নামক অতি বিস্তৃত তিন খণ্ডে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শন অল্পায়তন বলিয়া উহা উপেক্ষনীয় নহে, অথবা উহা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নহে, এরূপ বলা সঙ্গত হয় না।

বনফুলে বনমালা কুসুমালি গলে,
শিখি পাখা বামে বাঁকা,—পদ পাবে বলে !
যুগল রূপেতে এস, মম রাধা-শ্যাম ;
শ্রীদাম, সুদাম আর সখা বলরাম,
সকলে আসিবে আজ পরি পীতবাস,
চন্দন কুঙ্কুম চুয়া ছড়াবে সুবাস।
কুঞ্জে কুঞ্জে, কুঞ্জে আজি নীল যমুনায়,
লাল লীলা, লাল খেলা,—লাল বাসনায় !
সোণালী সন্ধ্যায় পুনঃ কুঙ্কুমে আবিরে,
শ্রীরাধা সাজায়ে দিল নীল বংশীধরে !

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৮। সত্যবেদ—শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার সঙ্কলিত। All rights reserved. সাম্য যন্ত্র। সত্যবেদে শয়তান ও এক রকম অপার্থিব গদ্যের অস্তিত্ব সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় একাধারে Manichæan এবং গদা মেঘনাদবধ। এ বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

৩৯। Keshub—The Reconciler of Pure Hinduisn and Pure Christianity. A paper read by Pandit Gour Gobind Roy Upadhaya, New Dispensation Church, at the Albert Hall, on Thursday, the 19 July, 1900. এই পুস্তিকার অধিকাংশই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নিজোক্তিতে সুবাসিত। ঈশার ধর্ম্ম কেশবচন্দ্র যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহার সহিতই হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধ নাই —কোনও ধর্ম্মের বিরোধ হওয়া উচিত নহে। গৌর গোবিন্দ বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।

৪০। আমিত্বের প্রসার—১ম খণ্ড। কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য। শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আনা। হিন্দু পত্রিকা প্রেস। "অন্তর্জগতে আমিত্ব বস্তুটী যেন মায়া-নির্যাস-নির্ম্মিত স্থিতি স্থাপকপদার্থ বিশেষ। অতি প্রসারণেই ইহার বিনাশ।" মন্বাদি-শাস্ত্র বিহিত চতুরাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কিরূপে এই আত্মপ্রসারণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এই গ্রন্থে তাহা বুঝান হইয়াছে। বিষয়টী নিতান্ত নূতন না হইলেও, ইহার আলোচনায় প্রগাঢ় ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এ গ্রন্থের আর একটী বিষয় চাতুর্ব্বর্ণ্য। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যানভঙ্গীতে বোধ হয়, চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক মাত্র ;—সমাজে যাহাকে শূদ্র বলি, সে যদি সত্ত্ব গুণভূয়িষ্ঠ হয়, তবে সেও দ্বিজাতিলভ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী। "কোন অধিকারের স্ফুরণ দেখিলেই তৎশিক্ষাসাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই।" কিন্তু এ উক্তি কি শাস্ত্রসম্মত ? আমাদের মনে পড়ে, শারীরকভাষ্যে সাধনসম্পত্তিশিষ্ট শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা যদি আধ্যাত্মিক মাত্র হয়, তবে নিষেধের কারণ কি ? গ্রন্থকার হিন্দু বলিয়াই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

৪১। গৃহস্থের আদর্শ-দেহত্যাগ।—শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাসন্তী প্রেস ময়মনসিংহ এই পুস্তকে ভক্ত লেখক তাঁহার পরলোকগতা পুণ্যশীলা জননীর চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুস্তক পড়িয়া আমরা অনেক স্থলেই বিগলিত হইয়াছি।

৪২। বৌদ্ধযুগে ভারত মহিলা বা বিশাখার উপাখ্যান। বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্রণেতা শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পালিভাষা হইতে অনুবাদিত। মূল্য ।৴৹ আনা। পারসিভিয়াল্স যন্ত্র। ধর্ম্মপদ নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এই উপাখ্যান অনুবাদিত হইয়াছে। উপাখ্যানটী তেমন মনোহর না হইলেও, দুর্ব্বুদ্ধি শ্বশুর সমক্ষে বুদ্ধশিষ্যা বিশাখার সে প্রখর তেজঃস্ফূর্ত্তি—ধ্যান করিবার সামগ্রী বটে। কিন্তু অনুবাদের বাঙ্গালা ভাল হয়

নাই। অনেক স্থলেই তাহা কর্কশ অথচ অশুদ্ধ।

৪৩। আর্য্য-জাতি।—শ্রীসতীশচন্দ্র সান্যাল (Author of Notes on History of England and Children's Arithmetic) প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। হরসুন্দর যন্ত্র। সতীশ বাবু স্বরাষ্ট্রেই তো বেশ শোভা পাইতেছিলেন, তবে আবার এ ছাই পররাষ্ট্রের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না কেন? কিন্তু হায়, পেট ছোট হউক আর বড় হউক, যশঃক্ষুধা কার নাই? সে জন্য কাহাকেও মন্দ বলিতে পারি না। তবে দুই একখানা গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থকারের জন্য বড় দুঃখ হয়। আর্য্য জাতি সেইরূপ গ্রন্থ। হণ্টার সাহেব, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এই তিন লেখকের লিখিত স্কুলপাঠ্য ইংরেজী ভারতেতিহাস তিনখানি পুঁজি করিয়া সতীশচন্দ্র এই পুঁথিটুকু লিখিয়াছেন। কিন্তু হায়, ঐ সকল ইতিহাসে ইংরেজী অক্ষরে যে সমস্ত নাম লিখিত আছে, সতীশচন্দ্র সে নামগুলিও ঠিক্ করিয়া পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। পতঞ্জলি যে "পাতঞ্জলি" অথবা চাতুর্মাস্যযাগ যে "চতুর্মাসা" হইয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্যা গার্গী বাচক্নবী—গার্গী "ভাকনাভি" হইয়াছেন। দর্শপূর্ণমাস নামক প্রসিদ্ধ হবির্যজ্ঞ "দশপূর্ণামাসা" এবং ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রকার আশ্বলায়ন মুনি সংক্ষেপে "আশ্লায়ন" হইয়াছেন। দুঃখেও পোড়া হাসি যায় না, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত একেবারে "ময়ূর বংশীয়" হইয়াছেন! বই, অথচ তার নাম ব্রাহ্মণ—জিনিষটা কি ঠাওরাইতে না পারিয়া বেচারা একটা ফুট্‌নোটে সরল হৃদয়ে ইংরেজীতে যেমন দেখিয়াছেন, তেমনই লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণাম্ পাঠে জানা যায়" ইত্যাদি! একস্থানে মাথা মুণ্ডু একটা শব্দই তুলিয়া দিয়াছেন; তাই দৃষ্টান্ত দিতেছেন; "যেমন Uranus সংস্কৃতে উর্ব্বা" ইহাতেও সাঙ্গ হইল না—"মৎস্যগন্ধার পুত্র ব্যাসিত্র" প্রভৃতিও আছে। সতীশ বাবু কেন এ বকুম্যারী করিয়াছিলেন? আর্য্যজাতির ইতিহাস তো Children's Arithmetic নয়!

৪৪। পীঢ়ী দর্ পীঢ়ী।—নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস। দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাদ। পুঁথির আবিষ্কারক ও তাহার বঙ্গানুবাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এম্ আর্ এ এস্ ইত্যাদি। মূল্য ৸০ আনা। "ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত 'সবাই' জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে।" নগেন্দ্র বাবু সেই নগরের কোনও বৃদ্ধ হিন্দুর নিকট এই পুঁথি প্রাপ্ত হন। পুঁথিখানি ঝাড়সাহী বা জয়পুরী হিন্দী ভাষায় রচিত। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলমগীর বাদশাহ নিহত হন; এই ঘটনার পরে—কত পরে, বলা যায় না—গ্রন্থখানি রচিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর অতি ক্ষুদ্র—বার পেজী তের পাতায় ইহার বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। "পীঢ়ী দর্ পীঢ়ীর অর্থ পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বা বংশাবলী"। কিন্তু ইহা এক দিল্লীর রাজবংশাবলীরই সংগ্রহ—তবঁার বংশ, চৌহান বংশ এবং ঘোরী প্রভৃতি মুসলমান বংশাবলী। নামের তালিকাই ইহাতে আছে, ইতিহাসের কথা বড় বেশী নাই। সেই সকল তালিকা প্রভৃতিও আবার প্রায়শঃ প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিসংবাদী। ইতিহাসের হিসাবে এরূপ গ্রন্থের কোনও মূল্য আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

৪৫। নির্ম্মলা। '- সামাজিক উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। বগুড়া রায় প্রেস। গ্রন্থের নাম করণটা ঠিক্ হয় নাই—কেন না, উপন্যাসের শক্তি-কেন্দ্র নির্ম্মলা নহে, ঠিরাম দত্ত। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু উপন্যাস ভাল হয় নাই। সন্ন্যাসী আর ভগবদ্গীতাই, আজ কাল উপন্যাসের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে।

BENGAL LIBRARY
7 MAY. 19.

229

সংবাদপত্র ও থিয়েটার।

সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন—সংবাদপত্র ও থিয়েটার। জিনিস দুইটি খাস বিলাতী। আগে যাহা ছিল, তাহার কথা তুলিয়া ভারতের প্রাচীন-তত্ত্ব আবিষ্কার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে ঐ দুইটি বস্তু যে ভাবে আছে এবং যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গতি, ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং ফলাফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য।

বিলাতী সভ্যতার আলোকে যেমন আমরা অসংখ্য বস্তু লাভ করিয়াছি, তেমনই সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিস দুটিও পাইয়াছি। সাধারণ লোকশিক্ষার হিসাবে, এ দুইটি জিনিসই অমোঘ বলশালী। যাহার প্রভাবে, একদিনেই সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে, তাহার শক্তি ও প্রভাব, বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাধারণতঃ, অল্প শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় ও মন লইয়া জিনিস দুইটি গঠিত। এ কথায় কেহ এমন না মনে করেন যে, তবে বুঝি আমরা সংবাদপত্র ও থিয়েটারের পরিচালকগণকে প্রকারান্তরে অশিক্ষিত সমাজের নেতা প্রতিপন্ন করিতেছি, এবং ঐ দুই বস্তুর রসাস্বাদনকারীগণকেও নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ সেরূপ প্রতিপন্ন করাও দূরে থাক্, আমরা নিজেই এ দুই জিনিসের অনুরক্ত এবং ভক্ত। অশিক্ষিতের উপভোগ্য বলিয়া যে, সেই জিনিস সুশিক্ষিতের আদরণীয় হইবে না, এমন কোন অর্থ নাই। এই দেশে এবং প্রায় সকল দেশে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা পণ্ডিতে ও মূর্খে সমান আগ্রহে উপভোগ করিতে পারে। এই সংবাদপত্র ও থিয়েটার হইতেও তাহা পাবে। কারণ সংবাদপত্রেও ডিলানী ও ষ্টেড সাহেবের ন্যায় কৃতবিদ্য উদ্যমশীল শক্তিধর পুরুষ ছিলেন এবং আছেন, এবং থিয়েটারেও গ্যারিক ও আরভিংএর ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন। এমত অবস্থায় ঐ দুই বিষয় বা বিষয়ের পরিচালক যে, সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে, আসল কথাটা হইতেছে এই যে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার জিনিসটা প্রধানতঃ Mass বা দল লইয়া পরিচালিত। দলের রুচি অনুযায়ী সাময়িক আন্দোলন হুজুগ সংস্কার ও প্রবর্ত্তন,—প্রধানতঃ এই লইয়াই ঐ দুইটি জিনিস চলিয়া থাকে। সুতরাং অনেকটা আড়ম্বর ও দোকানদারী ঐ জিনিস দুটার করিতে হয়। না করিলে আসর জমে না, খরিদদার জুটে না। এদেশের কথা দূরে যাউক, এখনও—এই শিক্ষা-সভ্যতার পূর্ণ আধিপত্য কালে, খাস ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়ও ঐ অবস্থা। তবে, সেখানে ঐ ব্যবসাদারীর সঙ্গে সঙ্গে, লোকহিতের প্রতি একটু দৃষ্টি থাকে, এখানে অনেক স্থলে তাহাও নাই। নাই বলিয়াই আমাদের দুঃখ এবং নাই বলিয়াই ঐ দুই বিষয়ের পরিচালকগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ অনুযোগ।

যাঁহারা দেশের ও দশের এবং তৎসহিত আপনার কথা দিনান্তেও একবার ভাবেন,

তাঁহারা অবশ্যই জানেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, যে ভাবে আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। তাহার সহিত আবার সংবাদপত্র ও থিয়েটাররূপ প্রবলশক্তি,—এ শক্তিও ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম রূপ—মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ-শরীর (যে টুকু এখনও আছে) আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। তবে,কালের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ফলিতেছে এবং ফলিবেও। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে একেবারে স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। সমাজের অধঃস্তন সম্প্রদায় সর্ব্বকালে—সর্ব্ব সময়েই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের একটুখানি মাত্রও পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা এবং কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই, আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণের হৃদয় ও মন লইয়া সাধারণতঃ সংবাদপত্র ও থিয়েটার পরিচালিত। সুতরাং সাধারণ যাহার প্রাণস্বরূপ, তাহার শক্তি ও প্রভাব অসীম। কারণ সাধারণ লইয়াই দেশ, সাধারণ লইয়াই সমাজ, সাধারণ লইয়াই ধর্ম্ম, সাধারণ লইয়াই সাহিত্য ও সাধারণ লইয়াই যা কিছু। সেই সাধারণের সহিত যাহার এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সে জিনিসের উচ্চ আদর্শ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে চাই; পরন্তু তাহার ব্যভিচার দেখিলে মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করি।

দুঃখের বিষয়, এই সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, ক্রমেই বড় অবনতির পথে যাইতেছে। কথাটা উল্‌টাইয়া বলিলে ইহাই বলা হয় যে, সাধারণ লোকের মতিগতি ক্রমশই বড়ই নিম্নগামী হইতেছে। সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ স্বরূপ; সাধারণের প্রতিবিম্ব অনেক সময় সেই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। একজন বিদেশী পর্য্যটক কোন দেশে উপনীত হইয়া যদি সর্ব্বাগ্রে সেই দেশের সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং থিয়েটার দেখেন, তবে তিনি অনায়াসে সেই দেশের রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা ও মনের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভ দেখিয়া, যেমন সেই দেশের অভাব অনুযোগ উপলব্ধি হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়াও তেমনই সেই দেশের শিক্ষা দীক্ষা, রুচি প্রবৃত্তি এবং মানসিক গঠন জানা গিয়া থাকে। পক্ষান্তরে থিয়েটার দেখিতে গিয়াও দেশের অবস্থা খানিকটা বুঝা যায়। সাধারণ লোক কি চায়, কি ভালবাসে, কোন্ রসের বেশী ভক্ত, তাহা সেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মুখের তৎকালীন ভাব দেখিয়া জানা যায়। আর জানা যায়, রঙ্গভূমির পরিচালক বা অধ্যক্ষের বিষয় নির্ব্বাচন দেখিয়া এবং অভিনীত অংশে নট নটীর অঙ্গভঙ্গী ও নেত্রবক্রবিকারাদি দর্শন করিয়া। বলা বাহুল্য, শ্রোতা ও দর্শকের মনের ভাব বুঝিয়া অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ 'বাহবাই'

তাঁহাদের সম্বল; সমবেত দর্শক ও শ্রোতার তুষ্টি সাধনই তাঁহাদের লক্ষ্য; আর রঙ্গমঞ্চের অধিকারী বা অধ্যক্ষের ইঙ্গিত-উপদেশ পালন করাই তাহাদের কার্য্য। তাহার বেশী তাহারা বড় একটা যায় না, যাইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, দেশের অবস্থা এবং সাধারণের মতি গতি ও রুচি প্রবৃত্তি বুঝিতে হইলে, সংবাদপত্র ও থিয়েটার দ্বারা তাহা স্বল্পায়াসে বুঝা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র ও থিয়েটারকে আমরা সমাজের দর্পণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা সমাজের দর্পণ এবং যাহার শক্তি ও প্রভাব অতি প্রবল, সে জিনিসের অধোগতি দেখিলে, স্বভাবতই মনে বড় কষ্ট হয়। আমাদের দেশের আধুনিক সংবাদপত্র ও থিয়েটারের অবস্থা দেখিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি, এবং তৎপক্ষে দেশের সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। বস্তুতঃ যিনি দিনান্তেও একবার আত্মসমাজ এবং সমাজরূপী আত্মপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য চিন্তার সহিত এই দুই বিষয়ের চিন্তা করাও এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সংবাদপত্র ও থিয়েটার, দেখিতে দেখিতে আমাদের সদরে অন্দরেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। সংবাদপত্রের ভাব ও চিন্তা, এখন অনেকের নিত্য আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আপিসের স্বল্প বেতনভোগী কেরাণী হইতে মুদি-দোকানী পর্য্যন্ত এখন সংবাদপত্র পাঠ করে; সম্পাদকীয় আলোচ্য বিষয়ে বাদানুবাদ করে; কোন 'পাবলিক্' বিষয়েও স্বাধীন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আর মোটা-মাহিনাওয়ালা মুৎসুদ্দি, সদরালা, ডেপুটী, মুন্সেফ, ইহাঁদের ত কথাই নাই;—সকলেই এখন চা ও পান-তামাকের সহিত সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুধু সহরে নহে, সুদূর মফস্বলেও এখন সংবাদপত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আদালতেও দেখিবে, বিশ্রাম-মণ্ডপে বসিয়া, উকীল মোক্তার সংবাদপত্রের কথা কহিতেছেন। আবার অন্দরেও,—নিতান্ত সে-কাল-ঘেঁসা স্ত্রীলোক ছাড়া, আধুনিক অনেক মহিলাও নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন, দেশের সকল খবরই রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রভাব, কেবলই যে পুরুষ পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা নহে, অনেক পুর-মহিলা পাঠিকাও সংবাদ পত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পক্ষান্তরে, থিয়েটারের প্রভাব ও আকর্ষণ, সংবাদ পত্র হইতেও অনেকাংশে অধিক। সংবাদপত্রের কোন কোন বিষয় পাঠে একটু ভাবিতে হয়, তাহা আয়ত্ত করিতে একটু বেগ পাইতেও হয়; পরন্তু থিয়েটারে একেবারে সমস্তই খোলাখুলি। সেখানে হাব-ভাব বিলাসিতা ভরপুর; নৃত্যগীত সুপ্রচুর; সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট নয়ন রঞ্জন; এবং আমোদ-উল্লাস চরম মাত্রায় বিদ্যমান। বিশেষ, কোনরূপ প্যাণ্টমাইম্ বা কমিক্ অপেরা অথবা প্রহসন হইলে ত আর কথাই নাই—সে সময় আর আদৌ আব্রু থাকে না। নট নটীর মধ্যেও নয়, বুঝি দর্শক-শ্রোতার মধ্যেও নয়! সকলেই তখন ভাবে ভোর;—হো হো হাসি, ঘন ঘন করতালি, আর রসায় বোলচালে রঙ্গমঞ্চ

প্রকম্পিত হইতে থাকে।—সে সব দেখিয়া শুনিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিতে হয়; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়; অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে হয়।

অথচ এই থিয়েটারই, এখন সমাজের একটা দিক্ রাখিয়াছে। ইস্কুল ইস্কুলের ছাত্র হইতে, নাগাইদ অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ পর্য্যন্ত, এখন সমান আগ্রহে থিয়েটার দেখিয়া থাকেন। থিয়েটার গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়।—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সকল শ্রেণীর লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত পুর-মহিলা, থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। থিয়েটার দেখা তাঁহাদের প্রায়ই ফাঁক যায় না। তাঁহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া মনে হয়, থিয়েটারের প্রভাব তাঁহাদের হৃদয়ের উপর বড় বেশী পরিমাণে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

কথাটা যখন পাড়িলাম, তখন একটু খুলিয়াই বলি। থিয়েটার সংশিষ্ট আমার একটি বন্ধু একদিন আমায় বলিলেন, "মহাশয়, আর দেখেন কি? এখন ঘরে ঘরে সজীব থিয়েটার হইতে চলিল। সে দিন বেলা দুইটার সময় আমি একস্থানে যাইতেছি, একটা গলির মধ্যে একটা বাড়ীর সাম্নে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ভদ্র পল্লী, গৃহস্থ বাড়ী। দিব্য পরিষ্কার অভিনয়-স্বর, আমার কাণে গেল। অনুভবে বুঝিলাম, বামা-কণ্ঠস্বর। দুইটি স্ত্রীলোক নায়ক-নায়িকা হইয়া, যথারীতি আমাদের থিয়েটারী সুরে, আমাদেরই অভিনীত একখানি নাটকের কথোপকথন আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর, একজন মৃদুস্বরে যথানিয়মে গানও ধরিলেন। আমি অবাক্ হইলাম।"—কথাটা সত্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। কারণ এইরূপ এবং অন্যরূপ প্রমাণ আমি আরও পাইয়াছি, এবং স্থলবিশেষে তাহা প্রত্যক্ষও করিয়াছি। তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীর, কাব্য ও উপন্যাস পড়িয়াই যখন Hero ও Heroine সাজিতে সাধ যায়, তখন যে থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদের মনে ঐ ভাবের আবির্ভাব হইবে এবং সুবিধা পাইলেই যে তাঁহারা ঐ অভিনয়ের একটু আধটু "কেরামৎ" দেখাইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ফল কথা, থিয়েটারে, প্রলোভন ও আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, এক হিসাবে সংবাদপত্র-পরিচালক অপেক্ষাও অধিক। সংবাদপত্র পরিচালক একটা 'ছক্'—ভাষায় আঁকিয়া দেন; আর থিয়েটারের কর্ত্তা, সেই 'ছক্', সজীবভাবে, দর্শক ও শ্রোতার হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

অথচ থিয়েটার একেবারে হেলাফেলায় সামগ্রীও নহে। আমোদের সহিত লোকশিক্ষা দিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পুঁথিগত বিদ্যায় তেমন অভ্যস্ত ও সন্তুষ্ট নহে; কিন্তু যাত্রা, থিয়েটার ও কথকতার উপদেশে অতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এখন, সময় শিক্ষা ও রুচিভেদে—যাত্রা ও কথকতা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে;—থিয়েটার তাহার স্থানে স্থায়ী আসন লইতেছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি, বিশেষ প্রয়োজন।

থিয়েটারের সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইলে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণকে একটু

উদার ও উন্নত প্রণালীতে থিয়েটার চালাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে এমন সব উচ্চ আদর্শ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে হইবে, যাহাতে লোকের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়; চরিত্র সুগঠিত হয়; এবং ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা অজ্জিত হইতে পারে। এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে একটু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; একটু পয়সার মায়া কাটাইতে হইবে;—একবার দেশের ও দশের পানে তাকাইয়া, সমাজের মঙ্গল স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সোপান উচ্চে উঠিতে হইবে। কারণ তাঁহারা যখন আনন্দ প্রদানের সঙ্গে লোক-শিক্ষকের আসন লইয়াছেন, তখন লোককে একটু উন্নত করিতে না পারিলে, আর কি হইল? বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের ন্যায়, রঙ্গ-সাহিত্যও সমাজের কল্যাণসাধন করে। মহাকবি সেক্সপিয়রের রঙ্গ-সাহিত্য,—তাঁহার অদ্ভুত নাটকাবলী,—ইংরেজী সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছে, এবং সাহিত্যের পুষ্টির সহিত, ইংরেজ-সমাজেরও অনেক উন্নতি করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের রঙ্গালয়ের এখন শিশুকাল; এখানে অবশ্যই এখন সেক্সপিয়রের মহা-নাটকের ন্যায় রঙ্গ-সাহিত্যের আশা করিতে পারি না বটে; কিন্তু তা বলিয়া ছাই ভস্ম যাহা ইচ্ছা তাহাই যে রচিত ও অভিনীত হইবে, এবং তাহার ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবে, এরূপ অভিমতিও প্রকাশ করিতে পারি না। তদপেক্ষা যদি দেশ হইতে থিয়েটার একেবারে উঠিয়া যায়, তাহাও মঙ্গল।—দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল।

পরন্তু আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে অভিনয়ের উপযোগী বহু বিষয় ত রহিয়াছে? রামায়ণ ও মহাভারত যে দেশের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ; রাম সীতা যে জাতির উপাস্য দেবতা; শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া পূজিত; সে দেশের এবং সে জাতির অভিনয়োপযোগী আদর্শ-মূলক কাব্য বা নাটক, বড় বেশী খুঁজিতে হয় না। রামায়ণ মহাভারতের পুঁজি ফুরায়, বিশাল রাজস্থান রহিয়াছে;—তাহাই ভাঙ্গিয়া অভিনয় কর। তাহাও নিঃশেষিত হয়, উচ্চ ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ কর, এবং তাহাই সুকৌশলে ও নিপুণতা সহকারে জাতীয় চরিত্রে প্রতি-ফলিত করিয়া নাট্য-কাব্য রচনা করিতে থাকো। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, বাঙ্গালী জীবনে এখন ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়াছে, এখন বঙ্গীয় সংসার বা সমাজ অবলম্বনে নাটক রচিত হইতে পারে।—যদি নিজেদের সে শক্তি বা সৌভাগ্য না থাকে,—তবে বঙ্গের কৃতবিদ্য শক্তি-শালী সাহিত্যসেবীগণকে আহ্বান কর;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাও,—নিশ্চয়ই উত্তম উত্তম নাটক বাহির হইবে;—নিশ্চয়ই সৎগ্রন্থের অভিনয়ে দেশ এক সোপান উচ্চে উঠিবে।

তা নয়, যদি কেবলই কুৎসিত নাচ-গানের প্রলোভন দেখাইয়া এবং অশ্লীল প্যান্টমাইম্ প্রহসনের বুক্নি দিয়া, দেশকে রসাতলে দিতে চাও, ত আর কথা কি,—সাহিত্য, সমাজ, জাতীয়তা এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব, এখন কিছু কালের জন্য চাপা পড়িল; আর দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতি স্বভাবসুলভ পঙ্কিল আদিরসে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী কাল হাবুডুবু খাইতে রহিল।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ;—হিন্দুর পবিত্র

অন্তঃপুরেও, ধারে ধারে ঐ বিষের বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়,—অন্তঃপুরচারিণী কুলমহিলাগণও তোমাদের রঙ্গালয়ে-অভিনীত কুৎসিত নাটকপ্রহসনের নায়ক নায়িকার অনুকরণে এখন বেশ ভূষা ও অঙ্গরাগ করিতে অভিলাষিণী! তাঁহাদের হীনবুদ্ধি স্বামিগণও তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতেছেন! এ দৃশ্য আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—আমাদের অধঃপতনের আর বাকী কি?

অথচ এই থিয়েটারের শক্তি এত অধিক যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার প্রভাবে এক দিনেই দেশ মাতিয়া উঠিতে পারে। মনে পড়ে, "চৈতন্যলীলা" "প্রহ্লাদ চরিত্র" "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি অভিনয় দেখিয়া একদিন সমগ্র বঙ্গ মাতিয়া উঠিয়াছিল। দেশে ধর্ম্মের বেশ একটা সুবাতাসও বহিয়াছিল। সহস্র উপদেশ এবং ধর্ম্ম-বক্তৃতায়ও যাহা হয় নাই, এক থিয়েটার হইতেই তাহা হইয়াছিল। এখন বোধ হয় ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাই আর ভাল নাটক হইতেছে না, ভাল অভিনয়ও হইতেছে না। অভিনয়ের সে মর্ম্মস্পর্শী গভীর ভাব গিয়াছে; এখন কেবল কথার গাঁথুনি ও পট-পোষাকের বাহার আছে। বলা বাহুল্য, থিয়েটারের এই সংক্রামতা কেবল সহরেরমধ্যে পরিব্যাপ্ত নহে,—সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহার টান গিয়াছে। অজ্ পাড়াগাঁয়েও এখন থিয়েটার হয়। সুতরাং সেখানকার স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও থিয়েটারী ঢং অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে।

থিয়েটারের অবস্থা ত এই; আর সংবাদ পত্রের? এদিকে চাহিলেও অন্ধকার দেখিতে হয়;—বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার জন্মে। এখন অধিকাংশ সম্পাদকের মনের আর সে তেজ নাই, সে স্বাধীন ভাব নাই, সে উচ্চ লক্ষ্য নাই, সে সত্যপ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতাও নাই,—কিসে কাগজ জমে, কিসে খরিদদার জুটে, কিসে হৈ চৈ পড়ে, কিসে নাম জাহির হয়, কেবলই সেই চেষ্টা ও মতলব। ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালি, বৈরতা ও দলাদলি,—এখন কোন কোন কাগজের একমাত্র অঙ্গ। সাধারণ শিক্ষা ও লোকহিত কিরূপে হইবে; সমাজ ও দেশ কিরূপে উন্নত হইবে; দেশের অভাব ও অভিযোগ কোন্ উপায়ে প্রশমিত হইবে; প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি কিসে আকৃষ্ট হইবে,—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লক্ষ্যের মধ্যে আছে, কিসে পাঠকের মনোরঞ্জন হইবে,—কিসে নিজের দুই পয়সা লাভ হইবে, আর কিসে গ্রাহক জুটিবে। অথচ ইহাঁরাই এখন লোক-শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত! ইহাঁরাই এখন দেশের "বড়লোক!"

যে বিলাতের আদর্শে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সংবাদ পত্র ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কি এই দুই প্রবল শক্তির এইরূপ অপব্যবহার হয়? বিলাতের লোকও ব্যবসাদার বটে; কিন্তু তাহারা জাতীয়তা ভুলে না, দেশ ভুলে না, সমাজ ভুলে না; মনুষ্যত্ব ভুলে না,—দেশের ও দশের উন্নতির জন্য তাঁহারা জীবন পণ করিয়া থাকেন।—তাহার সহিত আবার ব্যবসায়ও রক্ষা করেন।—ব্যবসা-বুদ্ধি কি ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত জড়িত হয় না? স্বার্থ কি পরার্থের পূর্ব্ব-সূচনা নয়?

এমন দিনে সেই চিরস্মরণীয় "সোমপ্রকাশ" (পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-

সম্পাদিত,) নব-বিভাকর,সাধারণী এবং হরিশচন্দ্রের সেই "হিন্দু পেট্রিয়টের" কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই কি দিন ছিল, আর এখন কি দিন আসিয়াছে! সেই সময়েই যেন সংবাদপত্রের মধ্যে একটা "মাহেন্দ্র-ক্ষণ" আসিয়াছিল। সে "ক্ষণ" এখন গিয়াছে,—যেন একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে! এখন এটা বিজ্ঞাপনের যুগ।

সত্যই বিজ্ঞাপনের যুগ! যার যত বিজ্ঞাপন, তার তত জয় জয়কার! ধর্ম্ম মানিবে না, মনুষ্যত্ব দেখিবে না, সমাজের পানে চাহিবে না,—যেন তেন প্রকারেণ টাকা আসিলেই হইল। সর্ব্বত্রই কেবল —"টাকা, টাকা, টাকা"-রব। এই টাকার মোহেই সাধারণ লোকশিক্ষার প্রধান দুটি অঙ্গ, এখন একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত।

সংবাদ পত্র ও থিয়েটার,—এই দুই প্রবল শক্তি ক্রমেই লোকের মন হইতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতেছে। সংবাদ পত্রের সকল কথা এখন আর লোকে বিশ্বাস করে না। কাহারও সম্বন্ধে প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ হইলে, পাঠক স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ঐ লোকটার সঙ্গে এই কাগজওয়ালার কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ বা মনোবিবাদ আছে। এইরূপে বিশ্বাস হারাইতে হারাইতে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব,—শেষে বিজ্ঞাপনেই পর্য্যবসিত হইবে। আর ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালির আধিক্য দেখিয়া, লোকের সেই "রসরাজ" ও "গুড়গুড়ে ভট্টাচার্জ্জির কথা মনে পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংবাদপত্র ও থিয়েটার সমাজের দর্পণ স্বরূপ। যে দর্পণে বাঙ্গালী জীবনের এমন কুৎসিত প্রতিবিম্ব উঠে, সে দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। সে দর্পণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া, অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া থাকাই প্রশস্ত।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে—বেদান্তবিচারে]

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদ প্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াছেন। বিশ্রামের পর সেই মধ্যাহ্নকালে তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, অষ্টাবক্র সংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলেন, সোহহং, অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়।

সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হতে পারে ?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।

"কৃষ্ণকিশোর বোল্‌তো, আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা'সে পরমভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

পাপ-পুণ্য।

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা বল্‌তে বল্‌তে সে মুক্তই হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ', এ কথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হয়ে যায়। যে কেবল বলে, 'আমি পাপী' 'আমি পাপী,' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌তে হয়, আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

মায়া না দয়া ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, হৃদে চিঠী লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া, না দয়া ?

মাষ্টার কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগ্নী, ভাইপো-ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হোলো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে গু পরিষ্কার কোর্‌তো। আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ কর্‌তে গিছলুম। কিন্তু অনেক করেছিল—এখন কিছু (টাকা) গেলে আমার মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বল্‌তে যাব ? কে বলে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(অধর সেন ও বলরামের প্রবেশ)

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হয়ে আছে।" তিনি হৃদয়ের * পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গি'ছিলুম। চাষাধোপা পাড়ায় একজন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়োবাড়ী। তারা গরিব হয়ে গেছে। এখানে

* হৃদয় ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলাস্থিত সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺ কামারপুকুর হইতে ২ ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর জন্মভূমিতে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

পায়রার গু, ওখানে শ্রেওলা, এখানে ঝুর্ ঝুর্ করে বালি সুর্কি পড়্ছে; অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, এর মানে কি, বল দেখি?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার কর্তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ, এ সব মান্তে হয়।

"মৃন্ময় অধারের চিন্ময়ী দেবী"।

(মাষ্টারের প্রতি) আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্লুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জল্ জল্ কর্ছে। আবির্ভাব মান্তে হয়।

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গে'ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ী দর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।"

ভক্তের সুখ দুঃখ।

এতক্ষণে তাঁর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজ-বিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিলো। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ কর্লেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, কিন্তু সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাট্তে নিয়ে গি'ছিলো। একজন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভাল বাস্লেন—কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্লো না।

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। তাই যে ক'দিন আছে, দেহ ধারণ কর্তে হয় যেমন এক জন কাণা গঙ্গাস্নান কর্লে তার পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচ্লো না। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মভোগ।

মাষ্টার। যে বাণটা ছোড়া গেছে, সে বাণের উপর আর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখন ও যাবার নয়। দেখনা,—পাণ্ডবদের অত বিপদ। কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায়?

"বেঙ্গল্ গেজেট" ও "সমাচার-দর্পণ"।

(নব্যভারত, বর্ত্তমান বর্ষের (১৩০৭ সালের) আষাঢ়, ১৪০ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।)

"বেঙ্গল্ গেজেটকে" সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা বার্ত্তাবহ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার কামনা ও প্রয়াস, প্রকৃষ্ট প্রণালীতেই চলিয়াছিল। "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"-নাম্নী ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকায়, "কলিকাতা রিভিউ" নামক মাসিক ইংরাজি পত্রে, "সমাচার দর্পণ"-নামক ইংরাজি ও বাঙ্গালা-বার্ত্তা-বিষয়ক পত্রে এবং "সমাচার-চন্দ্রিকা"-নামিকা পত্রিকায় সেই স্মরণাতীত সময়েও কত-মত প্রকারেই আন্দোলন ও অনুশীলন হইত, তাহার গণনা হয় না, বলিলেও চলে। বিশেষতঃ, শেষোক্ত পত্রিকা-দ্বয়ে তুমুল, বহুল ও বিপুল কোলাহল, প্রচলিত ছিল। এক বারের ঘটনা, পশ্চাৎ নিবদ্ধ করা যাইতেছে।

এক জন সংবাদপত্রিকার পাঠক, "সমাচার-চন্দ্রিকা"-নামক চতুর্থ সমাচার-পত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন,—

"শ্রীযুক্ত "চন্দ্রিকা"-প্রকাশক মহাশয়েষু।—

"বাঙ্গলা-সমাচার-পত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম, গত ৬৮০ (ছয় শত আশি) সংখ্যক "দর্পণে" অনেক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে,—

"এই অপূর্ব্ব 'সমাচার-দর্পণাবতারের' পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে, 'বাঙ্গালা-সমাচার-পত্র'-নামে কোন পদার্থ আছে।"

"উত্তর।—ঐ লেখক মহাশয়, বুঝি, এতন্নগরবাসী না হইবেন। কেন না, ৺ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন, তিনি "বাঙ্গলা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা, নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রকাশক, সাংসারিক কোন বিষয়ে বিশেষ বাধিত হইয়া, তাঁহার নিজ ধাম বহরা গ্রামে গমন করিলে, সে পত্র, রহিত হয়। তৎপরে দর্পণাবতার, ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ, প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

—সমাচার-চন্দ্রিকা (১)।

"সমাচার-চন্দ্রিকা" হইতে উল্লিখিত অংশ, "সমাচার-দর্পণ"-সম্পাদক মহাশয়, স্বীয় পত্রিকায় ১৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ১৯৪ পৃষ্ঠায় স্বীয় (সম্পাদকীয়) অভিপ্রায়, এইরূপে ব্যক্ত করেন,—

"চন্দ্রিকায় এক পত্র-লেখক, "দর্পণে" প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন—"দর্পণ" যে, প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। এবং তিনি কহেন যে, "দর্পণ" প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি, প্রথম "বাঙ্গালা গেজেট" নামক সম্বাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।"

"সমাচার-চন্দ্রিকার" পত্র-লেখক মহাশয়, "বেঙ্গল্ গেজেটের" সম্পাদক' গঙ্গাধর' ভট্টাচার্য্য-স্থলে-"গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য" করিয়াছিলেন। ইহাই,' তাঁহার একমাত্র ভ্রম। তাঁহার অন্য কোনই ভ্রম নাই। যিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "সমাচার-দর্পণের" সম্পাদকের পদে. ব্রতী ছিলেন, তিনিই কেবল "দর্পণের" প্রাথম্য ও প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "সমাচার-দর্পণের" প্রথম সম্পাদকবর্গের সে মত ছিল না। ইহার তিন বৎসর পর (১৮৩৪ খ্রীঃ) যখন

(১) "সমাচার-দর্পণ"—১৮৩১ খ্রীঃ, ১১ই জুন, (১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ), ১৯১ পৃষ্ঠা।

"সমাচার-দর্পণের" বন্ধ হইবার কথা উঠিয়াছিল, তখনও "সমাচার-চন্দ্রিকার" সম্পাদক মহোদয়, "সমাচার-দর্পণের" তিরোধান-নিবন্ধন বিস্তর বিলাপ ও আক্ষেপ সহকারে দৃঢ়তা পূর্ব্বক, লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—

"সমাচার দর্পণ" উপকারক কাগজ। ইহার পূর্ব্বে "বাঙ্গালা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে; অতি শৈশব-কালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব "সমাচার-দর্পণ" প্রাচীন এবং বিবিধ-সংবাদপ্রদ"।—'চন্দ্রিকা'। (২)

"ইহাতে আমাদের এই উত্তর যে, আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে, "বাঙ্গালা গেজেট" নামে পত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। 'চন্দ্রিকার' পত্র প্রেরক মহাশয়, যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ বাঙ্গালা গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তবে "দর্পণের" প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপৌর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে, তবে ১৮১৮ সালের যে ইংলণ্ডীয় সম্বাদ-পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয়, তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতু ভারতে বঙ্গের মধ্যে বঙ্গভাষার যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়, তন্মধ্যে "দর্পণ" আদিপত্র, ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া তৎ সম্বন্ধে অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে, অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।" (৩)

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন "সমাচার-দর্পণের" প্রথম প্রকাশ হয়, তাৎকালিক সম্পাদক মহাশয়, ভ্রম-ক্রমে বা স্বপ্ন দর্শনেও ঐ কথা, লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। প্রথমাবধি চতুর্থ বৎসরের প্রাচীনতম 'ফাইল' সকল আমরা দেখিয়া, এই কথা বলিতেছি।

কোন কোন ঐতিহাসিকও, ঐ ভ্রমের বিষম আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল মহাশয়ের "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসেও" বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত ভ্রান্তিময় উক্তি, বিরাজিত! প্রস্তাবিত অংশ এইরূপ,—

"তাঁহারই (লর্ড ময়রারই) উৎসাহদানে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র, সমাচার দর্পণ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। (২৩শে মে, ১৮১৮)"। (৪)

"সমাচার দর্পণ" যে, প্রথম বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ নহে, তাহার প্রমাণ, পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলে ডব্‌লিউ গর্ডন্ ইয়ঙ্ সাহেব, পাদরিপুঙ্গব লঙ্ সাহেবকে বঙ্গীয় পুস্তকাবলী ও বার্ত্তাবহ-সমূহের ইতিহাস সঙ্কলনে অনুরোধ করেন। প্রথমোক্ত সাহেবের ন্যায়ানুগত প্রার্থনায় লঙ সাহেব, যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

প্রমাণান্তরও প্রদর্শিত হউক না কেন? সুতরাং মূল ইংরাজি তুলিয়া দিতে না পারিলে, আমাদের নিজের উক্তিতে লোকের আস্থা-স্থাপনার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব লঙ্ সাহেবের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত ঐ ঘটনার প্রসঙ্গ, উপস্থিত ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইল। সেই বৃত্তান্তটী এই,—

(২) সমাচার দর্পণ, (১৮৩৪ খ্রীঃ) ৫৪৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

(৩) সমাচার দর্পণ—১৮৩১ খ্রীঃ, ১১ই জুন, ১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) ২১৪ পৃষ্ঠা।

(৪) প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস, ঊনবিংশ সংস্করণ, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

"In 1816, the 'Bengal Gazette' was started by Gangadhar Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and various other works, illustrated with woodcuts; the paper was short lived." (১)

এখন সকলেই, বুঝিতে সমর্থ হইলেন—"বেঙ্গল্ গেজেট" প্রথম সংবাদ পত্র। যথা—

পত্রিকার নাম।	প্রকাশাব্দ।	সম্পাদকের নাম।	বক্তব্য।
১। বেঙ্গল গেজেট (সপ্তাহিক)।	১৮১৬ খ্রীঃ (১২২৩ সাল)	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।	ইহার মাসিক মূল্য ১৲ টাকা। ১ (এক) বর্ষ স্থায়িত্ব।
২। সমাচার দর্পণ।	১৮১৮ খ্রীঃ (১২২৫ সাল)	মার্শম্যান কে'রি; ওয়ার্ড প্রভৃতি।	মাসিক মূল্য—ঐরূপ
৩। সংবাদ কৌমুদী।	১৮১৯ খ্রীঃ, জুলাই	রাজা রামমোহন রায়।	ইহা, বহু কাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় পত্রিকার কথা বলিতে হইবে।

"সমাচার-দর্পণ।"

(দ্বিতীয় সংবাদপত্র)।

১। প্রকাশ সময়— { ১২২৫ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮১৮ খ্রীঃ, ২৩শে মে। } শনিবার।

২। বন্ধ হওয়ার কাল—১২৪৮ সাল (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।)

৩। সম্পাদকগণ। যথা,—

(ক) ডাক্তার কেরি
(খ) ,, মার্শম্যান্
(গ) ,, ওয়াড
} শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। ১৮১৮ হইতে ১৮৪২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত (৬)

(ঘ) কলিকাতান্তর্গত সান্‌কিভাঙ্গার এক ব্যক্তি। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

(ঙ) অজ্ঞাতনামক কোন ব্যক্তি, ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

(চ) পুনরায় শ্রীরামপুরের পাদরিবর্গ। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ।

৪। মাসিক মূল্য—১৲ (এক টাকা)। সুতরাং বার্ষিক মূল্য ১২৲ (বার) টাকা।

৫। স্থায়িত্ব, ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বৎসর।

৬। "সমাচার-দর্পণের" মুকুট-শ্লোকঃ—
"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু, 'সমাচারস্য দর্পণে'॥"

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার উদ্ভব। ঐ অব্দ, তিন প্রধান কারণ-নিবন্ধন খ্যাতিমান্ ছিল। যথা:—

১ম। শ্রীরামপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠা।

২য়। স্কুল্‌বুক্ সোসাইটির স্থাপন।

৩য়। এই "সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তি।

৪র্থ। শ্রীরামপুর হইতেই ইংরাজি ভাষার বহুল প্রচার হয়।—প্রথমটী দ্বারা জনকলীর মানব-নিচয়ের অশেষ উপকার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে অ্যারভের—

(১) Descriptive Catalogue of Bengali works, by Rev. J. Long, 1855, p 66.

(৬) তৃতীয় সম্পাদক মহাশয়, এই সময় পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন।

বিশেষতঃ,বঙ্গের—বিবিধবিষয়িণী, উপকারকারিণী একটী মহতী সমিতির সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তৃতীয় বা শেষোক্ত ব্যাপারে বঙ্গ-সাহিত্য, কতই উপকৃত, প্রবন্ধের অনুশীলনে তাহারই প্রতীতি করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের" উৎপত্তির পূর্ব্বকথা, কথঞ্চিৎ কৌতূহলোদ্দীপক। হিন্দু মুসলমান, জৈন বৌদ্ধ, শিখ মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতীয়-প্রজা সাধারণের বিষয় বলিব না। কেন না, তাহারা একে বিজিত, তাহাতে আবার বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। কিন্তু রাজপুরুষগণের সজাতীয়,সুশিক্ষিত,অথচ তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ী পাদরী-পুঙ্গব-পুঞ্জেরও গবর্ণমেণ্টের প্রতি কীদৃশ ভয়ের ভাব ছিল, তাহার পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি।

এতক্ষণের পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিবৃত করিবার অবসর ঘটিল। বর্ষান্তে উক্ত "সমাচার-দর্পণেই" যে ইতিহাস, প্রকাশ পাইয়াছিল, আমরা অশেষ আয়াসে, প্রভূত প্রয়াসে তাহার সারোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি। এই বার সেই অংশটী, বিদ্যমান ক্ষেত্রে উত্থাপিত হউক। যথা,—

১২২৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে) তারিখে শনৈশ্চর বাসরে 'সমাচার-দর্পণ'-তরুর প্রথম বীজ বপন হয়। তদনন্তর উক্ত "বৃক্ষ, অঙ্কুরিত হইয়া, দ্বি-পত্র—ত্রি-পত্র—শাখা, পল্লব, পুষ্পাদি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া ও দৃঢ়মূল হইয়া-ক্রমে ক্রমে সংবৎসরে ফলবান্ হইয়াছে এবং নিকটস্থ—দূরস্থ—ভাগ্যবান্ বিদগ্ধ লোকেরা,ও তৎ-সহবর্ত্তী শিষ্ট লোকেরা, আদর পূর্ব্বক তাহার ফলভোগ করিতেছেন। ইহাতেই আমাদের ("সমাচার-দর্পণ"-সম্পাদক-বৃন্দের) পরিশ্রমের সার্থক্য হইল।

"কিন্তু 'সমাচার-দর্পণের' প্রথমারম্ভকালে আমাদের মানসিক উদ্বেগ এই ছিল যে, এতদ্দেশে এই রীতি, কখন ছিল না (৭)। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা, "সমাচার-দর্পণ" গ্রহণ করিবেন না।

"এখন আমাদের সে উদ্বেগ শান্তি হইল। আমরা এই বলবতী আশা করি যে,এ-বিষয়ে আমরা কখনও অকৃত্য হইব না ও ইহাতে নিবৃত্তও হইব না। এই "সমাচারদর্পণে"—

(১) কেহ, কেবল 'রাজনীতির সমাচার' জানিতে চাহেন।

(২) কেহ, কেবল প্রাচীন ইতিহাস,

(৩) কেহ, চোর-ডাকাতির সমাচার,

(৪) কেহ, যুদ্ধাদির সমাচার,

(৫) কেহ, নানা দেশের সমাচার জানিতে বাসনা করেন।

"অতএব নানা লোকের নানা অভিপ্রায়। এক ব্যক্তির অভিমত সমাচার দিলে, অন্যের অনভিমত হয়। এই প্রযুক্ত সকলের অভিমত সকল প্রকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমাচার লিখিয়াছি। এই এক বৎসরে এই "সমাচার-দর্পণে" যাঁহারা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে অনুগ্রহ, আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না এবং আগামী বৎসরে এমন পরিশ্রম করিব যে, তাঁহারা অনুগ্রহানুরূপ তুষ্টিপ্রাপ্ত হন।" (৮)

তৎকালে শ্রীরামপুরই, খ্রীষ্টান মিসনরি-

(৭) কথাটা ভুল। যেহেতু, এই ঘটনার সংঘটনের অগ্রেই সংবাদ পত্র চলিত। সমাচার-পত্রিকা প্রচারের রীতি,ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ছিল। কেন না, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল গেজেটও" উদ্ভূত হইয়াছিল।

(৮) "সমাচার-দর্পণ"—১ম বর্ষ, ৫২ সংখ্যা। ১২২৬ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮১৮? ১৫ই মে) দেখুন।

দিগের নিবাসের প্রধান স্থান ছিল। শ্রীরামপুরই, তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র। এই শ্রীরামপুরই—ডাক্তার মার্শম্যান্, ডাক্তার ওয়ার্ড, ডাক্তার কেরি প্রভৃতি বিদ্যা-ধন পাদরি-পুঙ্গবগণের লীলা-খেলার কেন্দ্র বলিলেই হয়। বহুকালাবধি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বার্ত্তাবিষয়িণী পত্রিকার প্রচারের বলবতী বাসনা, ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের হৃদয়-মধ্যে বিহার করিতেছিল। ইতঃপূর্ব্বে "বেঙ্গল্ গেজেটের" প্রসঙ্গ, কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার আয়ুঃ শেষ না হইলে, হয় তো তাঁহাদের এতটা ব্যগ্রতাই ঘটিতে পাইত কি না, সংশয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালা অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে পাদরিদের আন্তরিক আতঙ্ক, অত্যন্তই অধিক। "রাজনীতিতন্ত্র" বঙ্গভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইতে থাকিলে, পাছে রাজপুরুষদের সরোষ বিষ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, এই এক আত্যন্তিকী আশঙ্কা, তাঁহাদের অন্তর অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল কল্পনা-মূলক মানসিক বিভীষিকায় তাঁহাদিগকে বিচলিত করে নাই। সেটী, তাঁহাদিগের আন্তরিক আশঙ্কা। তাঁহাদিগের অন্যতম উদ্যোগ-কর্ত্তা ডাক্তার কেরি সাহেবকে একাদিক্রমে ২৫ (পঞ্চবিংশ) বৎসর-ব্যাপক কালে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ পুঙ্গব-পুঞ্জের সমক্ষে ও পরোক্ষে এক প্রকার নজরবন্দী ভাবে যাপিত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিকতম ভীত, চকিত, এবং ত্রস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী পাদরিপুঞ্জ, পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। যথা :—

(ক) তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত সংবাদপত্রিকা-সমূহে তদা ভাবম এই "সমাচার-দর্পণের" উদ্দেশ্যের ও উহা কি প্রকারের উপকরণে পরিপুষ্ট হইবে, তাহার তাৎপর্য্য, বিজ্ঞাপনভাবে মুদ্রিত করিতে থাকিলেন। কিন্তু কি বিস্ময়েরই বিষয়—তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—কার্য্য-কালে উক্ত বিজ্ঞাপকদিগকে তিরস্কৃত, শাসিত বা কোনরূপেই দণ্ডিত হইতে হইল না। এইটীই প্রথম উপায় ছিল। দ্বিতীয় উপায়ের বিষয়, পরে উল্লিখিত হইতেছে। (খ) পত্রিকা প্রচারের পূর্ব্ব-রজনীযোগে (১২২৫ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীঃ ২২ শে মে, শুক্রবার) কেরি সাহেব, শেষ প্রুফ সন্দর্শন-সময়ে সান্ধ্য সমিতিতে পুনরায় পূর্ব্বতন বিভীষিকার কথা উত্থাপিত করিলেন।

ডাক্তার মার্শম্যান সাহেব, সেই সংস্রবাধীন কথা প্রসঙ্গে ধীর ভাবে স্বীয় মানসিক ভাব অভিব্যক্ত করিয়া এই প্রস্তাব করেন যে,—

"আগামী কল্য শনিবার প্রাতঃকালেই গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে "সমাচার-দর্পণের" সূচীগুলির সহিত একখণ্ড পত্রিকা, আদর্শ (নমুনা)-স্বরূপ প্রেরণ করা যাউক।" সেই প্রস্তাব, যথারীতি কার্য্যেই পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু, কি সৌভাগ্য দেখ, উচ্চপদস্থ কোন রাজপুরুষই (কর্ম্মচারীই), কোন প্রকার আপত্তি বা অসম্মতি বিজ্ঞাপিত করিতে সাহসী হন নাই! বরং গবর্ণর-জেনারেল, স্বহস্তে সেই সুযোগ্য সম্পাদক-প্রবরকে একখণ্ড পত্র লিখিলেন। সেই চিঠিতে তিনি সরল অন্তরেই প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

"It is salutary for the Supreme authority to look to the control of Public Scrutiny."

"সমাচার-দর্পণে" উহার যে ইতিহাস প্রকাশিত হয়, যথাস্থানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

পার্শী ও ইংরাজী ভাষা, যখন "দর্পণের" অঙ্গে প্রতিফলিত হইত, তখনকার এক রূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কেরি সাহেব, এই পত্রিকা-প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায় লিখিত রাজনীতি-সংক্রান্ত এরূপ সংবাদপত্র ("সমাচার-দর্পণ") রাজপুরুষদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে না। কেন না, উহা বঙ্গভাষায় আলোচিত হইতেছে। এইরূপ রাজনৈতিক আলোচনায় আপামর ব্যক্তি, রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া এদেশে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ইত্যাদির সৃজন করিতে পারে।

লঙ সাহেব, ভ্রম-ক্রমে "সমাচার-দর্পণ" না লিখিয়া "শ্রীরামপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন। এই ভ্রান্তির হেতু কি, নির্দ্দেশিত হইতেছে। "কলিকাতা রিভিউ" (৯) পত্রে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" অর্থাৎ 'শ্রীরামপুরের দর্পণ' লিখিত আছে। এখানে "সমাচার-দর্পণ"-কে সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল "দর্পণ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার পরে ৫(পাঁচ) বৎসর অতীত হইলে "দর্পণ অব্ শ্রীরামপুর" শব্দটী, সাহেব কর্ত্তৃক "শ্রীরামপুর দর্পণ" আকার ধারণ করে, এই পত্রিকা (সমাচার-দর্পণ) খানি, ফলতঃ শ্রীরামপুরেরই "দর্পণ" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"সমাচার-দর্পণ" সাধারণ পাঠকগণের এমন কি, হিন্দুভাবাপন্ন গ্রাহকবর্গের বক্ষ-বর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটী, গ্রাহকশ্রেণীর তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করায় ইংরাজ-সমাজ, বঙ্গবাসিবৃন্দের বদন-মণ্ডল উজ্জ্বল দেখিলেন। তখন রাজধানী ও ইহার বেষ্টনকারী স্থান-সমূহে সংবাদপত্রের ডাক মাসুল ।০ (চারি) আনা ধার্য্য ছিল। লর্ড হেষ্টিংস্ সমীপে উক্ত ডাকমাসুল কমাইবার জন্য আবেদন প্রেরিত হইলে, তিনি রাজধানীতে (কলিকাতায়) আসিয়া উহার সুবিধা করিয়া দেন। ৴০ (এক) আনায় মাশুল দিলেই, প্রতি সংখ্যা বিলি হইবে, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল (১০)।

শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরী, উক্ত মার্শম্যান (সমাচার দর্পণের প্রথম সম্পাদক), সাহস করিয়া উহার প্রথম সংখ্যা, লর্ড হেষ্টিংসের গোচর করিলে, তিনি রাজোচিত অভ্যর্থনায় তাহার সমাদর করিয়াছিলেন।

"সমাচার-চন্দ্রিকা" "দর্পণের" প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও, "দর্পণের" অন্তর্দ্ধানের প্রস্তাবে কিরূপ দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, বক্ষ্যমাণ বিবরণ, তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

"সমাচার-দর্পণের রহিতের কল্পবিষয়ক" এক প্রবন্ধে চন্দ্রিকা-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

---

(৯) Calcutta Review, 13th vol, 1850 A.

(১০) এই বৎসরেই ডাক্তার মার্শম্যান সাহেব কর্ত্তৃক "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার" প্রচার আরম্ভ হয়। প্রথমে উহা প্রত্যেক মাসে প্রচারিত হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেও উহা ঐরূপেই প্রচারিত হয়। কিয়দ্দিনানন্তর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উহা ত্রৈমাসিক আকার ধারণ করিয়া লোকনয়নের গোচর হয়। তৎপরে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই সপ্তাহে সপ্তাহে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" গৃহে গৃহে উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়া যাইত। এই ভাবে ইহা বহু কাল চলিয়া "ষ্টেটস্ম্যানের" অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে।

"সমাচার দর্পণ"রহিতের কল্প। "আমরা অবশ্য স্বীকার করি—"সমাচার দর্পণ "উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে, এ সকলের অগ্রজ, অনুমান হয়। ইহার পূর্ব্বে "বাঙ্গালা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র, সর্জ্জন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব "সমাচার দর্পণ" প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ। যেহেতুক, এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুর, দেশাধিপতি। তজ্জাতি, সর্ব্বত্র বিচারপতি ইত্যাদি নানাবিধ প্রধান প্রধান পদস্থ। বঙ্গদেশস্থিত ইংলণ্ডীয় মহানুভবদিগের দ্বারা "দর্পণ"-কার, যে প্রকার সমাচার-সংগ্রহ করিবার সমর্থ, তাদৃশ প্রকার অন্যের হওয়া ভার। অপর, "সমাচার দর্পণের" প্রতি, পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের যে প্রকার আশঙ্কা ছিল, তাহা কালে অনেক লোপ হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তার "কেরি" সাহেব, ঐ কাগজের স্রষ্টা। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষ্টা, এই প্রধান কারণ। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে মিসনরি সাহেবেরা, অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, যেখানে লোক-জনতা হইয়াছে, সেই স্থানেই বিতরণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে বাহুল্য রূপ নাই। যথা কথঞ্চিৎ আছে। সে যাহা হউক, সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে অনেকেরি মনে উদয় হইল, কেরি সাহেব, এই এক ফিকির করিয়া খ্রীষ্টিয়ান মত লওয়াইবার উপায় করিয়াছেন। এই সকল কারণে সমাচার দর্পণ সর্ব্বত্র বিশেষরূপে মান্য হয় নাই। দ্বেষে-চন্দ্রিকাদি কাগজ হইলে, নানা প্রকার বাদানুবাদ হওয়াতে এবং ঐ কাগজে মানাধিপতি শ্রীযুত জান্ মার্সমেন্ সাহেবের বিশেষ পরিশ্রম ও বিদ্যা বুদ্ধি-প্রকাশে, কাগজের পূর্ব্ব-রাষ্ট্রীয় দোষ, অনেক মোচন হইল; এবং গ্রাহকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদ্যপিও আমারদিগের ধর্ম্ম পক্ষের বরাবরি বিপক্ষ, তথাচ "দর্পণ" সকলেরি পাঠ্য। যে হেতুক এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচার করা হয় মাত্র। পরে "চন্দ্রিকা" কাগজ, বারত্রয় প্রকাশ হওয়াতে, "দর্পণে" কিঞ্চিৎ 'চিতি' পড়িয়াছিল। তৎপ্রকাশক মহাবিবেচক, তৎক্ষণাৎ অম্লরসে "চিতি"-রূপ কলঙ্ক মোচন না করিয়া, অপূর্ব্ব মিষ্টরসে "দর্পণের" দোষ দূর করিলেন, অর্থাৎ ইংরেজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে, ইংরেজ বাঙ্গালি, উভয় জাতীয়ের নিকট সমাদৃত হইল। ইহাতে গ্রাহক বৃদ্ধি হইবায় প্রকাশক মহাশয়, মহাসাহসিক হইয়া বার-দ্বয় "দর্পণ" দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রের ঊর্দ্ধ মূল্যাধিক হইল না। যদ্যপি সে তরজমায় পরিশ্রম ও ক্ষমতা লোক বিবেচনা করেন, তবে "দর্পণের" মূল্য তিন টাকা দিলেও, ক্ষতি বোধ হয় না। যদিও আমারদিগের চিরকালের বিরোধী, তথাপি আমরা স্বরূপ কথা অবশ্যই কহিব। এমত সুদৃশ্য "দর্পণ", রহিত হইবার সংবাদ শুনিয়া, আমরা, মহা দুঃখিত হইলাম। "দর্পণ"-কার মহাশয়, গত ৫ই নবেম্বর ২১শে কার্ত্তিক বুধবাসরীয় "দর্পণে" লিখিয়াছেন যে, ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়াতে, অনেক গ্রাহক, "দর্পণ" পরিত্যাগ করিয়াছেন। একারণ এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত, তাহা

রহিত হইবেক। পরে এক টাকা মূল্যে এক বার অর্থাৎ কেবল শনিবারে প্রকাশ করা যাইবেক। ইহাতেও যদি গ্রাহকগণের আনুকূল্য বোধ না হয়, তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে “দর্পণ,” দর্পকর্তা-সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে।

এতদ্বিষয়ে “দর্পণ”কারের খেদোক্তিতে আমরাও, মহা-খেদিত হইলাম। কেন না, “দর্পণ”কার, অতি দূরদর্শী এবং এক প্রকার আমারদিগের সকলেরি পরামর্শী। যেহেতুক, “দর্পণ”, যে ধারায় প্রথমতঃ প্রকাশ হয়, তদ্দৃষ্টে আমাদিগেরও কাগজ প্রকাশ পাইল। অপর, “দর্পণের” মূল্য অধিক করিলে অনায়াসে করিতে পারিতেন। কিন্তু বিচক্ষণ প্রকাশক, দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুই টাকা মূল্য করিলেও, কেহ, দুর্মূল্য-বোধে ত্যাগ করিতেন না। তথাচ তাহা না করিয়া ১॥০ টাকা করিয়া-লেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ, বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। “দর্পণ”-কারের অভি-প্রায়, কেবল ‘দর্পণ’-নির্ব্বাহোপযুক্ত ধন হইলেই চিরদিন “দর্পণ” প্রকাশ পাইবেক। এক্ষণে এ সকল মন্ত্রণা, যন্ত্রণা বোধ হই-তেছে। আমরা অদ্যাপি এমত স্বরূপ সম্বাদ পাই নাই; কিন্তু পরে কি হয়, বলা যায় না। যাহা হউক, সমাচার-কাগজের দ্বারা মফঃস্বল বাসিদিগের উপকার হইতে-ছিল, তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। ইহা, অতি খেদের বিষয়। কাগজ-প্রকাশকেরা, গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি দীন, তাহার সন্দেহ কি? এই দীন, ধনহীন ব্যক্তিগণ, আপনা-দিগের লভ্য ত্যাগ করিয়া কেবল কাগজ-প্রকাশোপযুক্ত ধন লইয়া, দেশের লোক-হিতার্থ সমাচারের কাগজ প্রকাশ করিতে-ছেন। গবর্ণমেণ্ট, দেশাধিপ হইয়া কিঞ্চিৎ ডাকমাশুল ন্যূন, স্বীকার করিতে পারি-লেন না। ন্যূন করা দূরে থাকুক, দ্বিগুণ করিবার কি আবশ্যক হইয়াছিল? কি গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে কোষশূন্য হইয়াছে? যে কোন প্রকারে হউক না কেন, ধনসঞ্চয় অবশ্যই কর্ত্তব্য। তাদৃশ সময় এক্ষণে উপ-স্থিত হয় নাই। অতএব প্রার্থনা, এতদ্দেশীয় ভাষায় যে একটা কাগজ প্রকাশ হয়, ইহারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিলে, ইহার প্রকাশকেরা এবং তৎপাঠকবর্গ, বিশেষ উপকৃত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি এক শত টাকাও, প্রতি মাসে সম্ভব নহে। এই অল্প ধনের নিমিত্ত কেন রাজ্য-শুল্ক লোককে দুঃখিত করিবেন? আমরা অনুমান করি, শ্রীশ্রীযুক্ত লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর, এ রাজধানীতে আগমন করিলে, অবশ্যই ইহার বিহিত হইতে পারিবেক।”—(চন্দ্রিকা)।* (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বার-ভূঞা।

লক্ষ্মণ মাণিক্য।

ভূঞা অবস্থিতি কালে, রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহার কতিপয় সাধারণ পাঠক-গণের অবগতি জন্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* সমাচার দর্পণ, ১৮৩৩। ২৩এ নবেম্বর (১২৪০ সাল, ১লা অগ্রহায়ণ) ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

বঙ্গীয় যে দ্বাদশ ভৌমিক আকবর বাদসাহের সমকালে অভ্যুত্থিত হইয়া বঙ্গে স্বাধীনতা ধ্বজা প্রোথিত করিবার জন্য, বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মহাত্মা লক্ষ্মণ মাণিক্য তাহার অন্যতম। মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া প্রদেশে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, অধুনা তাহা নোয়াখালি জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন আকবরী গ্রন্থে উহার 'বালাজোয়ার' নাম দৃষ্ট হয়, ঐ জোয়ার সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী মহাল ছিল। উহার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১৩৩০৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৬২ টাকা। বালা শব্দটী ভুলুয়ার অপভ্রংশ হইবে। নোয়াখালির ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী স্থানগুলি পূর্ব্বে ভাটি নামে অভিহিত হইত। প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর অতীত হইল, নোয়াখালির অন্তর্গত বাবুপুরের চৌধুরীদের একটা দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া, 'চৌধুরীর লড়াই' নামে যে একখানা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত চৌধুরিরা আপনাদের সম্পত্তির গৌরব উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের মতন জমিদার আর ভাটির বাঙ্গালায় নাই।" এই বাবুপুর ভুলুয়ার এক অংশ। অতএব আইন আকবরীর বালাজোয়ার ও ভাটি, আধুনিক ভুলুয়া প্রভৃতি দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি যে একই, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আইন আকবরী হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, উহাতে এ বিষয়ের মীমাংসা আরও সুন্দররূপে হইতে পারিবে। "সুই আফগান নামে একজন সেনাপতি পূর্ব্বদিকে ভাটি নামে একটী দেশ জয় করিয়া, সুবে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নব্য সংযুক্ত দেশের আম্র বৃক্ষ সকল,একজন মনুষ্যের ন্যায় দীর্ঘাকার; মনুষ্যের অপেক্ষা উচ্চ নহে। এই ভাটি দেশের সীমান্তেই ত্রিপুরা রাজার বিস্তৃত রাজ্য।" ভুলুয়া, বাবুপুর প্রভৃতি পরগণা গুলি ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন ও দক্ষিণাংশে অবস্থিত। অতএব প্রতীতি হয় যে, ঐ ভূভাগই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কখন ত্রিপুরার রাজা, কখন বা আরাকানাধিপতি উহা হস্তগত করিয়া শাসন করিতেন। সুই আফগান্ সম্ভবতঃ আরাকান রাজার হস্ত হইতে, ভাটিদেশ উদ্ধার করিয়া, মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা ও সমতট বঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলি, সাগরশাখামধ্যে নিমজ্জিত ছিল। পরে জল সরিয়া পড়ায়, উহা চরাতে এবং তৎপশ্চাৎ জননিবাসে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ উদ্ভব সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর শর্ম্মার ও দনুজ মর্দ্দন রায়ের যেরূপ একটা কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে, ভুলুয়ার উদ্ভব সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। আমরা উহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম এইস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রবাদ, মিথিলানিবাসী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব আদিশূর বংশীয় বিশ্বম্ভর শূর স্বজনগণ সহ, নৌকারোহণে চন্দ্রনাথ তীর্থ সন্দর্শন মানসে তথায় যাইতেছিলেন। ক্রমে মেঘনা নদ অতিক্রম করিবার সময় নদমধ্যেই তাঁহাদের একরাত্রি যাপন করিতে হয়। কুল কিনারা না পাইয়া তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে থাকেন। যখন ত্রিযামা অতীতপ্রায়, তৎসময়ে শূর

মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হয়। তদবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান, এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তোমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই, এই যে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বিভাবরী অবসানের সহিত উহাও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তোমার এই বৃহৎ যান মৃত্তিকাসংলগ্ন হইলে পর, সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া উহা কিঞ্চিত পরিমাণে খনন করিও তবেই আমার বারাহী মূর্ত্তির অনুকৃতি এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। পরে উহা উত্তোলন করিয়া, যদি এইস্থানে সংস্থাপিত কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই এই স্থানের অধিপতি হইবে। এবং বহুপুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশধরেরা এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। অন্যথা আমার কথা অবহেলা করিয়া যদি প্রস্থান করিতে চাহ, তাহা হইলে কখনই সফলকাম হইতে পারিবে না।" দেবীর অন্তর্দ্ধানের সহিত শূর মহাশয়েরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইষ্টনাম স্মরণানন্তর তিনি স্বপ্নের যাবতীয় বিবরণ সঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ নিকটে বলিতে লাগিলেন। তাহারা 'শুভ শুভ' বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশি অবসান হইয়া গেল। এই সময়ে দৃষ্ট হইল, বহু দূর পর্য্যন্ত স্থল ব্যতীত জল বিদ্যমান নাই। বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, নৌকা চড়ায় সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূচনাতেই স্বপ্নের সত্যতা লক্ষ্য করিয়া মৃত্তিকা খনন করা আরম্ভ হইল, কিছুদূর খুঁড়িতেই তন্মধ্য হইতে এক পাষাণময়ী প্রতিমা উত্থিতা হইলেন। সকলেই আনন্দে মাতিয়া গেল, ঠিক হইল, ঐ দিবসেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যে দিবস প্রতিমা সংস্থাপন করা হইল, ঐ দিবস দিনমণি একবারও উদিত হইলেন না। নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পরদিন যখন সুপ্রভাতে সূর্য্যদেব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া গগনে সমুদিত হইলেন, তখন দেখা গেল, দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। এই স্থলে ভ্রমে পতিত বলিয়া, শূর মহাশয় ঐ স্থানের নাম রাখিলেন, "ভুলুয়া" (ভুল-হুয়া হইতেই ভুলুয়ার নামের উৎপত্তি, এইরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে)। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রদেশের পূর্ব্বাধিপতিকে অল্প পরিমিত স্থান এই বলিয়া ভুলাইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আধিপত্য লাভ করায়, উহার নাম করা হয় ভুলুয়া। বাস্তবিক গল্পাংশে, প্রথমটীই মনোরম এবং সমীচীন বোধ হয়।

রাজা আদিশূর বংশীয় এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের জন্ম হয়। এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিখিতে হইল, ইনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি বৈদ্যজাতীয় আদিশূর নহেন। ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, পরে তদ্বংশীয়েরা কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের তিন কি চারি পুরুষ অন্তর রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত আদান প্রদান সম্পাদন সুকঠিন বিবেচনায়, লক্ষ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলন লাভের প্রয়াস পান। এই সময়ে গাভার ঘোষবংশের পূর্ব্ব পুরুষ, পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়াকে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে

পর, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাঁহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হইল না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতা সহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণ মাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হইলেন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চারিজন দলপতি ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়, ইঁহারা স্ব স্ব সমাজের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারি দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, তাঁহার সহায়তা সকলেই করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের বাড়ীতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দলবল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করিলেন না। এই নিমিত্ত রাজাদেশে ঘটকগণ এই উদ্ধত সমাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী শ্লোক রচনা করিলেন, যথা—

"বেজগ্রাম স্থিতাঃ সর্ব্বে
যে চাতুর্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলীমেব
নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ।"

এইরূপে বিক্রপুরস্থ বেজগাঁ চতুর্মণ্ডল, চান্দনী, চাকুলী গ্রামবাসীরা, কুলভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। অপরদিকে ভূষণা সমাজের অন্তর্গত উজানীর রাজবংশও এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে তেলীহাটী ও ভুলুয়ার এই বিষয় লইয়া, ঘটক মহাশয়গণ দ্বারা, অপর আর একটী শ্লোক বিরচিত হয়। যথা—

"গঙ্গায়াং পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখায়ু তদুত্তরে॥
কায়স্থাঃ অত্রৈবসন্তাঃ ভিন্ন দেশনিবাসীণাং।
ভুলুয়াতেলীহাটীয়ৌ সুরা দিত্যো প্রশস্তকৌ॥
অপিচ।
সিংহ গ্রামেস্থিতঃ সিংহশির্ষায়ে গুহককীশ।
ভুলুয়ায়াং তেলিহট্টে সুরাদিত্যো নৃপাবুভৌ॥

ভুলুয়ার রাজারা শূর বংশীয় এবং ফরিদপুরান্তর্গত তেলিহাটী পরগণার মধ্যবর্ত্তী উজানীর রাজগণ আদিত্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা পরে ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই রাজগণ যে কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তাহা নিরাকরণ করা সুকঠিন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের রাজত্বের সময়ে আরাকানের মগেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরস্থিত স্থানগুলিকে মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎস্থানীয় হিন্দুরা এই সময়ে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাবিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করিত। অধিকাংশ স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। মহাত্মা মিঃ গ্রাণ্ট বলেন, ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিশেষতঃ মগদের দৌরাত্মে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম হইতে শেষোক্ত কারণটী সমধিক ভয়ানক বলিতে হইবে। তৎকালে যাহারা ঐ সকল বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে কোনরূপে বাস করিত, তাহারা ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণের নিকট, জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি আরাকানের মগেরা এই সময়ে

যাহাদের বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাইত, সর্ব্বসাধারণে তাহাদিগকেও জাতিচ্যুত মনে করিয়া, মগীয় অপবাদ দিতে লাগিল। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে বহু 'মগীয়' তিলি, বারুই, কামার প্রভৃতি উপাধিযুক্ত দলের সৃষ্টি হয়, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, মগদিগের অত্যাচারের পরকাষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

সন্দীপ আক্রমণ করিয়া আরাকানীরা অধিকার করিয়া লয়, পরে ভুলুয়ায় আপতিত হইয়া উহাও লুণ্ঠন করিতে থাকে। লক্ষ্মণ মাণিক্য ২।৩ বার আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন, কিন্তু পরে রাজার গৃহশত্রু কর্ত্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আরাকানরাজ ভুলুয়ার রাজাকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। এই শত্রু আর কেহই নহেন, লক্ষ্মণ মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাপিষ্ঠ রাজানুজ রাজ্য-লোভে অবিভূত হইয়া, আরাকানরাজের সহায়তা প্রার্থনা করে। সুযোগ পাইয়া আরাকানরাজ গৃহবিচ্ছেদে ব্যতিব্যস্ত লক্ষ্মণ মাণিক্যকে আক্রমণ করিয়া, পরাস্ত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য অনন্যোপায় হইয়া খিজিরের ঈশাখাঁ *মসনদ আলির সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঈশাখাঁ বারভুঞাদলের অন্যতর, খিজিরপুর তাঁহার বাসস্থান ছিল। একবার রাজা মানসিংহ, বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া খিজিরপুর অবরোধ করেন, (১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে) পরে তাঁহার বীরত্ব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পরাজিত ঈশাখাঁকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার বীরত্বের কথা ও কতিপয় মহত্বের বিবরণ বাদসাহকে অবগত করান। গুণগ্রাহী আকবর সাহ, সন্তুষ্ট হইয়া ঈশাখাঁকে মুক্তি প্রদান এবং সোণার গাঁয়ের শাসনভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত করেন। ঈশাখাঁ অতঃপর, বাদসাহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এই কারণে এবং অন্যান্য বারভুঞার অন্যান্য দলপতির সহিত, তাঁহার মনান্তর ঘটিয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহায়তা করেন।

ঈশাখাঁ আরাকানবাসিগণের এই সকল দৌরাত্ম্যের বিবরণ বাদসাহকে লিখিয়া পাঠান। আকবরসাহ উহাদিগকে দমন জন্য সাহাবাজ খাঁ নামক সেনাপতিকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন (১৫৮৫—১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে)। যদিও বারভুঞা দলের নেতারা বাদসাহের প্রতিকূলাচারী ছিল, তথাপি এই সময়ে তাহারা, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কারণ, মগের দৌরাত্ম্য সকলের রাজ্যমধ্যেই সমভাবে প্রসারিত হয়। এই জন্য উহাদের উচ্ছেদ সাধন সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইয়াছিল। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ, বঙ্গীয় সমুদয় ভূম্যধিকারীগণকে, তাঁহার সহায়তা জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। সাধারণের শত্রু মগদিগকে উচ্ছেদ করিতে, কাহারও কোন আপত্তি রহিল না। জমিদারগণ সকলেই বাদসাহ সেনাপতির সাহায্য জন্য তন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সাহবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহনায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া, তন্মধ্যে সৈন্য সংস্থাপন করেন। ঐ দুর্গাধিষ্ঠিত স্থান তদবধি তাঁহার নামানুসারে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে উত্তর ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

সাহাবাজ সমবেত সৈন্যদল সহিত মগদিগের অন্তরঙ্গ কেল্লা সহর কসবা আক্রমণ করেন। এই স্থান ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত, অধুনা হুদা ভুলুয়া' নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মণ মাণিক্য তাড়িত, হইলে পরে, ঐ স্থানেই আরাকানীরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিল। মোগল সেনাপতির সহিত, ঐ স্থানে মগদের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, বারভূঞা দল পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া, মোগল পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সমবেত সৈন্যদলের নিকট আরাকানিরা পরাজিত হইয়া, সন্দীপের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভুলুয়াতে তাহাদের আর কোন আধিপত্য রহিল না।

ভুলুয়া অবস্থিতি সময়ে, আমি এই সহর কস্‌বায় বহুদিন বাস করিয়াছি। ঐ যুদ্ধের নিদর্শনযোগ্য কতিপয় উপকরণও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী কামান, ঐ যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ, আজিও তথায় প্রোথিত দেখা যায়। শুনিলাম, আরও ৩।৪ টী কামান ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা খনন করিলে, তন্মধ্য হইতে গোলাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটী গুলি আমি দেখিয়াছি। উহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু অগ্নিতাপে বিশেষ দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। তত্রত্য মুসলমানেরা বলিল, এই গুলি, গুলাল বাঁশে ব্যবহৃত হইত। তৎকালে বন্দুক, কামান অপেক্ষা, তীর ও গুলাল বাঁশের সমধিক চলন ছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মুসলমান জায়গিরদার ও পোর্ত্তুগিজ খ্রীষ্টীয়ান আজিও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে। যে সকল সৈনিকেরা এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, এবং যুদ্ধান্তে প্রত্যাগমন না করিয়া মগদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তথায় অবস্থান করে, তাহাদিগকে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়। ঐ সম্পত্তি খোসবাস নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জায়গিরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তদবধি ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর কোন রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই, উহা নিষ্কর চলিয়া আসিতেছে।

সাহাবাজ খাঁর সহিত নবী সাহেব নামে একজন ফকির বা গাজী এই যুদ্ধে গমন করেন, যুদ্ধান্তে আর ঐ ফকির স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তিনি তথায় এক দরগা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। উহা আজ অবধিও নবী সাহেবের দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর নবী সাহেবের পদচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ মাণিক্য তথায় একটী দীর্ঘিকা ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সহর কসবায় ঐ সকল দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া আপন ইষ্টদেবী বারাহী দেবীর প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই দেবীমূর্ত্তিই বিশ্বম্ভর শূর ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার স্বপ্নাদেশেই ভুলুয়াতে রাজ্য সংস্থাপন করেন। বারাহী দেবী অধুনা আমিশাপাড়া গ্রামে রাজপুরোহিতগণের বাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার 'আটি' হাত, তিন মুণ্ড এবং বাহন বরাহ। ঐ রাজপুরোহিতেরা যে ধান্য শর্ত্তি করিয়া দেবীর অর্চনা

করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া-দিলাম।

"বারাহী চাষ্টভুজাং দেবী ত্রিনেত্রাং বরহাস্থিকাং।
পাশাঙ্কুশ ধনুর্বাণাং মধ্যে শ্রীবদনাম্বুজাং।
দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকং।
বরাহবাহিনী মাদ্যাং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।"

পূজক মহাশয়েরা যেরূপ বলিলেন, অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু ধ্যানটী বড়ই অশুদ্ধ। একে দেবীর আট হাতের মধ্যে মাত্র চারি হাতের বর্ণনা আছে, ছন্দের দোষ আছে, তাহাতে দক্ষ কর্ণে মুখং দুর্গা, প্রভৃতির অর্থও অবোধ্য; যদি কেহ বারাহী দেবীর বিশুদ্ধ ধ্যান অবগত থাকেন, তবে ঐ পুরোহিতদিগকে জানাইলে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের গুরু ও পুরোহিতের বংশধরেরা সকলেই আপনাদিগকে মৌথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। চৌপল্লী, বাবুপুর প্রভৃতি স্থানের গুরুবংশ ও আমিশাপাড়ার পুরোহিতেরা অদ্যাপি প্রচুর ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান জমিদারেরা উহার অধিকাংশ বাজে আপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া ভুলুয়াতে সংস্থাপন করেন। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব তট পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থান বলিয়া পরিচিত। সেই স্থানে সমাজ সংস্থাপিত করিয়া, সকল সম্প্রদায় হিন্দুর সমাবেশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে, ভুলুয়াধিপতি যে বিবাহ-সভায় [illegible] সমাজপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন; সেই সময় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয়। বাকলাধিপতি রামচন্দ্র তৎকালে বালক থাকিলেও তাহার ধারণা ছিল যে, সমাজ মধ্যে চন্দ্রদ্বিপাধিপতিই সকলের শীর্ষস্থানীয়; এই স্থলে প্রতাপাদিত্যকে অধিক সম্মান করায় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরেও কোন কোন ঘটনায় ভুলুয়ারাজ রামচন্দ্রকে বালক বলিয়া ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। এই সকল কারণে আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদর্শনার্থে চন্দ্রদ্বীপরাজ, লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া, সহসা কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভুলুয়া আক্রমণ করেন।

অচিরে এই কথা ভুলুয়ারাজ জানিতে পারিয়া; ক্রোধে অধীর হইয়া কতিপয় সৈনিক সহিত, বালক রামচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার রণতরীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইরূপ উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ অন্যের সাহায্য লওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া স্বয়ং বাকলার রণতরীর নিকটবর্ত্তী হন, পরে রামচন্দ্রকে ধৃত করিবার জন্য যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া বিপক্ষের রণযানে পতিত হইলেন, অমনি প্রচণ্ড বলশালী রামমোহন তাঁহাকে ধৃত করিয়া নৌকার নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। ভুলুয়ারাজ এইরূপে ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইলেন; রামচন্দ্র শত্রুকে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, ঐ রাজ্য আর আক্রমণ না করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার মাতা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে এই বীরবিনাশন

পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃআদেশ লঙ্ঘন না করিয়া, লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

কোন সময়ে লক্ষ্মণ মাণিক্যের বীরত্বের পরিচয় জন্য, তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আনয়ন করা হয়; পরে তাঁহাকে শৃঙ্খলচ্যুত করা হইল; এই সুযোগে লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে রাম চন্দ্রের হত্যার প্রয়াস পান, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপাধি-পতির দেহরক্ষকেরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া ফেলে; এই সংবাদ রাজা রাম চন্দ্রের মাতা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ মাণি-ক্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন; তৎ-ক্ষণাৎ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, তিনি আরাকানের মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়া লোকান্তরিত হন। আমাদের বিশ্বাস, এটী প্রবাদ নয়, সত্য ঘটনা। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে মোগল পক্ষা-বলম্বী হইয়া বারভূঞাদল মগদের বিরুদ্ধে সুন্দিপে যে লোকবিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর বীর-জীবনের শেষ পরিচয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ মাণিক্যও উহার একতম ছিলেন। সেই লোকবিস্ময়কর যুদ্ধে বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায় যে অমানুষিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহার এই বীরত্ব সন্দর্শনে মোগল সেনাপতি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, মগদিগকে বিদু-রিত করিয়া সুন্দিপের শাসনভার রাজা কেদার রায়ের হস্তেই ন্যস্ত করেন। ডাক্তার মিঃ জেকব লিখিয়াছেন, পর্টুগীশ সৈন্যের সহায়তা লইয়া কেদার রায় সুন্দীপ শাসন করিতেন। যুদ্ধবীর লক্ষ্মণ মাণিক্য এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অব্যবস্থিত চপল বালকের ন্যায় ধৃত হইয়া যে চন্দ্রদ্বীপে নীত হইয়াছিলেন না, তাহা নিশ্চয়। আমরা বারান্তরে লক্ষ্মণ মাণিক্য ও তদ্বংশীয়দের অপরাপর বিষয় পাঠক মহোদয়গণকে জানা-ইতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২১)

পূর্ব্বে প্রকাশিত চারি সংখ্যায় আমরা মায়াবাদের যেরূপ বিবরণ দিয়াছি, তাহাই শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ। এই জগতের স্থূলভাব অপগত হইয়া, যখন সমগ্রজগৎ সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাহারই নাম মায়া। এই মায়া যে অলীক পদার্থ নহে, ইহা আমরা শঙ্করের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরে দেখাইব। এই-রূপ প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞান-সম্মত, এখন আমরা তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, হিন্দু দর্শন দুইটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ১। ব্রহ্মতত্ত্ব; ২। ব্রহ্মশক্তি বা জড়াণু। এই দুইটীই অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুইই নিত্য। কেবল জড়াণু, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয় মাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীব সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র রূপে ব্রহ্মে নিহিত থাকে বলিয়া, ব্রহ্মের একত্বের ব্যাঘাত হয় না। প্রাদুর্ভাবের অর্থই হিন্দু-দর্শনের "সৃষ্টি"। নতুবা কোন বিশেষ কালে সমস্ত নূতন সৃষ্ট হইয়াছে, একথা হিন্দুদর্শন কুত্রাপি স্বীকার করে নাই।

কালবিশেষে সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলিলে, Law of continuity নামক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এই দৃশ্যমান জড় ও দৃশ্যমান জীব দেখা দিয়াছে—প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহারা অকস্মাৎ আইসে নাই, ইহারা পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ভাবে ছিল, তাহাই স্থূলভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানও একথা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সূক্ষ্ম, চক্ষুর অদৃশ্য পরমাণু সকল অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, পরে ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া যে দৃশ্যমান জড়পুঞ্জের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এই জড়বর্গ ও জড়ান্তর্ভূত শক্তি (energy) উভয়েই, সূক্ষ্ম (latent, potent) অবস্থায় ছিল, তাহাই স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে।

শক্তি বা ক্রিয়ার যতই ক্ষয় হইতে থাকে, ততই পরমাণুবর্গ ঘনীভূত হয় ও স্থূলপিণ্ড (aggregate) রূপে অভিব্যক্ত হয়। শক্তির স্বভাবই এই যে, উহা নিয়ত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে,—অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণত হইতেছে। বাহ্য ক্রিয়ারূপে, কখনও তাপাদিরূপে এবং কখনও বা সূক্ষ্ম (latent) ভাবে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য, সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহে ক্রিয়া (energy) সূক্ষ্মরূপে অদৃশ্য ছিল, তাহাই যত তাপাদিরূপে ক্ষয়িত (dissipated) হইতে লাগিল, ততই উহারা চক্ষুর দর্শনের যোগ্য হইল। এই পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক নক্ষত্রাদি জড়পিণ্ড ও তদন্তর্গত ক্রিয়া,—সেই অদৃশ্য পরমাণু ও অদৃশ্য শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার, এই যে সূর্য্যাদি হইতে অনবরত তাপ ও আলোকরূপে ক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে,—ক্রমশঃ এইরূপ ক্রিয়া ক্ষয় হইতে হইতে, সমস্ত জড়বর্গ চূর্ণ হইয়া চক্ষুরাদির অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবে দেখিতে গেলে স্থূল জড়বর্গের আদি ও অন্ত আছে বটে, কিন্তু ইহারা পূর্ব্বেও (দর্শন যোগ্য হইবার আগে) সূক্ষ্ম ভাবে ছিল এবং পরেও অদৃশ্য সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া মনুষ্যদেহ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই মত। এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। হক্সলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেক চিন্তাতে (thought) মস্তিষ্কের অণুর অবস্থান্তর বা স্থানচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। স্মৃতি কি? স্মৃতি ক্রিয়া এই যে,—পূর্ব্বে কোন একটা বস্তু বা ঘটনার অনুভব-কালে, সেই অনুভূতি-শক্তি তোমার মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের কিঞ্চিৎ স্থান-পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটাইয়াছিল। পরমাণুনিবহের এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন, সূক্ষ্মরূপে সেই সেইরূপে মস্তিষ্কে অবস্থিত ছিল। এবং তৎকালীয় চিন্তা ও কার্য্যেই তন্মধ্যে নিহিত ছিল। যদি তৎকালীয় চিন্তা (consciousness) ও পরিবর্ত্তিত-পরমাণু সমূহ সূক্ষ্মভাবে সেই সেই ভাবে তোমার মস্তিষ্কে অবস্থিত না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আজ্ সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি তোমার জন্মিতে পারিত না। অতএব জ্ঞানের ক্রিয়া যে সর্ব্বদাই হইতে থাকিবে, এরূপ নহে; জ্ঞান সূক্ষ্মভাবেও অনেক দিন থাকিতে পারে। মনুষ্যজ্ঞানের আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, প্রত্যেকটী জ্ঞানের (thought) সঙ্গে সঙ্গেই, মস্তিষ্কের কতকগুলি পরমাণুরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর ঘটিয়া যায়। সেই

পরিবর্ত্তিত পরমাণুগুলি সেই সেই ভাবে কিছু দিন থাকিয়া যায়। "Each specific thought denotes some specific waste of brain-matter. * * * * In like manner, memory is looked upon as dependant upon traces, left behind in the brain, of the state in which it was when the sensation remembered took place." "Those motions which give rise to sensation leave on the brain *changes of its substance*" (Huxly), "The sensation which has passed away, leaves behind molecules of the brain competent to its production which constitute the physical foundation of memory" (Fait and Stewart). এইরূপে দৈহিক ক্রিয়ামাত্রেরই কতকাংশ সূক্ষ্মরূপে, অদৃশ্যরূপে, দেহের অদৃশ্য, সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জে লুকায়িত থাকিয়া যায়; কালে প্রকাশিত হয়। ঐ ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা কথঞ্চিৎ অবস্থান্তরিত হইয়া সেই পরমাণু গুলিও সেই সেই ভাবে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায়। যদি বৈজ্ঞানিকদিগের এ কথা সত্য হয়, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শক্তি যখন একেবারে ধ্বংস পায় না এবং পরমাণুও যখন একেবারে ধ্বংস পায় না,—তখন মনুষ্যের চিন্তরাশি ও (a kind of energy) ধ্বংস পাইবে না এবং সেই চিন্তা দ্বারা পরিবর্ত্তিত পরমাণুগুলিও ধ্বংস পাইবে না। সুতরাং Law of continuity মানিতে গেলেই, ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে যে, মানুষের দেহ মৃত হইলেই, সমস্ত ফুরাইয়া যায় না। ইহা অবশ্য সূক্ষ্মরূপে থাকিবেই। ইহারই নাম হিন্দুদর্শনের "সূক্ষ্ম-শরীর"। স্মৃতি ও স্মৃতির যন্ত্র, চিরকালই মানুষের থাকিবে। থাকিবে বলিয়াই, মৃত্যুর পরও ইহা অদৃশ্য হয় মাত্র, কিন্তু একান্ত ধ্বংস হয় না। মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে যে নিয়ম, অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহেরও সেই নিয়ম। এইজন্যই হিন্দুদর্শন সূক্ষ্ম শরীরকে অবিনাশী ও স্থূল দেহকে বিনশ্বর বলিয়াছেন। এইজন্যই হিন্দুদর্শন সৃষ্টির একটা নির্দ্দিষ্ট কাল স্বীকার করিতে পারেন নাই। এ সমস্ত কথা আর একটু বিশদভাবে বলিতে হইবে। বারান্তরে সে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সুলভ সাহিত্য।

নব বঙ্গসাহিত্যের নেতা বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পরে, যখন কর্ণধারহীন তরণীর মত, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময়ে কবি হেমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"হায় কি হল বঙ্কিম দিল বঙ্গদর্শন ছেড়ে
হায় কি হল দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।"

মাসিকের গৌরব, বঙ্গদর্শনের তিরোভাবেই অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখনও দেশ সাপ্তাহিকে প্লাবিত হয় নাই। দু তিন খানি নূতন সুলভ সাপ্তাহিক প্রচারিত হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু সেই গুলির রচনাভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়াই কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাহিত্যের অধোগতি হইতেছে।

ঈশ্বরকৃপায় বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থাভাব ছিল না; অর্থলাভের জন্য তিনি কখনও সাহিত্য-সেবা করেন নাই। তাঁহার লিখিবার অনেক ছিল, শিখাইবার অনেক ছিল; তাহাই তিনি অনেক লিখিয়াছেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর, যে দেশ হিতৈষণার উত্তেজনায় সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রচারিত হইতে

আরম্ভ হইল, অধিকাংশ স্থলেই তাহার অপর নাম "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গেরে বাবা"। যে উপায়েই হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া, সাধারণ লোকের রুচির অনুসরণ করিয়া সম্পাদকগণ যাহা খুসী লিখিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বা সুবিবেচক লোকের অসন্তুষ্টিতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহারা সংখ্যায় ক জন? যাহাদিগের নিকট হইতে তিল সংগ্রহ করিয়া সম্পদের তাল গড়া যায়, তাহারা সন্তুষ্ট হইলেই হইল। ইহাতে সরলতা ও স্বাধীনতা চলিয়া যায়, এবং সাহিত্যের নামে অপাঠ্য পদার্থেরই সৃষ্টি হয়। পেটের দায়ে রচিত সাহিত্য, পাঠকের কৃপার ভিখারী বলিয়া, পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় সনাতন ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইতেছে; এবং যাত্রাওয়ালাবিরহ যাতনার ভাষায় "হায়রে সেকাল" বিষয়ে রচনা-বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে। দেবী সরস্বতীকে সপত্নীর দাসী করিবার প্রয়াস করাতে, কোথাও কোথাও লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রসন্না হইতেছেন দেখিতেছি; কিন্তু অভিমানিনী ভারতী দূরে পলায়ন করিতেছেন।

অর্থের প্রত্যাশায় সাহিত্য রচিত হইলে তাহা প্রায়শঃ অপাঠ্য হয়; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে সাহিত্য বিতরণ করিতে বসিবেন, এ কথা বলি না। বরং সাহিত্যের কিছু অধিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়। সস্তা সাহিত্যের গৌরবে আমার আস্থা নাই। শূকরে মুক্তা চিনিবে, এ কথায় বিশ্বাস হয় না। সাহিত্য সস্তা করিয়া কুশিক্ষিতের হস্তে দিলে কোন পক্ষই লাভবান হইবেন না। যাঁহারা পবিত্র শিক্ষার জন্য উদ্যোগী, তাঁহারা লাইব্রেরী করিয়া, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া, পুরস্কার গ্রন্থের দ্বারা দাম তুলিয়া না লইয়া, কোন গ্রন্থ বা পত্রিকা ক্রয় করেন, তাঁহারা ক্রীত সাহিত্যে অনুরাগী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে গ্রন্থাদিরও গৌরব পরীক্ষিত হয়, ক্রীত সাহিত্যও পঠিত হয় বলিয়া আশা করা যায়।

আমি জানি যে, অনেক কৃতী লেখক অর্দ্ধমূল্যে বা সিকি মূল্যে পূজার হাটে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যশ হারাইতেছেন। যদি প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য সুরচিত হইয়া থাকে, তবে এক দিন না এক দিন তাহার আদর হইবেই। যদি তাহা না হয়, তবে সে সাহিত্য বিলুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি? সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট ক্ষণস্থায়ী যশের জন্য লোলুপ না হইয়া বরং শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির পাদানুধ্যান করিয়া এক একবার তাঁহার কথা আবৃত্তি করা ভাল—

> যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
> জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ
> উৎপৎস্যতেস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা
> কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

সঙ্গীতে কুশিক্ষিতা হইয়াও যে উপায়ে "সোনার" 'নানা,' দর্শকগণের চিত্তরঞ্জনে সক্ষমা হইয়াছিলেন, বিদ্যাশূন্য হইয়াও যে কৌশলে শঙ্করকবি বা বল্লনকবি রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিতেন; সেই উপায় এবং কৌশল প্রভাবে যদি এ কালের রঙ্গমঞ্চ এবং সাহিত্য খ্যাতিলাভ করে, তবে তাহা দেখিয়া কৃতী লেখকগণ বিচলিত হইবেন কেন?

কেবল মাত্র কুপরিচালিত বলিয়াই সাপ্তাহিকের বাহুল্য, সাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা নহে; অন্যান্য কারণে উপযোগী হইলেও, সাপ্তাহিক জিনিসটা

প্রায়ই অনেক পরিমাণে সাহিত্যের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতের রাজ্যশাসন পদ্ধতি যে প্রকারে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পলিটিক্স্ নামক একটা জিনিস আছে। প্রধানতঃ সেই পদার্থ লইয়াই দেশের সংবাদ পত্র। আমরা পরাধীন জাতি, কাজেই আমাদের পলিটিক্স্ নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহারই আধিক্য লইয়া আমরা সংবাদ পত্র পড়ি। পলিটিক্সের অতিরিক্ত কোলাহলে বিলাতের সাহিত্যও ম্লান হইতেছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের স্বার্থময় কর্ম্ম প্রভাবে ইউরোপের ব্রাহ্মণ্যও হীনপ্রভ হইতেছে। একালে রবার্টস্ প্রমুখ ক্ষত্রিয়দল, স্পেন্সারাদি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা সমাজে অধিক পূজ্য। দেখিতে দেখিতে গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষাপ্রদ স্থায়ী সাহিত্য আর বিকশিত হইতেছে না। কাব্যকুঞ্জে পিকধ্বনি নীরব হইয়াছে, এখন কিপ্‌লিং এর দর্দ্দুর রবে বিশ্ব মুগ্ধ। আমাদের দেশের দুর্গতির ত সীমা পরিসীমা নাই। ভূদেববাবুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়াও এডুকেশন গেজেট লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই; অথচ সেই সময়ে, কত অসার পত্রিকার সম্পাদক কুবেরের ভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছেন। কেবল অনুকরণ গৌরবে, যাহা নাই, সেই পলিটিক্স্ লইয়া আন্দোলন করিয়া, শুদ্ধধ্যানরত সাহিত্য, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতেছে।

বিলাতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে যেমন পলিটিক্স্, আমাদের দেশের পক্ষে সেই প্রকার সামাজিক অবস্থার আন্দোলন। যদি মিথ্যা পলিটিক্স্ পরিহার করিয়া সামাজিক কথার বিচারে সাপ্তাহিকগুলি মনযোগী হয়েন, তাহা হইলে এতটা দুর্গতি না হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সুপরিচালিত মাসিক পত্রাদি না থাকিলে, কেবল দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সাহিত্যে একটা বিষম অনিষ্ট সাধিত হয়। এমন পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতা কোন মনুষ্যেই সম্ভবপর নহে, যে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অবিরত উদ্গীরিত বিজ্ঞতা, সারবত্তা প্রকাশ করিতে পারে। এই সপ্তাহ-সুলভ বিজ্ঞতার বাণী, অবিশ্রান্ত পাঠ করিলে, চিন্তাহীনতা এবং অগভীরতা ব্যাপ্তিলাভ করিবেই করিবে। সাপ্তাহিকের প্রচার বাহুল্যের সঙ্গেসঙ্গে মাসিক পত্রও, অনেক প্রচলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পসংখ্যক সুলেখক দ্বারা এত বিস্তৃত সাহিত্য শাসিত হইতে পারে না। এই জন্যই কবির আক্ষেপ পড়িয়া মর্ম্মবেদনা হয় যে, এ দেশে আর বঙ্কিমের মত নেতা আসিল না এবং উপরন্তু "হায় কি হল দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।"

এখনও এই কোলাহলের মধ্যে যে সকল কৃতী লেখক তপস্যানিরত, আশা করি, সম্পদবিলাসরূপিণী উর্ব্বশী তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমস্যাকল্পলতা।*

৫৫ বৎসর হইল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাত্রেরা সমস্যাপূরণচ্ছলে কতকগুলি সংস্কৃত-শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সমস্যাকল্পলতা

* সমস্যাকল্পলতা। ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রেস।

সেই শ্লোকগুলির সংগ্রহ। এরূপ গ্রন্থকেও কাব্য বলিতে বাধা নাই। আলঙ্কারিকেরা বলিবেন, কোষকাব্য।

যে কাব্যই বলুন, সমস্যাকল্পলতার অনেক কুসুমই মনোহর নহে। অনেকগুলিই কৃত্রিম। অনেকগুলিই মান্ধাতার আমলে সুগন্ধি লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু এখন বড় পর্য্যুষিত—অতএব একটু পূতিগন্ধি। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

শশাঙ্কঃ সাশঙ্কং নিশি চরতি বক্ত্রেন্দুবিজিতঃ
সরোজানাং রাজির্ভজতি জলদুর্গাশ্রয়মিমম্।

অথবা যদুনাথের—

নাসৌ চন্দ্রঃ কীর্ত্তিরাভাতি শুভ্রা
কোষাগারো নৈব তে কল্পশাখী।

কয়েকটা খাস্ গৌড়ীরীতির শিমুলফুল—খুব মোটা মোটা, খুব নির্গন্ধ, খুব সখ্‌ত। যথা প্রেমচন্দ্রের—

হৃত্রাসোদ্দামধামোর্জ্জিতজয়জযশশ্চন্দ্রসান্দ্রাবদাত-
প্রদ্যোতদ্যোতমানত্রিভুবনজনিতোদ্গীর্ণগাম্ভীর্য্য-
বীর্য্যঃ।

দুই একটার দুই গুণই আছে—যেমন পচা, তেমনই কাঁটা। যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

সম্রাম্যদ্ভূরিভূমিধরবরবিজয়োপার্জ্জিতৌজোবিড়োজা-
নিস্তেজোবৈরিনারীবদনবিধুকলাম্লানিমধ্যাহ্নসূর্য্যঃ।

সংস্কৃত কাব্যের চিত্রশালায় বিজিত-বৈরিনারীর রঙ্গ বরঙ্গ চিত্র আছে। কিন্তু সকল চিত্রে হূণনারীর সে কপোলপাটলিমা বা যবনীমুখপদ্মের সে মধুমদ কই?

গৌড়ীরীতিমাত্রেরই নিন্দা করিতেছি না। কথাগুলা পুরাণ হইলেও, নিবিড় রচনার গুণে নিম্নোক্ত অর্দ্ধশ্লোকে একটা উদাত্ত ভাবের অপূর্ব্ব আরোহ অবরোহ হইতেছে—

রাজন্ রাজন্ রাজাবলিবলিতশিরঃশেখরস্বস্তপাদো
আব্যাহ্লাদকারী কীর্তিরিব জয়মহাদানদারিদ্র্যদৈত্যঃ!

বাঁচিয়া থাকিলে প্রেমচন্দ্র এ শ্লোকে আজ জয়পুরপতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন।

সমস্যাকল্পলতায় সুরভি কুসুমেরও অভাব নাই। গৌড়ীরীতি দেখিয়াছি। লাটীরীতির একটা নমুনা দিই। রচনা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের—

ন তত্র দিবসদ্বয়াধিকমেব নেষ্যং প্রিয়ে
নয়েতি শপথেন মাং প্রতি নিবেদ্য যাতো হরিঃ।
প্রবৃত্তিরপি লভ্যতে সখিন তস্য মাসেন কিং

*　　　*　　　*

উক্তি বিরহোৎকণ্ঠিতার। মধুরে এমন প্রসন্ন রচনা সংস্কৃতকাব্যে কিছু বিরল।

দুই একটী শ্লোক পুরাণ হইলেও পুরাণেও একটু নূতন। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

ধ্রুবমেষ্যতি গৌরভোৎসবে
কথমাবিষ্করষে মনোব্যথাম্।

নারীকে যে "গৌরভোৎসবা" বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে কবি বটে।

যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

কোকিলালিকুলকাকলীরবৈ-
রাকুলীকৃতহৃদঙ্গবন্ধনা।
মঞ্জুবঞ্জুলনিকুঞ্জমঞ্জনা
কামিনী ব্রজতি যামিনীমুখে।

কামিনী অভিসারিকা। "আকুলীকৃতহৃদঙ্গবন্ধনা"—কথাটীর অর্থধ্বনি বড় মোহকর।

দুই একটা শ্লোকে ভারবির আওয়াজ শুনিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়—

জলধির্ন চ বাড়বানলং
নহি সত্যাদ্বিচলন্তি সাধবঃ।

প্রেমচন্দ্রের একটা উচ্ছাস একটু Byronic—

কলয়সি কঠিনে তথাপ্যভীষ্টং
হরি হরি রে হরিণাক্ষি দুর্বলাস্মি!

একটা অপদার্থ শ্লোকে একটী চরণ একটা কুৎসিত স্তূপে কুশলকারুৎকীর্ণ এক-খণ্ড bass relief এর মত ফুটিয়াছে। রচনা রামকৃষ্ণের—

যৎ পশ্যা......

শ্যামাঙ্গং বনমালিনং বৃতবতী তীরে সুধাবারিধেঃ।

রিলীফে রঙ্গ হয় না, কাব্যে একটু রঙ্গও ফলিয়াছে। দূৎদূরগামিনী স্মৃতি বাকীটুকু পুরাইতেছে।

প্রেমচন্দ্রের একটা শ্লোকে রঙ্গের বড় চটক—

পিশঙ্গবসনোজ্জ্বলঃ সজলনীরদশ্যামলঃ।

তার পরে আর রঙ্গ নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অত রঙ্গেও ফলে নাই—

স্ফুরৎকুটিলকুন্তলাকুলিতমুগ্ধভালস্থলঃ।

শ্রীশচন্দ্রের একটা শ্লোকে চক্ষের জলের রঙ্গ আছে। রঙ্গ মৃদু, কিন্তু খাঁটি—

ভবাদ্য কুচমণ্ডলে মরকতাচ্ছহারচ্ছিন্নং
দধাতি সখি পক্ষ্মতির্গলিতকজ্জলাশ্রুজ্জ্বলা।

ফোঁটা ফোঁটা ফটিক জলে কজ্জলের নীলিমা লাগিয়াছে!

বিনা রঙ্গেও চিত্র হয়, একবার দেখিয়াছি। আর একবার দেখাই—

আকর্ণ্য গৌতমবধূমনুজস্থলাভং
ভীতেন নাবিকজনেন নিবারিতোঽসৌ।
সোঽবতিমাহ মুদিতো রঘুবংশচন্দ্রো
ভ্রাতঃ পদং কথয় কুত্র নিবেশয়ামি॥

রাম, লক্ষ্মণ, ঐ নাবিক—সব যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাবিকটার চিত্রে একটু প্রহসনও আছে।

প্রেমচন্দ্রের তুলি আরও সরু—

মুখিতজলিতহাসং রোষমেতং জহীহি।

কয়েকটী শ্লোকখণ্ড যোড়াইলে পশ্চিম সন্ধ্যার এক মোহিনী ছবি জাগিয়া উঠে—

মন্দং মন্দং বহতি পবনো হন্ত সায়ন্তনোঽয়ং
কোকাঃ শোকাকুলিতহৃদয়ঃ কিঞ্চ মুঞ্চন্তি জায়াঃ।

* * * *

মন্দং মন্দং গলিতকিরণো ভানুমানস্তমেতি।

* * *

বালা জালবিলাবলম্বিতমুখী মার্ত্তণ্ডমালোকতে।

পশ্চিমাকাশ রাঙ্গা করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রেমচন্দ্র দুই দিগ্বধূর খেলা দেখিতেছেন—

সায়ন্তনোষ্ণকরপাটলিতাংশুজাল-
পিষ্টাতমুষ্টিমনকুৎ কুতুকাৎ কিরন্তীম্।
রক্তাম্বরোজ্জ্বকচীমভিতঃ প্রতীচীং
প্রাচীবধূঃ ক্ষিপতি কন্দুকমিন্দুবিম্বম্॥

উষায় চন্দ্র অস্ত যাইতেছে। প্রেমচন্দ্র সাগরে সূর্য্যোদয় দেখিতেছেন—

অস্তোৎসঙ্গতরঙ্গশঙ্কিতমনস্যস্তাচলপ্রান্তরা
রণ্যানীং নিবিড়াং ভয়াদিব রয়াদিন্দৌ সমুৎসর্পতি।
সাটোপং হরিণা সমুত্থিতবতা বারাংনিধেঃ কন্দরাৎ
সংক্ষোভাদিব পূর্ব্বপর্ব্বততটীমাক্রম্য বিক্রম্যতে॥

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে যেন একটা গ্রীক মূর্ত্তি চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। *দিক্‌কালশৃঙ্খলাচ্ছেদী* এ বলিষ্ঠ কল্পনা যবনশিল্পীরই যোগ্য বটে।

একটী মালিনীশ্লোকে ফুলগন্ধের গোল-মাল হইতেছে। রচনা প্রেমচন্দ্রের—

দরবিদলিতযূথীনীথিসঞ্চারলক্ষ্মৈ-,
র্দিশি দিশি মধুগন্ধৈরন্ধয়ন্ পার্শ্বসাখান্।

খোশ্‌বু টুকু ধরিতে পারি না, কিন্তু গুলজারটার টের পাইতেছি। পার্শ্বশব্দে ময়ূর।

গোধূলিতে বালক কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। প্রেমচন্দ্র যশোদাকে ডাকি-তেছেন—

কথং গৃহবিধানতো বিরম মন্মুখীঙ্গুলিমি।

ভবনং বনমনু ভ্রমন্নমুপদং গবাং তে শিশুঃ
সমেতি যদতিস্ফুটং রণতি নূপুরং গোপুর ॥

শ্লোকে কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শুনিতেছি।

শুনিতেছি বলিয়াই উহা উৎকৃষ্ট কাব্য। বহিঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব এ কাব্যে কিরূপ জাগিয়াছে, দেখাইলাম। অন্তঃপ্রকৃতির একটা দৃষ্টান্ত দিই। কুরুসভায় কৃষ্ণার অবমাননা দেখিয়া ভীমসেন ভাবিতেছেন—

অরুন্তুদং ভোঃ কিমিতোঽস্তি লোকে
যদ্ ভীমসেনস্য মহোগ্রশক্তেঃ।
পুরোঽন্ধপুত্রেণ বিমানিতেয়ং
মধ্যেসভং রোদিতি যাজ্ঞসেনী।

বজ্রলেপে রুদ্ধমুখ বহ্নিগিরি আপনারে আপনি খাইতেছে! কাব্যে তার ঝাঁজ লাগিয়াছে।

এক স্থানে বড়মানুষ বাঁদর দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতেছেন—

নিঃস্বঃ শাস্ত্রবিশারদোঽপি ধনিভির্মূর্খোঽয়মিত্যুচ্যতে
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি
নাহং কলে।

হাসি না হায়হায়, বলিতে পারি না।

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকিবে। একটী মঙ্গলশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। শ্লোকটী রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক এবং আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের। ভাবের ইঙ্গিতটা তিনি গুরু নানকের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তারও বীজ বেদে—

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে।

কালিদাসও মেঘকে উজ্জয়িনীর সন্ধ্যায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন,

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্।

হেমচন্দ্রের শ্লোক এই—

স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্
সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি
প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাদ্ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে ॥

বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যারতি হইতেছে।

ঠেকিয়া আমাকে এ গ্রন্থের এইরূপ অসম্বদ্ধ সমালোচনা করিতে হইয়াছে। বত্রিশ জনের রচিত পাঁচশতের অধিক বিশিষ্ট শ্লোকরাশির অন্য সমালোচনা সম্ভবে না। তবে সংস্কৃতকাব্যের সমালোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিলাম না কেন, তার কৈফিয়ৎ এ কালে লাগিবে না। নকলে আসল নষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি উদ্ধৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশগুলির অনুবাদ দিই নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

মলিনা?

বিমনা বিবসা এক বিধুরা ললনা,
বসে আছে বাতায়নে হ'য়ে আনমনা,
শূন্য আকাশের পানে,
চাহিতেছে শূন্যপ্রাণে,
আধার সরত আঁখি
আধখানি পানেতে রাখি

নখরে কি লিখি যেন করিছে গণনা,
আত্ম কির্ণ-অদৃষ্টের রহস্য মন্ত্রণা।
আলু থালু কেশ পাশ নীবির বাঁধন,
দলিত নলিনী সম মলিন বদন;
সজল নয়ন দুটী,
ম্লান ভাবে আছে ফুটি,

নাহিক জ্যোতির কণ,
মধুভরা দিঠি ঘন,
ক্লান্তি ভরে সদানত যুগল রতন,
আলু থালু কেশ পাশ নীবির বাঁধন।

প্রীতি ভরা কলেবর—আশা-নিকেতন,
এবে রুদ্র নিরাশার হয়েছে ভবন;
চিবুক-কুহরে আর,
খেলেনা লাবণ্য ধার,
বাঁধুলি জড়িত ওঠে
হাসি ফুল নাহি ফোটে,
কপোলের পদ্মরাগ হ'য়েছে বিলীন,
অশ্রুসিক্ত মুখ খানি নিষ্প্রভ মলিন।

প্রদোষের স্বর্ণাঞ্চল দোলাইয়া ধীরে,
বাসন্তী সমীর এলো কোথা হ'তে ফিরে;
আইল কুসুম গন্ধ,
পিকের পঞ্চম ছন্দ,
ঝঙ্কারী সঙ্গবী বধূ,
ধাইল খুঁজিতে মধু,
কিশোরী চাহিয়া দেখে সম্মুখে তাহার,
প্রীতি, প্রেম, আনন্দের পূর্ণ অবতার।

দৃপ্ত যৌবনের কোন অজানিত স্রোত,
করিল মলিনা চিত্ত তূর্ণ ওতঃপ্রোত—
নয়ন দীপতি মালা,
করিল বদন আলা,
ললিত লাবণ্য কলা,
অখণ্ড অমৃত গলা

সুপ্তাধরে শুভ্র হাসি, দিল দরশন,
দেহ মাঝে রূপোচ্ছ্বাস জাগা'ল মদন।

সম্মুখে দাঁড়াল পান্থ নির্ব্বাক নীরব,
দিঠি হ'তে বাহিরিল মন্দার সৌরভ
বাসনার গ্রন্থি গুলি,
ছায়া স্পর্শে গেল খুলি,
আঁখির আদর জলে,
প্রখালিয়া কুতূহলে,
সোণার লতায় ধীরে করিল বেষ্টন,
সুখ, যেন স্পর্শ মূর্ত্তি করিল ধারণ।

ভাষায় নাহিক স্বর নাহিক নিক্কণ,
প্রেমের অমৃত সরে ভাষা নিমগন,
প্রীতির পরশে চিত,
তরলিত, তরঙ্গিত,
স্বপ্ন যেন জেগে উঠে,
দাঁড়াইয়া করপুটে,
মণি মন্ত্রে মায়া পুরী করিল সৃজন,
বিরহ শ্মশানে, আজ মধুর মিলন।

স্বপনে বাজিল বাঁশী; স্তব্ধ রজনীর,
শেষ পান্থ হ'তে মৃদু মলয় সমীর,
মধুর কুসুম স্নেহ—
পরাগে, রঞ্জিয়া দেহ,
স্পর্শাতুরা বল্লরীরে,
দোলাইয়া অতি ধীরে,
করিছে সরসস্পর্শে, অশ্রান্ত নবীন,
মলিনা, সুরভি ভরা প্রভাত নলিন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

প্রতিবাদ।

গত পৌষ মাসের "নব্যভারতে", শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় "বর্ণ সাম্য ও ধর্ম্ম সাম্য" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহার মধ্যে "বর্ণ সাম্য" আংশিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। হিন্দুর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দু সমাজের ভিতর অবস্থান করিয়া, এক জন হিন্দু নাম-ধারী শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ অভূতপূর্ব্ব,

অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শনে অগ্রসর হইতে পারেন, এরূপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে ছিল না। "অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি।"

নূতন মত গঠনে, নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে একটা বাহাদুরী আছে, সন্দেহ নাই; যদি সে মত যুক্তিযুক্ত হয়, যদি সে মত বিজ্ঞ-জন-সমাদৃত হয়।

মধুসূদন বাবু একটী সব ডিভিজনের দুই শত স্কুলের ছাত্রের গাত্রবর্ণ হইতে আর্য্যোনার্য্যের জাতীয়ত্বের হিসাব করিয়াছেন। এবং তাহাতে তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান ইংরেজের বর্ণ আর্য্যবর্ণ (শ্বেতবর্ণ)। সাঁওতালদিগের বর্ণ অনার্য্য বর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ। এক্ষণ যদি ইংরেজের বর্ণ বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ব্যক্তির শরীর শত ফোঁটার শত ফোঁটাই আর্য্যরক্ত আছে, বিবেচনা করা যায় এবং সাঁওতালের বর্ণানুরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির শত ফোঁটার এক ফোঁটাও আর্য্যরক্ত নাই, ধরা যায়, তবে হিন্দুজাতি (caste) সকলের মধ্যে আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত কি, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে।"

সরকার মহাশয় উক্ত স্বতঃসিদ্ধমত অনুসারে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে ২৩.৫, কায়স্থকে ২১.৬, বৈদ্যকে ১৬.৮, ডিক্রীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

জাতিভেদের এই যে আর্য্যানার্য্যের রক্তের তালিকা, ইহা দেখিলে হঠাৎ একটা বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও নির্ভুল। কিন্তু উহার ভিতর তলাইয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে না আছে যুক্তি, না আছে বিজ্ঞতা, না আছে বিজ্ঞান।

পারদ-নির্ম্মিত জ্বরের উষ্ণতা পরিমাপক ও পরিবোধক থার্ম্মোমিটারে কত ডিক্রী জ্বর হইয়াছে, তাহা জ্বরগ্রস্ত রোগীর শরীর হইতে পরীক্ষিত হয়। কিন্তু জাতিভেদের, —বর্ণ-ভেদের আর্য্যানার্য্য রক্তের অনুপাত নির্ণয় করিবার কোন যন্ত্র থাকিলে, অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইত যে, ব্যক্তি বিশেষের শরীরে এত পরিমাণে আর্য্যরক্ত আছে; এত পরিমাণে অনার্য্য রক্ত আছে। এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যখন নাই, তখন নজর পছন্দে সংগৃহীত তালিকায় কিরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায়? উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত হইবে। বিশেষতঃ উক্ত তালিকার সিদ্ধান্ত এরূপ ভ্রমসঙ্কুল যে, তর্কস্থলেও উহা স্বীকার করা যায় না।

আর্য্যগণ এদেশের—বঙ্গ দেশের আদিম অধিবাসী কিনা, এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আর্য্যগণের অধিবাস যে হিমপ্রধান প্রদেশে ছিল, ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সমসাময়িক কালে আর্য্যগণ হিমপ্রধান প্রদেশে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের যে শ্বেত-বর্ণ ছিল, তাহাই হিন্দু ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন পুরাণে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ উচ্চ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে—হিমপ্রধান স্থান হইতে উষ্ণ প্রধান স্থলে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জল বায়ু, প্রাকৃতিক শৈত্য উষ্ণতাই যে মানুষের আকৃতি প্রকৃতি বল বর্ণের মূল কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শীতপ্রধান দেশবাসীর অধিকাংশই, শ্বেত বর্ণের। গ্রীষ্ম-

প্রধান দেশবাসী কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ ও গৌর-বর্ণের। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম অনুসারে বল বর্ণের গঠন বিধাতার নিয়ম, ইহার উপর মানুষের হাত নাই, সুতরাং অস্বীকারও করাও কর্ত্তব্য নহে।

মধুসূদন বাবু একস্থলে বলিয়াছেন,—

"যদি জল বায়ু বশতঃ (Climatic influence) বশতঃ এই বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিত, তবে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৃষ্ণবর্ণ হইল না কেন? বিশেষতঃ এমন ঘটনা অনেক পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে পিতা-মাতা যথাক্রমে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, সেখানে প্রথম সন্তান কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় গৌরবর্ণ, তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণ এবং চতুর্থ গৌরবর্ণের হইয়াছে।"

মধুসূদন বাবুর উপরিউক্ত কথাগুলি, তাঁহার যুক্তিবিরোধী। তিনিইত দেখিতে পাইতেছেন, পিতা মাতা গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সন্তান একবার গৌরবর্ণ, অন্যবার কৃষ্ণ বর্ণের হইতেছে! সেস্থলে আর্য্যানার্য্যের কল্পনা আইসে কোথা হইতে? এ স্থলে সন্তানের এক দিক কৃষ্ণ ও অন্য দিক গৌর বর্ণের হইলে, মধুসূদন বাবুর যুক্তির সহিত মিল হইত।

মধুসূদন বাবু যে উদাহরণ দিয়াছেন, আমরা বহু স্থলে উহার বিপরীত অবস্থা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। পিতামাতা উভয়েই গৌরবর্ণ, সন্তান হইতেছে কৃষ্ণ বর্ণের। আবার পিতা মাতা উভয়েই কৃষ্ণ বর্ণ; সন্তানগুলির মধ্যে কোনটী গৌরবর্ণ, কোনটী শ্যাম বর্ণ, কোনটী নিভাজ কৃষ্ণ বর্ণের হইতেছে। অন্যস্থলে পিতামাতা ফিট গৌরবর্ণ; সন্তান আবলুসের বর্ণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। এ সকল বিসদৃশ অবস্থার মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে বৈজ্ঞানিক মীমাংসা রহিয়াছে, মধুসূদন বাবু যদি তাহা আলোচনা করিতেন, তবে আর এরূপ অজ্ঞতা অন্ধকারে তাঁহাকে পড়িতে হইত, না। মধুসূদন বাবুর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, কেবল স্বীয় মত সমর্থনের জন্য দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতেও স্বমত সমর্থিত হয় নাই। আমরাও কয়েকটী উদাহরণ দিয়া এবার আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

একজন ইংরেজ বহুকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে এবং একজন বাঙ্গালী দীর্ঘকাল শীতপ্রধান দেশে অবস্থান করিলে, উভয়ের বল বর্ণের বিপর্য্যয় অবশ্যই হইবে। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, বাল্যকালে যে শ্যামবর্ণ, যৌবনে সে গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে; বাল্যকালে যাহাকে কৃষ্ণ-বর্ণ দেখিয়াছি, যৌবনে দেখি, তাহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—সে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপ বিসদৃশ চিত্র যখন সর্ব্বদাই দেখিতেছি, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, আর্য্যানার্য্য রক্তের সংশ্রবেই বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটে।

ব্রাহ্মণের মধ্যে যেমন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ আছে, মেথর ডোমের মধ্যেও তেমনি গৌরবর্ণের মানব আছে। যদি এস্থলে সরকার মহাশয়ের তালিকায় আর্য্যা-নার্য্যের রক্তের পরিমাণই ধরা যায়, তবে তাহার ফল কি দাঁড়ায়? এস্থলে, তাঁহার তালিকার প্রণালী কখনই থাকিবে না। কারণ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণের আর্য্যরক্ত, ডোমের গাত্রের আর্য্যরক্ত অপেক্ষা অনেক কম সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং ২৩'৫ নিশ্চয়ই পুছিতে হইবে।

বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয়গণ আর্য্য-বংশসম্ভূত, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণ গৌর, শ্বেত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভুটিয়া পাহা-

ড়ীয়া ম্যাচ্ জাতীয় লোকের বর্ণও ত শ্বেত, তাহারাও কি আর্য্য জাতি বলিয়া অভিহিত হইবে? বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ণ ধরিয়াই যদি আর্য্যানার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পশুর মধ্যে, শ্বেত হস্তি, শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত বরাহ, ও পক্ষী জাতির মধ্যে রাজহংস, শ্বেত পারাবত, বলাকা প্রভৃতিও আর্য্যত্বের দাবী উপস্থিত করিতে পারে। বাস্তবিক্ শ্বেতবর্ণ ধরিয়া মধুসূদন বাবু আর্য্যজাতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক, সুতরাং সর্ব্বথা ঐ মত পরিত্যাজ্য। মানুষ শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কেন প্রাপ্ত হয়, বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা করিলে, মধুসূদন বাবুর আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইবে না মনে করিয়াই বুঝি এ সকল বিসদৃশ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

উচ্চ নাসিকা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, উহাতে এমন কিছু মনে করিতে হইবে না যে, হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ নাসিকা আর্য্যত্বের পরিচায়ক। যে সময় উচ্চ নাসিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় কেবল আর্য্য ও অনার্য্য, এই দুই শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ ছিল বলিয়াই, উচ্চ নাসিকার ব্যাখ্যা ছিল। আর্য্যগণের উচ্চ নাসিকা ও অনার্য্যগণের নীচ নাসিকা ছিল।

পূর্ব্বকালের আর্য্যজাতির সহিত বর্ত্তমান আর্য্য জাতির—হিন্দু জাতির শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অবস্থার তুলনা করিলে, এক মহা সমস্যায় উপনীত হইতে হয়। সে কালের আর্য্যগণ দীর্ঘ ও দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, সাহসী, অমিত পরাক্রমী, জ্ঞানের আধার, ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, আর একালের আর্য্যগণ—হিন্দুগণ কবির বর্ণিত

"ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ মন, ক্ষীণ ধন, ক্ষীণ প্রাণ,
* * ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী" বলিয়া

পূর্ণ ভাবে অভিহিত। এক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মানুষের আকৃতি, বল, বর্ণ আলোচনা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্যস্থলের অধিবাসিগণের আকৃতি, বল, বর্ণ আলোচনা করিলে, প্রতিপদেই বিসদৃশ পরিলক্ষিত হইবে।

হিন্দু জাতির ভিতর যাঁহারা আর্য্য জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের অনার্য্য সংস্রব স্বীকার করার এখনও তত দরকার হইয়া উঠে নাই। জাতিভেদ স্বীকার না করা, অনার্য্যত্ব স্বীকার করা, এক কথা নহে, এ কথা যেন মধুসূদন বাবু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন।

ভড়ার মেয়ের বিবাহ—অসবর্ণ বিবাহ এখনও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সমর্থন করে না। এখনও ওগুলি সামাজিক ব্যভিচার বলিয়া কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতির মধ্যে যে শ্রেণীভেদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা উঠাইয়া দিলে বিবাহাদি ব্যাপারের কাঠিন্য অনেক কমিয়া যাইতে পারে। তাহাই যখন হইতেছেনা, তখন অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলন সামাজিক মতে ব্যভিচার।

শ্রীগোপালনারায়ণ মজুমদার।

টমাস্ কার্লাইল্।

সংসারে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক আছে, সংসারে কি রূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাঁহারা কেবল তাহারই চিন্তা করেন; মানসিক উন্নতি ইঁহাদের চিন্তার বিষয় নহে। কিরূপে বৈষয়িক উন্নতি করা যায়, কিসে স্বার্থ-সাধন হয়, ইহাই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈপ্সিত কার্য্য উদ্ধারের জন্য এরূপ লোমহর্ষণ কোন উপায়ই নাই, যাহা তাঁহারা অবলম্বন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দিগ্ধ। সংসারে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সংসারের অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর লোকের বাধ্য, এবং তাঁহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা ধনী, ক্ষমতাশালী এবং পরাক্রমশীল। কিন্তু সংসারের লোকও অন্তরের সহিত ইঁহাদিগকে ভক্তি করে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়; কারণ, স্বার্থসিদ্ধি হইবার আশা না থাকিলে সেই সকল লোকই তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বৈষয়িক উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিলেও, তাহাই যে মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, এরূপ মনে করেন না; সুতরাং এই উন্নতিকল্পে তাঁহারা গুরুতর অধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহেন। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিয়া চলেন। ইঁহাদের সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা অনেক কম। অপর আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতেই সংসারকে এক নূতন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, ভগবান্ মনুষ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন; মানবজীবন এক প্রহসন বা ধূলাখেলা নহে; যে সকল উপাদানে মনুষ্যের দেহ, মন গঠিত, তাঁহাদের মতে, তাহার যথাযথ ব্যবহার করাই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল বৃত্তি লইয়া মনুষ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার যথাযথ পরিচালনাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, এবং অপব্যবহারই পশুত্ব। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য তাঁহারা আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সংসারকে তাঁহারা পরীক্ষাস্থল মনে করেন; এই পরীক্ষায় যাঁহারা অনাহত শরীরে উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহাদের মতে তাঁহারাই মনুষ্য পদবাচ্য। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের "লজ্জা' ঘৃণা' 'ভয়' তিন থাক্‌তে নয়"—এই মন্ত্রের উপাসক। সুতরাং তাঁহাদের চাল্‌চল্‌তি একটু বেয়াড়া, অর্থাৎ সংসারের অবলম্বিত পন্থার বিপরীত। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহারা অন্যের প্রদর্শিত পন্থা—তাঁহাদিগের অনুমোদিত না হইলে অনুসরণ করেন না। এই জন্য তাঁহারা সংসারে লাঞ্ছিত এবং পদদলিত; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা সক্রেটিসের মত প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু নিজের ধ্রুব বিশ্বাস হইতে একপদও বিচলিত হইতে প্রস্তুত নহেন। সংসারের লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বলে, কিন্তু ভগবানের এমনি বিধান যে, কালে তাঁহাদের প্রলাপ বাক্যই এই দুর্নীতিক্লিষ্ট সংসার

য়ের একমাত্র পথপ্রদর্শক বলিয়া গণ্য হয়। টমাস্ কার্লাইল্ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক।

টমাস্ কার্লাইল্ এক ধর্ম্মপ্রবণ দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মনুষ্যের চরিত্রের উপর পিতামাতার চরিত্রের যে অসাধারণ আধিপত্য, এই বিশ্বাস আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; টমাস্ কার্লাইলের চরিত্রে এই বাক্যের সার্থকতা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরিবারের সকলেই পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং সরলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই পরিবার সম্বন্ধে কার্লাইল স্বয়ং বলেন, "They had to scramble for their very clothes and food. They knit, they thatched for hire, they hunted. My father tried all these things almost in boyhood." তাঁহার পিতামহের বিষয়ে কার্লাইল্ বলেন, "He did not drink, but he was a fiery man, irascible, indomitable, of the toughness and springiness of steel." কার্লাইল তাঁহার মাতার সম্বন্ধে বলেন "a woman of to me the forest descent, that of the pious, the just and the wise" তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কার্লাইল লিখিয়াছেন, "More remarkble man than my father I have never met in my journey through life, sterling sincerity in thought, word, and deed, most quiet, but capable of blazing into whirlwinds when needful, and such a flash of just insight and brief natural eloquence and emphasis, true to every feature of it as I have never known in any other." কার্লাইল যখন কারকেলডি (Kirkaldey) স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক পত্রে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন "Oh Tom, mind the golden season of youth, and remember your Creator in the days of your youth. Seek God while He may be found. Call upon him while he is near. We hear that the world by wisdom knew not God. Pray for his presence with you and His counsel to guide you. Have you got through the Bible yet? It you have, read it again. *I hope you will not weary*, and may Lord open your understanding." যাঁহার পিতামাতা এইরূপ, তাঁহার স্বভাব কিরূপ হইবে, তাহা পাঠক কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারেন। কার্লাইল শৈশবাবস্থায় অত্যন্ত লাজুক এবং নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। যাহার তাহার সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন না; তাঁহার মনের মত লোক সহস্রের মধ্যে একটী মিলিত। তিনি অধিক কথা কহিতেন না, কিন্তু যদি কিছু কহিতেন, সকলই সসার। ক্রোধপ্রবণতা কার্লাইল পরিবারের একটী বিশেষত্ব; কার্লাইলও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। বাচালতা ও চাঞ্চল্য তাঁহার চক্ষুর শূল ছিল। সরলতার সহিত সততার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কার্লাইল স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ইহার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা গিয়াছে। যাহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস না করিতেন, মুখে এরূপ কোন কথা বলা তিনি পাপ বোধ করিতেন, এবং যখন কার্য্য করিতেন, তখনও বিশ্বাসানুযায়ী চলিতেন; লোকের মতে বা স্বার্থের অনুরোধে কখনও বিচলিত হইতেন না। বিলাসিতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইহার সহিত নৈতিক শিথিলতা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশাইয়া আছে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে সংসারকে এবং জীবনকে তিনি বিশেষ ভাবে দেখিতে লাগিলেন। জীবন একটী ঘোরতর সমস্যা, সংসার সেই জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্র। 'হেসে খেলে নাওরে যাদু' ইহাকে তিনি জীবনের লক্ষ্য মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সংসারের প্রত্যেক লোকেই কোন না কোন বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সে আসিয়াছে, তাহা আত্মপরীক্ষার দ্বারা সময়ে সে বুঝিতে পারিবে। অলসতা বা আপাত সুখের অভিলাষ নিবন্ধন যে এই কর্ত্তব্য

হইতে বিচলিত হয়, তাহার জীবন বৃথা। যাঁহারা সৎ এবং চরিত্রবলবিশিষ্ট এবং ভ্রমেও কখন যাঁহারা গর্হিত কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা অনেক সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ; কিন্তু ঐ দাম্ভিকতা অহঙ্কার-প্রসূত নহে, সৎবিশ্বাস-জাত। সক্রেটিশ্ তাঁহার মৃত্যুকালে আত্ম সমর্থনের সময়ও এই দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার শত্রুগণ ভ্রমপ্রমাদ বশতঃই তাঁহার প্রতি এই অন্যায় শাস্তিবিধান করিয়াছে। কার্লাইলের কথোপকথনে এবং পুস্তকে এইরূপ দাম্ভিকতার আভাস পাওয়া যায়। তিনি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু সাংসারিক আর সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; সুতরাং সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তিনি অনেক সময় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে ত্রুটীও স্বীকার করেন নাই। কার্লাইল-পরিবারের সকলেই স্বাধীনচেতা ছিলেন; টমাস্ কার্লাইলের দারিদ্র্য-নিবন্ধন অনেক সময় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, অর্থাগমের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতে কখনই লেখনী-ধারণ করেন নাই। যিনি সংসার-বিরাগী অথচ সংসারেই থাকেন, তাঁহাকে ঘোর সাংসারিক লোক এক অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করে। কার্লাইলের আচার ব্যবহার, আকৃতি প্রকৃতি, সকলই অদ্ভুত ছিল। তিনি তাঁহার নিজভাবে এবং তত্ত্বানুচিন্তনে সর্ব্বদাই বিভোর থাকিতেন, সংসারের ধার ধারিতেন না; বোধ হয়, সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন তিনি দারিদ্র্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে রত ছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার অন্য কোনও পিপাসা ছিল না, এই কথা বলা অত্যুক্তি বোধ হয় না; এই জন্য তাঁহার জীবনে ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য-ত্রুটি- দোষ দেখা যায়; কিন্তু তাঁহার নিজের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, বোধ হয়, তাহা চিন্তা করিবার সময়ও ছিল না। প্রতিবেশীর বাটীর কুকুর ডাকিলে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত; কিন্তু যে সকল বিপদে মনুষ্যের স্থৈর্য্য বিচলিত হয় এবং চিত্তের স্বাভাবিক শান্তভাবের বিপর্য্যয় ঘটে, তিনি তাহাতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল থাকিতেন। আধুনিক সভ্যতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিলাসিতা, কপটতা, ব্যভিচার এবং অধর্ম্মের প্রতি তিনি অনেক সময়ে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহাতে সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনুষ্য-বিদ্বেষী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সেরূপ ছিলেন না। যাঁহাদের সত্ত্বতা অধিক, তাঁহারা অসৎ মনুষ্য এবং অসৎ কার্য্য দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হন এবং তদ্ধেতু মনুষ্য-বিদ্বেষ-সূচক শ্লানিকর বাক্য বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর মানব প্রেমে মাখা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ-জীবনেও ঐরূপ মনুষ্যবিদ্বেষ ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণ পরিলক্ষিত হইত; কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা এই দেশের মনুষ্যের হিতকারী আর কে আছে? কার্লাইল পার্থিব কোন বস্তুকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল

যে, পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে এক গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারাই প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর প্রধান কার্য্য।

কারলাইল্ প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রবেশ করেন। তথায় তাঁহার শিক্ষকগণ অচিরেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এনান্ (Annan) গ্রামার স্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া দুর্দ্ধর্ষ বালকদিগের প্রকৃতিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৪ বৎসর বয়সে তিনি এডিন্বরা কলেজে প্রবেশ করেন। এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয়েও গণিত ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ভালরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই এবং তথাকার শিক্ষকদিগের বিদ্যাবত্তা বিষয়েও তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না। এইস্থলে একাদশটী বয়স্যের সহিত তিনি বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হন। ইঁহারা সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্র বিষয়ে সাধারণ ছাত্রদিগের অনেক উপরে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই কার্লাইল্কে তাহাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিতেন, এবং তিনি যে উত্তরকালে প্রতিভাবলে একজন অসাধারণ মনুষ্য হইবেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন। ১৮১৪ খ্রীঃ কলেজের পাঠ্য সমাপ্তি না হইতেই কিরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিবেন, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন এবং Annan School এর গণিত শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে প্রতিযোগিতায় তিনি মনোনীত হইলেন। এই সময়ে কার্লাইল-পরিবার ইক্লিফিকান্ (Ecclefechan) মেন্হিলে (Mainhill) গিয়া তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শিক্ষকতা কার্য্য ভালবাসিতেন না। এনান্ স্কুলে অবস্থান কালে, অধিকাংশ সময়ই পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি Edward Irving এর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। Irving স্কট্ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কার্লাইল Kirkaldy বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; Irvingও তথায় শিক্ষকতা করিতেন। Irving এর সহিত বন্ধুতা ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং Irvingও কার্লাইলকে অতি সহৃদয় ভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহারা উভয়েই উক্ত Kirkaldy স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে কার্লাইলের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন এবং সন্দেহ উদিত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। কার্লাইলের মাতা কার্লাইলকে সময়ে সময়ে যে সকল নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ের উপদেশ দিতেন, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি ধর্ম্মযাজক হইবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, এবং কিছু দিন অতি যত্ন সহকারে ব্যবহার শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সাহিত্যই তাঁহার প্রকৃত ক্ষেত্র। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সময় Bunyan এর ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে, তিনি অত্যন্ত পাপী—পাপ-নিরয়ে নিমজ্জিত—তাঁহার আর পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। অবশেষে তাঁহার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল—তিনি শান্তিরাজ্যে পদার্পণ করিলেন।

তিনি স্থির বুঝিলেন যে, মনুষ্য স্বাধীন, তাহার আত্মা স্বাধীন; সে ইচ্ছা না করিলে পাপ এবং শয়তান্ তাহার আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না; মনুষ্য তাহার স্বীয় কর্ম্মবশেই সুখ দুঃখ ভাগী হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিণী জেন ওয়েল্‌শের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার বন্ধু Irvingই জেন ওয়েল্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। জেন্ ওয়েল্‌শের পিতা ধনী ছিলেন এবং জেন্ ও তাঁহার অতি আদরের কন্যা ছিলেন। প্রতিভার উজ্জ্বল রেখা তাঁহার সুচারু বদনকমলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। শৈশবেই তিনি সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা এবং আধুনিক ভাষায় বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কার্লাইলের ন্যায় বলবতী ছিল। কার্লাইল তাঁহার কিশোরাবস্থা বর্ণনা সময়ে বলিয়াছিলেন,—

"Feel that figure with electric intellect, love and general vivacity of all kinds, where in nature will you find a prettier"? Edward Irving কিছু দিনের জন্য জেন্ ওয়েলশের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জেন্ ওয়েলশের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহার সকল সম্পত্তি কন্যাকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। জেন ওয়েলশ্‌ও প্রথম হইতেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি নানা বিষয়ক পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং নানা গুণপণায় বিমোহিত হইয়া, অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলে; কিন্তু সকলকে তিনি আলাপ ব্যবহার দ্বারা সুখী করিলেও, কখনও বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতেন না। তাহার শিক্ষকের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, কিন্তু Edward পূর্ব্ব হইতেই Miss Martinএর নিকট পরিণয়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া, জেন্ ওয়েল্‌শ্ এবং এডওয়ার্ড কেহই পরস্পরের পরিণয় সম্ভাবনা মনেও স্থান দেন নাই। নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা হেতু, এডওয়ার্ড জেনের শিক্ষাবিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না, সুতরাং শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ তিনি টমাস্ কার্লাইল্‌কে তাঁহার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিতে বলেন। কার্লাইল্ তদনুযায়ী তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। উভয়েই উভয়ের প্রতিভা সন্দর্শনে প্রথম হইতেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কারলাইল জেন ওয়েলশের বিচারশক্তির এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর তাঁহার জীবন সমস্যায় সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সময় তিনি Life of Schiller লিখিয়াছিলেন এবং গেটে (Goethe) কোন গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই দুই পুস্তক ছাপা হইবার পূর্ব্বে তিনি জেনকে দেখিতে দিয়াছিলেন। কারলাইল জেনের নিকট প্রেমিকের ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, জেন তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলিয়াছিল, পরে ইহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই আসক্তি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং পবিত্রতা পূর্ণ কারলাইল

প্রথমে বিবাহ প্রস্তাব করেন, জেন তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। জেনের মাতা প্রথম হইতে এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি জানিতেন, কার্লাইলের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে জেনের চিরদিন দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইবে। জেন তাহা শুনিলেন না, বিবাহের কথা স্থির হইল। দেশের প্রথানুযায়ী জেন্ তাঁহার ভাবী শ্বশুর এবং শাশুড়াকে দেখিতে মেন্‌হিলে (Main hill) গমন করিলেন। কার্লাইলের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীগণ পূর্ব্ব হইতেই জেনের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন। দরিদ্র কৃষকের গৃহে রাজনন্দিনী আগমন করিবেন, কিছু অভ্যর্থনা আবশ্যক। কার্লাইলের ভগিনী মারগারেট (Margaret) টেবিলের উপর একখানা শাল বিস্তার করিলেন, তিনি কোন বন্ধুর নিকট হইতে উহা উপহার পাইয়াছিলেন। জেন কার্লাইলের গৃহে উপস্থিত হইলে কারলাইল-পরিবারের অনেকেই উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়াছিলেন—'কাঙ্গালের দুয়ারে হাতীর পাবা'। কেহ কেহ দূর হইতে উকী মারিয়া জেনকে দেখিয়াছিল; কারলাইলের পিতা তখন ক্ষেত্র হইতে কৃষকের মলিন পরিচ্ছদে জেনকে দেখিতে আসিলেন; বোধ হয়, কিছু লজ্জিত হইয়া জেনকে দেখা মাত্র সরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে পুনরায় জেনকে দেখিতে আসিলেন। জেনের সরল ব্যবহারে কার্লাইলের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই সুখী হইয়াছিলেন, এবং প্রাসাদবাসিনী সুখাঙ্কলালিতা ধনী-দুহিতা নির্ধনীর কুটীর সন্দর্শনার্থ আগমন করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে কার্লাইল-পরিবারের যে উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, জেনের সরল স্নিগ্ধ ব্যবহারে তাহা বিদূরিত হইল। জেনও আনন্দচিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জেন কার্লাইলের মাতার নিকট পত্রে একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

I have never been so happy since; though I have been at several fine entertainments, where much thought and purse and money were expended to assemble the ingredients of enjoyment, and this no wise strange, since affection is the natural element of my soul and that I found in your cottage warm and pure while in more splendid habitations it is chilled with vanity, affectation and selfishness. For there is nothing but a mixture of good and evil in this world, mother, and thus some have the 'dinner of herbs where love is,' others "the stalled ox and hatred therewith."

বিবাহের কথা স্থির হইল। জেনের মাতার নিতান্ত ইচ্ছা কার্লাইল এবং জেন্ তাহাদের বিবাহের পরে তাঁহার সহিত তাহাদের হ্যাডিংটনস্থ (Hadington) বাটীতে বাস করেন। জেন তাহার একমাত্র কন্যা। কার্লাইল তাহাতে রাজী নন। কার্লাইলের গৃহে অন্য কাহারও কর্তৃত্ব থাকিবে না। তিনি তথায় তাঁহার আপন রুচি মত থাকিবেন। তিনি বলেন, "two households could not live as if they were one, and he would never have any right enjoyment of his wife's company till she was all his own." এই জন্য কমলিব্যাঙ্কে (Comely Bank) তাঁহাদের জন্য একটী বাটী ভাড়া করা হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে বিনা আড়ম্বরে জেন এবং কার্লাইলের বিবাহ হইয়া গেল; তৎপরে কিছু দিবস তাঁহারা ঐ বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। অনেক লোক বাটীতে আসা যাওয়া করে, কার্লাইল ইহা ভালবাসিতেন না। এই সকল (Nauseous intrusions) হইতে দূরে এবং নিরুপদ্রবে থাকিবার

জন্ত সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত Craigenputtock এ থাকিবার সংকল্প করিলেন। তথায় প্রকৃতির নিভৃত কন্দরে বসিয়া তাহার শোভা সন্দর্শন এবং সাহিত্য সেবা করিতেন। এই স্থানে মহামতি এমার্সন (Emerson) আমেরিকা নিজন প্রান্তবাসী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এমার্সন স্বয়ং বড়, তাই কার্লাইল-বন্ধুকে দেখিবার জন্ত সাগর ভূধর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হইল, উভয়ই মুগ্ধ হইলেন। জেন ওয়েলস্কে এই Craigenputtock এ অবস্থান কালীন সামান্ত পরিচারিকার ন্থায় দুগ্ধ দোহন হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই করিতে হইত। কার্লাইল তাঁহার নিজ ভাবে বিভোর থাকিতেন, কখন কখনও পাইপ মুখে জগতত্ত্ব অনুচিন্তনে আত্মহারা হইতেন। কোমলি ব্যাঙ্কে (Comely Bank) অবস্থান কালীন সুধাবর গেটে (Goethe) কার্লাইল ও জেনকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। গেটে কারলাইল লিখিত Life of Schiller পাইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, নৈতিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে এক লোক জন্মিয়াছে,—"a new moral force, the extent and effects of which it is impossible to predict." কার্লাইল গেটে প্রদত্ত 'Faustus' পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উভয়ের পরস্পরে আত্মবিনিময় হইয়াছিল। কার্লাইলের স্ত্রীর জন্য গেটে এক ছড়া 'Iron Necklace' পাঠাইয়াছিলেন। কার্লাইল এবং তাঁহার স্ত্রী জেন গেটের জন্য নানা প্রকার সুন্দর উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এই জনশূন্য নিবিড় পর্ব্বতোপরি এক কুটীরে এই দম্পতি প্রায় সাত বৎসরের অনূর্দ্ধ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা এক সময় কিছু দিবস লণ্ডনে যাপন করেন। লণ্ডনে যাঁহাদের সহিত কার্লাইলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনি জন-ষ্টুয়ার্ট মিলকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহা বন্ধুতার পরিপন্থী হয় নাই।

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

যুগান্তরে।

সময়ে কত পরিবর্তন হয়। রাজধানীকে লোকে বৃত্তের কেন্দ্রের সহিত তুলনা করে। পরিবর্তন সম্বন্ধে রাজধানী পরিধিস্থ বিন্দু এবং কেন্দ্র দূরে, অতি দূরে। পরিধি যখন দ্রুত ঘোরে, কেন্দ্র সন্নিকটে তখন মন্দ গতি। পরিবর্তন রাজধানীতে যত দ্রুত হয়, দূরস্থ পল্লিগ্রামে তত শীঘ্র হয় না। সহরের পথে লোক ছোটে, ধীরে কেহ যায় না। দেহের মত মনটাও ছোটে। পল্লিগ্রামে সকলই মন্থর। নগরে সকলি অস্থির। বন্ধুতা অস্থির, শত্রুতা অস্থির, ভাব অস্থির—কেবল অকালপক্কতা। পল্লিগ্রামে বটবৃক্ষ বড় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু চিরদিন থাকে। নগরের বৃষ্টি-বৃক্ষ বে'র জল পাওয়া কণের মত লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু এক ঝড়েই চূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং রাজধানীর নিকটে কত পরিবর্তন হইয়াছে দেখিয়া পল্লিগ্রামের পরিবর্তন কেহ অনুমান করিবেন না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাজধানীতে

একটী শেমিজ পরাইয়াছিলাম। ননদেরা সব আয়া বলিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রশংসা করিলেন, প্রতিবাসীরা খ্রীষ্টান বলিয়া অভিহিত করিলেন, ব্রাহ্মণী মণ্ডল ঘাটের মেয়ে, শেমিজ ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এখন নদে শান্তিপুর, কুমিল্লা হিজলী, হাটে ঘাটে, বাটে মাঠে শেমিজ জ্যাকেট ছড়াছড়ি।

ব্রাহ্মণীর বাপের বাড়ীর দেশে তখনও বাঁকমল ও তাড়ু খাড়ুর চলন ছিল। আমরা সহুরে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে আমাদের বাড়ী। আমাদের দেশে মাথায় সিঁথি, কাণে মাকড়ী, গলায় মাদুলী বা সাতনর, হাতে বালা, মনদানা, যবদানা, মুড়কী মাদুলী ও বাজু ও তাবিজ; কোমরে গোট বা চন্দ্রহার, পায়ে পায়জর ও মল পরিত। তখনও বাউটী স্থুটের চলন হয় নাই। আমার ভাগ্যে ব্রাহ্মণীর নানা সংস্করণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বাউটী স্থুট, তৃতীয়ে মুক্তামালা যশমের সঙ্গে ইয়ারিঙ্গ ও ব্রেসলেট। চতুর্থ সংস্করণে হার ও চুড়ী। অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি? প্রথম সংস্করণে—বাড়ীতে যুগীর সাড়ী, বাহিরে শিমলা, দ্বিতীয়ে—বাড়ীতে বিলাতী, বাহিরে ফরাসডাঙ্গা, তৃতীয়ে—বাড়ীতে ফরাসডাঙ্গা, বাহিরে বারাণসীর তিন পাড় নীলাম্বরী। চতুর্থের দুই পাড় অনুবীক্ষণ সাপেক্ষ, তবে বোম্বায়ের কিছু বাড়া বাড়ী। বাবার মাথা কামান, মাঝখানে একটী টিকী, বাড়ীতে নপোয়া বহরের থান, বাহিরে আড়াই হাতী। বাড়ীতে খড়ম, বাহিরে খালি পা বা চটী জুতা। কাছারী যাইবার সময় মাথায় হাতে বাঁধা পাগড়ী থাকিত। গায়ে আঙ্গরাখা বা বেনিয়ান, তাহাতে ভুঁড়ীর অর্দ্ধেক ঢাকিত না, পায়ে চটী জুতা। কর্ত্তারা ছাতি ব্যবহার করিতেন না। বাড়ীতে একটী ছাতি থাকিত। ছেলেরা তাহা ব্যবহার করিত। সব বাড়ীতে ছাতি থাকিত না। সাধারণ লোকে গোল পাতার ছাতি ও টোকা ব্যবহার করিত। আমার জেঠা মহাশয় গ্রামের প্রধান জমিদার। তিনি যখন কোথায় যাইতেন, একটা প্রকাণ্ড ছাতা তাহার রূপার বাঁট চাকরে তাঁহার মাথায় ধরিত। আমরা ধুতি পরিতাম, কোথায় যাইতে হইলে গায় পিরাণ দিতাম। এক টাকায় এক জোড়া পিরাণ চেতলার হাটে কেনা হইত। স্কুলে যাইবার সময় গায়ে জামাও দিতাম না, পায়ে জুতাও থাকিত না। কুটুম্ব বাড়ী যাইতে কি কলিকাতায় যাইবার সময় জুতা পায়ে দিতাম। এক জোড়া জুতা ও এক জোড়া পিরাণে বছর কাটিত। শীতকালে গায়ে দোলাই দিতাম। তখন রেপার উঠে নাই। ১৮৬৯ সালে রেপারের প্রথম আমদানী হয়। এক একখানি রেপারের দাম দশ বার টাকা। ছেলে বেলা দিশী ছিটের ও বড় হইলে লক্ষ্ণৌ ছিটের দোলাই গায় দিতাম। কর্ত্তারা বনাত গায়ে দিতেন। কোথায় যাইতে হইলে শাল বাহির করিতেন। শালের ভিতর একখানা সরু চাদর ঢাকা দিতেন।

মা শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন বেতের পেঁড়ায় কাপড় ও সিঁদুর চুপড়ী সঙ্গে লইয়া। আমার জীবনের প্রভাত কালে ঘরে প্রকাণ্ড এক কাঁটাল কাঠের সিন্দুক ও

A bed by night and a chest of drawers by day

প্রকাণ্ড এক তপ্তকোষ তাহার তলায় জোড়া বাক্স। সে বাক্সে মার গহনা-গাঁটী

থাকিত. আমাদের তিন ভাই ও দুই বোনকে লইয়া মা সেই তপ্তকোষে শুইতেন।

ঘরে একটী কড়ির আনলায় কাপড় রাখা হইত। কড়ির শিকায় চিত্র করা হাঁড়ীতে মিষ্টান্নাদি রক্ষা করা হইত। কর্ত্তারা প্রায় চৌকিতেঁ বসিতেন। আমরা বারান্দার মাদুর পাতিয়া বসিতাম। কুটুম্ব আসিলে কাটীর মাদুর পাতা হইত। বিশেষ বড় লোকের উপলক্ষে সতরঞ্চী পাতিয়া চাদর ঢাকিয়া তাহার উপর দু চারিটা তাকিয়া রাখা হইত। আরো বড়লোক হইলে গালিচা বা দুলিচা পাতা হইত। ঘরে একটী জলচৌকার উপর পিতলের পিলসুজ, পানের বাটা ঘটী গেলাস ইত্যাদি সাজান থাকিত। এক পার্শ্বে গাড়ু ঝক ঝক করিত। গাড়ুর উপর গামছা পাট করিয়া রাখা হইত। পিলসুজের উপর রাত্রে প্রদীপ জ্বলিত। প্রাতঃকালে প্রদীপগুলি জলে ভিজান হইত। বিকাল বেলা মেয়েরা প্রদীপ মুছিয়া নূতন শলিতা তৈয়ার করিয়া প্রদীপে তেল শলিতা দিয়া পিলসুজের উপর রাখিয়া দিত। তখন সরিষার তেলেই প্রদীপ জ্বলিত, পরে রেড়ীর তেলের চলন হয়। কোচড়ার তেল আমদানী হয় নাই। কেরোসিন কাহাকে বলে, সাধারণ লোকে জানিত না। মজলীসে সাদাদান বাতি জ্বলিত। আমার মেয়েরা খুব উল বুনিতে জানে, সে দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সলিতা পাকাইতে কেহ জানে না।

বাবা তামাক খাইতেন না। তামাক খাওয়া ভদ্রতার ও হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কাকা তামাক খাইতেন। কুটুম্বদের জন্য বাঁধা হুঁকা তাঁহার ঘরে সাজান থাকিত, কিন্তু নিত্য ব্যবহারের জন্য কলি হুঁকা ছিল। চকমকি বাক্সে তামাক টিকে ও চকমকি পাথর থাকিত। ঘরে প্রতি রাত্রে তুঁষ ঘুঁটে দিয়া আগুন রাখা হইত। ম্যাচেস উঠে নাই। পাকাটীতে গন্ধক লাগাইয়া বাড়ীতে দিয়াশলাই তৈয়ার করা হইত। চেয়ার, টেবিল, কোচ লোকে চিনিত না। হাত বাক্সে খাতা পত্র, খরচের টাকা কড়ি থাকিত। তখন বাজার করিতে কড়ির খুব ব্যবহার ছিল।

আমরা বনিয়াদী বংশ। আমাদের গ্রামে অধিকাংশই কোটা বাড়ী ছিল। সাধারণতঃ পল্লিগ্রামে জমিদারের বাড়ী ভিন্ন পাকা বাড়ী প্রায় দেখা যাইত না। ভদ্রলোকের বাড়ীতে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, এক খানি কি দুখানি শোবার ঘর, রান্না ও ভাড়ার ঘর, ঢেঁকীশালা, গোশালা, গোলা ও আঁতুড় ঘর থাকিত। শোবার ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের পোতা খুব উচু করা হইত, এবং দাওয়া বাধা হইত এবং চালগুলি বেতের বা শণের বাঁধনে বাঁধা হইত ও উলুখড়ে ছাওয়া হইত। চালে রঙ্গ দিয়া চিত্র বিচিত্র করা হইত। অন্যান্য ঘরগুলি বিচালী বা গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হইত। গোলাঘর বাঁশের মাচার উপর উচু করিয়া তৈয়ার করিয়া উলু দিয়া ছাওয়া হইত। আতুড়ঘরটী সব ঘরের অপকৃষ্ট। কোন ঘরের বাহিরের দিকে প্রায় জানালা থাকিত না। উঠানের দিকে একটী দ্বার ও দুটী জানালা থাকিত। প্রত্যেক ঘরের সামনে দাওয়ার নীচে আঁস্তাকুড় থাকিত। সকল বাড়ীতেই দু একটী গরু থাকিত। আমি ছেলে বেলা কয়েকটী পায়রা পুষিয়াছিলাম, জেঠামহাশয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন। হিন্দুর বাড়ীতে মুরগী পোষা কেন?

গৃহস্থ বাড়ীতে কচিৎ একটা চাকর বা খানসামা থাকিত। চাকরাণী প্রায় রাখা হইত না। মেয়েরা তখনও তাস খেলিতে শিখে নাই। থিয়েটারে যাওয়া কি উলবোনা আরম্ভ হয় নাই। কর্ত্তারা বাজার করিতেন। রান্না বাড়না, বসনা মাজনা মেয়েরা সব করিত। কয়লা জ্বালান আরম্ভ হয় নাই। ঘুটে ও কাঠে রন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হইত। চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের ছাঁচ তৈয়ার করিতে, আলপনা দিতে, শিকা বুনিতে, দড়ী বা পৈতা পাকাইতে গৃহস্থের মেয়েরা কারুপণা দেখাইত। তখন হলুদ মাখা উঠিয়া গিয়াছিল, সাবান মাখা আরম্ভ হয় নাই। মাথাঘসা দিয়া মাথা পরিষ্কার ও বেসম দিয়া গা পরিষ্কার করা হইত। রন্ধন কার্য্যে পটুতা স্ত্রীলোকের আবশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। মাছের তরকারী এখন যত রকম হয়, তখন এত রকম হইত না। মাংস মহাপ্রসাদ বৎসরে পূজা উপলক্ষে আস্বাদ করা হইত। মাংস না খাইলে গায়ে বল হয় না, এ কথা লোকেরা শিখে নাই। হিন্দুর ঘরে পলাণ্ডুর এখন যথেষ্ট প্রচলন, তখন পেঁজ ছুইলে জাতি যাইত। পাউরুটী বিস্কুট হিন্দুরা ছুইত না। নিরামিষ রন্ধনে ও বহুবিধ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে মেয়েরা সুদক্ষ ছিল। এখনকার মেয়েরা পাক প্রণালী প্রভৃতি পড়িয়া যত প্রকার বিভিন্ন স্বাদের মাছ মাংস রাঁধিতে ও আচার তৈয়ার করিতে পারেন, তখনকার মেয়েরা তাহা পারিত না। কিন্তু এখন রন্ধন অভিরুচি সম্মত, তখন কর্ত্তব্য ছিল। তখন লেপ কাঁথায় যে কারিগরী দেখান হইত, এখন [illegible] ও সূচী তুলিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কারিগরী দেখান হয়।

আমার পিতৃ ও পিতৃব্যগণ কুস্তী শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া জানিতেন। আমাদের সময়ে কুস্তী শিক্ষার তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না। ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি, কপাটী প্রভৃতি খেলা করিত, যুবারা তাস খেলিত, প্রৌঢ়েরা পাশা ও দাবা খেলিতেন। পুরুষের দাতে মিশি দেওয়া, হাতে বাজু ও কোমরে গোট পরা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। ৮।৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি হাতে বাজু ও বালা এবং কাণে মাকড়ী পরিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে অনেক দিন মল পায় দিয়াছিলাম। আমরা প্রথম যৌবনে মাথায় সোজা সিঁথি কাটিতে, চওড়া পেড়ে ও তেপেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের আগে বাউরী চুলের চলন ছিল, আলবার্ট টেরীর চলন ছিল না। মেয়েরা মাথাঘসা ও তেলের মসলা পাইলে সুখী হইতেন, দোল দুর্গোৎসবে একটু আতর গোলাপজলের খরচ হইত। কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া ১৮৬৭ সালে যখন একশিশি পমেটম লুকাইয়া ব্রাহ্মণীকে উপহার দিয়াছিলাম, ননদের তাড়নায় শূকরের চর্ব্বিটা ব্রাহ্মণী ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তখন গুল বদান ঢাকাই শাড়ীর বড় আদর ছিল, তাহার পর কেরেপ, তাহার পর বেণারসীর আদর হয়। এখন বেণারসী বরুণার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি।

সংসারে স্বচ্ছলতা। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় ছয় সের করিয়া চাউল কিনিতে হইয়াছিল, তাহাতেই লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিয়াছিল। এখন ছয় সের নিত্য। চাসের ধান, পুকুরের মাছ, গাই এর দুধে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। তখন স্কুল মাষ্টার ও একজামিনে-

শনের তাড়া আরম্ভ হয় নাই। পাল পার্ব্বণে যাত্রার বড় ধূম হইত। কবিওয়ালারা তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, হাফ আকড়াই কচিৎ শুনা যাইত। সখের পাঁচালী ও যাত্রা লোককে পরিতৃপ্ত করিত। গোবিন্দ অধিকারী ও গোপালে উড়ের তখন বড় প্রাদুর্ভাব, দাসু রায় ও সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী প্রায় পেনসন লইয়াছেন। সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তীর অশ্লীল খেউড় ভাই বোন মাতা পুত্র এক আসরে বসিয়া তখন শ্রবণ করিত। তখন অশ্লীলতার কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। ভদ্র লোকের পরিবারের মধ্যে মেয়ে পাঁচালীর গান হইত।

বাড়ীতে বিপদ হইলে, বিশেষতঃ কাহাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে, কি সৎকার করিতে হইলে, সাহায্যের অভাব হইত না। না ডাকিতে প্রতিবাসীরা দৌড়িয়া আসিত। শ্রাদ্ধের সময় প্রতিবাসীদের বাড়ী যাইয়া দায় জানাইবার প্রথা ছিল। দায়গ্রস্তকে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রতিবাসীরা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। মোকদ্দমা মামলা গায়ের জোরে বা শালিসী দ্বারা মিটান হইত। বিশেষ আবশ্যক না হইলে কেহ কাছারী দৌড়িত না। হপ্তম ও পঞ্চমের নামে প্রজা থরহরি কাঁপিত, ছকুড়ী পাঁচ আইনের এত জোর বাড়ে নাই। প্রজা জমিদারকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, ভূদেব বলিয়া সম্বোধন করিত, খাজানা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া পড়িত, মাছট দিতে দ্বিরুক্তি করিত না, "রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই" বলিয়া জবাব দিতে শিখে নাই। ভৃত্য প্রভুকে পিতা বলিয়া জানিত। পণ্ডিত সাহেব ও মৌলবী সাহেব তখন অদৃশ্য হইয়াছিলেন, ডেপুটীর দল দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী মেজেষ্টর অপেক্ষা ডেপুটী কালেক্টার নামের গৌরব অধিক ছিল। ঘুস লওয়া এখন খুব বেশী থাকিলেও তখন যত ছিল, এখন তত নাই। মেজেষ্টরী কাছারীতে তখন বি-এল পাশ করা উকিলেরা আড্ডা করে নাই, মোক্তারদের সেস্থান একচেটিয়া ছিল। জজ আদালতে বি-এল দের অপেক্ষা সাবেক উকিল এল-এল ও কমিটী পাশ-দের পসার বেশী ছিল। মামলার চেয়ে সাদা পাগড়ীর খাতির বেশী হইত।

বর্দ্ধমানের গুরু মহাশয়েরা অন্তগত প্রায়, জল বিছুটী ও নাগরদোলা পণ্ডিত মহাশয়েরা কখন আদর করেন নাই। বড় বড় ভদ্র গ্রামে বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হইতেছিল। ইংরাজী শিখিতে হইলে সহরে রাজকীয় বিদ্যালয়ে ও পাদরীদের স্কুলে ছেলেরা পড়িতে যাইত। বড় বড় গ্রামে কচিৎ একটী লোক দেখা যাইত, যে সাহেবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিত। ইংরাজী পড়িলে ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়, এই ভয়টা বড় বেশী ছিল। বড় মানুষের ছেলেরাই ইংরাজী শিখিত। পনর ষোল বৎসর বয়সের কমে কেহ ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিত না।

গ্রামে গ্রামে চৌকিদার থাকিত, পাহারাওয়ালার সৃষ্টি হয় নাই। থানা ছিল, ফাঁড়ী হয় নাই, ছেলেবেলা ফাঁড়ী বলিতে [illegible] বুঝিতাম। আট দশ খানি গ্রাম একটী থানার অধীনে ছিল। থানার দারোগা বলিলে দাড়ীওয়ালা জুতাওয়ালা মুসলমান বুঝিতাম, থানা বসিবার পূর্ব্বে চৌকিদার গ্রামের জমিদারের অধীন ছিল। জমিদারকে চোর ডাকাইত ধরিয়া দিতে হইত [illegible]

মেজেষ্টার সাহেবকে খবর দিতে হইত। জমিদারের আমামোক্তার কাছারিতে নিত্য হাজির থাকিতেন। দারোগার সৃষ্টি হইলে জমিদার সুরথালের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সুরথাল করিতে দারোগাকে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইত। দারোগার বদলাবদলী বড় বেশী হইত না। দারোগার ঘুশ লওয়া ও অত্যাচার করা এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল। চুরি ডাকাইতিও অধিক হইত। তবে চুরির অপেক্ষা ডাকাইতি কিছু বেশী হইত। দরিদ্র লোকের সংখ্যা এত অধিক হয় নাই এবং মধ্য শ্রেণী লোকে এত দরিদ্র হয় নাই। ছাতা জুতা, থালা বাসন তখন নিম্ন শ্রেণীর ঘরে দেখা যাইত না বটে, কিন্তু মাছে ভাতে দিন কাটিত, একবেলা খাওয়া কি অনশন করার আবশ্যক হইত না। গৃহস্থের দাতৃত্ব অধিক ছিল। এখন ভিখারীর সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, দাতৃত্ব তেমনি কমিয়াছে। আয় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা বাড়িয়াছে। দারোগারা কবুল করাইবার জন্য প্রকাশ্যভাবে পীড়ন করিতে সঙ্কুচিত হইত না। পীড়নকালে যে সকল বীভৎস কাণ্ড করা হইত, এখন কল্পনা করিতে হৃৎকম্প হয়।

গতায়াতের খুব অসুবিধা ছিল। পাকা রাস্তা প্রায় ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী অতি অল্প ছিল, সে গাড়ীর চেহারাও ভিন্ন ছিল— এখনকার পাল্কী গাড়ীর মত নহে। জমিদারেরা পাল্কী চড়িত। ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেনসরী ছিল না। কবিরাজেরা ভুলি করিয়া রোগী দেখিতে আসিতেন। একটা পিত্তলের বড় ডিবায় ঔষধ সঙ্গে করিয়া আনিতেন। সাধারণ লোকে দশ বার ক্রোশ হাটিতে ক্লান্ত হইত না, যাহাদের আবশ্যক হইত, গরুর গাড়ী চড়িত। তখন হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল চলিয়াছিল। কিছু দিন পরে শিয়ালদহ হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেল চলে। তখন শিয়ালদার নাম ছিল শিবাদহ।

খবরের কাগজের নাম লোকে জানিত না। মাসিক পত্রের প্রচার ছিল না। অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে শতকরা দশজন লোকে নাম সহি করিতে পারিত না। সাহিত্যের চর্চ্চা ও আদর ছিল না। বৃদ্ধেরা কখন কখন কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশী দাসী মহাভারত শুনিতেন, একজনে পড়িত, আর দশজনে কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া শুনিত। কথকথার বড় আদর ছিল। দাঁড়া রামায়ণ ও মনসার গানের খুব আদর ছিল। যুবকেরা কেহ কেহ লয়না মজনু, নবনারী, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িত। পরন্তু মাছ ধরার সুখের তুলনায় পড়াশুনা নগণ্য ছিল।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তারা মা'র প্রতি।

খেলিব না ব্রহ্মময়ি! এ খেলা তোমার,
ক্ষণে কাঁদা ক্ষণে হাসা,
ক্ষণে নৈরাশ্য, পুনঃ আশা,
মরে বাঁচা, বেঁচে মরা—পারিনাতো আর।
যে জন খেলিতে চায়,
তারেই খেলাও হায়,

আমি না চরণতলে করি নমস্কার ;
আমি খেলিব না তারা, এ খেলা তোমার।

অক্ষম দুর্ব্বল আমি, তবু এ সংসার,
তিলেক করে না ক্ষমা,
তুমি তো দেখ না ওমা!
রাক্ষসের মত করে কত অত্যাচার!—
লয়ে মম সর্ব্বস্ব,
বিনিময়ে দেয় ভস্ম,
কাঁদিয়া পড়িলে পা'য় দয়া নাহি তার ;
আমি খেলিব না মাগো, এ খেলা তোমার!

খেলিবনা রঙ্গময়ি! এ খেলা তোমার—
হৃদয়ের যা' মহত্ব,
উদারতা মনুষ্যত্ব,
ক্রমে হারাইনু সব, বলিব কি আর!—
"মানব-বঞ্চক-জাতি
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী"
হেন পাপে পাপী হয়ে আছি অনিবার!
এ দারুণ খেলা হায়,
কেবা খেলিবারে যায়,
বুক ফেটে মুখে রক্ত নাহি উঠে কা'র?—
কি বিষম বিড়ম্বনা,
আমি তো মা খেলিব না,
"জয় পরাজয়" সাধ নাহি গো আমার!—
ছেড়ে এ নিঠুর খেলা,
ঘরে চল এই বেলা,
চরণকমলে এই ভিক্ষা অভাগার—
আমি খেলিব না মাগো! এ খেলা তোমার।

শ্রীমানকুমারী দাসী,
সাগর দাঁড়ি।

বসন্ত প্রভাত।

এস এস মধুময় নবীন অতিথি,
কোলে মলয়ের ডালা, কুন্তলে কুসুমমালা,
শ্রীঅঙ্গে আনন্দ মাখা, আঁখি ভরা ভাতি,

১

নব রূপে রূপবতী স্বর্ণবরণী ধরা
কোমল কুসুম কোলে, কিরণে পরাণ খোলে,
বিশ্ব-প্রেমে মনোরম সুখে আত্মহারা।

২

বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি নীলিম আকাশে
পাখী গায় জয়-গাথা,
সুখে ভোর ফুল-লতা,
কম্পিত বাঁধুলি-বধূ মৃদুল বাতাসে।

৩

মুখরিত—কোকিলের অশ্রান্ত কূজনে
কোমল কুসুমাবলী, অতীত কালের পুণ্য,
প্রকৃতির এই সুখ বিধির বিধানে।

৪

গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন মুকুলে মুগ্ধ অলি
মৃদু গুঞ্জরিয়া ফিরে, পত্র-পুষ্প শোভা করে,
আঁকা বাঁকা শ্যাম শাখা, লতা আছে ঝুলি।

৫

পল্লবিত শ্যামতরু শিশিরাশ্রু ভরা,
নবীন কিরণটুক, ধীরে ধীরে তোলে মুখ,
প্রাণভেদী ফোটে যেন সুখের ফোয়ারা।

৬

দিকবধূ সাজ করে পুষ্প-হার গাঁথি।
ভ্রমরার ভোঁ ভোঁ গান, মাতাইয়া তোলে প্রাণ,
ফুলবনে ফুল আছে মধু শয্যা পাতি।

৭

আকাশের নিরজনে চালে শোভারাশি,
নবীন নীরদমাল, প্রকৃতির কেশজাল,
প্রভাতের শুভ্রহাসি তাহে আছে মিশি,

৮

লোহিত উজ্জ্বল আভা নীল নভে জলে
নদীটি প্রফুল্ল মুখ, ক্রীড়া চঞ্চলিত বুক,
তরীটি আরোহী নিয়ে ধীরে যায় চলে।

৯

স্নাত হয়ে সিন্ধুনীরে তরুণ তপন,
আপন আঁকি কাগারে, প্রবেশিছে গোবরিকে,
তার রূপে চরাচরে খুয়েছে কিরণ।

শ্রীঅরুণাসুন্দরী দাসী।